পড়ার বইয়ের বাইরে পড়া

শ্রীপান্থ

'কাজের পড়া'-র ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই লেখক হাতে তুলে নিয়েছেন আপাত 'অকাজ'-এর কোনও বই। সে-পড়া শুধু পড়ার আনন্দেই। এক অর্থে, নিছক ছুটির পড়া। সেই আনন্দ-পাঠের যৎসামান্য নিয়ে এই বই। এ-বইয়ের কোনও মূল পরিকল্পনা নেই। নেই কোনও বিষয়-কেন্দ্রিকতা। এখানে পুষ্পিত উদ্যানে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে শুধু উড়ে বেড়ানো।

পড়ার বইয়ের বাইরে পড়া

শ্রীপান্থ
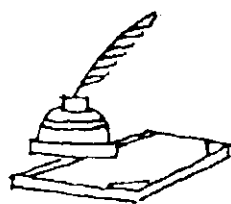
প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ **মুদ্রণ সংখ্যা** ১০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০০৫ **মুদ্রণ সংখ্যা** ১০০০

ISBN 81-7756-412-9

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে মুদ্রিত।

২৫০.০০

প্রস্তুতি-পর্বে সব বইয়ের নেপথ্যে
যাঁর বিশেষ ভূমিকা, অথচ
প্রথম বইয়ের পর যাঁকে কিছুই
আর দেওয়া হয়নি সেই

মীরা সরকারকে

পড়ার বাইরে পড়া নিয়ে

স্কুলে ওপরের ক্লাসের একজন দাদা ছিলেন। খুবই রাশভারি ছেলে। অন্যরা আড়ালে বলত ওর নাকি খুব “আউট নলেজ” রয়েছে। সবাই তাকে সমীহ করে চলত। আমিও। সেইসঙ্গে আমার কিছুটা ঈর্ষাও হত। ওর যদি “আউট নলেজ” থাকে, তবে আমারই বা থাকবে না কেন? সেই শুরু। স্কুল ছুটির পর চলে যেতাম স্কুলের লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরি নিচু ক্লাসের ছেলেদের জন্য খোলা থাকত সপ্তাহে মাত্র দু'দিন। হাতের কাছে যা পেতাম তা-ই নিয়ে আসতাম। ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা ছিল না। তবে ভাল লাগা, ভাল না লাগা ছিল বটে। সুতরাং, ফের কবে লাইব্রেরি খোলা পাব তার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠতাম। গরমের বা পুজোর লম্বা ছুটিতে সে-ক্ষুধা মেটাতাম গ্রামের নাতিবৃহৎ লাইব্রেরিতে। কত আবোল-তাবোল যে পড়েছি তখন তার ঠিকঠিকানা নেই। হ্যাঁ, বড়দের বইও বাদ পড়েনি।

পরবর্তীকালে যখন অনিশ্চিত পায়ে লেখালেখির খেলায় জড়িয়ে পড়ি, তখন আবার শুরু হয় অন্যরকম পড়া। কোনও একটি বিশেষ বই পড়তে গিয়ে হয়তো আটকে গেলাম ভাললাগার মায়াজালে, তখন সে-বিষয়ে আরও বই না-পড়লেই নয়। হাতের নাগালে যা পাওয়া যায় পড়তে হবে সবই। দরকার হলে হাত বাড়াতে হবে দেশের বাইরে। এ-পড়াকে আমি বলি—“কাজের পড়া”। কেননা, সব পড়ার পর তাগিদ অনুভব করি, এই পড়ার আনন্দ অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করার, দুই মলাটের মধ্যে সব ভাবনা পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার। এ-ভাবেই রচিত হয়েছে আমার সব বই। তার পাতায় মৌলিকতা বলতে তথ্য সমাবেশে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আর নিজস্ব ভাব ও ভাষা। বাদবাকি যা তার প্রায় সবটুকুই “কাজের পড়া”-র সূত্রে পাওয়া। আর, সত্যি বলতে কী, এই “কাজের পড়া”-তেই কেটে গেছে জীবনের বেশির ভাগ সময়।

তবু, বাল্যের সেই নেশা যাবে কোথায়? “কাজের পড়া”-র ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই হাতে তুলে নিই আপাত “অকাজের” কোনও বই। সে-পড়া শুধু পড়ার আনন্দেই পড়া। তার পিছনে, সবিনয়ে বলি, বই লেখার মতো কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না। এখনও থাকে না। সে-সব আমার, এক অর্থে, নিছক ছুটির-পড়া। সেই আনন্দ-পাঠের যৎসামান্য নিয়ে এই বই। এ-বইয়ে কোনও মূল পরিকল্পনা নেই। নেই কোনও বিষয়-কেন্দ্রিকতা। এখানে পুষ্পিত উদ্যানে শুধু এক ফুল থেকে অন্য ফুলে উড়ে বেড়ানো। পল্লবগ্রাহী যথা। সেদিক থেকে এ-বইকে বলা যায়— পল্লবগ্রাহীর পাঠসূচি। কিছু শুভানুধ্যায়ী আর আগ্রহী পাঠকের তাগিদে কিছুটা সংকোচের সঙ্গে হলেও শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে তা ছাপা হল। এখন সভয়ে ও সকৌতুকে প্রতিক্রিয়ার প্রতীক্ষা।

যে-সব বিদেশি বই নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে তার সব কয়টি তসলিমা নাসরিনের সৌজন্যে পাওয়া। বছরের পর বছর নানা বিষয়ে আমার পছন্দের সব বই সংগ্রহ করে উপহার হিসাবে নিয়মিত আমাকে পাঠিয়ে চলেছেন। তাঁকে আর ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করব না। নব্বুইয়ের দশকের প্রথমে তাঁর রচনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে তাঁর সাহসী কলম যে চমক ও প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিল তসলিমা নিঃসন্দেহে তা পূরণ করে চলেছেন। দেশান্তরি এবং নানা পারিবারিক বিপর্যয় ও নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা তুচ্ছ করে এখনও তাঁর কলম সমান ধারালো, সাহসী এবং আপন আদর্শে স্থিত। এ কৃতিত্ব সামান্য নয়। আশা রাখি তাঁর নিরলস কলম বাঙালি পাঠকদের ভবিষ্যতেও সমান তৃপ্ত করবে।

রচনাগুলি সবই প্রকাশিত হয়েছিল ‘দেশ’ ও ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য়। বেশির ভাগই ‘দেশ’-এ। গ্রন্থাকারে প্রকাশে অনুমতি দেওয়ার জন্য ওই দুই বিখ্যাত কাগজের সম্পাদকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। লুপ্ত না হলেও অধিকাংশ রচনাই ছিল বিস্মৃতির অতলে সুপ্ত। ফাইলের পর্বত-প্রমাণ স্তূপ থেকে সেগুলি উদ্ধারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রধান গ্রন্থাগার-উপদেষ্টা শক্তিদাস রায়। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। অথচ দায়-মুক্ত হই সে-সাধ্য নেই।

গ্রন্থনায় সহযোগিতা করেছেন দুই নবীন সহযোগী পুষ্পেন্দু নাথ ও গৌতম বিশ্বাস। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

কলকাতা,
অক্টোবর, ২০০৩

শ্রীপান্থ

সূচি

বইয়ের ভুবন

ছবির পর ছবি। একটি হাত চেয়ারের হাতলে। তাতে মাথা রেখে মন দিয়ে কোলে রাখা একটি জড়ানো পুঁথি পড়ছেন তরুণ অ্যারিস্টটল। তাঁর পা-দুটি আড়াআড়িভাবে একসঙ্গে জোড়া।... মাথায় পাগড়ি, মুখে লম্বা দাড়ি। নাকের ডগায় ক্লিপ দিয়ে আঁটা দুই খণ্ড কাচ। বই পড়ছেন ভার্জিল। এ ছবি তাঁর মৃত্যুর পনেরো শো বছর পরে আঁকা।... একটি চওড়া সিঁড়িতে বসে হাঁটুতে খোলা একটি বই রেখে মগ্ন সেন্ট ডোমিনিক। বইয়ের বাইরে তাঁর কাছে পৃথিবীর যেন কোনও অস্তিত্ব নেই।... গাছের নীচে একসঙ্গে কবিতার বই পড়ছেন পাওলো আর ফ্রান্সেসকা, দুই প্রেমিক। একজনের হাত চিবুকে, অন্যজনের দুই আঙুল স্পর্শ করে আছে খোলা বইয়ের পাতা। অতি অন্তরঙ্গ দৃশ্য। কে জানে, কোনও দিন এ-বই ওঁরা শেষ করতে পারবেন কি না... খোলা বই হাতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে চলেছেন দুই মুসলমান যুবক। ওঁরা চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র। যেন ক্লাসে ঢোকবার আগে সদ্য-পড়া পাতাগুলো আর-একবার ঝালিয়ে নেওয়া। এ ছবি দ্বাদশ শতকের।... কোলে একটি খোলা বই। শিশু যিশু উচ্চাসনে বসে তা-ই পড়ছেন। সামনে বসে বয়স্ক পাঠকেরা। শিশুর বক্তব্য তাঁরা কেতাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছেন।... মিলানের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা ভালেন্তিনা বালবিয়ানি আধশোয়া অবস্থায় গালে হাত রেখে বই পড়ছেন। পাশে তাঁর প্রিয় কুকুর। কবরের ওপর বসানো মর্মরপ্রতিমা।... শহর থেকে দূরে এক নির্জন পরিবেশে বসে সেন্ট জেরোম একটি পাণ্ডুলিপি পড়ছেন। পায়ের কাছে শুয়ে আছে একটি সিংহ। যেন পাঠ শুনছে।... মানবতাবাদী তাপস ইরাসমাস বন্ধু ও সহযোগী গিলবার্ট কুজিনের সঙ্গে বসে একটি বই পড়ছেন। সেকালের একটি কাঠখোদাই।...পুষ্পিত এক উদ্যানে বসে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে একটি চিত্রিত পুথি পড়ছেন সপ্তদশ শতকের ভারতের এক কবি। মুঘল মিনিয়েচারে ধরা সমকালের ছবি।... সামনে লম্বা লম্বা তাক। তাতে সাজানো রয়েছে ৮০ হাজার কাঠের পাটা। সপ্তম শতকে খোদাই করা ত্রিপিটক কোরিয়ানা। নবীন সন্ন্যাসী সেখান থেকে একটি পাটা হাতে নিয়ে পরখ করছেন। আধুনিক কালের আলোকচিত্র।... পাথরের ওপর একটা চাদর অথবা কম্বল বিছিয়ে গালে হাত রেখে আকাশপাতাল ভাবছেন দিগ্‌বসনা

মেরি ম্যাগডালেন। তাঁর সামনে একটি খোলা বই। বইটি চিত্রিত।... চার্লস ডিকেন্স অনুরাগী পাঠকদের নিজের উপন্যাস থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন।... দৃষ্টিশক্তিহীন হর্হে লুই বর্হেস দুই চোখ বন্ধ করে সব মনোযোগ সংহত করে অদেখা পাঠকের পাঠ শুনছেন।...

পাথরে খোদাই করা, অথবা রং-তুলিতে আঁকা কিংবা ক্যামেরার চোখে দেখা একের পর এক ছবি। যুগযুগান্তরের পাঠকের ছবি। এভাবে যখন কোনও বই শুরু হয় তখন বাধ্য হয়েই, এমনকী পল্লবগ্রাহী পাঠকেরও উপায় থাকে না লেখকের পিছু নেওয়া ছাড়া। চোখের সামনে এই আলেখ্যলহরী তুলে ধরে তিনি যখন বলেন— আমি নিঃসঙ্গ নই, তখন আমার মতো সামান্য পাঠকও মনে মনে বলি— নিঃসঙ্গ নই আমিও। কারণ, আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি দূরদেশের এমন এক পাঠককে যিনি শুধু যে বিস্তর পড়েছেন তা-ই নয়, তিনি অন্যদের পড়াতেও জানেন। বস্তুত আলবের্তো মাঙ্গোয়েল-এর (Alberto Manguel) 'আ হিস্ট্রি অব রিডিং' এমন একটি বই যা না-পড়লে সত্যকারের জ্ঞানী পাঠকের হয়তো কোনও ক্ষতি নেই কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে সেটা বিবেচিত হতে পারে বঞ্চনা বলে। দুই মলাটের মধ্যে তিনি সাদা-কালো হরফ আর ছবিতে যেভাবে বন্দি করেছেন সর্বকালের পাঠককে এবং একই সঙ্গে যেভাবে মিলিয়ে নিয়েছেন নিজের পাঠকে তা দেখলে অবাক হতে হয়। পৃথিবীর সব পড়ুয়াকে নিয়ে, প্রায় সব বাগিচা থেকে কুসুম চয়ন করে যে-বর্ণাঢ্য এবং সুরভিত মালাটি তিনি রচনা করেছেন সেটি সম্ভব হয়েছে শুধু এ-কারণে যে, মাঙ্গোয়েল-এর মতো একজন রসিক পাঠক তার মালাকার। এ মালা বিনা সুতোর নয়, পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া একজন পাঠকের প্রিয় উপহার।

পাঠক কে নন? এই দুনিয়ায় পাঠক সবাই। মোটরগাড়ির চালক পথে বিবিধ সংকেতের পাঠ নেন। এমনকী আলোর সংকেতও। জ্যোতির্বিদ দূরবীক্ষণে আকাশের নক্ষত্রের মানচিত্র রচনা করেন। জীববিজ্ঞানী বনে পশুপাখির আচরণ অধ্যয়ন করেন। গায়ক সামনে রাখা সাংকেতিক স্বরলিপি মিলিয়ে গান করেন, নর্তকী নির্দেশকের তালিম অনুসরণ করে দর্শকদের সামনে আপন অঙ্গকে ছন্দের মতো তুলে ধরেন। দর্শক তাঁর ভঙ্গি এবং ভান থেকে রস সন্ধান করেন। তাস খেলোয়াড় খেলতে বসে প্রতিপক্ষের চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর হাতে লুকানো তাসটি কী তা বুঝতে চেষ্টা করেন। মনোবিজ্ঞানী তাঁর সামনে বসা রোগীর অন্তরের গভীরে উঁকি দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন, স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করেন। এভাবেই সর্বত্র প্রতিনিয়ত চলেছে পাঠ। যে সমাজে লিপি নেই, বই নেই, সেখানেও মানুষ পাঠক। তাঁরা আকাশের ভাষা বোঝেন, জলের স্রোত সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় প্রামাণিক বইয়েরই মতো, পশুপাখির জীবন সম্পর্কে তাঁরাও অবহিত। তাঁদের সমাজেও প্রেমিক-প্রেমিকা চোখের তারায় ভালবাসা কিংবা ঘৃণা, আনন্দ অথবা বিষাদ পড়তে জানেন, শিশু জানে মা-বাবার চোখ-মুখে কখন বিরক্তি অথবা ক্রোধ— কখন উচ্ছ্বলিত স্নেহ। মাঙ্গোয়েল এই পাঠকদের চেনেন না এমন নয়। তবে তাঁর ইতিহাসে প্রায় সাড়ে তিনশো পাতাব্যাপী যে পাঠকের কাহিনী তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের হাতেই রয়েছে বিস্ময়কর এক পাঠবস্তু— বই।

মানুষের পৃথিবীতে প্রথম বই কবে?— কোথায়? আদি গ্রন্থ, বলা নিষ্প্রয়োজন, কোনও

ধর্মগ্রন্থ নয়। মাঙ্গোয়েল জানাচ্ছেন বাগদাদের পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় দুটি মাটির ফলক ছিল। ছিল, কিন্তু এখন আছে কি নেই তাঁর জানা নেই। কারণ, ইতিমধ্যে উপসাগরীয় যুদ্ধ নামে একটি খণ্ডপ্রলয় ঘটে গেছে ওই এলাকায়। এই ফলক দুটি খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৮৪ সালে সিরিয়ার তেল বার্ক নামে একটি স্থানে। পুরাতাত্ত্বিকরা বলেন আয়তক্ষেত্রাকার ওই ছোট্ট দুটি ফলকই পৃথিবীর প্রথম বইয়ের দুটি পৃষ্ঠা। ফলক দুটির গায়ে সাংকেতিক চিহ্ন থেকে বোঝা যায় সে-দুটি যেন হিসাবের খাতার দুটি পাতা। তার একটিতে রয়েছে দশটি ছাগলের ইঙ্গিত, অন্যটিতে দশটি ভেড়ার। এই আদি লিপিকৌশল সুমেরিয়ানদের অবদান। সভ্যতা এই আশীর্বাদ লাভ করেছে খ্রিস্টজন্মের চার হাজার বছর আগে। ক্রমে সাংকেতিক চিহ্ন আর-একটু স্পষ্টতর পরিণতি লাভ করে। মেসোপটেমিয়াতেই মাটির ফলকে জন্ম নেয় অভিনব চিত্রাক্ষর। সাংকেতিক ছবিতে মানুষের বক্তব্য প্রকাশের উদ্‌যোগ। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে চিত্রাক্ষর ধারণ করে আরও উন্নত, আরও বাঙ্ময়, আরও অর্থবহ নতুন এক লিপির রূপ—'কিউনিফর্ম'। যেন কৌণিক নখচিহ্ন। চিত্রাক্ষর ছিল সাকুল্যে হাজার দুই, এবার যে-প্রতীক আবিষ্কৃত হল বাধাবন্ধহীন তার প্রকাশক্ষমতা। সাহিত্য, দর্শন, মহাকাব্য, প্রেমের কবিতা, হাস্যরসাত্মক রচনা— সবই রচিত হল নতুন লিপিতে। মেসোপোটেমিয়া সাম্রাজ্যে তো বটেই, পরবর্তীকালে সুমের, আকডিয়া, আসিরিয়ান সাম্রাজ্যেও পনেরোটি ভাষায় লেখালেখি চলেছে এই লিপিতে। আজ যদি প্রাচীন পৃথিবীর সেই বিস্মৃত মানচিত্রের সীমারেখা টানা যায় তবে তার অন্তর্ভুক্ত হবে আজকের ইরাক, পশ্চিম ইরান এবং সিরিয়া। তার মানে এই নয়, প্রাচীন মেসোপোটেমিয়ায় মাটির ফলকে শুধু ছোট-বড় বইই লেখা হয়েছে। বৃহৎ পাঠ্যও ছিল বটে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে আসিরিয়ার আইন সর্বজনের গোচরে আনার জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ৬৭ বর্গফুট মাপের এক, শিলা নয়, মৃত্তিকালিপি। প্রত্নতাত্ত্বিকরা সেটি উদ্ধার করেন আসুর থেকে। সেই বৃহৎ মৃত্তিকাখণ্ডের দু' পৃষ্ঠায়ই লিপিবদ্ধ হয়েছিল সাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য। খেদের কথা এই, এইসব লিপি প্রসঙ্গে মাঙ্গোয়েল অশোকের শিলালিপি, নানা ভাষায় লেখা ভারতীয় তাম্রশাসন এবং সুপ্রাচীন বিবিধ দলিলগুলোর কথা উল্লেখ করেননি। ভারতে শিলালিপির ইতিহাস শুরু হয় কমপক্ষে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে।

প্রাচীন মিশরেও ছিল চিত্রাক্ষর—হাইয়ারোগ্লিফ (Hieroglyph)। এমন প্রতীক যা একই সঙ্গে শব্দ, ধ্বনি, ভাব ধারণে সক্ষম। সক্রেটিস বই-বিরোধী ছিলেন। সে-কথা পরে হবে। তিনি শিষ্যদের ওই প্রসঙ্গে মিশরীয় দেবতা 'থোত' (Thoth)-এর একটি কাহিনী শুনিয়েছিলেন। থোত জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, লিপি এবং সংখ্যার দেবতা। তিনি প্রাচীন মিশরের এক অধিপতিকে বলেন, বর নাও, তোমার প্রজাবর্গের মধ্যে এইসব বিদ্যা ছড়িয়ে দাও। সম্রাট আর সব নিতে সম্মত, কিন্তু লিপি নয়। কারণ, তিনি বললেন—মানুষ যদি এই বিদ্যায় পারংগম হয় তবে তাদের স্মৃতিশক্তি লোপ হবে, তারা মস্তিষ্কের ব্যবহার ভুলে যাবে, স্মৃতি নয়, তারা নির্ভর করবে বাইরের কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্নের উপর।

তবু লিপি। তবু বই। বিশ্বময় কত না লিপির ছড়াছড়ি। কত না তাদের রূপ, কত না তাদের রহস্য। বেশ-কিছু লিপির এখনও রহস্যভেদ করতে পারেননি গবেষকরা। এখনও অপঠিত লিপির তালিকায় নির্বাক বসে আছে যারা সে তালিকায় রয়েছে: সুমেরিয়ান,

মিনোয়ান, আজটেক, মায়ান এবং হরপ্পার লিপি। মাঙ্গোয়েল-এর তালিকায় কিন্তু হরপ্পার বিশ্বখ্যাত সিলমোহরগুলির উল্লেখ নেই।

লিপির মতোই বিচিত্র বইয়ের পৃথিবী। মেসোপোটেমিয়ায় যদি মাটির ফলক, মিশরে তবে প্যাপিরাস, নলখাগড়ার বাখারি দিয়ে তৈরি করা লেখার উপাদান। মাটির ট্যাবলেট বা ফলক পর পর সাজিয়ে রাখা যেত। প্রয়োজনে থলিতে বহন করাও শক্ত ছিল না। তবে ওজনদার বই বটে! প্যাপিরাসে লেখা বই, 'স্ক্রোল', বাংলার জড়ানো পটের মতো, বা লাটাইয়ের মতো জড়িয়ে রাখার বই। এ-কিতাব আবার ভাঁজ করা যায় না। ফলে পাঠকের মনের মতো বই তখনও অনেক দূরে। মিশরের টলেমি একসময় ঘোষণা করেন—প্যাপিরাস বিদেশে রফতানি করা যাবে না। ফলে প্রয়োজন-নাম্নী দেবীর তাড়নায় ভূমধ্যসাগরীয় পৃথিবীতে লেখার উপাদান হিসাবে উদ্ভাবিত হল ভেলাম ওরফে পার্চমেন্ট বা পশুচর্ম। তার সুবিধা এই, ভঙ্গুর নয়, প্রয়োজনে দু' পৃষ্ঠায় লেখা যায়, সর্বোপরি ইচ্ছামতো আকারে কেটে নেওয়ায় কোনও অসুবিধা নেই। পার্চমেন্ট বা পশুর চামড়ায় লেখালেখির শুরু খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। হয়তো বা তারও শ'খানেক বছর আগে। তার পর এল বিশ্বজয়ী নতুন বিস্ময়— কাগজ। চতুর্থ শতক পর্যন্ত ইউরোপে পুথি লেখা হত পার্চমেন্টেই। পার্চমেন্টে জড়ানো পুথি বা স্ক্রোলও হত। আবার 'কোডেক্স' অর্থাৎ ভাঁজকরা পাতা একসঙ্গে গেঁথে 'বই'ও হত। স্ক্রোল এভাবে ভাঁজ করে পুস্তিকার মতো করে সকলের আগে বার্তা প্রেরণ করেন নাকি খ্রিস্টপূর্ব ২১৩ অব্দে জুলিয়াস সিজার। আশ্চর্য, এই বাহাদুরির জন্যও দিব্যি তারিফ আদায় করে নিলেন তিনি!

যা হোক, ৪০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পুরোপুরি বিদায় নেয় স্ক্রোল বা গোটানো বই। পাঠকের হাতে এল আধুনিক বইয়ের পূর্বসূরি—দুই মলাটের মধ্যে সমান মাপের চামড়ার পাতা। তার দু' পিঠেই লেখা। চামড়া ভাঁজ করার রীতিও চালু হয়ে গেল ক্রমে। পার্চমেন্ট দু' ভাগ করলে ফোলিও, চার ভাগ করলে কোয়ার্টো, আট ভাগ করলে অক্টাভো। ষোড়শ শতকে ইউরোপে এই বিভাগ বিধিবদ্ধ করা হয়। ফ্রান্সের নরপতি প্রথম ফ্রঁসোয়া (Francois) ১৫২৭ সালে ঘোষণা করেন— ইচ্ছামতো কেউ পাতা ভাঁজ করতে পারবে না। করলে—দণ্ড। ইতিমধ্যে অবশ্য ইউরোপের হাতে এসে গেছে কাগজ। মাঙ্গোয়েল বলছেন— কাগজ উদ্ভাবিত হয় ইতালিতে, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে। এই খবর আদৌ সঠিক নয়। ইতিহাস-পাঠক জানেন, কাগজের আদি উদ্ভাবক চিনারা। আরবদের হাত ধরে সে-বিদ্যা একদিন প্রসারিত হয় ইউরোপে এবং ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার নানা দেশে। সে-সব খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের কাহিনী। চিনে কিন্তু কাগজের ব্যবহার শুরু হয়ে যায় খ্রিস্টীয় প্রথম শতকেই। সন্ধানীরা বলেন ভারতেও হিমালয় অঞ্চলে সেই সেকালে তৈরি হত কাগজ। অবশ্য খুব উচ্চমানের নয়।

মাঙ্গোয়েল-এর এই তথ্যবহুল সুখপাঠ্য ইতিবৃত্তে আরও কিছু কিছু পীড়াদায়ক ত্রুটিবিচ্যুতি চোখে পড়ে। তিনি অনেক ঘুরেছেন, অনেক কিছু দেখেছেন, পড়েছেনও বিস্তর, কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশ বলতে গেলে তাঁর জ্ঞানের ভুবনে অনুপস্থিত। অথচ প্রাচীন এবং মধ্যযুগের এই উপমহাদেশকে বাদ দিয়ে বই বা বই পড়ার কোনও ইতিহাস রচিত হতে পারে না। সেটা বড়জোর হয়তো 'আ হিস্ট্রি অব রিডিং', কিন্তু কিছুতেই নয় 'দ্য হিস্ট্রি অব রিডিং'। তিনি জানেন না, মানুষ কীভাবে স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তার প্রধান কিছু শাস্ত্র। বলতে

গেলে ভারতীয়দের মতো শ্রুতিধর খুঁজে পাওয়া ভার। বেদ তাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে বহন করেছেন মস্তিষ্কে, ছড়িয়ে দিয়েছেন মুখে মুখে। আর, বই কি শুধু মাটির ফলক, প্যাপিরাস, আর পার্চমেন্টেই লেখা হয়েছে? ভারতে লেখালেখিতে চামড়ার ব্যবহার ছিল না। ভূর্জপত্র বা গাছের দ্বিতীয় স্তরের ত্বকে লেখা হত। একাধিক গাছ ব্যবহৃত হত এ-কাজে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে জৈন পুথি লেখা হয়েছে পান বা পাতায়। তা ছাড়া, কাঠের পাটা, কাপড়, তালপত্র, কলাপাতা, শালপাতা, কীসে নয়? আলেকজান্ডারের সহযাত্রীরা সে-সব সংবাদ পশ্চিম পৃথিবীর মানুষের গোচরে এনেছেন। শিলালিপি, তাম্রশাসন, সোনা, রুপো, এমনকী হাতির দাঁতেও লেখালেখি চলেছে এই উপমহাদেশে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পাণিনির বিস্ময়কর ব্যাকরণ। মাঙ্গোয়েল-এর কাছে সে-সব সংবাদ অজানা। অজানা এমনকী মধ্যযুগের ভারতের পুথির ইতিকথাও। তাঁর জানা নেই মুঘলসম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনী লিখেছিলেন, তাঁর পুত্র হুমায়ুন মারা গিয়েছিলেন নিজের গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে। তস্যপুত্র 'নিরক্ষর' বলে কথিত আকবর আরও অনেক বইয়ের মতো 'হামজানামা' নামে এমন এক পুথি লিখিয়েছিলেন যে, তাতে ছবি ছিল ১৪০০টি। বাদশাহের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পুথি ছিল ২৪ হাজার। ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটেনের রাজকীয় লাইব্রেরি উইন্ডসর কাস্‌ল-এর সংগ্রহ থেকে এ দেশের দর্শকদের দেখার সুযোগ দিয়েছেন আর-একটি নয়নাভিরাম অলংকৃত বই— শাজাহানের উদ্‌যোগে শুরু করা—'বাদশানামা'। সে-বই সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কেও দেখানো হয়েছে। দর্শকদের নয়নসুখের জন্য ব্যবস্থা ছিল অণুবীক্ষণেরও। আহা, মাঙ্গোয়েল যদি সেই দীর্ঘ দর্শক-সারিতে হাজির থাকতেন! আর্জেন্টিনার সন্তান এই গ্রন্থকীটের বয়স খুব বেশি নয়। যদিও বিশিষ্ট লেখক, সম্পাদক এবং সংগ্রাহক আলবের্তো মাঙ্গোয়েল এখন কানাডার নাগরিক, দুষ্প্রাপ্য এবং বিস্ময়কর একটি মুঘল পুথি অনায়াসেই তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে পারত নিউ ইয়র্ক! হয়তো সে সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেননি। আমরা তা জানি না। এ-বই প্রকাশিত হয়েছে গত বছর (১৯৯৬)। 'বাদশানামা' দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে ১৯৯৭ সালে।

সে-সব কথা থাক। কাগজের পর ইউরোপে এল ছাপাখানা। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়কার কথা। ১৪৫০-১৪৫৫ সালের মধ্যে জার্মানিতে প্রকাশিত হল গুটেনবার্গের ঐতিহাসিক বাইবেল। ১২" × ১৬" মাপের কাগজে ৪২টি নয়নাভিরাম সুস্পষ্ট ছত্র। পার্চমেন্টে এ-বই লিখতে হলে নাকি মারা পড়ত দু'শো ভেড়া। ছাপা হয়েছিল মাত্র ১৫৮টি বই। কেউ কেউ বলেন ১৮০টি। এ-বই পশ্চিমি দুনিয়ায় তো বটেই, মুদ্রিত বইয়ের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ, গুটেনবার্গ বইটি ছেপেছিলেন ধাতু দিয়ে তৈরি হরফে। এমন হরফ যা সহজেই অদলবদল করা যায়, যাকে বলে—'মুভেবল মেটাল টাইপ'। সাম্প্রতিক কালে মুদ্রণে কম্পিউটার-এর প্রয়োগের আগে পাঁচশো বছরেরও বেশি কাল ধরে বিশ্বময় বই ছাপা হয়েছে গুটেনবার্গ-উদ্ভাবিত সেই পদ্ধতিতেই। সেই প্রযুক্তি দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইউরোপে। তার পর বিশ্বময়। ১৫০০ সালের মধ্যেই ছাপা হয়ে যায় ৩০ হাজার বই। ছাপাখানার শৈশবের সেই অবদানকে বলা হয়—'ইনকুলাবুলা'। এই লাতিন শব্দটির অনুষঙ্গ দোলনার সঙ্গে।

এখানেও মনে হয় মাঙ্গোয়েল দু'-একটি মারাত্মক ভুল করেছেন। তাঁর মুদ্রণের ইতিহাসে

১৯০৭ সালে তুর্কিস্থানের গিরিকন্দরে ব্রিটিশ পুরাতাত্ত্বিক অরেলস্টাইন 'হীরকসূত্র' নামে যে মুদ্রিত জড়ানো পুথিটি খুঁজে পান তার উল্লেখ নেই। অথচ চিনা ভাষায় লেখা সচিত্র এই পুথিটিই প্রথম মুদ্রিত বই বলে বন্দিত। এটি কাঠের ব্লকের সাহায্যে ছাপা হয়েছিল ৮৬৮ সালে। পরবর্তীকালে গবেষণায় জানা গেছে চিনের উদ্ভাবনী শক্তি বারুদ, রেশম, চা, পোর্সেলিন আর কাগজ আবিষ্কারেই ফুরিয়ে যায়নি। গুটেনবার্গের অনেক আগে চিন চলনক্ষম ধাতব হরফ তৈরির কাজেও হাত লাগিয়েছে। মাঙ্গোয়েল-এর কাছ থেকে এ-সব তথ্যও কিন্তু পাঠকের প্রাপ্য ছিল।

যা হোক, শুরু হল মুদ্রিত বইয়ের জয়যাত্রা। আকারে প্রকারে, বিষয়বৈচিত্র্যে এবং মুদ্রণের কৃৎকৌশলে বইয়ের দুনিয়া বুঝি বা পৃথিবীর মতোই বিস্ময়কর এক ভুবন। তার জয়যাত্রায় কত না ঘটনা! ১৯৩৫ সালে আগাথা ক্রিস্টিদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে রেলস্টেশনে মনের মতো পাঠ্য খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ অ্যালেন লেন ১৯৩৫ সালে একসঙ্গে দশখানা বই নিয়ে নতুন দিগন্তের লক্ষ্যে পা বাড়ালেন। পাঠকের পকেটে এল 'পেঙ্গুইন'। দেখতে দেখতে 'পেপার ব্যাক'-এ ছেয়ে গেল বাজার। ১৯৭০ সালে— কম্পিউটার। ছাপায় যুগান্তর। যুগান্তর পাঠকের জীবনেও। কম্পিউটার স্মৃতিধর। কম্পিউটার প্রয়োজনে গ্রন্থভুক। বোতাম টিপলেই যা চাই তা চোখের সামনে। টেড নেলসন দীক্ষিত করলেন নতুন বিদ্যায়, এল— 'হাইপারটেক্সট'। তার পর আরও কত কী!

আমি যেভাবে যুগ থেকে যুগান্তরে লাফিয়ে চলে এলাম মাঙ্গোয়েল অবশ্যই সেভাবে কাজ সারেননি। তাঁর বিবরণ কাছের রেলযাত্রীর বই পড়ার মতো নয়, তিনি ঘটনাবলি বিবৃত করেছেন ধীরেসুস্থে, বিস্তারিতভাবে। নতুন যুগে বই কি তবে মৃত্যুর অপেক্ষায়? কোনও এক বইমেলায় জাক দেরিদা বলেছিলেন— কলকাতায় এসে মনে হল বই এখনও জীবিত। মাঙ্গোয়েল বলছেন, জীবিত এমনকী খাস আমেরিকায়ও। ১৯৯৫ সালে লাইব্রেরি অব কংগ্রেস-এর ভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে ৩,৫৭,৪৩৭টি নতুন বই! এই গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা এখন ১০ কোটির উপর। তা ছাড়া, কম্পিউটার নিজেও কি বইয়ের স্মৃতি বহন করছে না? মুদ্রিত বই নানা লক্ষণে যেমন স্মরণ করিয়ে দেয় পুথির যুগের কথা, কম্পিউটারও তেমনই স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনে স্ক্রোল বা জড়ানো পুথির কথা। কখনও উপর থেকে নীচের দিকে, কখনও নীচ থেকে উপরের দিকে। স্ক্রিনের পাঠক কি জানেন তিনি স্ক্রোল পড়ছেন!

সক্রেটিস ছিলেন বইয়ের বিরুদ্ধে। প্রাচীন পৃথিবীর আরও অনেক জ্ঞানতাপসের মতো তিনিও মৌখিক পরম্পরায় বিশ্বাস করতেন। মোজেস, বুদ্ধ এবং যিশুর মতো তিনিও ছিলেন বাক্‌পতি। যিশু নাকি একবার বালির উপর কী লিখে ফেলেছিলেন, পরক্ষণে শিশুর মতো নিজেই তা মুছে দেন। সক্রেটিস বলতেন— বই বড়জোর স্মৃতির সহায়ক হতে পারে, কিন্তু মনের উৎস কখনও নয়। লিখিত শব্দের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি শিষ্যদের সজাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি বইকে তুলনা করেছেন আঁকা ছবির সঙ্গে। দর্শক চোখের সামনে পটে মানুষজন এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু সে-সব প্রাণহীন। কিছু জিজ্ঞাসা করলে কোনও উত্তর মেলে না। লিখিত বাক্যও তেমনই, কোনও প্রশ্নের উত্তর দেয় না। তারা নির্বাক। প্রশ্ন, অর্থ, ব্যাখ্যা, ব্যঞ্জনা, বিশ্লেষণ— সব পাঠকের উপর নির্ভর। বই বার বার একই কথা আউড়ে যেতে পারে মাত্র। আর, পাঠক যা ইতিমধ্যে জানেন, তার বাইরে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা তার নেই। সক্রেটিস তুলনা হিসাবে চাঁদের কথা বলেছেন।

স্যার চার্লস উইলকিনস (১৭৪৯-১৮৩৬)
প্রথম যখন

ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ (১৭৫১-১৮৩০)
প্রথম যখন

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A GRAMMAR OF THE BENGAL LANGUAGE

BY

NATHANIEL BRASSEY HALHED

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নয়যুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং॥

PRINTED

AT

HOOGLY IN BENGAL

M DCC LXXVIII.

'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর নামপত্র

প্রথম যখন

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক আলবেরুণীর একটি পুথির এক পৃষ্ঠা

আবু রায়হান মুহম্মদ বিন আহমদ (আলবেরুণী, ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ)
আল ওস্তাদ

স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-৮৪)

শব্দের মায়াজালে

নোয়া ওয়েবস্টার (১৭৫৮-১৮৪৩)

অশিষ্ট শব্দের বিখ্যাত সংকলক ও ব্যাখ্যাতা এরিক প্যাট্রিজ (১৮৯৪-১৯৭৯)
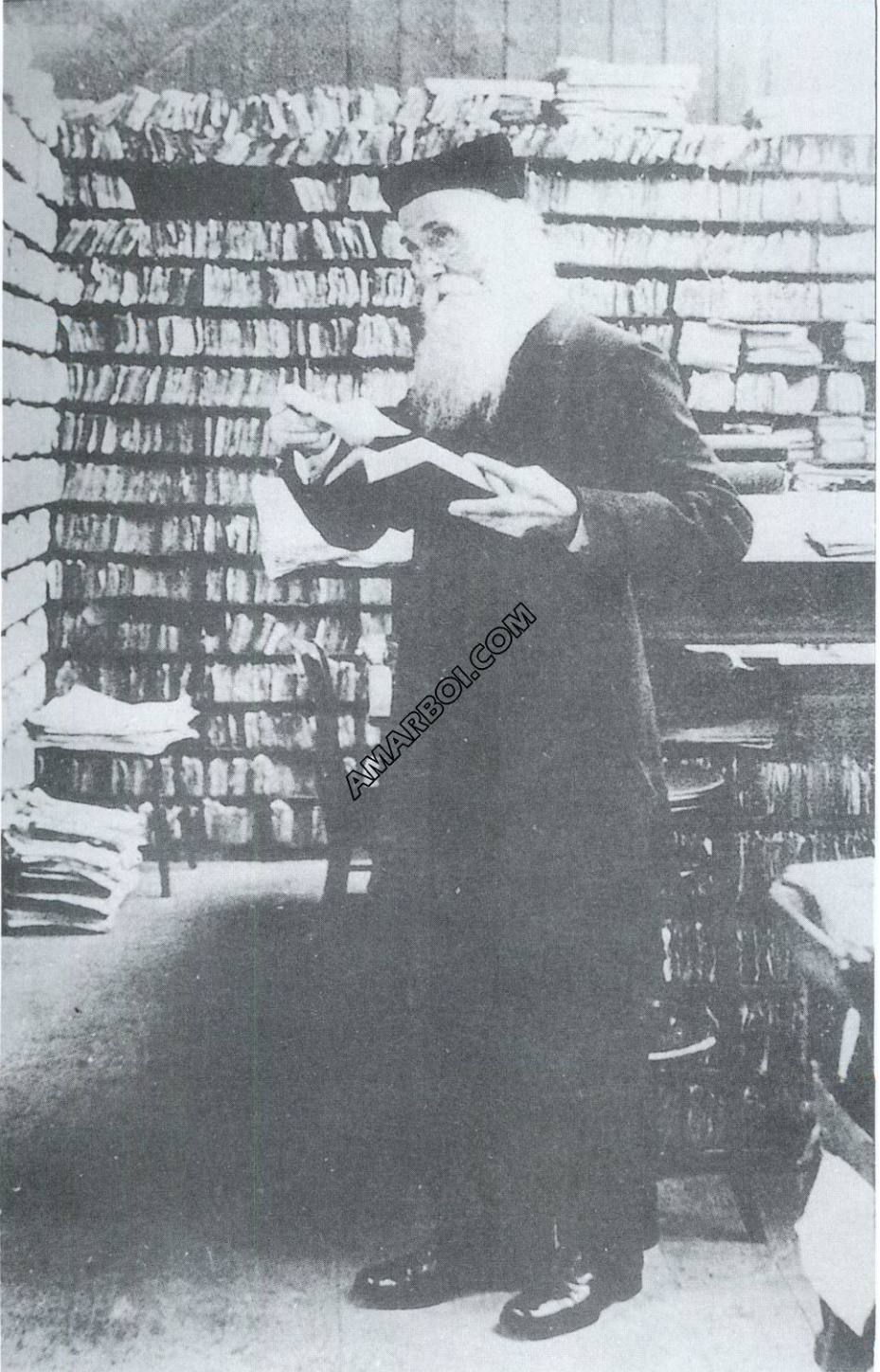
অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি-র প্রাণপুরুষ স্যার জেমস মারি (১৮৩৭-১৯১৫)।

মধ্যযুগের জাপানি পাঠিকা। কাঠখোদাই। শিল্পী হিসিকাওয়া মোরোনোবু।

পাঁচ হাজার বছর আগেকার সুমেরীয় পাঠক।

বলেছেন এথেন্সের আকাশে চাঁদ উঠেছে। তাকে ঘন কালো পটভূমিতে স্থাপন করবেন, না প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে, নাকি প্রাচীন কোনও ভাঙা অট্টালিকার মাথার উপরে, সে দায়িত্ব পাঠকের!

তাঁর এই বক্তব্যকে যাঁরা খণ্ডন করেন তাঁদের মধ্যে একজন রিচার্ড ফুর্নিভাল (Richard de Fournival)। তাঁর বক্তব্য: মানুষের জীবন দীর্ঘ নয়, অথচ পৃথিবীতে জ্ঞাতব্য অপরিমেয়। কারও একার পক্ষে অতএব সব-কিছু জানা সম্ভব নয়। সুতরাং, কেউ জ্ঞান সন্ধানে আগ্রহী হলে তাঁকে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়াতে হবে অন্যের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারের দিকে। ছবির উপযোগিতাও ব্যাখ্যা করেন তিনি, ছবি কি কেবলই শুধু পটে লিখা? অবশ্যই নয়। দর্শক মনে মনে চলে যান হয়তো অদেখা এক জগতে। হারিয়ে যাওয়া মানুষজন, ঘটনাবলি তাঁর চোখে জীবন্ত হয়ে ওঠে। যেন তিনি নিজেও হাজির সেখানে। সুতরাং, বই পড়া মোটেই অবান্তর নয়। বই বর্তমানকে সমৃদ্ধ করে, অতীতকে পুনর্নির্মাণ করে এবং তার ফলে স্মৃতি বেঁচে থাকে ভবিষ্যতের জন্য।

তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরাও কিন্তু সক্রেটিসের পরামর্শ মেনে চলতে পারেননি। মাঙ্গোয়েল জানাচ্ছেন অ্যারিস্টটল ছিলেন প্রাচীন পৃথিবীতে প্রথম ব্যক্তিগত পুথি-সংগ্রহকারী। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ছিল বেশ-কিছু মূল্যবান বই। তা ছাড়া, প্লেটো, অ্যারিস্টটলরা যদি গুরুর পরামর্শ শিরোধার্য করে বই বন্ধ করে বসে থাকতেন, তবে পরবর্তীকালের মানুষ কেমন করে জানতে পারতেন নানা বিষয়ে সক্রেটিসের বক্তব্য? প্লেটো এবং জেনোফান (Xenophon) লিখে গেছেন বলেই না সক্রেটিস এখনও জীবিত এক পণ্ডিতের নাম!

সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষের স্বপ্ন, সে ভৌগোলিক বাধাকে অতিক্রম করবে, মৃত্যু তার নিয়তি, সুতরাং সে মৃত্যুঞ্জয়ী হবে, নিজেকে সে কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেবে না বিস্মৃতির শূন্যতায়। বই সেই লক্ষ্যে এক বৃহৎ পদক্ষেপ। সুতরাং, সমূহ প্রয়োজনের বাইরেও লেখালেখি। আপাত অবান্তর বিষয় নিয়েও মগ্ন লেখক। এবং বিশ্বময় এক নতুন প্রাণের উন্মেষ, নাম যার— বই। সে পাহাড় ডিঙোতে পারে, সমুদ্র অতিক্রম করতে পারে, মরুভূমি, গহন অরণ্য কিছুই তার কাছে অনতিক্রম্য নয়। দুই মলাটের মধ্যে বন্দি যে ভাব, পাখির মতো ডানা মেলে তা অনায়াসে উড়ে যেতে পারে দেশ থেকে দেশান্তরে। এমন প্রাণশক্তির আধার বলেই তৎকালের পৃথিবীতে লেখকরা ছিলেন পূজ্য, দেবতুল্য। এমনকী লিপিকারেরাও ছিলেন বিশেষভাবে সম্মানিত। মাঙ্গোয়েল বলছেন মেসোপটেমিয়ায় লেখক তথা লিপিকারদের দেবী ছিলেন নিসাবা (Nisaba), তাঁর প্রতীক মাটির পাটা নয়, তাতে যা দিয়ে সংকেত-চিহ্ন খোদাই করা হয় সেই শলাকা— স্টাইলাস। এমনকী খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকেও আয়ার্ল্যান্ডে লেখক-লিপিকররা ছিলেন বিশেষ সম্মানের অধিকারী। কোনও লেখককে হত্যা করা ছিল যাজক-হত্যার তুল্য অপরাধ!

লেখকের পক্ষে লেখাই শেষ কথা নয়। তাঁর প্রথম প্রয়োজন— পাঠক। এমন মানুষ যিনি প্রতীকের রহস্যভেদ করতে সক্ষম, এবং তার অর্থভেদের যোগ্যতা যাঁর আছে। প্রাচীন চিনে সেই যোগ্যতা ছিল নাকি পুরোহিত-জাদুকরদের। কচ্ছপের তপ্ত খোলসের আঁকাবাঁকা ফাটলে অর্থ খুঁজতে জানতেন তাঁরা। মেসোপোটেমিয়ার কিউনিফর্ম দেখতে কিছুটা কাদামাটিতে পাখির পায়ের ছাপের মতো। সুতরাং, জ্ঞানীরা নাকি ঈশ্বরের বাণীর সন্ধানে সে-সবও পাঠ করতে চেষ্টা করতেন!

রাতারাতি কারও পক্ষে অচেনা লিপির পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তার জন্য চাই সৎগুরু, বিদ্যা যাঁর অধিগত। তাঁরাই দায়িত্ব নেন পাঠক তৈরির। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পৃথিবীতে, বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপে লেখাপড়ার ইতিহাসও সবিস্তারে চর্চা করেছেন মাঙ্গোয়েল। সেইসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে বিস্তর মানুষ এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ইউনেস্কোর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করেছেন তিনি— পৃথিবীর শতকরা ২৮ জন মানুষ পড়তে এবং লিখতে জানেন না।

যাঁরা পড়েন তাঁরা কী পড়েন, কেমনভাবে পড়েন, পড়ে কী তাঁরা পান— এ-সব নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন মাঙ্গোয়েল। এ-বইয়ে সব চেয়ে মূল্যবান মনে হয়েছে প্রাসঙ্গিক অধ্যায়গুলো। আপাতত সে-সব মুলতুবি থাক। তার আগে পড়ার পটভূমি আরও একটু স্পষ্ট করা যাক।

পাঠকের বই চাই। কিন্তু সব পাঠকের বই সংগ্রহের সামর্থ্য কোথায়? তা ছাড়া পাণ্ডুলিপির পৃথিবীতে চাইলেই বই পাওয়া যায় না। সুতরাং—গ্রন্থাগার। প্রাচীন পৃথিবীর সব চেয়ে সমৃদ্ধ, সব চেয়ে বড় গ্রন্থাগার— আলেকজান্দ্রিয়ার সংগ্রহশালা। বন্দর নগর আলেকজান্দ্রিয়ার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং আলেকজান্ডার। তার পত্তন খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে। আলেকজান্ডার মারা যান খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে। তিনি ছিলেন অ্যারিস্টটল-এর প্রিয় ছাত্র। বই পড়তে ভালবাসতেন। সামরিক অভিযানের সময়ও নাকি বিরাম ছিল না তাঁর বই পড়ার। মিশরেও তৎকালে লেখাপড়ার চর্চা ছিল। তাদের সভ্যতা সুপ্রাচীন শুধু নয়, তৎকালের পৃথিবীতে এক বিস্ময়। তবে এক ছাদের তলায় বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার তখন গড়ে তোলেননি মিশরীয়রা। সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারী টলেমিরা। প্রথম টলেমির উদ্‌যোগে তার সূচনা। তার পর দায়িত্ব নেন দ্বিতীয় টলেমি, এবং তার পর তৃতীয় টলেমি। শুধু পুথি নয়, ওঁদের চেষ্টায় পুথিশালার সঙ্গে গড়ে তোলা হয়েছিল একটি জাদুঘরও। দ্বিতীয় টলেমির কালে অ্যারিস্টটল-এর ব্যক্তিগত সংগ্রহও পৌঁছয় এই গ্রন্থাগারে। ওঁরা নিয়ম করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর দিয়ে যত জাহাজ যাবে তাতে কোনও পাণ্ডুলিপি থাকলে তা জমা দিতে হবে। লিপিকররা গ্রন্থাগারের জন্য সে-সব নকল করে রাখতেন, ফেরার পথে নাবিকেরা আবার তাঁদের পাণ্ডুলিপি পেয়ে যেতেন। এ-সব খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের কথা। সমসাময়িক দর্শকেরা বেশ-কিছু বিবরণ রেখে গেছেন এই বিশাল গ্রন্থাগারের। গ্রন্থাগার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও দেশে দেশে জ্ঞানীদের মুখে মুখে ফিরত আলেকজান্দ্রিয়ার পুথিশালার কথা। সেখানে পুথি ছিল ৫ লক্ষ। অন্য একটি বাড়িতে রাখা ছিল আরও ৪০ হাজার। ইউরোপে তখনও গ্রন্থাগার নেই। ছাপাখানার আগে ইউরোপে আভিগনন-এ (Avignon) পোপের গ্রন্থাগারটিই ছিল একমাত্র পুথিশালা। ইউরোপে খ্রিস্টীয় ৩৮০ অব্দের আগে কোনও গ্রন্থাগার ছিল না রোমান চার্চের। ভারতে অবশ্য প্রাচীনকালেও জৈন এবং বৌদ্ধ মঠগুলিতে পুথি সংগ্রহ ছিল। 'ভাণ্ডার' নামক বহু ব্যবহৃত শব্দটি কিন্তু এক সময় জৈন মন্দিরের পুথিশালাকেই বোঝাত। নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলায়ও পুথিচর্চা ছিল, কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার সঙ্গে কারও তুলনা চলে না। আলেকজান্দ্রিয়া অনন্য।

পরবর্তীকালেও দেখা গেছে পুথিশালা বা গ্রন্থাগারের প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন ওই অঞ্চলের মানুষ। মাঙ্গোয়েল বলছেন— আরব দুনিয়ায় বেশ-কিছু সংগ্রহশালা ছিল।

বাগদাদ, কায়রো এবং অন্যত্র। এমনকী স্পেনেও মুসলমান অভিযাত্রীরা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই গর্বিত উত্তরাধিকার। শুধু আন্দালুসিয়াতেই ওঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৭০টি গ্রন্থাগার। দ্বিতীয় আল-হাকিমের আমলে (৯৬১-৭৬ খ্রিস্টাব্দ) করডোবায় (Kardoba) খলিফার লাইব্রেরিতে ছিল ৪ লক্ষ পুথি।

তৎকালের দুনিয়ায় আলেকজান্দ্রিয়া অন্য কারণেও এক স্মরণীয় প্রতিষ্ঠান। এই গ্রন্থাগারেই প্রথম শুরু হয় সংগৃহীত পুথির শ্রেণীবিভাগ এবং বর্গীকরণ। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এই অসম্ভবপ্রায় কর্তব্যকে সম্ভব করেছিলেন যিনি তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার এক পণ্ডিত এবং লেখক। নাম তাঁর ক্যালিমাকাস (Callimachus)। গ্রন্থাগারে তাঁর উপরওয়ালা ছিলেন অ্যাপোলোনিয়াস (Apollonius) নামে রোডস দ্বীপের আর-একজন পণ্ডিত। তার আগে সুমেরিয়ানরা অবশ্য নিজেদের সংগ্রহ তালিকাবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু সে-সংগ্রহ এমন বিপুল ছিল না। শ্রেণীবিভাগ, উপবিভাগও হয়তো এমন সুশৃঙ্খল ছিল না। তালিকায় এমনকী নামের আদ্যক্ষরেরও ব্যবহার! মাঙ্গোয়েল বলছেন— পরবর্তীকালে কি বাইটেন সাম্রাজ্যে, কি খ্রিস্টীয় ইউরোপে সর্বত্র আলেকজান্দ্রিয়ার এই পুথি বিভাগ এবং বিন্যাসের প্রভাব।

প্রসঙ্গত, অদ্ভুত কিছু পুথি-বিন্যাসের কাহিনী শুনিয়েছেন তিনি। দশম শতকে পারস্যের প্রধান উজির আবুল কাশেম ইসমাইল নাকি কিছুতেই তাঁর পুথি সংগ্রহ হাতছাড়া করতে রাজি ছিলেন না। তিনি যেখানেই যেতেন উটের পিঠে তাঁর সঙ্গে চলত ১ লক্ষ ৭০ হাজার পুথি। চার শো উটকে এমনভাবে তালিম দেওয়া হয়েছিল যে, তারা বর্ণমালা অনুসারে চলত। প্রত্যেকের পিঠে সেই আদ্যক্ষর চিহ্নিত বই! ত্রয়োদশ শতকের ইউরোপে আর-এক গ্রন্থরসিক বই সাজিয়েছিলেন ফল এবং ফুল বাগিচার কায়দায়। বাগান, কারণ বই জ্ঞান নামক ফল উপহার দেয়। ফুল-বাগিচা রূপ আর সৌরভ। সে-ও উপভোগ্য। বাগানের চার এলাকার মতো তাঁর গ্রন্থাগারের বইও বিভক্ত চারটি প্রধান বিভাগে। তার পর—উপবিভাগ। মলাটে রঙের বৈচিত্র্য। আরও কত কী কাণ্ড!

এখন অবশ্য গ্রন্থাগার অনেক উন্নত। অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত। ব্যক্তিগত খামখেয়ালির কোনও সুযোগ নেই সেখানে। কিন্তু মাঙ্গোয়েল মনে করেন— পাঠক কোন বইকে কোন বিভাগে ফেলবেন তা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সর্বক্ষেত্রে নিশ্চয় করে বলা সম্ভব না-ও হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি সুইফট-এর 'গ্যালিভার ট্রাভেলস'-এর উল্লেখ করেছেন। এ-বই কি অ্যাডভেঞ্চার? হাসির উপন্যাস? ভ্রমণ কাহিনী? অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের সমাজচর্চা? শিশু সাহিত্য? ফ্যান্টাসি? কল্পবিজ্ঞানের পূর্বসূরি, না ক্ল্যাসিক বা ধ্রুপদী সাহিত্য? তার উত্তর জানেন গ্রন্থাগারিক নয়, একমাত্র— পাঠকই!

এবার অতএব পাঠকের দিকে তাকানো যাক। পাঠক, আমরা জানি, পড়েন। কিন্তু কীভাবে পড়েন? উচ্চৈঃস্বরে, না মনে মনে? আলেকজান্ডার তাঁর সৈন্যদের সামনে মায়ের লেখা একটি চিঠি পড়ছেন দেখে তাঁর সৈন্যরা নাকি অবাক। এভাবে কাউকে তারা নিঃশব্দে পড়তে দেখেনি। কীভাবে পড়া হয় বই, একজন একান্তে বসে সংগোপনে পড়বেন, না একটি বই অনেকে একসঙ্গে বসে পড়বেন? সবই চলত। তবে ক্রমে একান্তে নিঃসঙ্গ পাঠকই স্থিত হন। তার মানে এই নয় যে, চড়া গলায় অন্যদের পড়ে শোনাবার রীতি ছিল না। প্রাচীন গ্রিস এবং রোমে লেখকরা সমবেত রসিকদের নিজেদের রচনা পড়ে শোনাতেন। একালে সেটা প্রচলিত রীতি। কাব্যপাঠের আসর বসে। কবিরা নিজেদের লেখা অনুরাগী এবং আগ্রহীদের

পড়ে শোনান। ঔপন্যাসিকরাও নানা দেশে, নানা আসরে নিজ রচনা পাঠ করেন। এই রীতি সুপ্রাচীন। হেরোডোটাস অলিম্পিক-এর আসনে সমবেত দর্শকদের সামনে নিজের রচনা পড়েছেন। পরবর্তীকালে রোমে কনিষ্ঠ প্লিনি পড়ে শুনিয়েছেন তাঁর রচনা। সবসময় তাঁর অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। তবে তিনি লিখেছেন—এপ্রিল মাসে রোমে বলতে গেলে প্রতিদিনই বসে সাহিত্যবাসর। কখনও কখনও লেখক হাজির থাকলেও পাঠের দায়িত্ব দেওয়া হত দাসকে। কবি তখন ঠোঁট নাড়াতেন মাত্র। ভাষান্তরিত চলচ্চিত্রে হামেশাই তা হয়ে থাকে, কিন্তু মাঙ্গোয়েল মনে করেন পৃথিবীতে সে দিনই বোধহয় প্রথম দেখা যায় অভিনব এক দৃশ্য— 'লিপ সার্ভিস'! সেই প্রাচীন ঐতিহ্য টেনে অষ্টাদশ শতকে রুশো সারা রাত ধরে পড়ে শুনিয়েছেন অনুরাগী পাঠকদের তাঁর নিষিদ্ধ 'কনফেশানস'। তবে পশ্চিমে পাঠের সুবর্ণযুগ নাকি উনিশ শতক। চার্লস ডিকেন্স, লর্ড টেনিসন— অনেকেই আপন রচনার তুখোড় পাঠক। লেখকের স্বাক্ষর সংগ্রহের রেওয়াজও প্রধানত ওইসব আসর থেকেই। ১৯৮৯ সালে টোরানায় পাঠের আসরে অটোগ্রাফ দিতে দিতে ক্লান্ত ইংরেজ ঔপন্যাসিক গোল্ডিং নাকি বলেছিলেন— ভবিষ্যতে কেউ যদি অস্বাক্ষরিত গোল্ডিং-এর কোনও উপন্যাস খুঁজে পান তবে তার মূল্য হবে চিন্তার অতীত, সে-বই হবে 'ওয়ার্থ আ ফরচুন'।

তার পর পড়া নিয়ে আরও প্রশ্ন— কোথায় বসে কীভাবে পড়া? নাকি বিছানায় শুয়ে পড়া? ১৭০৩ সালে এক খ্রিস্টান সন্ত ফতোয়া জারি করেন— বিছানায় বই পড়া চলবে না। অথচ অনেকের কাছে পড়ার পক্ষে বিছানার তুল্য আর কিছু হয় না।

কিন্তু বৃহৎ প্রশ্ন— পাঠক বই পড়ে কী পান? এই প্রশ্নের শেষ উত্তর বোধহয় এখনও কারও জানা নেই। লেখক যা বলতে চেয়েছেন পাঠক তা শুনতে বা হৃদয়ংগম করতে পেরেছেন কি? জাক দেরিদার বৃদ্ধপ্রপিতামহদের প্রপিতামহরা ভেবেছেন এই প্রশ্ন। আলবের্তো মাঙ্গোয়েলের বইয়ে এ সম্পর্কে বেশ-কিছু অধ্যায় রয়েছে। একটিতে আলোচনা করা হয়েছে ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর কবিতার বক্তব্য। অন্য একটিতে রিলকের হাতে অন্য ভাষার কবিতার জার্মান অনুবাদ প্রসঙ্গ। কবি কি নিছক অনুবাদক? অবশ্যই না। অনুবাদে উপস্থিত কবি নিজেও, তাঁর অভিজ্ঞতা ভাবভাবনা অনুভূতিসহ। ভাষান্তরিত কবিতার সঙ্গে আদি রচনার মিল কতখানি, দূরত্বই বা কতখানি? সব পাঠকই কি তাঁর নিজস্ব আলোকে অন্যকে পাঠ করেন না? এই বইয়ে তার উত্তর মেলে কাফকা সম্পর্কে একটি আলোচনায়। তরুণ কাফকাকে তাঁর এক শিক্ষক 'ইলিয়ড' পড়িয়ে বলেছিলেন— ক্লাসের কেউ এই কাব্য বোঝেনি। তাই তো— ভাবনায় পড়লেন কাফকা। আমি আর কতটুকু জানি, কী আমার অভিজ্ঞতা? সব পাঠই প্রতীকী, তবে? তাঁর কোনও কোনও রচনার প্রচলিত অর্থে কোনও উপসংহার নেই। বন্ধু ম্যাক্সব্রডকে তিনি বলেছিলেন মৃত্যুর পর তাঁর রচনা পুড়িয়ে ফেলতে। তিনি সে-অনুরোধ উপেক্ষা করেছিলেন বলেই আজ কাফকা দেশে দেশে তন্নিষ্ঠ পাঠকের আলোচ্য। সকলেই তাঁকে বুঝতে চান। একজন জীবনীকার লিখেছেন, ১৯৮০ পর্যন্ত কাফকার রচনা নিয়ে গবেষণা-পুস্তক বের হয়েছে ১৫,০০০টি! তবু কাফকাকে নাগালে পেয়েছেন তাঁর পাঠকরা? সন্দেহ হয়। মাঙ্গোয়েল শুধু 'মেটামরফসিস' গল্পটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁর তেরো বছরের কন্যার কাছে এ-গল্প হাসির গল্প, আর-এক পাঠকের কাছে ধর্মতত্ত্ব, ব্রেখট মনে করতেন— সত্যকারের বলশেভিক সাহিত্যের প্রতিনিধি এই গল্প,

মার্কসবাদী সমালোচক লুকাচের মতে— এ-গল্প বুর্জোয়া অবক্ষয়ের পরিচিত অবদান। নবোকভ, বর্হেস, আরও কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন গল্পটি সম্পর্কে। কারও সঙ্গে কারও পাঠের মিল নেই!

বই নিয়ে কথা। সুতরাং প্রাসঙ্গিক সম্ভাব্য সব-কিছুই টেনে এনেছেন আলবের্তো মাঙ্গোয়েল। নিষিদ্ধ বইয়ের কথা, বই-চোরের কথা, পাঠকের জন্য আরামপ্রদ আসনের কথা, চশমার কথা— কী নয়! এখানে সব প্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচনার সুযোগ নেই। তবু কিছু শোনার মতো খবর শোনা যেতে পারে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমেরিকার অনেক অঞ্চলে দাস এবং কৃষ্ণাঙ্গদের হাতে বই ছিল নিষিদ্ধ বস্তু। কাউকে পড়তে দেখলে তার ভাগ্যে ছিল কঠোর সাজা। একালেও অনেক দেশে অনেক বই নিষিদ্ধ। আমাদের এই দেশও ব্যতিক্রম নয়। পাঠক-শাসনের এই ঐতিহ্য কিন্তু সুপ্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৪১১ অব্দে এথেন্স-এ প্রোটোগোরাস-এর পুথি পোড়ানো হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২১৩ অব্দে চিনের এক সম্রাট ঘোষণা করেছিলেন ইতিহাস শুরু হয়েছে আমার শাসন দিয়ে, সুতরাং আগেকার সব বই নিক্ষেপ করতে হবে অগ্নিকুণ্ডে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে অগস্টাস ওভিদসহ কয়েকজন কবিকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের বই পোড়ানো হয়েছিল। মধ্যযুগেও পাঠক-শাসনের উদ্‌যোগে কোনও ত্রুটি ছিল না। রোমান ইনকুইজিশন বা ধর্মীয় শুদ্ধাচারের যাচাইকারীরা প্রথম নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকা প্রকাশ করেন ১৫৫৯ সালে। তার বেশ-কিছু সংস্করণ হয় পরে। প্রতি সংস্করণেই নতুন নতুন সংযোজন। সর্বশেষ সংস্করণটি প্রকাশিত হয় নাকি ১৯৬৬ সালে। একালের কাহিনীতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা—১৯৩৩ সালে নাতসি জার্মানিতে গোয়েবলস-এর পৌরোহিত্যে বইয়ের বহ্ন্যুৎসব। যেখানে পোড়ানো হয়েছিল কুড়ি হাজার বই! এমনই সীমা ঘটনা ধর্মান্ধ যাজক, একনায়ক স্বৈরাচারী রাজা, নীতিবাগীশ শুচিবাইগ্রস্ত পাঠক, বইয়ের শত্রু অনেক। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অ্যান্টনি কমস্টক নামে এক নীতিবাগীশ সমাজকে পাপমুক্ত করার জন্য 'অশ্লীল' বই উৎপাটনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি গর্ব করে বলেছিলেন— আমি এত লেখককে দণ্ড দিয়েছি যে তাঁদের নিয়ে একষট্টি কামরার একটি রেলগাড়ি বোঝাই করা যায়। ষাটটি কামরার প্রত্যেকটিতে থাকবেন ষাটজন করে যাত্রী। একষট্টি নম্বর কামরায় ঠাসাঠাসি করে আরও বেশি। তাঁর দৌরাত্ম্য থেকে পনেরো জন লেখক এবং প্রকাশক মুক্তি লাভ করেন আত্মহনন ক'রে।

বই-চোর সে তুলনায় নিতান্তই সরল প্রকৃতির মানুষ। তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস পড়ার জন্য বই চুরি কোনও পাপ নয়। এমনকী স্থায়ী ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে চুরি করা বই সঞ্চয় করলেও না। তাঁর ভয়ে আমাদের পুথিতে যেমন নানা অভিসম্পাত, মধ্যযুগের ইউরোপেও তেমনই। তা সত্ত্বেও চুরি হত বই, এবং এই চৌর্যবৃত্তিতে আধুনিক কালে যিনি সব চেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত কাউন্ট লিব্রি (মৃত্যু ১৮৯৬)। রীতিমতো রোমাঞ্চকর তাঁর উপাখ্যান। বলা যেতে পারে এই চোরেরা নিতান্তই ছিঁচকে চোর। ইতিহাসে বড় বড় লুঠের ঘটনাও কিন্তু অনেক। প্রাচীন রোমের অনেক গ্রন্থ-সংগ্রহই ছিল গ্রিস থেকে লুঠ করে আনা সম্পদে বোঝাই। একই কায়দায় ভাইকিংরা বই লুঠ করেছে ইংল্যান্ডে। এবং বলা যায় ইংরেজরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও অনেক কিছুর মতো ভারত থেকে লুঠ করেছে মূল্যবান সব পুথিও। মাঙ্গোয়েল অবশ্য তাদের কথা উল্লেখ করেননি। বরং শুনিয়েছেন তরুণ বয়সে পড়ার নেশায় তাঁর নিজের চুরি করার কাহিনী।

কাউন্ট লিব্রি ছিলেন সত্যকারের পণ্ডিত। তাঁর যে প্রতিকৃতিটি রয়েছে তাতে দেখি সুদর্শন এই অভিজাত পুরুষের আয়ত দুটি চোখ যেন গভীর ভাবে মগ্ন। সে-চোখে কোনও চশমা নেই। অথচ অনেক আগে আঁকা ডুয়েরে-এর পণ্ডিত-মূর্খের চোখে চশমা। চশমা আরও অনেকের ছবিতেই। কোথা থেকে এল পাঠক-বান্ধব দৃষ্টিসহায়ক এই দ্বিতীয় চক্ষু? মাঙ্গোয়েল তা নিয়ে আকর্ষণীয় একটি অধ্যায় উপহার দিয়েছেন পাঠককে। চোখের আলো সর্বকালেই পাঠকের সমস্যা। হোমার, মিলটন, জেমস থার্বার, হর্হে লুই বর্হেস—অনেক বিখ্যাত লেখক ছিলেন সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন। মাঙ্গোয়েল বেশ-কিছুকাল বর্হেসকে তাঁর পছন্দের বই শোনাতেন। ১৯৫৫ সালে তাঁকে যখন বোয়েনোস আইরেসে আর্জেন্টিনার জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রধানের আসনে বসানো হয় একালের এক অসাধারণ লেখক-পাঠক বর্হেস-এর চোখের আলো তখন পুরোপুরি নিবে গেছে। তিনি বলেছিলেন— ঈশ্বরের কত না বাহাদুরি, একই সঙ্গে তিনি আমাকে দিলেন অন্ধকার এবং বই। বই-পাগল এই পাঠকের স্বপ্নের একটি সীমাহীন গ্রন্থাগারের রূপরেখা শুনিয়েছেন আমাদের মাঙ্গোয়েল। আশ্চর্য সেই মহাবিশ্বব্যাপী বইয়ের কল্পলোক। তেমনই মর্মস্পর্শী দৃষ্টিহীন ক্ষুধার্ত-পাঠক বর্হেস-এর অন্যের মুখে পাঠ। বর্হেস-এর কিছু কিছু চরিত্র-চিত্র অন্য লেখকদের লেখায় আমরা পেয়েছি। কিন্তু এই প্রতিকৃতি যে-কোনও পাঠককে একই সঙ্গে আলোড়িত ও বিষাদগ্রস্ত করে তুলবে।

যা হোক, ক্ষীণদৃষ্টি লেখক-পাঠকদের যে তালিকা মাঙ্গোয়েল তৈরি করেছেন সেটি রীতিমতো দীর্ঘ। বিখ্যাতজনদের সেই নামাবলিতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাম। মাঙ্গোয়েল বলছেন আজকের পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ মানুষই ক্ষীণদৃষ্টি। পাঠকদের মধ্যে অনুপাত আরও বেশি— শতকরা ২৪ ভাগ। সুতরাং ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে যখন চশমা এল ইউরোপে তখন স্ফটিকের সেই যুগল চক্ষু যে এক পরম প্রাপ্তি বলে গণ্য হবে তাতে আর বিস্ময় কী! কিন্তু কার হাত দিয়ে 'ঈশ্বর' পাঠালেন এই আশীর্বাদ? মাঙ্গোয়েল সে কৃতিত্ব অর্পণ করেছেন ভেনিস, এবং/অথবা ফ্লোরেন্সের দু'জন কারিগরকে। সমসাময়িক সাক্ষ্য হিসাবে কবরফলক, কারও কারও রচনা উদ্ধৃত করেছেন তিনি। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলতে ভোলেননি যে, রাডিয়ার্ড কিপলিং রজার বেকনকে সাক্ষী রেখে তাঁর একটি গল্পে বলেছিলেন— আরবদের একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র চুরি করে আনা হয়েছিল ইউরোপে। 'দ্য নেম অব দ্য রোজ'-এ উমবের্তো ইকো'ও কিন্তু নায়কের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, চশমা আবিষ্কারের বাহাদুরি আরবদের। চক্ষুবিজ্ঞান নিয়ে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক ভাবনার যে বিস্তারিত বিবরণ মাঙ্গোয়াল পেশ করেছেন তাতেও কিন্তু দেখা যায়, দৃষ্টিবিজ্ঞানে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে আরব বিজ্ঞানীরা।

কৃতিত্ব যাঁর বা যাঁদেরই হোক, মধ্যযুগের অনেক পাঠকের চোখেই দেখি চশমা। এমনকী পণ্ডিত-মূর্খের চোখেও। চশমা এককালে পড়ুয়ার প্রতীক, জ্ঞানীর লক্ষণ, একই সঙ্গে আবার কপট, অহংকারী, শূন্যগর্ভ মূর্খের ছদ্ম-আভরণ। বাংলা সাহিত্যেও চশমা নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ আছে, ইউরোপেও ছিল। পুথিসর্বস্ব চশমাধারীরা ছিলেন ব্যঙ্গের বিশেষ উপলক্ষ। অথচ চশমা না হলে সৎ পাঠকের চলে না। হয়তো বই না হলে মানুষের দিন চলে যাবে। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত রে ব্রাডবেরির উপন্যাস 'ফারেনহাইট ৪৫১'-র কথা মনে পড়ে। সেই কল্পকাহিনীতে লেখক বলেছিলেন— একদিন সব বই পুড়িয়ে ফেলা হবে। তার আগে পাঠককে মুখস্থ করে ফেলতে সব পাঠ্য, পথে পথে তখন মাথা-বোঝাই বই নিয়ে হাঁটবে

মানুষ। মাঙ্গোয়েল এই উপন্যাসটির কথা বলতে ভোলেননি। বলতে ভুলে গেছেন, ক্রুফো এই কাহিনী নিয়ে একটি চলচ্চিত্রও উপহার দিয়েছিলেন আমাদের। তবে মাঙ্গোয়েল পরিবর্তে এমন এক পাঠকের কথা শুনিয়েছেন যাঁর অসহায়তা আর দুঃখের তুলনা নেই। সেটাও এক কল্পকাহিনী। পারমাণবিক যুদ্ধে আর সবাই বিলীন। শুধু বেঁচে আছেন একজন পাঠক। আর বেঁচে গেছে বই। বিশ্বের সব বই তাঁর অধিকারে। কিন্তু হায়, হাত থেকে পড়ে তাঁর চশমাটি চুরমার! বেচারা।

শেষ করার আগে এই সুখপাঠ্য ইতিবৃত্ত থেকে কিছু উজ্জ্বল উদ্ধার। যাঁরা জানেন তাঁদের কথা আলাদা, আমার মতো যাঁরা জানতেন না তাঁদের তথ্যগুলো হয়তো মনে হবে রীতিমতো চাঞ্চল্যকর। পৃথিবীর অনেক দেশেই, অনেক সমাজেই পিতৃতন্ত্রের সৌজন্যে নারীদের পড়ার কোনও অধিকার ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য এই, প্রাচীন পৃথিবীতে দশজন বাক্সিদ্ধই ছিলেন নারী। তাঁদের জিহ্বাগ্রে উচ্চারিত হয়েছিল মানুষ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ। এই দ্রষ্টাদের সদুক্তি সংকলন হাজার হাজার বছর ধরে নিয়ন্ত্রণ করেছে মানুষের ভাগ্য। শক্তিধরেরাও মুক্ত ছিলেন না তাঁদের প্রভাব থেকে!

দ্বিতীয় চমকপ্রদ সংবাদ— বিশ্বের প্রথম লেখক যিনি, তিনি নারী। ভার্জিনিয়া উলফ একবার বলেছিলেন নামহীন যত উক্তি এবং রচনা, সবই নারীর— 'অ্যানোনিমাস ইজ ওম্যান'। মাঙ্গোয়েল যে-রচনার কথা বলেছেন সেটি স্বাক্ষরিত। নাম তাঁর এনহেদুয়ান্না (Enheduanna)। তিনি রাজদুহিতা। পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন আক্কাড (Akkad) দেশের রাজা প্রথম সারগন-এর (Sargon I) কন্যা তিনি। তাঁদের দেবী নান্না-র (Nanna) পূজারি এই রাজকন্যা প্রেম এবং যুদ্ধের দেবী ইনান্নার (Inanna) উদ্দেশে কিছু গীত রচনা করেছিলেন। মাটির ফলকে সেগুলি এখনও উৎকীর্ণ রয়েছে। তলায় রাজকুমারীর স্বাক্ষর। এ-ঘটনা খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০ অব্দের।

তৃতীয় সংবাদ: পৃথিবীর প্রথম ঔপন্যাসিকও একজন নারী। তিনিও পূর্বদেশীয়। পিতৃতন্ত্রের কঠোর কঠিন শাসন, পায়ে নিষেধের নিগড়, আধখানা আকাশও চোখের আড়ালে। রেশমের বাহারি পর্দার আড়ালে মসৃণ অন্তঃপুর। সেখানে নানা আয়োজনে সুখের অনন্তসাগর। তবু মনে বিষাদ, হৃদয়ে চাঞ্চল্য। সুতরাং, একাদশ শতকে সূর্যোদয়ের দেশের এক অসূর্যম্পশ্যা অভিজাত নারী মুরাসাকি (Lady Murasaki) কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। রচিত হল নতুন ধারার রচনা— উপন্যাস। নাম, বাংলায় বললে— 'গেঞ্জির উপাখ্যান'। ইংরেজিতে 'টেল অব গেঞ্জি'। বিশ্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হিসাবে আজ দেশে দেশে বন্দিত সেই বই। মুরাসাকি এই রচনা শুরু করেন ১০০১ খ্রিস্টাব্দে, আর তামাম শোধ ১০১০-এ।

আরও আছে। চতুর্থ চমক, বিশ্বের প্রথম পেশাদার বই-সমালোচকও একজন নারী। তিনি আমেরিকার প্রথম বৈদেশিক সংবাদদাতা, সম্পাদক এবং লেখক মার্গারেট ফুলার। বই সমালোচনা বা আলোচনাকে তিনিই প্রথম গ্রহণ করেন সর্বক্ষণের পেশা হিসাবে। মার্গারেট ফুলার উনিশ শতকের মানুষ। তিনি ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর সমসাময়িক। ফুলার তৎকালের একজন বিশিষ্ট নারীবাদীও বটে। তাঁর আবেগমথিত রচনা 'ওম্যান ইন দ্য নাইনটিনথ সেঞ্চুরি' এখনও নাকি বিবেচিত হয় নারী-চেতনার এক মূল্যবান দলিল হিসাবে।

আলবের্তো মাঙ্গোয়েল, 'আ হিস্ট্রি অব রিডিং', ভাইকিং; নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৬

শব্দের মায়াজালে
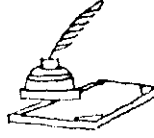
"Talk of war with a Briton, he'll boldly advance,
That one English soldier will beat ten of France;
Would we alter the boast from the sword to the pen,
Our odds are still greater, still greater our men...
First Shakespeare and Milton, like gods in the fight,
Have put their whole drama and epick to flight...
And Johnson, well arm'd like a hero of yore,
Has beat forty French, and will beat forty more!"

পদ্যটির লেখক অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত ব্রিটিশ অভিনেতা, নাট্যশালা পরিচালক এবং নির্দেশক ডেভিড গ্যারিক। এটি প্রকাশিত হয় তৎকালের লন্ডনের প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্র 'জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিন'-এ। সেইসঙ্গে লন্ডনের আরও কিছু কাগজে। প্রকাশকাল ১৭৭৫ সাল। উপলক্ষ সে বছরই ড. স্যামুয়েল জনসন-এর (১৭০৯-৮৪) ইংরেজি ভাষার অভিধানের প্রকাশ। অভিধানের নামপত্র: A Dictionary of the English Language: in which the words are deduced from their originals and illustrated in their different significations by examples from the best writers. To which are prefixed a History of the Language and a Grammar. By Samuel Johnson, A.M.

স্যামুয়েল জনসন, সর্বজনের কাছে যিনি একডাকে 'ডক্টর জনসন' নামে পরিচিত, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক অবদানই রেখেছেন। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তিনি আপন পটুত্ব দেখিয়েছেন, দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ রোমান্স লিখেছেন, শেক্সপিয়ার-এর নতুন সংস্করণ সম্পাদন করেছেন, বিশিষ্ট ইংরেজ কবিদের জীবনী সংকলন করেছেন, 'লিটেরারি ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে-ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রেনোল্ডস, বার্ক, গোল্ডস্মিথ, গ্যারিক,

বসওয়েল-এর মতো বিশিষ্টজনেরা। তাই বলে ইংল্যান্ডের প্রথম 'জাতীয় অভিধান' সংকলন! বসওয়েল-বর্ণিত সেই আড্ডাবাজ, বাকচতুর, রসিক মানুষটির পক্ষে কি আভিধানিক হওয়া সম্ভব? বিশেষত অভিধান রচনাকে যিনি নিজেই বলেছেন, 'ড্রাজারি'— শ্রমসাধ্য বিরক্তিকর কাজ। অথচ ইতিহাসের এমনই মতি যে, তাঁর হাত থেকেই ইংরেজরা সেদিন পেয়েছিলেন তাঁদের স্বপ্নের অভিধান।

হ্যাঁ, স্বপ্নের বইকী! অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের অভিধান চিন্তার পেছনে ভাষাগত তাগিদ যত ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল জাতীয়তার তাগিদ। ব্যবহারিক তথা সামাজিক চাহিদা ছাপিয়ে উঠেছিল ইউরোপের অন্যান্য জাতি রাষ্ট্রের, বিশেষ করে ফ্রান্সের সঙ্গে প্রতিযোগিতার বাসনা। ইউরোপের দেশে দেশে ভাষা চিহ্নিত, সুবিন্যস্ত ও সংহত হয়ে গেছে। সেখানে তখন চলছে ভাষার সংস্কার, বানান ও অর্থ নির্দেশ, শুদ্ধতা রক্ষার উদ্‌যোগ। আর তা করা হচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে, ইউরোপে যা অভূতপূর্ব না হলেও দীর্ঘকাল ধারণা হিসাবে যা ছিল সুপ্ত। ইংল্যান্ডেও ইংরেজি ভাষা তত দিনে স্পষ্ট অবয়ব লাভ করে সুনির্দিষ্ট ও সংহত হয়ে এসেছে। কিন্তু পরবর্তী ধাপে তখনও পা রাখা হয়নি। অথচ ফরাসিরা চোখের সামনে কতদূর এগিয়ে গেল। শত শত বছর পরে আবার সেখানে পুনরুজ্জীবন লাভ করেছে আকাদেমি। ইংরেজদের ক্ষোভ ও হতাশা স্বাভাবিক।

'দি অ্যাকাডেমি' (The Academy) একটি স্মৃতিমেদুর শব্দ। অতীত প্রজ্ঞার বার্তাবহ গরিমাময় এই শব্দটি। বিদ্যাচর্চার উৎকর্ষের জন্য ইউরোপে প্রথম আকাদেমির প্রতিষ্ঠা গ্রিসে, খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০ অব্দে। অ্যাথেন্স-এর পশ্চিম দিকে অ্যাকাদামস নামক বীরের স্মৃতিবাহী এক জলপাই কুঞ্জে প্লেটো তাঁর বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন, সেই থেকে— আকাদেমি। সম্রাট জাস্টিনিয়ান তা বন্ধ করে দেন। রোমান সেনাপতি সুলা অবশিষ্ট অ্যাথেন্স-এর সঙ্গে আকাদেমির স্মৃতিটুকুও মুছে দেন। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতা যে সেই বিদ্যাপীঠের কথা পুরোপুরি ভুলে যায়নি সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে দীর্ঘকাল পরে ফ্লোরেন্স এবং ফ্রান্সে আকাদেমি প্রতিষ্ঠায়। ফ্লোরেন্সের আকাদেমি (*Accademia della Crusca*) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫৮২ সালে। তার পর দীর্ঘ যতির পর দ্বিতীয় উদ্‌যোগ ফ্রান্সে ১৬৩৫ সালে ফরাসি আকাদেমি (*Académie Française*) প্রতিষ্ঠায়। ফ্লোরেন্স-এর আকাদেমি ইতালিয়ান সংস্কৃতি রক্ষার নামে একাধিক মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত করে। তার মধ্যে একটি ইতালিয়ান ভাষার অভিধান। উল্লেখ্য, রাজনৈতিকভাবে ইতালির আবির্ভাব তার তিনশো বছর পরে।

ফরাসি আকাদেমি স্থাপিত হয় কার্ডিনাল রিসেল্যু-র (Richelieu) উদ্‌যোগে ১৬৩৫ সালের ২ জানুয়ারি। বিদ্বজ্জনদের নিয়ে গঠিত আকাদেমির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফরাসি ভাষার নিয়মনীতি চূড়ান্তভাবে স্থির করা। এই বুধমণ্ডলী অবশ্য ১৬৩০ সাল থেকেই এ ব্যাপারে তৎপর ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁরা তৎকালের একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণের (Valentin Conrart) প্যারিসের বাড়িতে সমবেত হতেন। সেখানে অন্যতম আলোচ্য ছিল ভাষা চর্চা ঠিক নয়, চলতি ভাষার দোষগুণ বিচার বা ভাষার সমালোচনা। আড্ডাধারী পণ্ডিতদের সংখ্যা ছিল চল্লিশজন। আকাদেমি প্রতিষ্ঠার সময়ও বিদ্বানের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়— চল্লিশ। আমৃত্যু তাঁদের সদস্য-গৌরব। তাঁরা ফরাসি দেশে সম্মানিত 'অমর চল্লিশ'। এখনও আকাদেমির সদস্যসংখ্যা অপরিবর্তিত, চল্লিশ জনেই সীমাবদ্ধ।

ফরাসি আকাদেমি ছিল দৃষ্টিভঙ্গিতে গোঁড়া, যাকে বলে সনাতনপন্থী। ওঁরা ভাষাকে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী স্থায়ীভাবে বিধিবদ্ধ করতে চাইছিলেন, ভাষা যেন পায় আইনের মর্যাদা, তা-ই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। তা করতে হলে ভাষাকে একটি জাতীয় অভিধানের দুই মলাটের মধ্যে তালিকাবদ্ধ করতে হবে। আর, সে-কাজ দায়িত্বের সঙ্গে পালন করতে হলে সব মৃত প্রাচীন লেখকের রচনা খতিয়ে দেখতে হবে। কারণ, তাঁরা ছিলেন ভাষা ব্যবহারে শুদ্ধাচারী। বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসাবে তাঁদের গ্রহণ করে আকাদেমিকে এমন একটি অভিধান সংকলন করতে হবে যা হবে ফরাসি ভাষার ন্যায়াধিকরণ-তুল্য। সেই অভিধানের পাতা ওলটালে বোঝা যাবে কাকে বলে ভাল বিশুদ্ধ ফরাসি, কাকে বলে মন্দ, বা কী পুরোপুরি বর্জনীয়। তাঁদের কল্পিত অভিধান যেন এক ধর্মশাস্ত্র, যা আপ্ত-শব্দের আকর, এবং স্বভাবতই অপরিবর্তনীয়।

কাজ শুরু হয় ১৬৩৯ সালে, সে-কাজ শেষ করতে সময় লাগে পঞ্চান্ন বছর। গবেষকরা নিয়মিত শব্দ চয়ন করে আকাদেমির ভাণ্ডারে জমা দিয়েছেন। আকাদেমির মান্য বিজ্ঞ সদস্যরা দিনের পর দিন সেইসব শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন, বিতর্ক করেছেন। সময় গড়িয়ে গেছে। তবু স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো শক্ত। কাজ ভাগ করে দেওয়া হয় দুই ভাগে। তবু শুধু 'আ' (A) এই বর্ণটি খতিয়ে দেখতে সময় লেগে যায় দীর্ঘ নয় মাস! তার পরও রয়েছে পুনর্বিবেচনার প্রশ্ন। সুতরাং, কাজ শেষ হবার আগেই অনেক নক্ষত্রের জীবনতারা খসে পড়ে। পদে পদে নানা প্রতিবন্ধক। গবেষকরা তবু নিঃশব্দে নিজেদের কাজ করে গেছেন। বাগিচায় ঘ্রাত অনাঘ্রাত যত শব্দ-পুষ্প ছিল সব তাঁরা সযত্নে চয়ন করে মাতৃভাষার বেদিমূলে সাজিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত প্রাথমিক খসড়া তৈরির কাজ শেষ হয় ১৬৭২ সালে। খসড়া চূড়ান্ত রূপ পায় আট বছর পরে, ১৬৮০ সালে। অতঃপর ছাপা। এবং অবশেষে ১৬৯৪ সালে মুদ্রিত অভিধান সবিনয়ে, সাড়ম্বরে ফরাসি সম্রাটের হাতে তুলে দেওয়া। বইটি তাঁর নামেই উৎসর্গীকৃত।

ফরাসি আকাডেমির অভিধান (Dictionnaire de l'Academie) ঠিক ব্যবহারিক অভিধান নয়, বলতে গেলে ভাষাতত্ত্বের বই। একমাত্র সাহিত্যের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য শব্দই নাকি ছিল এই অভিধানে। অভিধানটি নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়। চলে নিয়মিত পরিমার্জনাও। কিন্তু কী চলছে তা নয়, কী চলা উচিত, এই অভিধান তা-ই নির্দেশ করে। ("it prescribes the language, rather than describe it.") স্ল্যাং বা অপভাষা তো বটেই, এমনকী শ্রমজীবীদের ভাষা থেকে শুরু করে অনেক বর্গের শব্দকেই বাদ দেওয়া হয়েছে এই অভিধানে। পরবর্তীকালে মাঝে মাঝে অবাঞ্ছিত শব্দও উঁকি দিয়েছে বটে অভিধানের পাতায়, তবে অভিধানকাররা জানিয়ে দিতে ভোলেননি যে, এরা বহিরাগত। একজন অধিকারীর মতে এই অভিধান জীবন্ত কোনও ভাষার অভিধান নয় যেন, স্থায়ীভাবে পাথরে খোদাই করা হয়েছে ভাষা সেখানে ("Synonymous with setting language in stone.")

খালের জলধারার এপারে ইংরেজ তবু ঈর্ষাকাতর। ওঁরা যদি জাতীয় ভাষাকে গুরুত্ব সহকারে মর্যাদা দিয়ে আকাদেমি প্রতিষ্ঠা করে প্রজ্ঞার আলোয় শব্দকে কষ্টিপাথরে ঘষে যাচাই করে ভাষাকে শুদ্ধ ও সুসংহত করতে পারেন, তবে আমরাই বা তা পারব না কেন, ইংরেজের মনে প্রশ্ন সেটাই। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই ইংরেজি ভাষার অভিধান সংকলিত হয়েছে। ব্লাউন্ট (Blount) ও ফিলিপ-এর (Philip) দুটি অভিধান ছিল। কিন্তু

ফরাসিদের মতো আদর্শ একটি জাতীয় অভিধান না হলে বুঝিবা আর চলে না। আর, আকাদেমি না থাকলে সে-কাজ দায়িত্বের সঙ্গে করবেন কারা?

ইংল্যান্ডে ঠিক আকাদেমি না থাকলেও অন্য ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৫৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আকাদেমি অব অ্যান্টিকুয়ারিজ (Society of Antiquaries)। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আর্চবিশপ পার্কার। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার রবার্ট কটন-এর বাড়িতে ওঁরা নিয়মিত মিলিত হতেন। প্রত্নতত্ত্ব একসময় ভাষাতত্ত্বের দিকে মোড় নেয়। ১৬০৩ সালে প্রথম জেমস সিংহাসনে বসার পর সোসাইটি স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু ফরাসি আকাদেমি ওঁদের আবার তৎপর করে তোলে। বিশিষ্ট ইংরেজ বিদ্বানরা ফের সোসাইটিতে সমবেত হন। রাজতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের পর প্রকাশিত হয় 'নিউ অ্যাটলান্টিস' (New Atlantis) নামে এক কাল্পনিক রাষ্ট্রের রূপরেখা। লেখক ছদ্মনাম— আর. এস. এস্কোয়ার (R. S. Esquire)। আসলে তিনি রবার্ট হুক নামে (Robert Hooke) একজন লেখক। বইটি একালে 'ইউটোপিয়া' বা কল্প-রাজ্যের অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত। তাতে একটি আকাদেমির কথা ছিল। স্পষ্টতই ফরাসিরা ইংরেজকে স্বপ্নাতুর করে তুলেছে! ১৬৬৪ সালে প্রকাশিত হয় জন ড্রাইডেন-এর নাটক— 'রাইভ্যাল লেডিজ'। তাতেও আকাদেমি প্রসঙ্গ। তাতে একটি চরিত্র বলছে— আমরা এমন একটি মহীয়ান ভাষায় কথা বলি, কিন্তু হায়, আমাদের তবু ফরাসিদের মতো কোনও আকাদেমি নেই।

ইংরেজদের যে প্রতিষ্ঠানকে ফরাসিদের আকাদেমির কাছাকাছি বলা যেতে পারে সেটি হচ্ছে রয়াল সোসাইটি ('Royal Society of London for the improvement of Natural Knowledge')। এই বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানের জন্ম ১৬৬২ সালে। ওঁদের চর্চার প্রধান বিষয় ছিল বিজ্ঞান। ড্রাইডেন-এর নাটকে ওই উচ্চারণের পর সভার এক অধিবেশনে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, যেহেতু সোসাইটিতে এমন অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা ভাষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে গণ্য, তাঁদের নিয়ে এমন একটি কমিটি গড়া হোক, যার লক্ষ্য হবে ইংরেজি ভাষার উন্নয়ন। কমিটির সদস্যসংখ্যা ছিল— বাইশ। তাঁদের মধ্যে একজনের প্রস্তাব ছিল সোসাইটির কর্তব্য হবে ইংরেজি ভাষার একটি ব্যাকরণ রচনা করা। তা ছাড়া বানান সংস্কার, বিশুদ্ধ ইংরেজি শব্দ সংগ্রহ করা, অন্য ভাষা থেকে যে-সব শব্দ ইংরেজিতে অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলিকে চিহ্নিত করা, সংক্ষিপ্তকরণ এবং সংকেতাদি নির্দিষ্ট করা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ-ধরনের আরও কিছু কিছু প্রস্তাব উঠেছে কমিটির বৈঠকে। যথা: ধ্রুপদী ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুবাদ। এমনকী সমকালের সেরা সাহিত্য সৃষ্টির অনুবাদের জন্যও সওয়াল শোনা গেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। রয়াল সোসাইটি শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানেই মগ্ন থাকে।

ফলে আকাদেমির স্বপ্নটা অপূর্ণই থেকে যায়। ১৬৯৭ সালে ড্যানিয়েল ডিফো এক তেজী প্রবন্ধ লিখে বড়াই করে বললেন— ইংরেজি তুচ্ছ করার মতো ভাষা নয়। ফরাসিরা আকাদেমি গড়ে যা করেছে আমরা তার চেয়ে অনেক বেশি চমকপ্রদ কাজ করতে পারব একটি সোসাইটি গড়ে। এই মণ্ডলীতে থাকবেন ছত্রিশ জন বিজ্ঞ ইংরেজ। তাঁদের মধ্যে বারো জন মনোনীত হবেন অভিজাত শ্রেণী থেকে, বারো জন ভদ্রলোকের ('Private Gentlemen') মধ্যে থেকে। এবং বারো জন মনোনীত হবেন বংশগৌরব বা অর্থকৌলীন্যের জন্য নয়, নিছক মস্তিষ্কের জন্য। ডিফো-র বক্তব্য— আদালতের রায় যেমন চূড়ান্ত, ভাষা ও

তার ব্যবহার সম্পর্কে ওঁদের রায়ও হবে তেমনই শেষ কথা। কোনও লেখক ওঁদের অমান্য করতে সাহস পাবেন না, এই ছিল তাঁর অভিমত। তিনি বললেন, ভাষা এমন বস্তু নয় যে টাকাকড়ির মতো যেখান-সেখান থেকে কুড়িয়ে নিলেই হল। ("it would be criminal to coin words as money.") তৎকালের বিশিষ্ট সাময়িকপত্র সমর্থন করলেন ওঁকে। কিন্তু সমর্থনে বিস্তর সওয়ালের পর ওজনদার ওই কাগজের বক্তব্য— আকাদেমি ছাড়া এরকম উচ্চন্যায়াধীশ আর কী হতে পারে? আরও একজন দাবি তুললেন— আকাদেমি চাই। তিনি জোনাথন সুইফট। ইংল্যান্ডের তদানীন্তন লর্ড ট্রেজারার আর্ল অব অক্সফোর্ডকে এক খোলা চিঠি লিখে ইংরেজি ভাষার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানালেন তিনি। বিষয়টা কতখানি জরুরি সেটা বোঝাতে সুইফট 'ট্যাটলার'-এর মতো বনেদি কাগজের একটি রচনার উল্লেখ করে বললেন— এখানেও কত না অশিষ্ট শব্দের ছড়াছড়ি! এই স্বেচ্ছাচার কি চলতে দেওয়া সংগত? ইংরেজি ভাষার যেটুকু উন্নতি হচ্ছে তার চেয়ে বেশি হচ্ছে অবনতি, ভাষা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে যা না কৌতুকজনক, না অর্থবহ। সুতরাং, আকাদেমি চাই। সুইফট যদি কিছু হাততালি কুড়িয়ে থাকেন সেদিন, তবে ইটপাটকেলও জুটেছে মন্দ নয়। একজন বিদ্বান বললেন— ভাষাকে স্থায়ীভাবে পঞ্জিভুক্ত করার অর্থ কী? তার মানে স্প্যানিশ সেই জোব্বাটির মতো একই ইংরেজিই কি চিরকালের মতো ধার্য করা ফ্যাশন? তা ছাড়া সুইফট-এর নিজের ভাষায়ও অশ্লীল শব্দ যততত্র!

কেউ কেউ বললেন কুইন অ্যান আর কিছুকাল বেঁচে থাকলে ঠিক আকাদেমির পত্তন হয়ে যেত। তাঁর উত্তরাধিকারী রাজা প্রথম জেমস এ-সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। উচ্চমহলে আড়ালে তাঁর ইংরেজি নিয়েও নাকি হাসাহাসি হয়। তিনি নিজেই বলেছেন কবি এবং চিত্রকররা তাঁর আদৌ পছন্দের প্রাণী নয়। ("I hate all Boets and Bainters.") সাহিত্য বা ভাষা সংস্কারে তিনি উদ্‌যোগী হবেন, এ-কথা ভাবাই যায় না।

সুতরাং আকাদেমি হল না। হল না ফরাসিদের মতো জাতীয় অভিধানও। তার অর্থ এই নয় যে, অষ্টাদশ শতকেও ইংরেজদের সেই আদ্যিকালের অভিধানগুলোই সম্বল। ইতিমধ্যে ১৭২১ সালে প্রকাশিত হয়েছে ন্যাথানিয়েল বেইলি-র শব্দতত্ত্বের অভিধান;— *A Universal Etymological English Dictionary*। স্টেপনিতে একটি আবাসিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক বেইলি বলতে গেলে অজ্ঞাতকুলশীল। অথচ তিনি ছিলেন একজন নিরলস অভিধান-সংকলক। তাঁর নাম উল্লেখ না থাকলেও বলা হয় একাধিক নির্ভরযোগ্য অভিধান সংকলন করেছেন তিনি। তবে তাঁর বৃহৎ ও উজ্জ্বল কীর্তি ১৭৩০ সালে প্রকাশিত *Dictionarium Brittanicum*। তাতে সম্ভাব্য সব-কিছুই ছিল। এমনকী পাঁচশো খোদাই করা অলংকরণ। বলা হয় এর আগে ইংরেজি ভাষার এমন অভিধান আর কখনও সংকলিত হয়নি। বেইলির মৃত্যু ১৭৪২ সালে। জনসন তখনও তাঁর অভিধানের কাজে হাত দেননি।

বস্তুত জনসন যখন অভিধানের কাজ শুরু করেছেন তখন আসর জাঁকিয়ে বসেছেন বেঞ্জামিন মার্টিন (Benjamin Martin) নামে একজন অভিধান-সংকলক। ১৭৪৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর—*Lingua* Britannica *Reformata*। জনসনের অভিধান প্রকাশিত হওয়ার এক বছর আগে প্রকাশিত হয় বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ। মার্টিন জ্ঞানের জগতে এক আশ্চর্য অভিযাত্রী। কৃষকের ঘরের এই সন্তানের জীবন শুরু হয়েছিল কৃষিক্ষেত্রে। বাল্য

থেকে বই পড়া ছিল তাঁর নেশা। স্বশিক্ষিত তরুণ একদিন পত্তন করেন একটি গ্রামীণ পাঠশালা। সেখানে ছেলেদের অক্ষরজ্ঞান, হস্তলিপি এবং সাধারণ অঙ্ক শেখাতেন। আর ফাঁকে ফাঁকে নিজে শিখতেন তাঁর প্রিয় বিষয় গণিত। সৌভাগ্যবশত উত্তরাধিকারসূত্রে হঠাৎ এক সময় তাঁর ভাগ্যে জুটে যায় ৫০০ পাউন্ড। ফলে কিছু বইপত্র ও যন্ত্রপাতি কেনার সামর্থ্য হল তাঁর। অচিরেই দেখা গেল গোটা ইংল্যান্ড ঘুরে প্রকৃতিবাদ (Natural Philosophy) নিয়ে বক্তৃতা করছেন তিনি। সেই সূত্রে নানামহলে কিছু গুণগ্রাহীর বন্ধুত্ব অর্জন করেন মার্টিন। ভাষাতত্ত্ব চর্চার জন্য তিনি এক প্রকাশনার পরিকল্পনা করেন। তার নাম দেওয়া হয়— 'Philological Library or Literary Arts and Sciences.' বন্ধুদের নাম এই উপলক্ষে তালিকাবদ্ধ করা হয় গ্রাহক হিসাবে। এ-সব ১৭৩৭-৪০ সালের কথা। ততদিনে চেস্টারে তাঁর স্থিতি হয়েছে। সেখানে ছাত্র পড়ানোর জন্য তিনি একটি টোল খোলেন, সঙ্গে সঙ্গে শুরু করেন কাচ নিয়ে গবেষণা। মার্টিন নিজেই পকেট অণুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন। তিনি চশমাও তৈরি করতে পারতেন। ১৭৪০ সালে মার্টিন চলে আসেন লন্ডনের ফ্লিট স্ট্রিট এলাকায়। সেখানেই তখন রয়াল সোসাইটির ঠিকানা। মার্টিন-এর জীবনের ধ্রুবতারা ছিলেন নিউটন। রয়াল সোসাইটিতে নিউটনের যে-কোনও অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেখানে হাজির থাকেন তাঁর নিত্য পূজারি বেঞ্জামিন মার্টিন। মার্টিন অভিধান রচনা ছাড়াও বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। একসময় 'মার্টিন্‌স ম্যাগাজিন' (Martin's Magazine) নামে বিজ্ঞানের একটি কাগজও করেছিলেন। কিন্তু এই জ্ঞানতাপসের শেষজীবন বড়ই দুঃখের। অন্যদের উপর সব ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞানচর্চায় মগ্ন হওয়ার ফল হিসাবে তিনি একদিন আবিষ্কার করলেন, তিনি দেউলিয়া। আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছিলেন তিনি। ১৭৮১ সালে সাতাত্তর বছর বয়সে মৃত্যু এসে মুক্তি দেয় তাঁকে। মার্টিনের অভিধান সম্পর্কে বলা হয়— সন্দেহ নেই উল্লেখযোগ্য কীর্তি। মূল্যবান বই। কিন্তু অভিধান না বলে এটিকে কোষগ্রন্থ বলাই ভাল। ("A valuable work, but partakes more of the quality of an Encyclopedia, than a Dictionary.")

এই পরিবেশ-পরিস্থিতিতেই নাটকীয়ভাবে আবির্ভূত হলেন স্যামুয়েল জনসন। জনসন মধ্যবিত্তের ঘরের সন্তান। জন্ম তাঁর লিচফিল্ড-এ। বাবা ছিলেন পুস্তক বিক্রেতা। তিনি সন্তানকে অক্সফোর্ডে পাঠিয়েছিলেন। অক্সফোর্ড থেকে বের হয়ে জনসন কিছুকাল স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তখনই ঘরসংসার শুরু করেছেন। লেখালেখিরও শুরু তখনই। শিক্ষকতায় বিশেষ সুবিধা হল না দেখে ১৭৩৭ সালে তাঁর একজন প্রিয় ছাত্র এবং শাকরেদ ডেভিড গ্যারিককে নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন লন্ডন। পরের বছর সাংবাদিক হিসাবে যোগ দেন 'জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিন'-এ। 'জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিন'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এডোয়ার্ড কেভ (Edward Cave) তৎকালের একজন অগ্রণী সাংবাদিক। বস্তুত সাংবাদিক বললে সামান্যই বলা হয়। এডোয়ার্ড কেভ ছিলেন এক অসাধারণ পুরুষ। রাগবি থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি লন্ডনে আসেন। সেখানে কিছুকাল কেরানির কাজ করার পর ছাপাখানায় শিক্ষানবিশ হন। সে বিদ্যা আয়ত্ত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত নিজেই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৩১ সালে প্রকাশ করেন 'জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিন'। দেখতে দেখতে কাগজের প্রচারসংখ্যা দাঁড়ায় মাসে দশ হাজার। ১৭৪০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় পনেরো হাজার। পার্লামেন্টের ধারাবিবরণী প্রকাশিত হত তাঁর কাগজে, আর তা লিখতেন স্যামুয়েল

জনসন। সেই সূত্রেই দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কেভ কাগজ পরিচালনা ছাড়াও স্পিনিং মিল, ওয়াটার-হুইল— এ-সব যন্ত্রপাতি নিয়ে কারবার করতেন। তিনি গোলাবারুদ নিয়েও কাজ করেছেন। তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয় তিনিও যেন শিল্পবিপ্লবের একজন অগ্রদূত। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন-এর সঙ্গেও বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। কেভ-এর বাড়িতেই তাঁর সহযোগিতা নিয়ে ফ্রাঙ্কলিন পরীক্ষানিরীক্ষা করেন বিদ্যুৎ নিয়ে। কিন্তু জনসনের সঙ্গে যেন তাঁর আত্মার আত্মীয়তা। জনসন তাঁর কাগজে কাজ করেছেন ১৭৪৩ সাল পর্যন্ত। কেভ-এর মৃত্যু ১৭৫৪ সালে। মৃত্যুকালে জনসন ধরে রেখেছিলেন তাঁর হাত।

যা হোক, এবার অভিধান প্রসঙ্গে ফেরা যাক। জনসন তখনও কেভ-এর কাগজে কাজ করছেন। একদিন অবকাশে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন, বিশিষ্ট বই বিক্রেতা, জেমস ডড্‌স্‌লে-র (James Dodsley) ভাই রবার্ট-এর দোকানে বসে। কথায় কথায় রবার্ট বললেন, এসময়ে ইংরেজি ভাষায় একটি অভিধান প্রকাশ করতে পারলে লোকেরা লুফে নিত। কিন্তু কে করবেন সেই কাজ? তা-ই শুনে জনসন নাকি মন্তব্য করেছিলেন, আর যিনিই করুন-না-কেন, আমি করছি না। ("I believe I shall not undertake it.")

তবু শেষ পর্যন্ত তাঁকে দায়িত্ব নিতে হয় সে-অভিধান সংকলনের। কেননা, গরজ বড় বালাই। শুধু 'জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিন'-এর কাজে আর চলে না। ইচ্ছা, ফ্রিল্যান্স লেখালেখি করে রোজগার বাড়াবেন। কারণ, তাঁর আর্থিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ। বস্তুত ঋণের দায়ে জেলে যাওয়ার দশা। তা থেকে মুক্তির জন্য নিজের ব্যবহারের অনেক জিনিসপত্র বেচে দিতে হয়েছে। ভাবছেন, তবে কি আইনজীবীর পেশা গ্রহণ করবেন? মন দ্বিধাগ্রস্ত। ঠিক সেই মুহূর্তেই অভিধান সংকলনের প্রস্তাব। কাজটি মূলত এক সাংস্কৃতিক উদ্‌যোগ, সেদিক থেকে যেমন গ্রহণীয়, তেমনই লোভনীয় আর্থিক দিক থেকেও। ওঁরা ১৫০০ গিনি দিতে সম্মত। ওঁরা মানে প্রকাশক ওই বই বিক্রেতা রবার্ট ডড্‌স্‌লে ও তাঁর সহযোগীরা। ১৫০০ গিনি সেকালে তুচ্ছ করার মতো অর্থ নয়, পাউন্ডে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৭৫! স্যামুয়েল জনসন টোপ গিললেন। তার পর বসে গেলেন অভিধানের খসড়া পরিকল্পনা রচনা করতে। সেটা ১৭৪৬ সালের এপ্রিলের কথা। খসড়াটি তিনি সবিনয়ে পাঠালেন লর্ড চেস্টারফিল্ড-এর কাছে। তিনি তখন সাংস্কৃতিক-ইংরেজ সমাজে একজন সমাজপতি। সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাঁর কথাই বেদবাক্য। জনসন-এর প্রত্যাশা ছিল এই উদ্‌যোগ শুধু তাঁর অনুমোদন নয়, পৃষ্ঠপোষণাও লাভ করবে। অনুমোদন মিলল বটে, কিন্তু দ্বিতীয়টির কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। তবু তিনি উপযাচক হয়ে সংশোধিত পরিকল্পনাটিও তাঁকে পাঠালেন। এবার আর 'স্কিম' (Scheme) নয়, 'প্ল্যান' (Plan)। চিঁড়া তবু ভিজল না।

অকুতোভয় জনসন তবু পিছু হটলেন না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি ডড্‌স্‌লে-দের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে চুক্তিবদ্ধ হলেন। সেটা ১৭৪৬ সালের কথা। তাঁর বয়স তখন আটত্রিশ বছর। তাঁর সাহস তারিফ করার মতো বইকী! ক'জন চেনেন স্যামুয়েল জনসনকে! পরিচিত মহলে তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি বটে, কিন্তু সাংস্কৃতিক জগতে তাঁকে 'বিশিষ্ট' বলা যাবে না। তিনি একজন সাংবাদিক। অন্য লেখালেখিও করেছেন হয়তো, কিন্তু সে-সব প্রধানত অনুবাদ। তবু তিনি ঝাঁপ দিলেন। বাংলা পদ্যের একা বাঙালি সন্তান জগাই লড়েছিলেন সাত জার্মানের সঙ্গে, স্যামুয়েল জনসন নামে এক ইংরেজ একাই লড়তে চান চল্লিশ ফরাসির সঙ্গে। 'অমর চল্লিশ' এক দিকে, অন্য দিকে একাকী ইংরেজ!

আগাম হিসাবে কিছু অর্থ হাতে এল। তা থেকে জনসন ফ্লিট স্ট্রিটের একটি গলিতে বাড়ি নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস স্টুয়ার্ট নামে একজন সহকারী নিয়োগ করলেন। ক্রমে সহকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়। ওঁরা বলতে গেলে সবাই স্কট। সবাই গ্রাব স্ট্রিটের ভাড়াটে কলমবাজ। ওঁদের কাজ ছিল জনসন-চিহ্নিত শব্দ ও বাক্য কপি করা, চিরকুটে উদ্ধৃতি লিখে রাখা, স্তূপীকৃত কাগজপত্র গুছিয়ে ফাইল করা, স্লিপ বা টুকরো কাগজ বাছাই করা। উপযুক্ত অধিনায়কের উৎসাহ যেন সঞ্চারিত হয় ওঁদের মধ্যে। অভিধানে প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু অবদান রয়েছে। অভিধানের বাইরেও পরে কেউ কেউ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার সাক্ষ্য রেখেছেন। ওঁদের কাহিনী শোনার মতো হলেও, এখানে বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই। জনসন-এর সঙ্গে ওঁদের প্রত্যেকের সম্পর্ক ছিল অন্তরঙ্গ। জনসন একজন সহকারীকে বলতেন—'গ্রেট স্কলার', বিরাট পণ্ডিত। আর-একজনের স্ত্রী মামলায় জড়িয়ে পড়ার পর তিনি নিজে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর জামিনদার হতে। পরবর্তীকালে স্বামী ও স্ত্রীর প্রয়াণের পর ওঁদের শেষকৃত্যের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন জনসন।

অভিধান-সংকলক হিসাবে জনসন-এর দক্ষিণা আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট মনে হলেও, কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে বাড়তি কিছু রোজগারের ব্যবস্থাও করতে হচ্ছিল। কেননা, সহকারীদের মাইনে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর, বইপত্র, কাগজ কালিকলম, সব খরচই মেটাতে হয় তাঁর পকেট থেকে। এদিকে বাজারে দেনাও বেড়ে গেছে। দুধওয়ালা হুমকি দিয়ে গেছে, সে তাঁকে জেলে পাঠাবে। রীতিমতো লড়াই করে টিকে থাকতে হচ্ছে জনসনকে। সুতরাং, ফ্রিল্যান্স লেখালেখি করে কিছু রোজগার করতে হচ্ছে। 'দ্য র‍্যাম্বলার' (*The Rambler*) নামে নিজে একটা কাগজ বের করেছিলেন ১৭৫০ সালে। তার জন্যও লিখতে হয়। তারই মধ্যে অবিরাম চলে অভিধানের কাজ। বস্তুত ১৭৫০ সালের শেষ দিকেই শব্দ তালিকা বলতে গেলে সম্পূর্ণ। এবার কাজ শব্দমূল নির্দেশ, সংজ্ঞা, দৃষ্টান্ত বাক্য ইত্যাদি। জনসন-এর এক হাতে শব্দ-তালিকা, অন্য হাতে উদ্ধৃতির কার্ড ফাইল বা বাক্যাবলি। আরও পাঁচ বছর কেটে গেল সে-সব গোছাতে। ১৭৫৫ সালের প্রথম দিকেই অভিধান কার্যত তৈরি। কিন্তু জনসন চান 'টাইটেল পেজ' বা নামপত্র ছাপার আগে অক্সফোর্ডের উপাধিটি অর্জন করতে। ফেব্রুয়ারিতে সেটি হাতে আসে। দীর্ঘ 'টাইটেল'-এ অভিধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ মুদ্রিত হল—"বাই স্যামুয়েল জনসন, আ. এম" (By Samuel Johnson, A.M.). সেই থেকে তিনি ডক্টর জনসন!

জনসন যা বলেছেন, তার মর্মকথা: এ-কাজ হাতে নেওয়ার পর আমি স্থির করি কোনও শব্দ, কোনও বস্তুকেই আমি যাচাই না করে ছাড়ব না। মনে মনে এই ভেবে আমি আনন্দিত যে অতঃপর আমার সময় কাটবে সাহিত্যের ভোজে, ভাষার অজানা আনাচেকানাচে। সেখানে আমি হানা দিয়ে সব তছনছ করব, পুরস্কার হিসাবে তুলে আনব এমন মণিমাণিক্য যা আমি মানবজাতির সামনে মেলে ধরব। আমি জানি এ-সব কবির স্বপ্ন, আভিধানিককে জাগিয়ে তুলতে শেষ পর্যন্ত যা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবু আমি যেন আর্কেডিয়ার আদিম বাসিন্দার মতো সূর্যকে ধরতে চাই, ওই পাহাড়ের আড়ালে যেখান থেকে সে বেরিয়ে আসে আমি সেখানে ছুটে যাই, পাহাড় দূরে সরে যায়।

জনসন কীভাবে ওই বিশাল অভিধান সংকলন করেছেন, কী ছিল তাঁর রীতি পদ্ধতি, সে অভিধানে কী ছিল, কী নিয়ে— তা-ই নিয়ে প্রয়োজন থাকলেও আলোচনার সুযোগ এখানে

নেই। সংক্ষিপ্ত তথ্য হিসাবে আপাতত জ্ঞাতব্য, তিনি রীতি অনুযায়ী তাঁর পূর্ববর্তী আভিধানিকদের বই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু নিজেও পরিশ্রম করেছেন বিস্তর। অভিধানের যে অংশটুকুর সঙ্গে সৃজনশীলতার সম্পর্ক সে-সব করেছেন তিনি নিজে। যথা: সংজ্ঞা ধার্য করা, শব্দমূল অনুসন্ধান করা, দৃষ্টান্তবাক্য সংগ্রহ করা, ইত্যাদি। তার জন্য বিস্তর পড়েছেন, বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। আপন কাজে তাঁর উদ্যমে কখনও ভাটা পড়েনি। তাঁর আত্মতৃপ্তি অতএব স্বাভাবিক।

সাধারণ পাঠকের কাছে আজও উপভোগ্য জনসন-এর অভিধানের সংজ্ঞা। এখনও যে-কোনও ইংরেজি "বুক অব কোটেশানস" বা উদ্ধৃতি সংগ্রহে তার কিছু-না-কিছু লভ্য। এখানে তার কিছু নমুনা পেশ করা গেল, যা সর্বত্র সহজলভ্য নয়।

Club = An assembly of good fellows, meeting under certain condition.

Excise = A hateful tax levied upon commodities, and adjudged not by the common judges of property, but wretches hired by those to whom excise is paid.

Grab Street = The name of a street near Moorsfield, London, much inhabited by writers of small histories, dictionary and temporary poems.

Essay = A loose Sally of the mind; an irregular undigested piece; not a regular and orderly composition.

Lexicographer = A writer of Dictionaries, a harmless drudge.

Oats = A grain, which in England is generally given to horses, but in Scotland supports the people.

Patron = Commonly a wretch who supports with insolence, and is paid with flattery.

Tory = One who adheres to the ancient Constitution of the State and the apostolical hierarchy of the church of England.

Whig = A faction. ইত্যাদি।

গুরুগম্ভীর অভিধান নয়, জনসন যেন খেয়ালে মেতেছেন, অভিধানের গাম্ভীর্যের পটভূমিতেই ফাঁকে ফাঁকে রেখে যাচ্ছেন তাঁর ব্যক্তিগত স্বাক্ষর! কেউ কেউ অনুমান করেছেন 'ওট' উপলক্ষে স্কটদের নিয়ে ওই রঙ্গ হয়তো তাঁর প্রিয় স্কট সহযোগীদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতা। 'হুইগ'-রা তাঁকে সনাতনপন্থী গোঁড়া 'টোরি' বলে নিন্দামন্দ কম করেননি। তার আদর্শগত অন্য কারণও ছিল নিশ্চয়। তবে অভিধানের 'হুইগ' সংজ্ঞা হয়তো তাঁদের কুপিত করেনি। কেননা, তাঁরা নিশ্চয় খেয়াল করেছেন টোরিদের তিনি সনাতন মূল্যবোধে আস্থাবান বলে খাতির করলেও, 'টোরি' শব্দটির মূল নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন— 'derived, I suppose from an Irish word meaning savage.'

সত্য, জনসন চেয়েছিলেন ইংরেজি শব্দাবলি বাছাই করে তাদের চিরকালের মতো স্থায়িত্ব দিতে। সেদিন বিদ্বন্মহলেরও দাবি ছিল— শুদ্ধ ইংরেজি শব্দ চয়ন এবং অভিধানে সেগুলিকে অক্ষয় অমর হিসাবে চিহ্নিত করা। কিন্তু কাজ করতে করতে জনসন বুঝতে পারেন সেটা এক অসম্ভব দাবি। তিনি নিজের কাছেই হার মানেন। লিখেছেন, আমি যা আশা করেছিলাম, যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে তা অলীক কল্পনায় পর্যবসিত। কোনও

অভিধানের সাধ্য নেই শব্দকে বিকৃত কিংবা জরা থেকে চিরকালের মতো বাঁচিয়ে রাখার। এই সংকল্প নিয়ে যে-সব আকাদেমি গড়ে উঠেছিল সেগুলিও ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ হতে বাধ্য। তা ছাড়া আকাডেমি সম্পর্কে তাঁর অন্য আপত্তিও ছিল। তাঁর মতে স্বাধীনচেতা ইংরেজরা পদে পদে তাকে বাধা দিত কিংবা ধ্বংস করত। ("English liberty will hinder it or destory it.") তাই চল্লিশ ফরাসির বিরুদ্ধে একাকী তিনি। ঘরে কিংবা বাইরে, নিন্দা অথবা প্রশংসা যা-ই জুটুক-না-কেন, তিনি অকুতোভয়। হাতে তাঁর একক কীর্তি, ইংরেজি ভাষার বিশাল এক অভিধান—*A Dictionary of the English Language*... .

বিশাল বই। মূল শব্দ ৪০ হাজার। ডালপালা নিয়ে শব্দ সংখ্যা— অসংখ্য। ১ লক্ষ ১৬ হাজার উদ্ধৃতি। বই প্রকাশের পর নানা মহল সেটাকে স্বাগত জানাল। প্রিয় ছাত্র ও শিষ্য ডেভিড গ্যারিক-এর সেই প্রশস্তি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজের জাতীয়-গর্ব, ডক্টর জনসন। তাঁর দৌলতে ইংরেজ বিজয়ী, ফরাসিরা পরাজিত! আর-একজন বিদ্বান মনে করিয়ে দিলেন জনসন মাত্র ক'বছরে যা করলেন চল্লিশ ফরাসি পণ্ডিত পঞ্চাশ বছরেও তা করতে পারলেন কই! অ্যাডাম স্মিথ প্রশংসায় মুখর। তাঁর দু'একটি ছোটখাটো সমালোচনা ছিল। তবু বললেন— অভূতপূর্ব।

বইটির দাম ছিল ৪ পাউন্ড ১০ শিলিং। সাধারণের নাগালের বাইরে এই উচ্চমূল্য। সুতরাং, বিশেষ বিক্রি হল না। (বস্তুত ৪ হাজার কপি বই বিক্রি হতে লেগেছিল পাকা দশ বছর)। অভিধান বাজার পেল ১৭৫৬ সালে, ১০ শিলিংয়ে ডিমাই সাইজে নবকলেবর গ্রহণের পর। (ত্রিশ বছরে সে-বই বিক্রি হয়েছিল ৪০ হাজার কপি!) তার পর রকমারি সংস্করণ। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭৬৫ সালে। চতুর্থ ১৭৭৩ সালে। চতুর্থ সংস্করণটি দু'জন সহকারীকে নিয়ে পরিমার্জনা করেছিলেন জনসন। তাঁর প্রয়াণ ১৭৮৪ সালে। কিন্তু তাঁর অভিধান সগৌরবে বেঁচে ছিল পরের শতকেও। অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটেনে এবং আমেরিকায়। পৃথিবীর অন্যত্রও। এমনকী আমাদের এই কলকাতায়ও। বস্তুত, আরও অনেক ক্ষেত্রেই কৃতী পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু জনসনও বলতে গেলে ইংরেজের কাছে অমর হয়ে আছেন এই অভিধানের জন্যই। অথচ কী খেলাচ্ছলেই না তিনি এমন একটা বিরাট কাজ করে গেলেন। ঘোড়ার পায়ে একটা বিশেষ অংশকে বলা হয় 'প্যাস্টার্ন' (Pastern)। জনসন তার সংজ্ঞা দিয়েছেন 'ঘোড়ার হাঁটু'—'নি অব দ্যা হর্স।' একদিন আসরে এক ভদ্রমহিলা চেপে ধরলেন তাঁকে— এটা কেমন হল? জনসন-এর সহাস্য উত্তর— অজ্ঞতা, মহাশয়া, স্রেফ অজ্ঞতা! ('Ignorance, Madam, pure ignorance!') আর-এক দিন আর-এক সাহিত্যরসিক ভদ্রমহিলা বললেন, আপনি 'দুষ্ট' শব্দ ('naughty words') বাদ দেওয়ার ব্যাপারে যে সংযম দেখিয়েছেন তার জন্য আপনার প্রশংসা করতে হয়। ডক্টর জনসন-এর তাৎক্ষণিক উত্তর— না, মহাশয়া, আমি তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিনি, তা আপনি বুঝি তা-ই খুঁজছিলেন! ("No, Madam, I hope I have not daubed my fingers. I find, however, that you have been looking for them.")

হ্যাঁ, ইনিই আভিধানিক ডক্টর স্যামুয়েল জনসন।

এবার অতলান্তিকের ওপারে।

আমেরিকার প্রথম অভিধান-প্রণেতার নামও স্যামুয়েল জনসন। স্যামুয়েল জনসন জুনিয়ার। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ১৭৭৬ সালের ঘটনা। আর, জুনিয়ার জনসন-এর

'স্কুল ডিকশনারি' প্রকাশিত হয় ১৭৯৮ সালে। এই অভিধান প্রকাশের আগে পর্যন্ত আমেরিকায় যে-সব অভিধান চালু ছিল তার সবই আমদানি করা। জনসন-এর অভিধান প্রথম আমেরিকায় পৌঁছায় ১৮১৮ সালে। ইংল্যান্ডে তখন বইটির একাদশ সংস্করণ চলছে। পরবর্তী এক দশক এই বই-ই নানা আকারে চালু ছিল আমেরিকায়। আমদানি-করা অভিধানগুলোর মধ্যে চারটি মোটামুটি জনপ্রিয় ছিল সে দেশে। সেগুলির সংকলক যথাক্রমে জন এনটিক (John Entick)। তাঁর বইয়ের নাম 'নিউ স্পেলিং ডিকশনারি অব দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ', প্রকাশকাল ১৭৬৫ সাল। দ্বিতীয়, উইলিয়াম পেরি-র (William Perry) 'দি রয়াল স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ ডিকশনারি'। সেটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৭৫ সালে। ১৭৮৮ সালে সেটি আমেরিকায় যখন পুনর্মুদ্রিত হয় তখন বলা হয়, ওই ভূখণ্ডে প্রথম মুদ্রিত অভিধান ('The First Work of the Kind Printed in America')। আমদানি-করা তৃতীয় অভিধান টমাস শেরিডন-এর (Thomas Sheridan) দুই খণ্ডে 'জেনারেল ডিকশনারি অব দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ'। এটির প্রথম প্রকাশ ১৭৮০ সাল। চতুর্থ, জন ওয়াকার-এর (John Walker) 'ডিকশনারি অব দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ'। প্রকাশকাল ১৭৭৪ সাল। ওয়াকার ছিলেন ডেভিড গ্যারিক-এর দলের একজন অভিনেতা। পরের বছর (১৭৭৫) অভিধানটির নতুন নামকরণ হয়—'দা রাইমিং ডিকশনারি।' অষ্টাদশ শতক তো বটেই, গোটা উনিশ শতক জুড়ে বেশ জনপ্রিয় ছিল এই অভিধানটি।

এই পটভূমিতেই ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত হয় স্যামুয়েল জনসন জুনিয়ার-এর প্রথম স্বদেশি অভিধান 'আ স্কুল ডিকশনারি।' জনসন ছিলেন নিউ ইয়র্কের কিংস কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আর-এক জনসন-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। সেই কলেজই এখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। জনসন ইয়েল-এ পড়াশুনা করেছেন। তাঁর বাবা ছিলেন শিক্ষক। পাঠশেষে তিনি বাবার পেশা-ই বেছে নিয়েছিলেন। জনসন শিক্ষকতা করতেন কানেকটিকাট-এর গিলফোর্ডে। আমৃত্যু সেখানেই ছিল তাঁর ঠিকানা। স্কুলে জনসন ছাত্রদের পড়তে, লিখতে, সাধারণ অঙ্ক করতে শেখাতেন। সেইসঙ্গে ব্যাকরণ ও ভূগোলও পড়াতেন। তা ছাড়া, ফলের চাষ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ জ্ঞান। এই ব্যাপারে তাঁর কালে তিনি একজন পথপ্রদর্শক বলে গণ্য ছিলেন। তাঁর আর-এক পেশা ছিল বংশলতিকা রচনা। তাঁর স্কুল-অভিধানটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৯৮, আর তাতে শব্দসংখ্যা ছিল ৪,১০০। তবু প্রথম উদ্‌যোগ হিসাবে বইটি অবশ্যই স্মরণযোগ্য। পরে ১৮০০ সালে পাদ্রি জন এলিয়ট-এর (Rev. John Elliot) সঙ্গে তিনি প্রকাশ করেন আরও একটি অভিধান। তাতে উচ্চারণও নির্দেশ করা হয়েছিল। বইটির নাম—'সিলেক্টেড প্রনাউন্সিং অ্যান্ড অ্যাকসেন্টেড ডিকশনারি' (*Selected Pronouncing and Accented Dictionary*)। এই বইটির শব্দসংখ্যা ছিল ৯,০০০ এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২৩। অদ্ভুত অদ্ভুত সংজ্ঞা ছিল নাকি বইটিতে। যথা: 'Ball—any round thing', 'Ballad—a Trifling song,' 'Balloon—a kind of Ball, a vessel to traverse the sky,' ইত্যাদি।

একই বছরে, অর্থাৎ ১৮০০ সালে প্রকাশিত হয় আমেরিকার দ্বিতীয় স্বদেশি অভিধান, কালেব আলেকজান্ডার-এর (Caleb Alexander) 'দা কলম্বিয়ান ডিকশনারি অব দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ' (*The Columbian Dictionary of the English Language*)। ৫৫৬ পৃষ্ঠা জুড়ে ২৫,৭০০ শব্দ। আমেরিকার মাপে বিশাল অভিধান। দাবি করা হয় এই অভিধানে

আমেরিকায় প্রচলিত এমন অনেক শব্দ রয়েছে যা অন্য কোনও অভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। জাতীয়তার উষ্ণ স্পর্শ!

আমেরিকার অভিধান-অভীপ্সার প্রথম পর্বে একজন মহিলার অবদানের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি অবশ্য জাতি-পরিচয়ে ইংরেজ। রয়াল নেভির একজন অফিসারের কন্যা তিনি। নাম সুসানা রাউসন (Susanna Rowson)। পত্নী-বিয়োগের পর ভদ্রলোক চলে আসেন আমেরিকায়। সেখানে কাস্টমস-এ চাকরি নেন। ম্যাসাচুসেট-এ তিনি দ্বিতীয়বার সংসার পাতেন। সুসানা ছিলেন তাঁর প্রথম পক্ষের মেয়ে। গুছিয়ে বসার পর দেশ থেকে মেয়েকেও তিনি আমেরিকায় নিয়ে আসেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় পরিবারটি বিপন্ন হয়। অপরাধ, ভদ্রলোক ইংরেজ নৌবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বিষয় আশয় সব বাজেয়াপ্ত করা হয়। এদিক-ওদিক ভাসতে ভাসতে তিনি ১৭৭৮ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। সুসানা তখন একজন ডাচেস-এর গভর্নেস হিসাবে কাজ করছেন। উইলিয়াম রাউসন নামে একজন লোহার ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামী আবার সৈন্যবাহিনীতে বাদ্যও বাজাতেন। বাল্য থেকেই সুসানার লেখাপড়ার দিকে বিশেষ ঝোঁক। তিনি বিস্তর পড়তেন, কিছু কিছু লিখতেনও। বিয়ের পর ডাচেস-এর উৎসাহে প্রকাশিত হয় দুই খণ্ডে তাঁর উপন্যাস 'ভিক্টোরিয়া' (*Victoria*)। বইটি ডেভনশায়ার-এর ডাচেস-কে উৎসর্গ করা। হৃদয়বান মহিলা মেয়েটিকে আলাপ করিয়ে দেন প্রিন্স অব ওয়েলস-এর সঙ্গে। তাঁর বদান্যতায় বিপন্ন বাবার জন্য সরকারি পেনশনের ব্যবস্থা হয়। ক'বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হল সুসানার দ্বিতীয় উপন্যাস, তিন খণ্ডে 'দি ইনকুইজিটার অর দি ইনভিজিবল র‍্যাম্বলার' (*The Inquisitor, or the Invisible Rambler*)। বইটি আমেরিকায়ও প্রকাশিত। দেখতে দেখতে সুসানা রাউসন বিখ্যাত একজন লেখক। শুধু বিখ্যাত নন তিনি, অতিশয় জনপ্রিয়ও। সেকালের, বলতে গেলে প্রথম 'বেস্টসেলার' তাঁর বই। পাঠকেরা তাঁর কলমে শুনতে পান নারীর অন্তর্লোকের কথা। তাঁদের দুঃখ বেদনা, যন্ত্রণা ও বিদ্রোহের বার্তা। এ-কালে হলে তিনি নাকি নারীবাদীদের একজন বলেই নিশ্চিত গণ্য হতেন।

তবু অভাব ঘোচে না। লেখক নন, বইয়ের মুনাফা সবই চলে যায় প্রকাশকের পকেটে। রোজগার বাড়াবার জন্য সুসানা অভিনয়ে যোগ দেন। এডিনবরার বেশ-কিছু নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি। ভাগ্য তবু অপ্রসন্ন। নিজে একটি নাটক লিখেছেন—'আমেরিকানস ইন ইংল্যান্ড' (*Americans in England*), সেই নাটক নিয়ে লেখক-অভিনেত্রী স্বামীকে নিয়ে পাড়ি জমালেন আবার আমেরিকায়। এ-সব ১৭৯৩ সালের কথা। তাঁর নাটক যথারীতি মঞ্চস্থ হয়েছিল, যথারীতি প্রশংসিতও। কিন্তু সংসার চালাবার জন্য শেষ পর্যন্ত মাত্র একজন পড়ুয়াকে নিয়ে তাঁকে খুলতে হয় স্কুল। সেইসঙ্গে সাময়িক পত্র প্রকাশ। রোজগারের জন্য অন্য কাগজেও লিখতে হত তাঁকে। স্কুল জমিয়ে তুলেছিলেন সমকালের চোখে এক বিপ্লবাত্মক কাণ্ড ঘটিয়ে— স্কুলে পিয়ানো শেখার বন্দোবস্ত ক'রে। এই স্কুল সূত্রেই ১৮০৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর জনপ্রিয় অভিধান—'দি স্পেলিং ডিকশনারি' (*The Spelling Dictionary*)।

তারই মধ্যে ডক্টর জনসন-এর মতো সূর্যকে বন্দি করবেন বলে আকাশে হাত বাড়ালেন এক দুঃসাহসী আমেরিকান। তিনি নোয়া ওয়েবস্টার (১৭৫৮-১৮৪৩) (Noah Webster)। জনসন জানতেন, সূর্য-ধরা কবির স্বপ্ন। নোয়া ওয়েবস্টার কবি নন, তিনি কঠোর কঠিন

বাস্তববাদী। তিনি উগ্র দেশপ্রেমিক। 'আমেরিকান টাং' ('American Tongue') শব্দ-যুগল নাকি প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর কলমে। 'আমেরিকান ইংলিশ' ('American English') বলে যাঁরা সে দেশে প্রচলিত ইংরেজিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁদের অগ্রণী। অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ইংল্যান্ডের মতো আমেরিকায়ও ভাষাচর্চার জন্য রকমারি সভা সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ দেখা গেছে। ১৮২০ সালে নিউ ইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে আমেরিকান অ্যাকাডেমি (The American Academy of Language and Belles Letter)। তার আগে ১৭৮৮ সালে নিউ ইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি ভাষাতত্ত্ব চর্চার কেন্দ্র ('Philological Society')। কিন্তু কোনওটিই স্থায়ী হয়নি। অ্যাকাডেমি তো দু'বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। তার পিছনে অনেক কারণই ছিল। একটি কারণ ছিল কেউ কেউ মনে করতেন ইংল্যান্ড সে-ভাষার আদি ভূমি, যেখানে এখনও চলেছে ব্যাপক ও গভীর ভাষা চর্চা সেখানে আমেরিকায় স্বতন্ত্র ইংরেজি ভাষা নিয়ে আলোচনা গবেষণা কি অবান্তর নয়? নোয়া ওয়েবস্টার-এর অভিমত ছিল এ-ধরনের বশ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত। দেশপ্রেমিক ওয়েবস্টার-এর সংকল্প, তিনি যে শুধু স্যামুয়েল জনসন-কে অভিধান রচনায় পর্যুদস্ত করবেন তা-ই নয়, অ্যামেরিকান ইংরেজিকে প্রতিষ্ঠা করবেন ইংরেজি থেকে স্বতন্ত্র এক ভাষা হিসাবে।

নোয়া ওয়েবস্টারের জন্ম কানেকটিকাট-এর ওয়েস্ট হার্ডফোর্ড গ্রামে। ওঁদের পরিবার ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় পাড়ি জমান ১৬৩৫ সালে। ওয়েবস্টার-এর বাবা (তাঁর নামও নোয়া) সামান্য লেখাপড়া জানতেন। তিনি ছিলেন একজন মোটামুটি সম্পন্ন কৃষক। নব্বই একর জমি জুড়ে ছিল তাঁর খামার। তা থেকেই তিন পুত্র আর দুই কন্যাকে নিয়ে গৃহস্থালি চালাতেন সিনিয়ার নোয়া। ধর্মে ওঁরা ছিলেন ক্যালাভনপন্থী খ্রিস্টান। ধর্ম-বিশ্বাসে অত্যন্ত গোঁড়া, আজকের ভাষায় বললে এক ধরনের মৌলবাদী। ক্যালাভন মনে করতেন একমাত্র যাজকদেরই অধিকার আছে রাষ্ট্র পরিচালনার। বাবা গ্রামের গির্জার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। এই ধর্মীয় পরিমণ্ডলেই ওয়েবস্টার বেড়ে উঠেন। চোদ্দ বছর অবধি বাবার খামারেই কাজ করেছেন তিনি। পড়াশুনা করেছেন গ্রামের স্কুলে। পড়াশুনার দিকে বাল্য থেকেই ঝোঁক ছিল তাঁর। মাঠেও নাকি বই নিয়ে যেতেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়তেন লাতিন ব্যাকরণ। ১৭৭৪ সালে তিনি ইয়েল-এ ভর্তি হন। ইয়েল তখনও ঠিকমতো গড়ে ওঠেনি। সেখানে তিনি গ্রিক, লাতিন ও হিব্রু শেখেন। ১৭৭৫ সালের জুনে জেনারেল জর্জ ওয়াশিংটনকে ইয়েল-এ যাঁরা অভ্যর্থনা করেছিলেন সেই ছাত্রদলে ছিলেন নোয়া ওয়েবস্টার। তাঁর দেশপ্রেম অতএব হঠাৎ আলোর ঝলকানি মাত্র ছিল না।

কুড়ি বছর বয়সে ওয়েবস্টার স্নাতক হয়ে গ্রামে ফিরে আসেন। একবার ভেবেছিলেন আইনজীবীর পেশা গ্রহণ করবেন। দ্বিতীয় চিন্তায় সে-ইচ্ছা বাতিল হয়ে গেল। দেশে তখন ঘোর মন্দা, স্বাধীনতা যুদ্ধও পুরোপুরি শেষ হয়নি। সুতরাং, আইনের পথে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ওয়েবস্টার ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেন স্বদেশের আগেই, বাবা যেদিন ৮০০ ডলার হাতে তুলে দিয়ে বলেন— যাও, এবার নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করো। ওয়েবস্টার তখনই ভাগ্যানুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। এখানে-ওখানে শিক্ষকতা করে কিছুকাল পরে কানেকটিকাট-এ শারন (Sharon) নামে একটা জায়গায় নিজেই একটি স্কুল খুলে বসে গেলেন। আর সেখানেই তাঁর দ্বিতীয় জন্ম, ভাষাতাত্ত্বিক নোয়া ওয়েবস্টার-এর

প্রথম কলির উন্মেষ। ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে তিনি দেখলেন ওদের হাতে বানান, এবং শব্দার্থের কোনও ভাল বই নেই। শিক্ষক ওয়েবস্টার নিজেই বসে গেলেন সে অভাব মোচন করতে। বের হল তাঁর রচনা, বানান, ব্যাকরণ, পাঠ্যবস্তু ইত্যাদির একটা পাঁচমিশেলি সংকলন। অন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলো খসে গেল। কিন্তু টিঁকে গেল বানানের সংকলনটি। দেখতে দেখতে রীতিমতো 'বেস্টসেলার' সেটি। বইটির পরিবর্তিত নাম তখন 'দ্য ব্লু ব্ল্যাক স্পেলার' (*The Blue Black Speller*, ১৭৮৮)। একসঙ্গে ২০৯টি প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান ছাপাচ্ছিল বইটি। ওয়েবস্টার শেষ পর্যন্ত ১৮১৮ সালে হার্ডফোর্ডের হাডসন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। কোনও রয়ালটি নয়, ওয়েবস্টার চোদ্দো বছরের জন্য তাঁদের স্বত্ব বিক্রি করে দেন। কাপড়ের দোকান, মুদি দোকান— বইয়ের দোকান ছাড়াও অনেক দোকান থেকেই বিক্রি হত বইটি। ১৮৪০ সালে শোনা গেল তিন কোটি বই বিক্রি হয়ে গেছে। ১৮২৯ সাল থেকে বইটির অবশ্য নাম হয়েছে—'এলিমেন্টারি স্পেলিং বুক' (*Elementary Spelling Book*)। বাষ্পচালিত মুদ্রাযন্ত্রে ঘণ্টায় ৫২৫ কপি করে ছাপা হচ্ছে বই। ১৮৬৯ সালে পৌঁছে দেখা গেল মোট বিক্রিত কপির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ২০ লক্ষ। ওয়েবস্টার রয়ালটি না পেলেও প্রতি কপিতে এক সেন্ট করে পেতেন। ফলে ধনশালী হতে পারেননি বটে, কিন্তু স্কুলপাঠ্য এই বইয়ের দৌলতে তাঁকে কোনওদিন অনাহারেও কাটাতে হয়নি।

শুভ সূচনা। ১৮০০ সালে ওয়েবস্টার স্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি বড়সড় অভিধান রচনায় হাত দিলেন। কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর তাঁর মনে হল, শুধু ছোটদের জন্য কেন, সর্বজনের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলনই তো শ্রেয়। চিন্তা অনুযায়ী কাজ। ১৮০৬ সালে প্রকাশিত হল সেই অভিধান, 'আ কমপেনডিয়াস ডিকশনারি অব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ' (*A Compendius Dictionary of English Language*)। বেশ মোটাসোটা অভিধান। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪০৮, শব্দসংখ্যা ৪০,৬০০। শব্দের বানান, উচ্চারণ ও অর্থ ছাড়াও বইটিতে ছিল রকমারি জ্ঞাতব্য, মুদ্রা তথা অর্থের আন্তর্জাতিক সারণি, ওজন ও পরিমাপ, প্রাচীন পৃথিবীতে কাল বিভাজন, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, আমেরিকার ডাকঘরের তালিকা, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওয়েবস্টার এই অভিধান সম্পর্কে কোনও বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করেননি। বলেছেন এটি ১৭৬৫ সালে প্রকাশিত এনটিক-এর (Entick) অভিধানের পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্র, তিনি তাতে বিশিষ্ট সব লেখকদের রচনা থেকে ৫ হাজার নতুন শব্দ যোগ করেছেন। ১৮০৭ সালে একটি চিঠিতে তিনি দাবি করেন, জনসন-এর চেয়ে অনেক বেশি বই তিনি পড়েছেন। তাঁর সংজ্ঞা জনসন-এর চেয়ে অনেক বেশি পরিপক্ক। এই অভিধানের ভূমিকায়ও তিনি ডক্টর জনসনকে আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর মতে জনসন ব্যর্থ, অভিধান সঠিক কীভাবে সংকলন করতে হয় তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অঙ্গীকার, তিনি আমেরিকান ইংরেজির একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলন করবেন। এখনও অনেকে মনে করেন আমেরিকার সংস্কৃতি ইউরোপের তুলনায় হীন। তিনি প্রমাণ করবেন সে ধারণা ভুল। এই অভিধান সেই বৃহৎ লক্ষ্যে একটি বিরতি বিন্দু মাত্র।

ওয়েবস্টার 'আমেরিকান ইংলিশ' নিয়ে দীর্ঘকাল ধরেই যুক্তিজাল বিস্তার করে চলছিলেন। ১৭৮৫-৮৬ সালে ভাষা নিয়ে তিনি বেশ-কয়েকটি বক্তৃতা করেন। সেগুলি একসঙ্গে বই হিসাবে প্রকাশিত হয়। নাম—'ডিসারটেশনস অন দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ'

(*Dissertations on the English Language*)। এটি প্রকাশ করে নোয়া ওয়েবস্টার নিজেকে আমেরিকার নিজস্ব ইংরেজি ভাষার প্রবক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার সপক্ষে তিনি অনেক যুক্তিই নানা সময়ে নানা রচনায় পেশ করেছেন, মূল বক্তব্য: 'পূর্বপুরুষ এক হওয়া সত্ত্বেও কোনও শাখা যদি দূরবর্তী অন্য দেশে বাস করে তবে তাদের পক্ষে মাতৃভাষা চিরকাল অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব নয়।' ("Two Nations, proceeding from the same ancestors but established in distant countries cannot long preserve a perfect sameness of language. Americans speak English but it is American English and therefore needs a Dictionary of its own.") তার অনেক আগে অন্যত্র বলেছেন, "future separation of the American tongue from the English call for a system of our own in language as well as in Government." অর্থাৎ, মাতৃভূমির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছেদ হতে চলেছে, এ সময়ে আমাদের যেমন স্বতন্ত্র শাসন পদ্ধতি চাই, তেমনই চাই স্বতন্ত্র (ইংরেজি) ভাষা! মনে হয় বুঝিবা সেদিনই রোপিত হয়েছিল সেই বীজ, যা থেকে পরবর্তীকালে জর্জ বার্নার্ড শ'র মুখে বেরিয়ে আসে বিখ্যাত সেই সদুক্তিকর্ণামৃত, "England and America are two countries separated by the same language."

ভাষা সংস্কারের লক্ষ্যে তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন বানান সংস্কারের উপর। উচ্চারণের সঙ্গে বানানের সমতা আনতে হবে এই ছিল তাঁর অভিমত। তাঁর কালে বানান সংস্কারের চিন্তা আরও কারও কারও মনে উদিত হয়েছিল। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তার জন্য কিছু নতুন লিপি পর্যন্ত উদ্ভাবন করেছিলেন। নোয়া ওয়েবস্টার-এর বক্তব্য ছিল শব্দের অন্তর্গত সব বাড়তি বা অবান্তর অক্ষর বাদ দিতে হবে, বাদ দিতে হবে অনুচ্চারিত শব্দও। তা ছাড়া ফরাসি প্রভাব কমাতে হবে, কিছু কিছু অক্ষরের বদলে অন্য অক্ষর ব্যবহার করতে হবে, ইত্যাদি। কিন্তু 'কম্পেনডিয়াস ডিকশনারি' (*Compendious Dictionary*)-তে দেখা গেল আগেকার চরমপন্থী আদর্শ থেকে তিনি কিছুটা সরে এসেছেন। তবে তাঁর দেশপ্রেম তখনও পূর্ববৎ উগ্র।

যা হোক, অভিধানে সংকল্প অনুযায়ী তিনি শব্দ থেকে অবান্তর 'u' ছেঁটে দিয়েছেন, আজও অতলান্তিকের দুই তীরে ওইসব শব্দ নিজেদের স্বতন্ত্র বানান বজায় রেখেছে। 'Musick', 'Logick'-এর মতো যে-সব শব্দে প্রাচীন অপ্রচলিত রীতি অনুযায়ী তখনও 'K' বহাল ছিল, তিনি তা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। প্রথম প্রথম মৃদু আপত্তি তুললেও ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত এই পরিবর্তন মেনে নেন। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে 'K'-এর বদলে তিনি 'ch' ব্যবহার করেছেন। যেমন—'cheque.' ফরাসি প্রভাববশত যে-সব শব্দে অনাবশ্যক বদলে 're' রয়েছে (যথা: Centre, Theatre, metre ইত্যাদি) তাকে তিনি স্বাভাবিক উচ্চারণ অনুযায়ী সংশোধন করেছেন। স্বদেশের মানুষ তা মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু 'medicine' 'কিংবা 'examine' ছাঁটার ব্যাপারে তাঁরা ওয়েবস্টার-কে সমর্থন করতে পারেননি। এত কিছু করার পরও দেখা যায় নোয়া ওয়েবস্টার তাঁর এই অভিধানে ব্যবহার করেছেন পুরনো ধারায় 'almanack', 'traffick'! এমনকী 'ache' না লিখে তিনি অবলীলায় লিখে গেছেন— 'ake'. এরকম আরও নানা কাণ্ড। তবে সন্দেহ কী, নোয়া ওয়েবস্টার স্বাদেশিকতার সাধনায় সত্য সত্যই নতুন কিছু করেছেন।

১৮১০ সালে ওয়েবস্টার ঘোষণা করলেন তাঁর এক নতুন অভিধানের রূপরেখা। সে

অভিধান হবে ইংরেজি ভাষার সম্পূর্ণ নতুন ও পূর্ণাঙ্গ অভিধান *A New and Complete Dictionary of the English Language*। এই কাজ শেষ করতে সময় লেগেছিল তাঁর দীর্ঘ পনেরো বছর। বার বার তিনি সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আবেদন করেছেন, দেশের মানুষকে জানিয়েছেন ইতিপূর্বে আমেরিকায় কেউ কখনও এমন বৃহৎ উদ্‌যোগ গ্রহণ করেননি, কিন্তু দেশের মানুষ ছিলেন বলতে গেলে সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ। বলেছেন— আমি খরচ ধার্য করেছিলাম ১০ হাজার ডলার, এখন দেখছি খরচ দাঁড়াচ্ছে প্রায় ২৫ হাজার ডলার। তবু কারও সাড়া নেই।

বিশাল কর্মযজ্ঞ। ৭০ হাজার মূল শব্দ। প্রতিটি শব্দ ওয়েবস্টার লিখেছেন নিজের হাতে। জনসন-এর মতো তাঁর কোনও সাহায্যকারী ছিলেন না। ছিলেন মাত্র একজন প্রুফ রিডার। তাঁকে নিয়েই শেষ করলেন তিনি তাঁর কাজ। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস 'আমেরিকান ইংলিশ'-এর অভিধান শেষ করতে হল শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের মাটিতে বসে। অভিধান শান্তভাবে ঘষামাজা করবেন বলে ১৮২২ সালে পাণ্ডুলিপি নিয়ে তিনি পাড়ি জমালেন ইংল্যান্ডে। আর-এক উদ্দেশ্য ছিল, যদি কোনও প্রকাশক মিলে যায়। সে স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি। কিন্তু কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বসে পূর্ণচ্ছেদ টানতে পেরে তৃপ্ত নোয়া ওয়েবস্টার। লিখেছেন— সেটা ১৮২৫ সালের জানুয়ারির কথা, শেষ শব্দে পৌঁছবার পর আমি কাঁপতে লাগলাম। আর এগোতে পারছি না। তবু আমি নিজেকে উজ্জীবিত করে তুললাম, যে করে হোক, এ কাজ আমাকে শেষ করতেই হবে। ঘরে কিছুক্ষণ পায়চারি করে আবার বসলাম এবং সুস্থ হয়ে উঠলাম। কাজটি অতঃপর শেষ হল।

দেশে ফেরার পর ১৮২৭ সালে মে মাসে পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় গেল। ছাপার কাজ শেষ হয় পরের বছর। ১৮২৮ সালের ২১ এপ্রিল প্রকাশিত হল—'আমেরিকান ডিকশনারি অব দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ', (*American Dictionary of the English Language*)। বিশাল বই। দুই খণ্ডে ১৬০০ পৃষ্ঠা। ছাপা হয়েছে ২৫০০ কপি। দাম ২০ ডলার।

বিরাট কীর্তি স্থাপন করলেন নোয়া ওয়েবস্টার। এই অভিধান নিয়ে অনেক কাণ্ডই হয়েছে পরবর্তীকালে। বিশেষ করে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে চলেছে সহযোগী জোসেফ উর্স্টার-এর (Joseph Worcester) সঙ্গে বিবাদ। ওয়েবস্টার অভিধানটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করতে দিয়েছিলেন। তা করতে গিয়ে উর্স্টার নিজেই প্রকাশ করে বসলেন নিজের একটি অভিধান। ওয়েবস্টার চৌর্যবৃত্তির অভিযোগ আনেন। কিন্তু উর্স্টারও নিজেকে প্রমাণ করলেন যোগ্য আভিধানিক হিসাবে। দু'জনের অভিধানকে কেন্দ্র করে দলাদলি, অভিধানে অভিধানে প্রতিযোগিতা। সে কাহিনী এখানে বাদই দেওয়া গেল। আমরা বরং ওয়েবস্টারের 'আমেরিকান ডিকশনারি'তেই ফিরি।

যথারীতি ওয়েবস্টারের ভাগ্যেও নিন্দা ও প্রশস্তি দুইই জুটেছিল। তবে বিশেষজ্ঞরা যাচাই করে দেখলেন যদিও অভিধানে নানা সূত্র থেকে আহৃত বেশ-কিছু বিশেষভাবে 'আমেরিকান' বলা যায় এমন শব্দ ছিল, তবে বেশির ভাগই ছিল ইংরেজি শব্দ। (Webster's material has no especial qualification as 'American')। অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন ওয়েবস্টার। অসাধারণ ছিল তাঁর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা। তাঁর আন্তরিকতা ও ক্ষমতা সম্পর্কেও কারও কোনও সন্দেহ ছিল না। তবু কেউ কেউ মনে করেন, প্রকাশকরা দফায়-দফায় সংস্কার না করলে ওয়েবস্টার-এর নাম অনেক আগেই মুছে যেত। ("Webster's original work

was far from 'American classic', and if it were not for elaborate publisher's revisions of Webster's work, revisions with which he had nothing to do, but which nevertheless did retain what was genuinely good in the Dictionary of 1828, Webster's name would probably be unknown in the land.")

প্রকাশকরা অভিধানটিকে কীভাবে পুনর্জীবন দিয়ে বিশ্বখ্যাত করেছেন তার দৃষ্টান্ত অভিধানটির ওয়েবস্টার-মান (Webster-Mahn) সংস্করণ। নোয়া ওয়েবস্টার দেহরক্ষা করেন ১৮৪৩ সালে। আর, এই সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সালে। জার্মান পণ্ডিত জি এফ মান (G. F. Mahn) নানা সময়ে পরিবর্তিত ও সংস্কৃত অভিধানটিকে চূড়ান্ত চেহারা দিতে গিয়ে যা করেছিলেন, তা অকল্পনীয়। ওয়েবস্টার-এর নব্য-বানান প্রায় সবই বাতিল হয়ে গেল, তাঁর উচ্চারণ-নির্দেশ বহুলাংশে বদলে গেল, সব চেয়ে অবিশ্বাস্য, ওয়েবস্টার-এর শব্দমূল প্রায় সবই বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হল। কার্যত ওয়েবস্টারকে বাদ দিয়ে রচিত হল ওয়েবস্টারের অভিধান! অথচ আজ 'ওয়েবস্টার' শব্দটার মানেই কিন্তু অভিধান। তিনি 'Eponym' হয়ে গেছেন। ব্যক্তি থেকে বই, অভিধান।

কেমন মানুষ ছিলেন ওয়েবস্টার? তাঁর সাহসিকতা, একাগ্রতা, যোগ্যতা এবং উৎসাহ প্রশ্নাতীত। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে অনেকেই নাকি তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ধর্মান্ধ, তিনি আত্মগর্বী, তিনি উগ্র দেশপ্রেমিক, তিনি ছিটগ্রস্ত, তিনি অন্যের খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা সহ্য করতে পারেন না, তিনি সংকীর্ণমনা, খিটমেজাজি, রুক্ষ, কর্কশ— সমকালের অনেকের চোখেই তিনি অপছন্দের মানুষ। তিনি বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন-এর চেয়ে নিজেকে বড় ভাবতেন। কারণ, ফ্রাঙ্কলিন স্বশিক্ষিত, আর তিনি ইয়েল-এ পড়েছেন। ডক্টর জনসন-এর খাতি তাঁর কানে ছিল বিষের বাঁশির মতো। জনসন অবকাশে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আসর জমাতেন, পানশালায় হাস্যকৌতুক করতেন, তিনি ছিলেন কাজের বাইরে সবসময় সহজ স্বাভাবিক নম্র, ভদ্র। তুলনায় ওয়েবস্টার যেন রামগরুড়ের ছানা। হাসতে তাঁর মানা।

উপসংহারে ইংরেজের ইংরেজি ভাষাবিদ্বেষী নোয়া ওয়েবস্টারের সম্পর্কে দু'-চার কথা। ওয়েবস্টার ইংল্যান্ড, ইংরেজ সমাজ বা ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করে থাকুন-না-কেন, ইংল্যান্ড কিন্তু তাঁকে উদারভাবেই গ্রহণ করেছিল। অভিধানটির লন্ডন সংস্করণ ছাপা হয়েছিল আমেরিকান সংস্করণের চেয়ে ৫০০ কপি বেশি— ৩০০০ কপি। ১৮৭০-এ পৌঁছে দেখা গেল ওয়েবস্টার-এর অভিধান ইংল্যান্ডে বিক্রি হয়েছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার। ১৮৪১ সালে ওয়েবস্টার একটি কপি উপহার পাঠান রানি ভিক্টোরিয়াকে। সেখানে কিন্তু তিনি অনুগত প্রজার মতো বলেন— আমরা, "genuine descendents of English ancestors born on the west of the Atlantic, have not forgotten either the land or the language of their fathers." অভিধানের ভূমিকায় জনসন সম্পর্কেও শেষ পর্যন্ত তিনি কিছুটা উদারতা দেখিয়েছেন। কিন্তু সংজ্ঞা নির্ণয়ে তাঁকে পরাস্ত করার অঙ্গীকার করলেও কখনও কখনও যা করেছেন তা হাস্যকর। জনসন-এর "ওটস" সম্পর্কে আগে বলা হয়েছে। ওয়েবস্টার জনসনকে নস্যাৎ করতে গিয়ে লেখেন—"A plant of the genus Avena, and more usually seed of the plant, ... the meal of this grain, the oatmeal, forms a considerable and very valuable article of food for man in Scotland, and everywhere

oats are excellent food for horses and cattle." একজন মন্তব্য করেছেন, নিশ্চয় কবরে শুয়ে হাসছেন স্যামুয়েল জনসন!

ফের একবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসা যাক। ডক্টর জনসন-এর অভিধানের একশো বছর পরের কথা। ঊনবিংশ শতকের ব্রিটেন। অভিধান উপলক্ষে সেখানে দেখি নতুন করে আবার তৎপরতা। ১৮৪২ সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয় ফিলোলজিক্যাল সোসাইটি। দু'শো তিন জন বিদ্বানের সমাবেশ সেখানে। ততদিনে জনসন-এর অভিধান পুরনো হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে রিচার্ডসন একটি অভিধান সংকলন করেছেন। তা ছাড়া ওয়েবস্টার, উর্স্টার-এর অভিধানও রয়েছে। কিন্তু সোসাইটির বিচারে এ-সব অভিধান যথেষ্ট নয়—প্রয়োজন এ-সব অভিধানের অসম্পূর্ণতা দূর করা। এবং সেটি কারও একা হাতে সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন একটি বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী। এ ব্যাপারে যাঁরা বিশেষভাবে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়টি নাম: রিচার্ড শেনেভিক্স ট্রেঞ্চ (Richard Chenevix Trench), হার্বার্ট কোলরিজ (Herbert Coleridge), এবং ফ্রেডরিক ফার্নিভ্যাল (Frederick Furnivell)। প্রথমজন একজন ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত যাজক। দ্বিতীয়জন কবি কোলরিজ-এর পৌত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের তুখোড় ছাত্র। ভাষাবিদ প্রাবন্ধিক। দুর্ভাগ্যবশত মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে মারা যান তিনি। তৃতীয়জন, ফার্নিভ্যাল এক বর্ণাঢ্য, বিস্ময়কর চরিত্র। তাঁর সঙ্গে পরে আবার দেখা হবে। সোসাইটির তরফে তিনজনের এই কমিটির দায়িত্ব এ পর্যন্ত প্রচারিত কোনও অভিধানে যে-সব শব্দ ঠাঁই পায়নি সেগুলি খুঁজে বের করে তালিকাবদ্ধ করা। ('unregistered words committee') এবং সেই সব শব্দ নিয়ে একটি পরিপূরক সংযোজনী সংকলন করা ('as a form of supplement to existing works')। বলা হয় ইংরেজি ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে এটা একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ('one of the major events in the history of language study.') সেটা ১৮৫৭ সালের ১৮ জুনের ঘটনা।

পরের বছর জানুয়ারিতে (১৮৫৮) শুনি, সংযোজনী নয়, সোসাইটির কাজ হবে একটি পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি ভাষার অভিধান সংকলন। যদি শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব না হয়, তা হলে যে তথ্যভাণ্ডার গড়ে উঠবে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সোসাইটি তা তুলে দেবে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের হাতে। ইতিমধ্যে সংযোজনীর জন্য সোসাইটির ডাকে তেষট্টি জন স্বেচ্ছাসেবক কাজ করেছিলেন। অর্থাৎ শব্দ, বাক্য চয়নের কাজ। তাঁরা ১২১টি পুরনো পুঁথি যাচাই শেষ করে ফেলেছেন। কিন্তু উদ্‌যোগটিতে একটা ফাঁক থেকে গিয়েছে। সন্ধান করা দরকার ছিল জনসন, রিচার্ডসন কিংবা ওয়েবস্টার-এর অভিধানে ইতিমধ্যেই তার কিছু কিছু স্থান পেয়েছে কি না। তা ছাড়া, পরিপূরক হিসাবে যা ভাবা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ করা হলে সংগ্রহ বিরাট আকার ধারণ করবে। তার চেয়ে নতুন ভাষাবিজ্ঞানের আলোয়, নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংকলিত একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধানই কি শ্রেয় নয়? অতএব অতঃপর নতুন এক ইংরেজি অভিধানের লক্ষ্য, যাকে বলে—'নিউ ইংলিশ ডিকশনারি' (New English Dictionary).

প্রস্তাবিত এই অভিধানের প্রথম সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন কোলরিজ। তাঁর প্রয়াণের পর যে-দু'জনের ওপর দায়িত্ব বর্তায়, নানা কারণে তাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে শেষ পর্যন্ত সম্পাদনার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় জেমস মারি নামে

অপেক্ষাকৃত অচেনা এক স্কুল শিক্ষকের হাতে। এ-ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন সোসাইটির প্রাণপুরুষতুল্য সদস্য ফ্রেডরিক ফার্নিভ্যাল। সেদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি অদূর ভবিষ্যতে এই মারির সঙ্গে চিরকালের মতো জড়িয়ে যাবে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি অভিধানের নাম!

জেমস অগস্টাস হেনরি মারি (James Augustus Henry Murray, ১৮৩৭-১৯১৫) স্কটল্যান্ডের মানুষ। তাঁর জন্ম রক্সবারোশায়ার-এর হ্যাউইক-এ এক দরজির ঘরে। তাঁর মা নিজেও টুকিটাকি সেলাইয়ের কাজ করতেন। বেশ কয়েক বছর আগে তাঁর নাতনির লেখা জেমস মারি-র একটি দীর্ঘ, অনুপুঙ্খ, উপভোগ্য জীবনী পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। কৌতূহলী পাঠক সেটি পড়তে পারেন (*Caught in the Web of Words James Murray and the Oxford English Dictionary*, By, K. M. Elisabeth Murray, OUP 1979.) এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁর জীবনের একটা রূপরেখা মাত্রই দিতে পারছি। দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, কিছুটা বাবুয়ানায় আসক্ত (ঘাড় অবধি লম্বা চুল ছিল তাঁর), তরুণ মারি যদি পারিবারিক পেশায় যোগ দিতেন তবে হয়তো একজন প্রথম শ্রেণীর কারিগর হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। কিন্তু পরিবর্তে তিনি বেছে নেন চাষবাসের কাজ। সাড়ে চোদ্দো বছর বয়সে স্কুল থেকে বের হয়ে তিনি পাড়াপড়শিদের জমিতে কাজ করতেন। সেইসঙ্গে চেষ্টা ছিল নিজেকে আরও শিক্ষিত করে তোলার। তিনি কাছাকাছি এলাকার ভূতত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নিজের জেলার গাছপালার বর্গীকরণের কাজে হাত দেন, সীমান্ত এলাকার মানুষজনের মুখের ভাষাচর্চার দিকেও আগ্রহ ছিল তাঁর। এক কথায় তরুণ গরুড়ের মতো মহৎ ক্ষুধার আবেশে সেদিন তরুণ জেমস মারি। নিজের গাঁয়ের স্কুলেই চারটি ভাষা আয়ত্তে আসে তাঁর; গ্রিক, ইতালিয়ান, জার্মান এবং ফরাসি। তাঁর পড়ার বইয়ের পাতায় নিজের হাতে লেখা ধ্রুব বাক্য,—"নলেজ ইজ পাওয়ার" ("Knowledge is Power")। সতেরো বছর বয়সে সহকারী শিক্ষক হিসাবে তিনি গ্রামের স্কুলে যোগ দেন। পরবর্তী কয় বছর দেখা যায় নানা ক্ষেত্রে তাঁর ব্যস্ততা। তিনি গ্রামে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রকৃতিবিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তিনি ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, শুধু তা-ই নয়, নানা ভাষার লিপিও তাঁর সুপরিচিত। বিয়ের পর তিনি স্কটল্যান্ড ছেড়ে লন্ডনে পাড়ি জমান। উদ্দেশ্য, হাওয়া-বদল করে অসুস্থ স্ত্রীর স্বাস্থ্যোদ্ধার। লন্ডনে তিনি একটি ব্যাঙ্কে কেরানির কাজ পান। বলা হয়—ওই শতকে তাঁর মতো বিদ্বান ব্যাঙ্ক কর্মচারী দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আসা, মারির সে সুখ-স্বপ্ন ব্যর্থ হল। ১৮৫৫ সালে তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। মারি তবু লন্ডনেই থেকে যান। দু'বছর পর আবার তিনি বিয়ে করেন। স্ত্রী'র নাম অ্যাডা (Ada)। এ-বিয়ে খুবই সুখের হয়েছিল। এই মহিলা জন মারির এগারোটি সন্তানের জননী।

যা হোক, ১৮৭০ সাল পর্যন্ত মারি ব্যাঙ্কেই কাজ করেছেন। তখন তিনি ধ্বনিতত্ত্বে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ পণ্ডিত। নানা বিদ্বৎসভায় প্রবন্ধ পাঠের জন্য আমন্ত্রিত হচ্ছেন তিনি। ফিলোলজিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৮৬৮ সালে। সেখানেই জেমস মারি-র সঙ্গে প্রথম আলাপ-পরিচয় ফ্রেডারিক ফার্নিভ্যাল-এর। তিনি তখন দু'জন সেক্রেটারির মধ্যে অন্যতম। বলতে গেলে তিনিই সোসাইটির নায়ক, তার প্রাণপুরুষ। পরবর্তী বিয়াল্লিশ বছর ধরে তিনিই ছিলেন প্রধান পুরুষ— বন্ধু, সহযোগী, চালিকাশক্তি, এবং কী নয়!

ফ্রেডরিক ফার্নিভ্যাল-এর জন্ম ১৮২৫ সালে সারে-র এক গ্রামে। বাবা ছিলেন চিকিৎসক। এক সময় শেলির চিকিৎসক হিসাবেও খ্যাত হন তিনি। প্রচুর অর্থ উপার্জনের পর তিনি মানসিক রোগীদের জন্য একটি বিশাল আরোগ্যশালা গড়ে তোলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ২ লক্ষ পাউন্ডে সে-বাড়ি বিক্রি হয়। নানা বেসরকারি স্কুলে পড়ার পর ফার্নিভ্যাল যোগ দেন ইউনিভারসিটি কলেজ অফ লন্ডনে। অক্সফোর্ডের বিকল্প হিসাবে ১৮২৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন। গোঁড়ারা বলতেন—'গড্‌লেস কলেজ অব গাওয়ার স্ট্রিট,' ('Godless College of Gower Street.') এখানে ছাত্রজীবনেই ফার্নিভ্যাল যেন খুঁজে পান তাঁর জীবনের ভাবাদর্শ। এক দিকে তিনি যদি বহমান প্রাণদায়ী মুক্ত বাতাস, অন্য দিকে তিনি আবার কখনও কখনও দুরন্ত ঝড়ের মতো। তাঁর পড়াশুনা ছিল ব্যাপক, পাণ্ডিত্য প্রশ্নাতীত। সমসাময়িক ধর্মীয়, সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক বিতর্কে সোৎসাহে যোগ দিতেন তিনি। আবার খেলাধুলায়ও তাঁর খুবই উৎসাহ। বিশেষ করে বক্সিং এবং নৌ-প্রতিযোগিতায়। তাঁর প্রাণশক্তি ছিল অফুরন্ত। সব সময় কোনও-না-কোনও কিছু নিয়ে ব্যস্ত তিনি। ১৮৪২ সালে তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে যোগ দেন। এ সময়ে হঠাৎ তিনি নিজেকে নিরামিষাশী হিসাবে ঘোষণা করেন। কিছুকাল পরে ধূমপান এবং মদ্যপানও ত্যাগ করেন। কেমব্রিজ থেকে বি. এ. এবং এম. এ হওয়ার পর তিনি লিঙ্কন-ইন থেকে ব্যারিস্টার হন। তারপর আবার সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত তাঁর চেহারায় এবং পোশাকেও নাকি বিদ্রোহের অভিব্যক্তি। বিদ্যাচর্চায় তাঁর উৎসাহে কিন্তু এত পরিবর্তনের মধ্যে কখনও ভাটা পড়েনি। ফিলোলজিক্যাল সোসাইটিতে তিনি যোগ দেন ১৮৪৭ সালে। তা ছাড়া, ভিক্টোরিয়ান-যুগের এক বিশিষ্ট উদ্‌যোগ, সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী পুরুষ। কমপক্ষে তিনি এক ডজন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। তার মধ্যে ছিল—'দি আর্লি ইংলিশ টেক্সট সোসাইটি' ('The Early English Text Society'), 'দ্য চসার সোসাইটি' ('The Chaucer Society'), 'দ্য ব্রাউনিং সোসাইটি' ('The Browning Society'), 'দ্য নিউ শেক্সপিয়ার সোসাইটি', ('The New Shakespeare Society'), 'দ্য শেলি সোসাইটি' ('The Shelley Society'), ইত্যাদি ইত্যাদি। ফার্নিভ্যাল-এর প্রাণশক্তিতে সব কয়টি সোসাইটিই ছিল জীবন্ত। তার মধ্যে 'টেক্সট সোসাইটি' ছিল বিশেষভাবে অভিধান প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত।

বিদ্বান এবং অতি ব্যস্ত সাংস্কৃতিক-নায়ক ফার্নিভ্যাল-এর ব্যক্তিগত জীবনও ছিল প্রথাবিরোধী, হয়তো কিছুটা স্বেচ্ছাচারী। অভিভাবক এবং অনুরাগীদের মতামতের তোয়াক্কা না-করে তিনি এলিনর ডালজিয়েল (Eliner Dalziel) নামে এমন একটি কমবয়সী মেয়েকে বিয়ে করেন, অন্যদের চোখে যে নিছক একজন পরিচারিকা, 'আ প্রিটি লেডিজ মেইড' ('a pretty ladies maid'), সেই মেয়েটি ঘরগৃহস্থালি, রান্নাবান্নার সঙ্গে ফার্নিভ্যাল-এর গবেষণার কাজেও ছিলেন বিশেষ সহায়ক। ওঁদের দুটি সন্তানও হয়। প্রথম সন্তান কন্যা, অল্প বয়সে মারা যায়। ছেলে বাবার মতো অজ্ঞেয়বাদী, যুক্তিশীল ও উদারচেতা ছিলেন। তিনি তাঁর কালে প্রসিদ্ধ একজন সার্জনও হয়েছিলেন। তা ছাড়া ক্রীড়ানুরাগী বাবার যোগ্য সন্তান হিসাবে তিনি একজন বাইসাইকেল চ্যাম্পিয়ানও ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত এই বিয়ে ভেঙে যায়। তার পর ফার্নিভ্যাল আবার যখন বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স সাতান্ন বছর, কনের বয়স একুশ। তাঁর চিঠি পেয়ে জন মারি স্তম্ভিত। তিনি নাকি এমন আহত হয়েছিলেন যে চিঠিতে প্রেরকের নামটি কাগজ দিয়ে ঢেকে ফেলেন!

দুইজন সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের। একজন ধীর স্থির, ধৈর্যশীল, ধর্মপ্রাণ নিয়মনিষ্ঠ সুশৃঙ্খল ভাষাবিজ্ঞানী, অন্যজন প্রখর ভাষাজ্ঞানী হয়েও সোসাইটির লক্ষ্যপূরণের জন্য বেপরোয়া কর্মী, তিনি যদৃচ্ছ, মুক্তবিহারী। এই দুইয়ের একজন চারিত্রিক পার্থক্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, ভাষাগত তুলনা ব্যবহার করলে বলতে হয় একজন অপভাষা, অন্যজন শুদ্ধ ইংরেজি,—"টু টেক আ সুটেবল লিঙ্গুইস্ট মেটাফর, ফার্নিভ্যাল ইজ স্ল্যাং হোয়ার মারি ইজ স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ।" (—"To take a suitable linguist metaphor, Furnivall is slang where Murry is standard English.")

ব্যাঙ্ক ছাড়ার পর জেমস মারি আবার ফিরে গিয়েছিলেন শিক্ষকতার কাজে। তিনি লন্ডনের উত্তরে মিলহিল স্কুলে যোগ দেন। সোসাইটি তথা ফার্নিভ্যাল-এর সঙ্গে যোগাযোগ তখনও অক্ষুণ্ণ। ফার্নিভ্যাল অভিধানের কাজ চালু রেখেছেন, সন্দেহ নেই। তাঁর আহ্বানে স্বেচ্ছাসেবকরা কাজ করে চলেছেন। মাঝে মাঝে যাচাই করার জন্য তাঁদের বইও সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু দশ বছর হতে চলল, তবু অভিধানের সম্ভাবনা তখনও অনিশ্চিত। ফার্নিভ্যাল একজন নতুন সম্পাদকের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়ে কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। কেননা, উৎসাহীদের মধ্যে অসহিষ্ণুতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ১৮৭৫ সালে একজন সাব-এডিটর ফার্নিভ্যালকে বললেন— এই অনিশ্চয়তা অসহ্য। যে করে হোক, ফার্নিভ্যালকে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। পরিস্থিতি যখন এই অবস্থায় পৌঁছেছে তখন জেমস মারি একদিন কথাচ্ছলে ফার্নিভ্যালকে বললেন, প্রয়োজনে তিনি প্রস্তাবিত অভিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। ডুবন্ত মানুষের কুটো আঁকড়ে ধরার মতো তিনি জেমস মারিকে আঁকড়ে ধরলেন। অচিরেই অবশ্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তিনি কুটো নয়, নির্ভরযোগ্য ভাসমান জীবনরক্ষককেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। ব্যস্ত মাকড়সার মতো উদ্যমী ফার্নিভ্যাল তক্ষুনি জাল বুনতে শুরু করলেন। এক দিকে এই উদ্যোগের সঙ্গে তিনি পাকাপাকিভাবে যেমন জেমস মারিকে জড়াতে চান, অন্য দিকে তেমনই চান কোনও প্রকাশককে জড়াতে। ১৮৭৬ সালের কথা। লন্ডনের প্রকাশক আলেকজান্ডার ম্যাকমিলান একটি নতুন অভিধান চালু করতে পারে—খবরটি কানে আসার পর ফার্নিভ্যাল চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ওঁরা চাইছিলেন সোসাইটির পরিকল্পনামতো বৃহৎ কিছু নয়, সর্বজনের ব্যবহারযোগ্য মাঝারি মাপের একটি অভিধান। ফার্নিভ্যাল তবু ওঁদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন, বললেন, ন্যায্য অর্থের বিনিময়ে সোসাইটি তাঁদের পরিকল্পিত 'নিউ ইংলিশ ডিকশনারি'-র সব তথ্যভাণ্ডার কোম্পানির হাতে তুলে দিতে সম্মত। সম্পাদকও তৈরি, তিনি জেমস মারির কথাও তুললেন। ইতিমধ্যে তিনি নাকি মারিকে 'মি. এডিটর' বলে সম্বোধন করতে শুরু করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলোচনা ব্যর্থ। বিনিয়োগের পরিমাণ, অভিধানের সম্ভাব্য আয়তন, এবং ফার্নিভ্যাল তথা সোসাইটির অভিধানের রূপরেখা বিচার-বিবেচনা করে ম্যাকমিলান পিছিয়ে গেলেন। ফার্নিভ্যাল অতঃপর হানা দিলেন অক্সফোর্ডে। জন মারিকে তিনি অনুরোধ জানালেন দ্রুত অভিধানের রূপরেখা-সহ একটি ছোট্ট নমুনা তৈরি করতে। সেই নমুনা পাঠানো হল কেমব্রিজ এবং অক্সফোর্ড-এ। অক্সফোর্ড ইতস্তত করছে শুনে ফার্নিভ্যাল নিজেই সেখানে হাজির হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের তিনি বোঝাবার চেষ্টা করলেন—কাজটা কেন জরুরি। সব-কিছু মালমশলা বলতে গেলে তৈরি। জন মারির মতো পণ্ডিত প্রস্তুত সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে। আখেরে

এতে তোমাদের বিলক্ষণ লাভ হবে। আর, লাভের যদি কোনও সম্ভাবনাই না থাকে তো, ম্যাকমিলান আগ্রহী হয়েছিল কেন? মনে হয়, তিনি অক্সফোর্ড-এর কর্তাদের চোখের সামনে এক গোলাপি ভবিষ্যতের ছবি তুলে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৮৭৮ সালে মারিকে নিয়মমাফিক সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করে সোসাইটি। পরের বছর ১৮৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস-এর (ক্ল্যারেনডেন) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় ফিলোলজিক্যাল সোসাইটি। ফার্নিভ্যাল-এর উপর দায়িত্ব বর্তায় সংগৃহীত সব মালমশলা একত্র করে সামনে জড়ো করতে। তাঁদের পুরোভাগে মিল হিলস্ স্কুলের শিক্ষক জেমস মারি।

তাঁর আঠারো বছরের পরিশ্রম এবার সফল হতে চলেছে। তৃপ্ত ফার্নিভ্যাল এবার সরে দাঁড়ালেন। এই বছরগুলো ধরে তিনি সযত্নে আগলে রেখেছেন সোসাইটির স্বপ্নের প্রকল্প, তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন, এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ থেকে জাহাজকে একটি নিরাপদ বন্দরে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছেন, এ সামান্য কীর্তি নয়। উল্লেখ্য, তার মধ্যেও নিজের শব্দসন্ধানে কখনও ছেদ পড়েনি ফার্নিভ্যাল-এর। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ ৩০ হাজার উদ্ধৃতি। আমৃত্যু তিনি চালিয়ে গেছেন তাঁর সেই কাজ। যখন যা নতুন শব্দ বা বাক্য তাঁর নজরে পড়েছে, এমনকী দৈনিক কাগজে, তৎক্ষণাৎ তিনি সেটি মারির নজরে এনেছেন। ১৯১০ সালে পঁচাশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর মুহূর্ত অবধি ফার্নিভ্যাল ছিলেন মারির মানস-সহচর। কখনও কখনও তাঁর আচরণে মারি বিরক্ত হয়েছেন, কখনও বিব্রত, কিন্তু সবসময়ই তাঁকে তিনি স্নিগ্ধ বন্ধুত্বের আবরণে জড়িয়ে নিতে চেয়েছেন। ফ্রেডরিক ফার্নিভ্যাল-এর মৃত্যুতে সমগ্র ব্রিটেন সেদিন শোকস্তব্ধ। লন্ডনের বিভিন্ন বিদ্বৎসভার অসংখ্য অনুরাগী যোগ দিয়েছিলেন তাঁর শোকযাত্রায়। অনেক কীর্তিই তিনি রেখে যান ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের সাংস্কৃতিক মানচিত্র তথা মনচিত্রে। তাঁর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই 'নিউ ইংলিশ ডিকশনারি'।

অভিধানের কাজ হাতে আসার পর মারিকে নতুন করে আবার সব শুরু করতে হয়। আবার স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে আবেদন জানানো হল। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখবার জন্য মিল হিল-এর বাড়ির পেছনে একটি ছাউনি তৈরি করা হল। ঘরটিকে বলা হত—'স্ক্রিপ্টোরিয়াম' "Scriptorium" বা লেখবার ঘর বা পাণ্ডুলিপি নকল করার ঘর। মারির বাড়ির লোকেরা ঘরটিকে বলতেন—'দ্য স্ক্রিপি' ("The Scrippy")। ছাউনিটি ছিল ঢেউ-খেলানো লোহার। ৩৫×১৫ ফুটের একটি গুদাম বিশেষ। আবার ছোটখাটো কারখানা কিংবা আস্তাবলও হতে পারত। ধূসর দেওয়াল, বাইরের রং বাদামি। এখানেই মারি তাঁর সাব-এডিটারদের বসাতেন। দেওয়ালে পায়রার খোপের মতো ছোট ছোট খোপ, সেখানে জমা হচ্ছে শব্দ, বাক্য। সম্পাদক হিসাবে কোলরিজ-এর ছিল ৫৪টি খোপ, জন মারির ১০৯টি। সাব-এডিটার বা সহকারী সম্পাদকরা সবাই বসতেন টুলে। তাঁদের চেয়ে ঈষৎ উঁচু একটি টুলে বসে কাজ করতেন সম্পাদক মারি। তিনি শব্দের অর্থ, উচ্চারণ, সংজ্ঞা, দৃষ্টান্ত, বাক্য, ব্যবহারবিধি, এ-সব গোছাতেন। অচিরেই দেখা গেল ওইসব খোপে আর চলছে না, আরও জায়গা দরকার। ফলে শেলফ-এর সংখ্যা বাড়াতে হল। লন্ডনে মারির এই গবেষণাগার দেখে একটি সংবাদপত্র লিখেছিল—"Largest single engine of research working anywhere in the world." এমন গবেষণাগার পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

মিল হিল স্কুল, তথা লন্ডন ছেড়ে মারি পাকাপাকিভাবে অক্সফোর্ডে উঠে আসেন ১৮৮৫ সালে। ১৯১৫ সালে প্রয়াণ পর্যন্ত সেখানেই ছিল তাঁর ঠিকানা। বাড়িটা ছিল ৭৮ নম্বর বানবারি রোড-এ। বাড়ির নাম—'সানি সাইড'। সেখানেও সেই 'স্ক্রিপ্টোরিয়াম', ('Scriptorium')। শত শত পায়রার খোপ। সহকারীদের সেই ব্যস্ততা। ইতিমধ্যে একাধিক সহকারী সম্পাদকও নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিয়েছেন। কিন্তু পুরোভাগে তাঁদের জেমস মারি। যেমন অসাধারণ পণ্ডিত, তেমনই অসাধারণ তাঁর চরিত্র। তিনি নিজের হাতে বাগান করেন, ডাকটিকিট সংগ্রহ তাঁর নেশা, তিনি তিন-চাকার সাইকেল চড়ে অক্সফোর্ড-এ দিব্যি ঘুরে বেড়ান। সপ্তাহশেষে ছুটির দিন কাটে তাঁর পরিবার-পরিজনদের নিয়ে সমুদ্রের ধারে। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠেন জেমস মারি। আটটায় পরিবারের সকলকে নিয়ে প্রার্থনা। দুপুরে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া। খাওয়ার টেবিলে সকলে হাজির থাকা চাই। সেখানে বেশি কথাবার্তা চলবে না। রবিবারও একই রুটিন। বাড়তি, সন্ধ্যায় প্রার্থনা। পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যোগ দিত অভিধানের কাজেও। ওরা 'স্লিপ' গোছাত। তার জন্যে সপ্তাহে ৬ পেনি পারিশ্রমিক পেত তারা। তা এক দিকে যেমন হাতখরচ, অন্য দিকে তেমনি জ্ঞানের রাজ্যে দীক্ষা গ্রহণও বটে! অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সের ছেলেমেয়েরা কমবয়সীদের পড়াত। বাড়িতে ধূমপান নিষিদ্ধ। কিন্তু ইস্টার বা খ্রিস্টমাস-এর উৎসবে অন্য সকলের সঙ্গে আনন্দে যোগ দিতেন পরিবারের কর্তাও। কোমলে-কঠোরে মিলিয়ে অদ্ভুত মানুষ। দীর্ঘ দেহ, মুখে লম্বা পাকা দাড়ি। গায়ে লম্বা ভারী কোট; সমীহ করার মতো গম্ভীর চেহারা। কিন্তু থেকে থেকে প্রসন্ন উজ্জ্বল হাসি ঝিলিক দিত তাঁর মুখে।

মারির সহকারী, সহযোগী এমনকী স্বেচ্ছাসেবীরাও ছিলেন প্রায় প্রত্যেকে স্বতন্ত্র চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। জনসন-এর মতো তিনি গ্রাব স্ট্রিট থেকে পেশাদার কলমবাজদের তুলে আনেননি। এঁরা সবাই ছিলেন সুশিক্ষিত, কেউ কেউ বিদ্বান, কেউ কেউ রীতিমতো বিশেষজ্ঞ। প্রসঙ্গত, শুধু দু'জন আমেরিকান সহযোগীর কথা বলব। তাঁদের একজন ডব্লিউ সি মাইনর (W. C. Minor)। তিনি মারিকে নিয়মিত শব্দ ও দৃষ্টান্তবাক্য সরবরাহ করে চলেছিলেন বার্কশায়ার-এর একটি ঠিকানা থেকে, কিন্তু কখনও মারির মুখোমুখি হননি। মারি তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেও স্বাস্থ্যের অজুহাত দেখিয়ে তিনি তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে দেন। এমনকী অভিধান প্রকাশ উপলক্ষে যে মহাভোজ আয়োজিত হয় সেখানেও ছিলেন তিনি অনুপস্থিত। শেষ পর্যন্ত মারি ঠিকানা অনুযায়ী এক দিন হানা দেন তাঁর ডেরায়। দেখা গেল সেইটি একটি পাগলাগারদ, এবং খুনের দায়ে সেখানেই দিন কাটাচ্ছেন মাইনর। তিনি ধনশালী ব্যক্তি। আরোগ্যশালাতেই গড়ে তুলেছেন তাঁর দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংগ্রহ। সেখানেই জেমস মারির জন্য নিঃশব্দে কাজ করে চলেছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা হয়। দেশে ফিরে যাওয়ার দিন বিদায় জানাতে হাজির হয়েছিলেন মারি ও তাঁর স্ত্রী। দ্বিতীয় আমেরিকান ভদ্রলোকের নাম ড. হল (Dr. Fitzedward Hall)। নিরুদ্দিষ্ট ভাইয়ের সন্ধানে ১৮২৫ সালে এই আমেরিকান পরিবারের নির্দেশে যাত্রা করেছিলেন কলকাতা। ফেরার পথে জাহাজ ধরতে ক'মাস দেরি হয়ে যাবে দেখে স্থানীয় ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। প্রথমে হিন্দি, তার পর সংস্কৃত। কলকাতা এবং বারাণসীতে সংস্কৃত শিখে এদেশেই থেকে যান হল, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে ইংরেজের হয়ে লড়াই করেন, তার পর পণ্ডিত

হিসাবে লন্ডনের কিংস কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতেও কাজ করেছেন। কিন্তু পণ্ডিত-চক্রের শিকার হয়ে সব-কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে শান্তিতে দিন কাটাবার জন্য চলে যান সাফোক-এ একটি অখ্যাত ঠিকানায়। সেখান থেকেও জেমস মারিকে তথ্য সরবরাহ করছিলেন তিনি। কিন্তু 'শত্রুপক্ষ' তখনও সক্রিয়। তাঁরা মারিকে জানালেন লোকটি দুশ্চরিত্র এবং ভুয়া পণ্ডিত। প্রথমটি সম্পর্কে মারি স্বভাবতই সত্য-মিথ্যা কিছু জানেন না, কিন্তু তাঁকে পণ্ডিত-অপণ্ডিত চেনানো বাতুলতা। মারি কোনও অভিযোগ কানে না তুলে তাঁর সাহায্য নিতে লাগলেন। ভদ্রলোককে মারি কতখানি গুরুত্ব দিতেন সেটা বোঝা যায় যখন তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ শোনা মাত্র কালমাত্র বিলম্ব না-করে তিনি একশো স্বেচ্ছাসেবককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ওঁর ঠিকানায়, সংগৃহীত সব কাগজপত্র নকল করার জন্য।

হ্যাঁ, ইনিই হচ্ছেন জেমস মারি। ফার্নিভ্যাল চলে গিয়েছেন। সহকারী সম্পাদকদের মধ্যে ব্র্যাডলিও চলে গেলেন ১৯২৩ সালে। ফার্নিভ্যাল বলেছিলেন তাঁদের প্রত্যেককে বছরে ৪০০ পাউন্ড করে দক্ষিণা দিতে হবে। কিন্তু কোথায় অর্থ! সোসাইটি যখন মারিকে অস্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত করে তখন তাঁকে দেওয়া হয়েছিল মাত্র ১৯৫ পাউন্ড। অক্সফোর্ড-এর সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে সাকুল্যে দেওয়া হবে ৯০০০ পাউন্ড। তার মধ্যে আগাম দেওয়া হয়েছিল ২১০০ পাউন্ড। এই অর্থে কেমন করে চলবে আগামী তেরো-চোদ্দো বছর? জেমস মারি ভেবে পান না। সোসাইটি প্রথমে অক্সফোর্ড-এর সঙ্গে রয়ালটির বন্দোবস্ত করেছিল। কাজ শেষ হতে সময় লাগবে দেখে ওঁরা ১৯০০ সালে বলে দিলেন ৫০ পাউন্ড, মানে ওঁদের ছাপাবার খরচটা যদি অক্সফোর্ড দেয় তবে তাঁরা খুশি। জেমস মারি অক্সফোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে অর্থের জন্য আবেদন জানালেন। কিন্তু তাঁরা সহজে গলবার পাত্র নন। এক দিকে তাঁরা যেমন বিদ্যোৎসাহী হিসাবে নিজেদের প্রমাণিত করতে চান, অন্য দিকে চান এই প্রকল্প থেকে অর্থ লাভ করতে। স্বভাবতই দ্বিতীয় ব্যাপারে তাঁরা যারপরনাই কৃপণ। তাঁরা মুঠি আলগা করতে চান না। তা ছাড়া দলাদলিও ছিল। অক্সফোর্ড পণ্ডিতদের আড্ডা। জেমস মারি নিছক একজন ভূতপূর্ব স্কুল শিক্ষক। তিনি লন্ডনে কলেজে পড়েছেন বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙোননি। ফলে দলাদলির জন্য কাজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম। একসময় মারিকে সম্পাদকের আসন থেকে হঠাবার উদ্‌যোগও গ্রহণ করা হয়েছিল। একটি কলেজের কর্তা নিজেই এগিয়ে এসেছিলেন সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। একজন সতর্ক এবং বিজ্ঞ ভাইস চ্যান্সেলারের হস্তক্ষেপে সে-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। জেমস মারি বহাল থাকেন। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে কেউ কেউ অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেও এগিয়ে এসেছিলেন। এভাবেই পাঁচজনের চেষ্টায় 'আ' (A) থেকে 'অ্যান্ট' (Ant) পর্যন্ত ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বের হয়েছিল প্রথম নমুনা। সেই সূচনা। ১৮৯৭ সালে 'ডিকশনারি ডিনার', ডিকশনারি প্রকাশ উপলক্ষে মহাভোজ। অতঃপর ক্রমান্বয়ে বের হয় ১০ খণ্ডে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫,৮৪৭। তার মধ্যে ৭২০৭, অর্থাৎ অর্ধেকের চেয়ে কিছু কম পৃষ্ঠা সরাসরি সম্পাদনা করেছেন জেমস মারি নিজে। অভিধান উৎসর্গ করা হয়েছিল রানি ভিক্টোরিয়াকে। সম্পূর্ণ অভিধান উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হয় রাজা পঞ্চম জর্জ-এর হাতে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টকেও পাঠানো হয় একটি সেট। চতুর্দিকে জেমস মারির জয়জয়কার। ১৯০৮ সালে তিনি 'নাইট' হলেন, ভূতপূর্ব স্কুল শিক্ষক অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ থেকে তো বটেই, নানা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক 'ডক্টরেট'-এ ভূষিত হলেন। অগণিত বিদ্বৎসভা তাঁকে সাম্মানিক ফেলো মনোনীত করে নিজেরা সম্মানিত।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চিরকালের জন্য বিদায় নিলেন জেমস মারি। আরও তেরো বছর লেগেছিল পুরো অভিধান সম্পূর্ণ হতে। তবে সবই তাঁর নির্ধারিত পথে, নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী। এমনকী অভিধান মুদ্রণের সময় যেভাবে তা সাজানো হয়, তার হরফ নির্দেশ থেকে ধাপে ধাপে জ্ঞাতব্য সাজানো সবই তাঁর নকশা অনুসারে চলে। এমনকী আজও নাকি তা-ই চলছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। ১২ খণ্ড। তৎসহ মোটাসোটা সংযোজনী। ততদিনে, অভিধানের নাম পালটে গেছে। 'নিউ ইংলিশ ডিকশনারি'-র নাম 'অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি' (Oxford English Dictionary), সংক্ষেপে 'ও ই ডি' (OED)। ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ অভিধান হিসাবে এখনও স্বীকৃত সেই অভিধান। পার্লামেন্ট, আদালত, খবরের কাগজ, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র ইংরেজি ভাষার মান্য এবং নির্ভরযোগ্য নিয়ামক। 'অক্সফোর্ড' যেন ইংরেজি ভাষার আপ্ত শব্দের সংকলন।

কেমন সম্পাদক ছিলেন এই মহাগ্রন্থের দুর্ধর্ষ সম্পাদক প্রবাদতুল্য পুরুষ জেমস মারি? তাঁর দূরদর্শিতা, উদারতা, শব্দ সম্পর্কে সহনশীলতা নাকি তৎকালের পটভূমিকায় কল্পনাই করা যায় না। অভিধানে এমন অনেক অন্ত্যজ শব্দকে ঠাঁই করে দিয়েছিলেন তিনি, সাধারণ সংকলকের পক্ষে যা চিন্তার অতীত। ভিক্টোরিয়ান শুচিবাইয়ের কথা ভেবে তিনি হয়তো সামান্য কিছু শব্দকে 'অচ্ছুৎ' বলে ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুরাগীরা মনে করেন তাঁরই অভিধানে আজ 'Fuck' বা 'Cunt'-এর মতো শব্দ দেখেও তিনি নিশ্চয় উপর থেকে দাড়ি নেড়ে সম্মতি জানাচ্ছেন—স্বাগতম। শুধু বিদ্যা, বুদ্ধি, নিষ্ঠা আর একাগ্রতা নয়, এই বিচারবুদ্ধি, এই উদারতা এবং দূরদৃষ্টির জন্যই জেমস মারি আভিধানিকদের মধ্যে তুলনাহীন।

জনাথন গ্রিন-এর 'চেজিং দ্য সান, ডিকশনারি মেকার্স অ্যান্ড দ্য ডিকশনারিজ দে মেড' (*Chasing the Sun: Dictionary-Makers and the Dictionaries They Made*) এক কল্পলোকের কাহিনী যেন। কখনও কখনও মনে হয় রূপকথা পড়ছি। সেই ব্যাবিলন, সুমেরিয়া, থেকে শুরু করে প্রাচীন গ্রিস রোম হয়ে তাঁর কাহিনী পৌঁছেছে ইউরোপে। সেখানে দেশে দেশে পরিক্রমা সেরে অতলান্তিকের ওপারে আমেরিকায়। ফের এপারে ইংল্যান্ডে। প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক কালের কোনও আভিধানিকই তাঁকে ফাঁকি দিতে পারেননি। তিনি প্রত্যেককে সমকালের পটভূমিতে সমকালের আলোয় উপস্থিত করেছেন, তার পর বিচার করেছেন একালের মানদণ্ডে। এ-কাজ একজনের পক্ষে রীতিমতো দুঃসাধ্য মনে হয়। কিন্তু জনাথন গ্রিন-এর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে কারণ তিনি নিজেও সূর্য-ধরার সেই উদ্দাম স্বপ্নবিলাসীদের একজন। এই ইংরেজ পণ্ডিত ইংল্যান্ডের একজন প্রথম সারির আভিধানিক। তাঁর তহবিলে রয়েছে বেশ-কয়েকটি মূল্যবান অভিধান। তবে অধিকাংশই অপভাষা সংক্রান্ত। (slang and jargons)। [হ্যাঁ, এরিক প্যাট্রিজ-এর (Eric Partrige, 1894-1979) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে বইকী তাঁর বইয়ে।] রয়াল সাইজে প্রায় সওয়া চারশো পৃষ্ঠার এই সচিত্র বইতে তিনি কোনও অশিষ্ট শব্দ বা বাক্য ব্যবহার না করেই কিন্তু আমাদের শুনিয়ে গেলেন অবিশ্বাস্য সেই অদৃশ্য ভুবনের কথা, যেখানে

মাকড়সার জালের মতো শব্দের জালে বন্দি শব্দভুক-শব্দসন্ধানী পণ্ডিতেরা।

পড়তে পড়তে নিজেদের কথা মনে পড়ছিল। আমি ভাষাতাত্ত্বিক নই। ইংরেজি এবং বাংলা দুই ভাষাতেই আমার অধিকার সীমাবদ্ধ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমার বাংলা শব্দভাণ্ডারও অফুরন্ত নয়। স্বভাবতই আমি আভিধানিকদের সমীহ করি। যখনই কোনও বাংলা অভিধানের পাতা ওলটাই তখনই বিস্ময় এবং শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। প্রতিটি শব্দের আড়ালে তাঁদের নীরব উপস্থিতি অনুভব করি। কী অমানুষিক পরিশ্রমই না করেছেন এইসব শব্দসন্ধানী! শব্দের মহাসাগর মন্থন করে আমাদের জন্য সামান্য নুড়ি থেকে শুরু করে মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছেন ওঁরা। শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজিয়েছেন, আদি উৎস খুঁজে বের করেছেন, ব্যাকরণ অনুসারে 'নিষ্পন্ন' করেছেন, সর্বশেষ—অর্থভেদ। অর্থ-বেদও বলা চলে। একই শব্দের কত অর্থই না হয়! কোনও কোনও অভিধানের নামেও সেই সাগর তোলপাড় করার ইঙ্গিত। যথা: শব্দ সন্দর্ভ সিন্ধু, শব্দ সিন্ধু, শব্দার্থ মুক্তাবলী, শব্দাম্বুধি, শব্দকল্পতরঙ্গিণী ইত্যাদি।

আমার সামনে রয়েছে বাংলা অভিধান বিষয়ে দুটি বই। একটি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু বিশিষ্ট গবেষক প্রয়াত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের 'বাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয় [১৭৪৩ হইতে ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত]'। দ্বিতীয়টি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক নম্র নীরব গবেষক সরস্বতী মিশ্রের 'বাংলা অভিধানের ক্রমবিকাশ'। দুটিই ভাল কাজ। পরিশ্রমের স্বাক্ষর রয়েছে প্রবীণ নবীন দুই সন্ধানীর বইয়েই। যতীন্দ্রমোহনের মতে প্রথম বাঙালি আভিধানিক সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১১৫৯ সালে তাঁর রচিত অমর কোষের একটি টীকা। অমরকোষ, অনুমান করা হয় খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে সংকলিত। এই অভিধানের অন্তত পঞ্চাশটি টীকা রয়েছে, তার মধ্যে পঁচিশটি টীকাকার বাঙালি। তার পর শত শত অভিধান সংকলিত হয়েছে বাংলায়। ইংরেজ আমলে স্বভাবতই বাংলা-ইংরেজি কিংবা ইংরেজি-বাংলা অভিধানও রচিত হয়েছে অনেক। যতীন্দ্রমোহন এবং সরস্বতীর তালিকা দেখে মনে হয় বিংশ শতক অবধি শত শত অভিধান (প্রায় দু'শো তো হবেই) সংকলিত হয়েছে বাংলায়। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাঁরা অনেক অভিধানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দিয়েছেন। কিন্তু কোথায় সেই আশ্চর্য মানুষগুলো, যাঁদের বলা হয় আভিধানিক বা অভিধান সংকলক!

জনাথন গ্রিন-এর বই, সে-কারণেই আরও মনকে বিষণ্ণ করে। বিশেষত আমরা জানি, আমাদের অধিকাংশ অভিধানই ছিল ব্যক্তিগত উদ্‌যোগ। রাধাকান্ত দেবের সংস্কৃত অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম' অবশ্য অনেকের মিলিত উদ্যমের ফল। সেই অতুল কীর্তির কথা বলছি না। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৯) আমাদের কালের মানুষ। তাঁর সম্পর্কেই বা আমরা কতটুকু জানি! কতটুকু জানি 'বাচস্পত্য অভিধান'-এর সংকলক তারানাথ বাচস্পতি, কিংবা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সম্পর্কে! যেটুকু ওঁরা ভূমিকায় বলেছেন, কিংবা প্রশস্তি হিসাবে অন্যরা যে-সব স্তুতিবাক্য রচনা করেছেন তার বাইরে বিশেষ কিছু নয়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কথা কিছু কিছু লিখে গেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, পরিমল গোস্বামী প্রমুখের কলমেও আমরা কিছু কিছু খবর পাই। রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষণা, পতিসরে ঠাকুরদের জমিদারিতে মুহুরির কাজ কিংবা বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা, এ-সব জীবনের রূপরেখা মাত্র। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে একক চেষ্টায় যিনি একটি বিশাল অভিধান সংকলন করেছেন তাঁর সংগ্রামের আন্তরিক কাহিনী ওইসব বয়ানে পাওয়া যাবে না। তাঁর কর্মপদ্ধতি,

অনুসৃত রীতিনীতি—তা নিয়েও কিন্তু গবেষণার সুযোগ ছিল। ছিল প্রয়োজনও। অভিধান ছাপার জন্য তৈরি করার পর তিনি শুনলেন বিশ্বভারতী এটি প্রকাশে অক্ষম, তখন তিনি ছুটলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে। সেখানেও সহানুভূতি জুটল না, ওঁরা জানালেন এই অভিধান প্রকাশ করার মতো আর্থিক ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। গবেষক তবু হাল ছাড়লেন না। বললেন—প্রতি মাসে নয় আনা, বছরে ছয় টাকা হারে গ্রাহক করে তিনি অভিধান ছাপাবেন। ছাপিয়েও ছিলেন পাঁচ খণ্ডে সেই বিশাল অভিধান। ১৯৬৭ সালে তাঁর জন্মের শতবার্ষিকী পার হয়ে যায়, তার পর আরও দুই দশক পার হয়ে যায় সাহিত্য অকাদেমির উদ্‌যোগে দুই খণ্ডে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে। তাও করতে হয় সরকারি অর্থানুকূল্যে। লজ্জার কথা, বইটি এখনও প্রকাশিত হচ্ছে সম্পূর্ণ আদিম চেহারায়, অপরিবর্তিত অবস্থায়। পরিবর্ধন, সংশোধন, বা পরিমার্জনের কোনও উদ্‌যোগ এখনও নেই! ওয়েবস্টার কিংবা জেমস মারির অভিধান কিন্তু সতত পরিবর্তনশীল!

আরও পেছনে তাকালে আরও অন্ধকার। ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত হয় রামকমল সেনের বিশাল ইংরেজি-বাংলা অভিধান। ডক্টর জনসন-এর টড-সংক্ষেপিত অভিধানের বাংলা বলা যায় এই অভিধানটিকে। শব্দসংখ্যা ৬০ হাজার। রামকমল সেনের একটি জীবনী রয়েছে। ভূমিকায়ও তিনি অভিধানের কথা কিছু কিছু বলেছেন। কিন্তু রচনা পদ্ধতি, রীতি বা কৌশল সম্পর্কে নয়, তাঁর বিবরণ প্রধানত মুদ্রণের সমস্যা সংক্রান্ত। কলকাতা-শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর-কলকাতা করতে করতে তিনি হয়রান। ১১৫২ পৃষ্ঠার বই ছাপাতে সময় লেগেছিল সতেরো বছর। অনেক নাটকীয় ঘটনা এই অভিধানের মুদ্রণপর্বে। রামকমল লিখেছেন, বইটির ১১৬ পৃষ্ঠা আমি ছাপিয়েছিলাম নিজের তত্ত্বাবধানে বাংলা টাইপ তৈরি করিয়ে। লেখক তাঁর নিজের বইয়ের জন্য নিজে দাঁড়িয়ে হরফ তৈরি করাচ্ছেন এ-দৃশ্য কল্পনা করতেও রোমাঞ্চ হয়! কিন্তু কোথায় সেই বিস্তারিত ইতিহাস!

জনাথন গ্রিন, 'চেজিং দ্য সান/ডিকশনারি মেকার্স অ্যান্ড দ্য ডিকশনারিজ দে মেড,' পিমলিকো, ১৯৯৭।
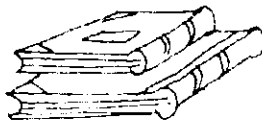
আল ওস্তাদ
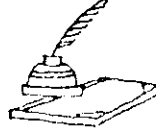
"ওদের রীতির মধ্যে একটি হচ্ছে যে, ওরা শরীরের কোন কেশ ছেদন করে না। অত্যধিক গ্রীষ্মের জন্য ওরা এককালে উলঙ্গ থাকত, তখন কেশ দিয়ে সূর্যের তাপ থেকে মস্তক রক্ষা করত। গুম্ফের শোভা বর্ধনের জন্য ওরা তাতে তাও দেয়। জননেন্দ্রিয়ের লোম ওরা পরিষ্কার করে না; কারণ ওদের বিশ্বাস তা করলে যৌন উত্তেজনা ও সঙ্গমেচ্ছা প্রবল হয়। সুতরাং যারা সঙ্গমেচ্ছা প্রবলভাবে অনুভব করে তারা সে ইচ্ছা হ্রাস করার জন্য জননেন্দ্রিয়ের লোম কর্তন করে না। ওর নখ বড় রাখে আর তার অব্যবহারে গর্ব বোধ করে। নখ দিয়ে ওরা কোন কাজ করে না। কেবল আলস্যভরে মস্তক কণ্ডুয়ন করে, আর কেশের উকুন বাছে। ওরা প্রত্যেকে পৃথকভাবে গোময়ে লিপ্ত স্থানে বসে ভোজন করে; উচ্ছিষ্টের সদ্ব্যবহার করে না এবং ভোজন পাত্রগুলি মাটির হলে সেগুলিকে আহারের পর ফেলে দেয়। ভোজনের পর পান ও চুনের সাথে সুপারি চর্বণ করে বলে ওদের দাঁত লাল। আহারের পূর্বে ওরা সুরা পান করে। হিন্দুরা গোমূত্র পান করে, কিন্তু গোমাংস খায় না। ওরা কাঠি দিয়ে করতাল বাজায়। পাগড়ীর বস্ত্রকে ওরা পাজামার মত ব্যবহার করে। যারা অল্প পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট থাকে তারা দুই অঙ্গুলি পরিমাণ বস্ত্র দিয়ে শুধু তাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে, আর যারা অধিক বস্ত্রের পক্ষপাতী তারা পাজামার (...) জন্য এত বস্ত্র ব্যবহার করে যে তা দিয়ে অনেকগুলি উত্তরীয় ও ঘোড়ার জিনের অন্তর্বাস তৈরি করা চলে। এ পাজামার কোন ছিদ্র (opening) থাকে না। এবং এগুলি এত দীর্ঘ যে পায়ের পাতা দেখা যায় না। এর বন্ধনটি (ইজারবন্দ্) পিছনে থাকে। উপরের জামাও পাজামার মত পিঠের দিকে কাপড়ের বুটির সঙ্গে সুতা দিয়ে আটকান থাকে। স্ত্রীলোকের জামার (কুর্তক) নীচের দিকে, দক্ষিণে ও বামে চেরা থাকে। পায়ের সঙ্গে আঁটসাঁট করে ওরা পাদুকা পরে এবং তার অগ্রভাগ উপরের দিকে ঈষৎ উল্টান থাকে। স্নান করার সময় ওরা প্রথমে পা ধোয়, পরে মুখ। স্ত্রী সহবাসের পূর্বে ওরা স্নান করে। দণ্ডায়মান অবস্থায় দ্রাক্ষাশাখার মত পরস্পরকে জড়াজড়ি করে ওরা সহবাস করে।..."

বাবরের আত্মজীবনীর কোনও খুঁজে-পাওয়া নতুন পাতা কি? না কি একালের, একালেরই

নতুন কোনও নর্দমা-পরিদর্শকের বিবরণী? স্বভাব-নিন্দুক কোনও পরদেশি, ওয়াকিয়ানবিশের ভারত-বর্ণনা বলেও সন্দেহ হতে পারে বইকী! কিন্তু যদি বলি এই বিবরণ শুরু করার আগে খুঁত-ধরা ওই দর্শক বন্ধুভাবে বিস্তারিত ভূমিকাও রচনা করে নিয়েছিলেন, তা হলে হয়তো থমকে দাঁড়াবেন অনেকেই। না দাঁড়িয়ে উপায় নেই। কারণ, পাঠকদের তিনি আগেই শুনিয়ে রেখেছিলেন তাঁর বক্তব্য: একের চোখে যা অদ্ভুত ঠেকে অন্যের কাছে কিন্তু তা স্বাভাবিক। সুতরাং চমকিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা, যা কদাচিৎ ঘটে, কিংবা যা দেখার সুযোগ অল্প দর্শকদের কাছে তাই অদ্ভুত। শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গ শেষ করেছিলেন তিনি এমন কয়টি বাক্য দিয়ে নিন্দুক বা শত্রুর কাছ থেকে যা আশা করা যায় না। তিনি লিখছেন—"এই সব বিকৃতির জন্য আমি অবশ্য হিন্দুদিগকে দোষ দিই না। আরবদেরও ওই রকম বহু কদাচার কুরীতি ছিল। তারা রজঃস্বলা ও গর্ভিণী স্ত্রীগমন করত, নিজ স্ত্রী বা কন্যার গর্ভে অন্যব্যক্তির বা অতিথির সন্তানকে তারা নিজ সন্তান বলে গ্রহণ করত। তাদের পূজা পদ্ধতিতে হাত ও মুখ দিয়ে শীষ দেওয়া, এবং নোংরা ও মৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করার মতো কদর্যতার কথা না হয় বাদই দিলাম।..." সুতরাং, শেষ পর্যন্ত বুঝতে অসুবিধা হয় না, ভিন্ন পালকের পাখি বটে, তবু এ-চিড়িয়ার সুর অন্যরকম। কর্কশ তো অবশ্যই নয়। কড়া হয়তো। তবে মিঠেকড়া।

এখনও যাঁরা অনুমান করতে পারেননি, তাঁদের অবগতির জন্য জানাই, এই ছত্রগুলো আলবেরুণীর। সেই আলবেরুণীর স্কুল-কলেজের ইতিহাসের পাতায় মাঝে মধ্যে উঁকি দিয়েই যিনি মিলিয়ে যান, হামলাবাজ সুলতান মামুদ-এর রক্তারক্তি কাণ্ডের মধ্যেও যিনি পড়ুয়ার জন্য ভারত এবং ভারতীয়দের সম্পর্কে উদ্ধৃতি-যোগ্য কিছু বাক্য রেখে যান। সাধারণ পাঠকের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় সেখানেই শেষ। বাদবাকি যা-কিছু জ্ঞাতব্য সব বিশেষজ্ঞদের জন্য। অথচ ভারত-তত্ত্ব নামক সেই প্রাঙ্গণের ধারে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিলেও কিন্তু অচিরে সামনে এসে দাঁড়ান নাতিদীর্ঘ, ঈষৎ স্থূল, গৌরবর্ণ সেই মানুষটি। মাথায় পাগড়ি, মুখে দাড়ি, ঠোঁটে স্মিতহাসি, চঞ্চল চোখে শিশুর কৌতূহল। হাতে খোলা নোটবই আর পেনসিল নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুড়ে দিলেও আবুর রায়হান মুহম্মদ বিন আহামদ অবশ্য ব্যক্তিগত কাহিনী বিশেষ কিছু শোনাতে পারবেন না। কেননা, তিনি সেই সব অসাধারণ মানুষদের একজন যাঁদের জীবন আছে কিন্তু জীবনী নেই। পদ্য করে বলবেন তিনি— আমি সত্যই আমার ঠাকুরদার নাম জানি না। আর, ঠাকুরদার নাম জানব কী করে, আমি যখন আমার বাবার নামই জানি না!

কোন কাননের চিড়িয়া তিনি? আলবেরুণীর আজ অনেক দাবিদার। ১৯৭৩ সনে তাঁর জন্মের হাজার বছর পূর্তি উপলক্ষে 'ইউনেস্কো'র উদ্যোগে বিশ্বময় তাঁকে নিয়ে আলোচনা সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিস্তর দেশ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ইরান বলে আলবেরুণী আমাদের, আরবরা বলেন— আমাদের। রাশিয়া, আফগানিস্তান— তারাও আবু রায়হান মুহম্মদ বিন আহামদকে গ্রহণ করেছেন আপনজন বলে। তবে গবেষকরা বলেন— ঠিকানা খোরেজম (ফারসি— খ্বরিজম) হলেও জন্মসূত্রে আলবেরুণী ছিলেন পারসিক। লিখতেন বটে তিনি আরবিতে, কিন্তু তাঁর মুখের ভাষা ছিল নব্য-ফারসি আর মাতৃভাষা ছিল খোরেজমি বুলি। আবু রায়হান-এর আলবেরুণী নাম হয়েছিল তিনি বহিরাগত ছিলেন বলেই।

দশম-একাদশ শতকে বোগদাদের খলিফাদের যখন অবনতি, তখন সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই মধ্য এশিয়ায় খোরেজম-এর জন্ম। খোরেজম বোখারার সামানি বংশের অধীন একটি ছোট্ট সামন্ত রাজ্য মাত্র। তবু ঐশ্বর্যে আর জ্ঞানগরিমায় মুসলিম জাহানে নতুন আলোকস্তম্ভ যেন। সেখানকার হাওয়ামহলে পুবের হাওয়া, পশ্চিমের হাওয়া। এক দিকে গ্রিক জ্ঞানবিজ্ঞান, অন্য দিকে ভারতীয় গণিত জ্যোতিষ এবং জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপক চর্চা। বিস্তর পণ্ডিতের সমাবেশ সেখানে। আবু নস্‌র মনসুর বিন আলী বিন ইরাক জিলানী, শেখ বুআলী ইবনে সীনা (পশ্চিমিরা যাঁকে বলেন—অ্যাবিসিন্না), আবুল খয়ের, আবু সহল ইসা বিন ইয়াহিয়া আল-মসিহী, এবং আরও অনেক অনেক 'ওস্তাদ'। কেউ বিজ্ঞানী, কেউ দার্শনিক, কেউ চিকিৎসক। আরব সাগরের দক্ষিণে আমুদরিয়ার উর্বর বদ্বীপে এই খোরেজম রাজ্যের রাজধানী উরগেঞ্জ। তার কাছেই শহরতলির একটি গ্রাম ক্যাস (Kyat)। তখন নাম তার—কার্স। সেখানেই ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন মধ্যযুগের অসামান্য প্রতিভা জ্যোতির্বিদ, গাণিতিক, ভূগোলবিদ, পদার্থবিদ্যাবিশারদ, ঐতিহাসিক, সংকলক, ভেষজবিদ, চিকিৎসক, কবি, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক এবং ভ্রমণকারী আলবেরুণী। আলবেরুণী নাম হয়েছিল তার কারণ, মধ্যযুগের প্রাচীরবেষ্টিত শহরে বহিরাগতদের খোরেজমি ভাষায় যদি বলা হত আবিজাক, তবে ফারসিতে বলে—'বেরুণী'। ওঁদের পরিবার বাইরের আগন্তুক, তাই কাস-এর 'আল ওস্তাদ', তিনি আলবেরুণী। কাস এখন রাশিয়ার উজবেকিস্তানে। হাজার বছর পূর্তি উপলক্ষে রাশিয়ানরা তার নাম রেখেছে—'বেরুণী'।

বিস্তর লিখেছেন। অবিশ্বাস্য যেমন তাঁর জ্ঞানের পরিধি, তেমনই সাধনার ফসল। একজন গবেষক হিসেব করেছেন—শুধু বিজ্ঞান বিষয়েই কমপক্ষে বারো হাজার পৃষ্ঠা লিখেছেন তিনি! বয়স যখন তাঁর তেষট্টি তখন বন্ধুর জিজ্ঞাসার জবাবে নিজের লেখা বইয়ের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন তিনি। তাতে ছিল ১৩৮টি পুথির কথা। ২৫টি পুথি বিষয়ে জানিয়েছিলেন— সেগুলো তাঁর নামে চললেও তাঁর নিজের লেখা নয়। আর জানিয়েছিলেন ১০টি কিতাব তখনও অসম্পূর্ণ। তার পরও প্রায় সতেরো বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। সে-বছরগুলোও নিষ্ফলা যায়নি। সমসাময়িক একজন লিখেছেন—বছরের দুটো পরবের দিন বাদ দিলে বাদবাকি দিনগুলোতে কখনও তাঁর হাত থেমে থাকত না, চোখ পর্যবেক্ষণের কাজ চালিয়ে যেত বিরামহীন, মন চালিয়ে যেত অনুধ্যান। সপ্তাহে একদিন নাকি তিনি বেরিয়ে আসতেন পথে। বাজার থেকে কেনাকাটা সেরে আবার গিয়ে লিখতে বসতেন। সুতরাং, সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি তাঁর বইয়ের সংখ্যা ১৮০-তে গিয়ে ঠেকে, তবে বোধহয় সেটা খুব অবিশ্বাস্য ঘটনা নয়।

একশো-দেড়শো বই একালেও অনেক লেখক লিখে থাকেন বটে। তবে সে-সব গালগল্প বা হালকা আমুদে কিতাব। বড়জোর গোয়েন্দা কাহিনী নয়তো উপন্যাস। তৎকালের পণ্ডিতদের মতো, আলবেরুণী অন্য-কলম হাতে নিয়েছিলেন। যেমন নিয়েছিলেন আবু সীনা কিংবা ওমরখৈয়াম, অথবা সুরাবর্দি। তিনিও উপন্যাস লিখেছিলেন ছয়খানা। তৎসহ কিছু কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, সমগ্র উৎপাদনে ভারী বস্তুই পরিমাণে বেশি।

তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে: জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষ বিষয়ে ১৮ খানা বইয়ের কথা। বিভিন্ন দেশের ভূগোল এবং ভৌগোলিক তত্ত্ব বিষয়ে ১৫ খানা। গণিত পদ্ধতি—৮ খানা,

সূর্যকিরণ এবং ছায়ার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—৪ খানা, জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মাণ বিষয়ে ৫ খানা, কাল ও সময় নির্ণয় বিষয়ক—৫ খানা, জ্যোতিষ গণনাবিধি—৭ খানা, জ্যোতিষ অনুযায়ী শুভাশুভ নির্ণয় পদ্ধতি বিষয়ক—১২ খানা, ধর্মবিশ্বাস এবং লোকাচার বিষয়ে—৬টি। তার উপর ইতিহাস, ভারত-তত্ত্ব, ভেষজ তথ্য—ইত্যাদি। কোনও কোনও পুথির পৃষ্ঠাসংখ্যা হয়তো দশ, কোনও কোনওটি আবার সাতশো-আটশো পৃষ্ঠা ব্যাপী। আলবেরুণী বিদ্রূপ করে লিখেছেন—ভারতীয় পণ্ডিতেরা তাঁর বিদ্যাকে সাগরের সঙ্গে তুলনা করেন। হয়তো ওই বিশেষ মুহূর্তে সেটা সত্যিই খোশামুদি ছিল, আজ কিন্তু সবাই মানেন তুলনীয় তিনি সাগরের সঙ্গেই। খেদের কথা, এই সব পুথির মধ্যে আনকোরা অবস্থায় পাওয়া গেছে মাত্র সাতাশটি আর সবই লুপ্ত। নয়তো ছিন্নপত্র মাত্র।

সতেরো বছর বয়সে গ্রহনক্ষত্রের দূরত্ব মাপবার যন্ত্র তৈরি করেছেন তিনি, চব্বিশে আবু সীনার সঙ্গে অ্যারিস্টটলের দর্শন নিয়ে লিখিত বিতর্ক চালিয়েছেন তিনি (অবশ্য অ্যাবিসিন্নার বয়স তখন মাত্র সতেরো) পঁয়তাল্লিশে সংস্কৃতের মতো দুরূহ ভাষা শিখতে বসেছেন তিনি, এবং সত্তর পেরিয়ে যাওয়ার পরও শোনা গেল কাশ্মীরের পণ্ডিতদের নানা জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে চলেছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, ইসলামাবাদের একশো কিলোমিটার দূরে নন্দনদুর্গের কাছে দাঁড়িয়ে দূর ১০৮০ খ্রিস্টাব্দে আমাদের এই গ্রহের যে ব্যাসার্ধ পরিমাপ করেছিলেন তিনি, একালের বিজ্ঞানীরা বলেন—তা প্রায় নির্ভুল। আলবেরুণী লিখেছিলেন পৃথিবীর ব্যাসার্ধ— ৬৩৩৮.৮০ কিলোমিটার। একালের বিজ্ঞানীর মাপে তার পরিমাণ— ৬৩৭০.৯০ কিলোমিটার। নন্দনদুর্গ থেকে মাপলে— ৬৩৫৩.৪১ কিলোমিটার। মোটামুটি পনেরো কিলোমিটারের হেরফের। সোনার আপেক্ষিক গুরুত্ব ধার্য করেছিলেন তিনি ১৯.০, লোহার— ৭.৯২। হাজার বছর পরে আজকের বৈজ্ঞানিকরা বলেন প্রথমটি হবে ১৯.৩ এবং দ্বিতীয়টি ৭.৯২। এ প্রতিভা কি অসাধারণ নয়?

কম বয়সে এক গ্রিক বিজ্ঞানীর সঙ্গ পেয়েছিলেন তিনি। তিনিই নাকি আলবেরুণীর প্রথম শিক্ষক। তাঁর শিক্ষাতেই গাছপালা, বীজ, ফল— ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের সূচনা। আলবেরুণী ফুলের গড়নে জ্যামিতির নকশা দেখতে পান, মৌমাছির আচরণে মানবসমাজের চলনধারা। দ্বিতীয় শিক্ষক তথা অভিভাবক আবু নসর মনসুর বিন আলী বিন ইরাক জিলানী। খোরেজম রাজপরিবারের লোক তিনি। গাণিতিক এবং জ্যোতির্বিদ। তাঁর কাছে পেয়েছিলেন ইউক্লিডের জ্যামিতি আর টলেমির জ্যোতির্বিদ্যা। আলবেরুণী তাঁর উৎসাহে গ্রহনক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন, খনিজ সম্পর্কে আগ্রহী হলেন। মধ্য এশিয়ায় প্রথম 'গ্লোব' বা বিশ্ব-গোলক তৈরি হল তাঁর হাতে। একই সঙ্গে চলল পড়াশুনা। কমবয়সেই শত শত বই পড়েছেন তিনি। পরবর্তীকালে অনুরাগীদের তিনি বলতেন—যাঁরা কেবল সাজিয়ে রাখার জন্য বই সংগ্রহ করে, আর তাই দেখিয়ে অন্যদের কাছে গর্ব করে বেড়ায় তারা স্বভাব-কৃপণের মতো। জমানো সমাজের দিকে তাকিয়ে থেকেই তাদের আনন্দ। পুরনো প্রবাদ আওড়ে তিনি বলতেন— জ্ঞান যেন অঙ্গের পোশাকের মতো না হয়, স্নানের সময় তা যেন ধুয়ে না যায়!

তাঁর তৃতীয় শিক্ষকের নাম— আবদুস সামাদ। ইসলামের প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে তিনি সুলতান মামুদের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া আলবেরুণী আলামামুনের আকাদেমিতেও নাকি কাটিয়েছিলেন কিছুকাল। সেখানেও অনেক

জ্ঞানী-গুণীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। জ্ঞানের যে-পরিমণ্ডলে মানুষ তিনি সেখানে যুক্তিবাদ আর মুক্তমনের ফুরফুরে হাওয়া, ইচ্ছেমতো নিশ্বাস নিতে কোনও অসুবিধে নেই। তাঁর সমসাময়িক সহযোগী বিজ্ঞানীদের মধ্যে সবাই মুসলমান ছিলেন না, অন্তত দু'জন ছিলেন নাকি ধর্মে খ্রিস্টান। প্লেটো, অ্যারিস্টটল তো বটেই, আলবেরুণীর লেখা পুথির পাতা উলটে গেলে প্রমাণ মেলে আর্কেমেডিস, ডেমোক্রিটাস, এমনকী হোমারের মহাকাব্য পর্যন্ত সেই তরুণ বয়সেই পড়া হয়ে গেছে তাঁর।

তবু নিয়তি ছিল বুঝি অন্য; মাতৃভূমিতে বসে শান্তিতে বিদ্যাচর্চা করে যাবেন তিনি সেটা বোধহয় তাঁর ভাগ্যে ছিল না। অথবা এমনও হতে পারে, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছিল বলেই হয়তো লোহা ক্রমে পরিণত হয়েছিল ইস্পাতে। এই অভিজ্ঞতা তাঁর প্রয়োজন ছিল। তা না হলে অন্তত কয়টি অতি দরকারি বই যে তাঁর লেখা হত না, এ-বিষয়ে বোধহয় কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

একাদশ শতক শুরু হতে-না-হতে খোরেজম এক ঝড়ের কেন্দ্র। প্রথমে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে ওপরওয়ালা সামানি সম্রাটদের বিরোধ। ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন হারালেন সামানিরা। সেইসঙ্গে পৃষ্ঠপোষক হারালেন তরুণ আলবেরুণী। পরক্ষণেই ইলকখানি তুর্কিরা এসে গদিচ্যুত করল সামানিদের। বোখরা অতঃপর তাদের দখলে। দুই শক্তিমানের সেই লড়াইয়ের সুযোগে খোরেজমে আবার ফিরে এলেন পুরনো শাসকরা। আলবেরুণী তখন ভবঘুরের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাবারিস্তানের নানা শহরে। তখন তাঁর বয়স বড়জোর পঁচিশ। মনে অশান্তি আর অস্থিরতা। এক কারণ ঘর ছাড়তে হয়েছে তাঁকে। দ্বিতীয়ত, পকেটে পয়সা নেই। দুঃখের সেই দিনগুলো প্রসঙ্গে একটি পদ্য স্মরণ করেছিলেন তিনি, যার বক্তব্য—যার কাছে দুই দিরহমও নেই, তার স্ত্রীও তার দিকে ফিরে তাকায় না। বেড়ালও তার মাথায় লাথি মারতে ছাড়ে না। বস্তুত এক শহরে মূর্খ এক জ্যোতিষী নাকি অপমান করেছিলেন তাঁকে। আলবেরুণী লিখছেন— তাঁর আর আমার মধ্যে পার্থক্য ছিল ঐশ্বর্য আর দারিদ্র্যের! পরবর্তীকালে ভারত-তত্ত্ব লিখতে বসে এক জ্ঞানীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তিনি। তাঁকে শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন— পণ্ডিতেরা কেন সব সময় ধনাঢ্যের দুয়ারে ভিড় করেন? ধনীরা তো কখনও পণ্ডিতদের কাছে ছোটেন না। ঋষি উত্তর দিয়েছিলেন— তার কারণ, পণ্ডিতেরা অর্থের প্রয়োজন বোঝেন, কিন্তু ধনীরা বিদ্যার মহিমা কী তা জানে না! বোঝা যায়, আলবেরুণীর জীবনে অর্থচিন্তা একসময় খুবই জরুরি ছিল। তাবারিস্তানের বিদ্যোৎসাহী সুলতান অবশ্য তাঁকে যথেষ্ট খাতির করেছিলেন। তবু খোরেজম-এ শান্তি ফিরেছে শুনে তিনি ফিরে এলেন আপন ঘরে। সেখানকার শাসকরা প্রিয় 'ওস্তাদ'কে দূত করে পাঠালেন গজনীতে। কেননা, সেদিক থেকে আবার ঝড়ের সংকেত। গজনীর সুলতান মামুদ খোলা তলোয়ার হাতে মাঝে মাঝে আড়চোখে খোরেজম-এর দিকে তাকাচ্ছেন। নতুন জীবিকা সম্পর্কে আলবেরুণী লিখছেন— আমি রাজসরকারের কাজ নিয়েছিলাম একবার। তাই দেখে নির্বোধেরা ঈর্ষাকাতর, আর জ্ঞানীরা আমার জন্য দুঃখিত। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল সহযোগী জ্ঞানীদের আর আলবেরুণীর জন্য দুঃখ প্রকাশের সুযোগ নেই। ঝড়ের বেগে সুলতান মামুদ এসে খোরেজম তছনছ করে দিয়েছেন। আর বিজয়ী গজনী-বাহিনীর সঙ্গে বন্দি হিসাবে দেশ ছেড়ে চলেছেন অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গে আল-ওস্তাদ আলবেরুণী।

এ-সব ১০১৭ সনের কথা। কেউ কেউ পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আলবেরুণীর ভাগ্য অন্য রকম, তিনি মামুদের দরবারি জ্যোতির্বিজ্ঞানী। কিন্তু বন্দি বিজ্ঞানী। সুলতান কথায় কথায় বিদ্রূপ করেন তাঁকে। এমনকী দৈহিক নির্যাতনও নাকি করা হয়েছে তখন তাঁর ওপর। তা ছাড়া, আর-এক যন্ত্রণা, সুলতানের হুকুমে তাঁর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ঘুরতে হয় পণ্ডিতকে। সেই সূত্রেই একদিন ভারতে।

সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেছেন বার বার সতেরো বার। ১০২০ খ্রিস্টাব্দে দেখা গেল ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় তাঁর আধিপত্য। উত্তর থেকে দক্ষিণে সে-অঞ্চল কমপক্ষে হাজার মাইল দীর্ঘ, পশ্চিম থেকে পুব দিকে মাপলে চওড়ায় দু'শো মাইলের কম হবে না। বন্দি আলবেরুণীকে সেই 'মুক্ত এলাকা'তেই ছুড়ে দিয়েছিলেন। বলা যায়— নির্বাসন দণ্ড। শোনা যায়, কাবুলের কাছে একটি গ্রামে নিতান্ত একজন দরিদ্রের মতো দিন কাটাতেন খোরেজম-এর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আলবেরুণী। অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল না তাঁর। ছিল না স্বচ্ছন্দ জীবন। তারই মধ্যে কিন্তু অব্যাহত বিদ্যাচর্চা। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করেন, খনিজের সন্ধান করেন, জোয়ার-ভাটার সঙ্গে চাঁদের সম্পর্ক খোঁজেন, ভারত-বিষয়ক পুথির জন্য মালমশলা সংগ্রহ করেন। ভারত অবশ্য তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ নয়। তৎকালের নানা আরবি পুথিতে এই বিস্ময়কর দেশ সম্পর্কে রাশি রাশি খবর;— ভারতীয়রা অঙ্ক জানে, গ্রহনক্ষত্রের গতিগতি বোঝে, ভাল মূর্তি তৈরি করতে পারে, পদ্য লিখতে পারে, দর্শন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রেও ভারতীয়দের তুলনা নেই। স্বপ্নের দেশ সেই ভারতে এসে আলবেরুণী অতএব এক চঞ্চল শিশুর মতো। তিনি এদেশকে জানতে চান। যাকে বলে—নিবিড়ভাবে জানা। জ্ঞানের জন্য এই ব্যাকুলতা অবশ্য তাঁর বরাবরের। স্বচক্ষে একাধিক রাজ্যের উত্থান-পতন দেখেছেন তিনি। সম্ভবত সে-কারণেই বোধহয় তাবারিস্তানে প্রবাসের দিনগুলোতে লিখতে বসেছিলেন— 'আসারুল বাকিয়া', প্রাচীন জাতিসমূহের ঘটনাবলি। রাজ্য ভাঙাগড়ার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন যেন তিনি। ইতিহাসের রথের চাকার দিকে তাঁর নজর। ওই পুথিতে আলেকজান্ডারের আগেকার পৃথিবীর হরেক খবর। আজকের গবেষকরাও মনে করেন মধ্য এশিয়ার ইতিহাসকে বুঝতে হলে ওই বইটি এড়িয়ে যাওয়া অসংগত।

গুরুত্বপূর্ণ অবশ্য তাঁর প্রায় সব রচনাই। ইতিহাসের বইতে যদি নানা দেশের ঘটনাপঞ্জি, ভূগোল-বিষয়ক পুথিতে (Geodesy) তবে নানা দরকারি খবর। পাঠকরা শুনলে চমকিত হবেন—ওই শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থটি, যার ইংরাজি বয়ান,—'দি ডিটারমিনেশনস অ্যান্ড কো-অর্ডিনেটস', তার পাতায় রয়েছে সুয়েজখালের কাহিনী। পারসিকরা যখন মিশর অধিকার করে তখন তারা চেষ্টা করেছিল খাল কেটে ভূমধ্যসাগর আর লোহিত সাগরকে যুক্ত করতে। কিছুটা নাকি কাটাও হয়েছিল, কিন্তু রোমানরা বুজিয়ে দেয়। মণিমুক্তা-বিষয়ক বইয়ে রয়েছে ঈগল পাখি দিয়ে হিরে সংগ্রহের বিবরণ। আলবেরুণী শুধু তাকে 'অদ্ভুত' বলেই ক্ষান্ত হননি, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছেন—এ-সব কাহিনী অবিশ্বাস্য। ভেষজ-বিষয়ক বিশাল পুথিতে কিছু অবিশ্বাস্য গল্প শুনিয়েছেন তিনি নিজেও। যথা: এক-ধরনের গিরগিটি আছে। তার ডিমফোটার পর বাচ্চা যখন জলের দিকে ছুটে যায় তখন সে কুমির হয়, আর যেগুলো ডাঙায় থাকে সেগুলো

হয় গিরগিটি! কিন্তু পাশাপাশি শব্দক্রম অনুযায়ী সাজিয়েছেন তিন হাজার বস্তুর বিবরণ এবং দ্রব্যগুণ। তার মধ্যে গ্রিক সূত্রে পাওয়া নাকি ৭০০ শব্দ, সিরিয়া থেকে পাওয়া ৪০০, ভারত থেকে ৩৫০টি। সে-বইয়ের জন্য আলবেরুণী আজও গণ্য হন আরবি চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিসাবে। অস্ত্রোপচার করে গর্ভমুক্তিকে তিনি বর্ণনা করেছিলেন 'সিজারিয়ান' অস্ত্রোপচার হিসাবে। শুধু তা-ই নয়, চিনের চা বিষয়ে অবশিষ্ট দুনিয়া সর্বপ্রথম বিস্তারিত খবর পেয়েছিল তাঁর পুথি থেকে। 'ওস্তাদের' জন্মের হাজার বছর পূর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি দুই খণ্ডে এই পুথির ইংরাজি তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে করাচি থেকে। তাই বলছিলাম হাজার বছর হয়ে গেছে বলে আরবেরুণীর কিছুই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। এমনকী ওস্তাদের তৈরি আর-এক লেখক আলবাজীর গ্রন্থতালিকাটিও। আলবেরুণীকে বুঝতে হলে সেটিও অপরিহার্য। কেননা, আলবেরুণী তাতে লিখছেন— যাঁরা মনে করেন বিজ্ঞানের কলাকৌশল প্রেরিত পুরুষেরা এসে শিখিয়ে দেন তাঁরা ভ্রান্ত। মানুষ সে-কৌশল আয়ত্ত করে বুদ্ধিবলে কোনও বস্তুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে তারা যে জ্ঞান অর্জন করে তার সাহায্যে, যুক্তি তর্ক দিয়ে যাচাই করে। তাঁর কথা— আত্মা হয়তো এক দেহ থেকে দেহান্তরে যেতে পারে, কিন্তু মানুষের জ্ঞান বর্তায় পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে, তার গতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের দিকে।

আলবেরুণীর রচনায় সব-কিছুই পাঠ এবং অনুধ্যানযোগ্য। এমনকী টুকরো কথাগুলোও যেন শোনার মতো। তবে ভারতীয় পাঠক স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হন তাঁর 'কিতাব-আল-হিন্দ্' বা ভারত-বিষয়ক বইটির দিকে। তার মূল নামটি অবশ্য দীর্ঘ। বাংলায় অনুবাদ করলে তার মানে দাঁড়ায়— 'বুদ্ধি বিচারে যা গ্রহণযোগ্য আর গ্রহণযোগ্য নয়,— হিন্দুদের সব রকম চিন্তাপদ্ধতির সঠিক বর্ণনা।' "Book on an accurate descriptions of all categories of Hindu though those which are admissable to reason as well as those which are not." আলবেরুণীর হাতে লেখা মূল পুথি নেই। সরাসরি তার থেকে নকল করা একটিমাত্র পুথি পাওয়া গেছে। সেটি আছে প্যারিসে। পরে অবশ্য তার থেকে নকল করে আরও দু'টি পুথি তৈরি হয়েছিল। গত শতকে (১৮৮৭) এডোয়ার্ড জাকাউ (Edward C. Zachau) সেটিকে ছাপিয়ে নতুন করে প্রচার করেন। পরের বছর 'আলবেরুণীস ইন্ডিয়া' (*Alberuni's India)* নাম দিয়ে তিনিই প্রকাশ করেন টীকা সমেত বইটির প্রথম ইংরাজি অনুবাদ। ক' বছর আগে ১৯৫৭ সালে ভারত সরকারের উদ্‌যোগে প্রকাশিত হয়েছে প্রথম ভারতীয় আরবি সংস্করণ। আর গত জুনে (১৯৭৪) বাংলাদেশে প্রকাশিত হল আরবি পুথির প্রথম বাংলা অনুবাদ। অনুবাদক— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ। অসাধারণ কাজ। বাঙালি পাঠকদের তরফে বলতে পারি ঐতিহাসিক কাজ। প্রায় হাজার বছর ধরে যে-বই কার্যত সাধারণের কাছে জনশ্রুতির মতো, শ্রীহবিবুল্লাহ তাকে সকলের নাগালে এনে দিলেন। তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় ঢাকার বাংলা একাডেমিকেও। কেননা, অতি মূল্যবান এই বইটির তাঁরাই প্রকাশক। পাঠকদের সবিনয়ে জানিয়ে রাখি আমার এ-রচনায় ভারত বিষয়ে যে-সব উদ্ধৃতি আছে সেগুলো সবই শ্রীহবিবুল্লাহর বাংলা পুথি 'আলবেরুণীর ভারত-তত্ত্ব' থেকে।

ভারত বিষয়ে আলবেরুণীর এটাই অবশ্য মুখ্য বই। কিন্তু সবাই জানেন প্রায় একযুগ

ভারতে কাটিয়ে তিনি যখন গজনীতে ফিরেছিলেন তখন ভারতের সঙ্গে তাঁর সংসর্গের ফল হিসাবে সমকালের মানুষ হাতে পেয়েছিলেন আরও কিছু পুথি। সেগুলো অবশ্য সবই অনুবাদ। সংস্কৃত থেকে আরবিতে তর্জমা করেছিলেন তিনি—কপিলের সাংখ্য, পাতঞ্জল দর্শন, পৌলিশ সিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত, বৃহৎ সংহিতা, খণ্ডখাদ্যক, বরাহমিহিরের লঘুজাতকর্ম ইত্যাদি ছোট-বড় বাইশটি পুথি। তা ছাড়া পঞ্চতন্ত্রের আরবি অনুবাদেও আগ্রহী হয়েছিলেন তিনি। এর মধ্যে মাত্র দুটি অনুবাদ পাওয়া গেছে। অন্য দিকে ভারতীয়দের জন্য সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন—ইউক্লিড-এর 'এলিমেন্টস', টলেমির 'অ্যালমাজেসট' এবং গ্রহনক্ষত্রের দূরত্ব মাপবার যন্ত্র নির্মাণ বিষয়ে একটি বই। কাশ্মীরের হিন্দু জ্যোতিষী এবং পণ্ডিতদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েও তিনি নাকি সংস্কৃতে একাধিক বই লিখেছিলেন। অথচ, আগেই বলেছি আলবেরুণী সংস্কৃত শিখতে বসেছিলেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে, আর ভারতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লেনদেন চলেছিল মাত্র বছর বারো!

'আল ওস্তাদ' ভারত-তত্ত্ব রচনা শেষ করেন ১০৩০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। পুথির শেষ লিপিকার বলেছেন আলবেরুণী নিজের হাতে পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ শেষ করেছিলেন ১০৩১ সনের ১১ ডিসেম্বর। অর্থাৎ এ-বই রচিত হয়েছিল সুলতান মামুদের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে। তার পর মামুদ-পুত্র মাসুদের আমলে লেখেন গণিতশাস্ত্র এবং জ্যামিতি-বিষয়ক পুথি। সে-বই পৃষ্ঠপোষক হিসাবে মাসুদকেই উৎসর্গ করা। তার পর মাসুদ-পুত্র মাওদুদুদ-এর সময়ে লিখেছিলেন মণিমুক্তা বিষয়ে বইটি। সেটিও মাওদুদুদকেই উৎসর্গ করেছিলেন তিনি। কিন্তু ভারত-তত্ত্ব মামুদের জীবৎকালে রচনা বা প্রকাশ করেননি আলবেরুণী। মামুদের মৃত্যুর ক'মাস পরে রচনার কাজ শেষ হলেও বইটি মৃত সুলতানের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করার কথা মনে আসেনি তাঁর। দুটি ঘটনাই তাৎপর্যপূর্ণ। বোঝা যায় সুলতান মামুদ ছিলেন ,তাঁর দৃষ্টিতে পৃষ্ঠপোষক নন, শত্রুর সামিল। মামুদ তাঁর চোখে লুঠেরা, সভ্যতার ধ্বংসকারী। এক জায়গায় সরাসরি লিখেছেন তিনি—"ইসলামের দৃঢ়তম স্তম্ভ, সুলতানের আদর্শ দৃষ্টান্ত, বিশ্বের সিংহ সবিশেষ, যুগের অনন্য কীর্তি মাহমুদ, আল্লাহ যেন তাঁকে ক্ষমা করেন।" বিজয়ী সুলতানের জন্য তাঁর বড়জোর অনুকম্পা আছে মাত্র, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

কী আছে ভারত-তত্ত্বে? উত্তরে একটাই প্রশ্ন মনে আসে—কী নেই? ওই বিশাল পুথিতে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, জ্যোতির্বিদ্যা, ভাষা, ব্যাকরণ থেকে শুরু করে সব আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দুদের বিশ্বাস, ভাব ও ইন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা... আত্মার সঙ্গে জড়পদার্থের সম্পর্ক,... জন্মজন্মান্তরবাদ, স্বর্গনরক, শ্রেণীভেদ, জাতিভেদ, মূর্তি পূজা, বর্ণমালা, ভূগোল, সংখ্যা চিহ্ন আরও কত কী। আশিটি অধ্যায়। প্রতি অধ্যায়ে হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে সহজ সরল আলোচনা। আলোচনা তুলনামূলক। পাশাপাশি চলেছে গ্রিক, ইরানি, সুফি ইসলাম এবং অন্যান্য মতামতের কথাও। ওই বইতে সক্রেটিস প্লেটো থেকে শুরু করে চোদ্দো জন গ্রিক পণ্ডিতের চব্বিশটি উদ্ধৃতি আছে, চল্লিশটি সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা আছে। তার পরও হয়তো আজকের ভারত-তাত্ত্বিক বলবেন অনেক দরকারি পুথি আলবেরুণীর নজরে পড়েনি। ভারতের প্রচলিত সব ধর্মমত তিনি ধরতে পারেননি। বিশেষত, হিন্দুদের ইতিহাস, বৌদ্ধদের মতামত, কিংবা

উপনিষদের বক্তব্য বিষয়ে তাঁর উদাসীনতা উল্লেখযোগ্য। লক্ষণীয় এই, বৌদ্ধদের জানতে পারলেন না বলে তিনি অবশ্য খেদ প্রকাশ করেছেন, এবং অন্য সব বিষয়েই যে তিনি শেষ কথা জেনে গেছেন, আলবেরুণী কিন্তু কোথাও সে-দাবি জানাননি। তিনি সবিনয়ে জানিয়েছেন— "হিন্দুরা জ্ঞানের আরও নানা বিষয় নিয়ে চর্চা করে থাকে, এবং সেসব বিষয়ে গ্রন্থও অজস্র আছে। আমার জ্ঞানে তার পরিধি করা যায় না।" আলবেরুণীর বৈশিষ্ট্যই এখানে— তিনি কখনও আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেন না।

ভারত-তত্ত্বের প্রথম ছত্রেই তিনি জানিয়ে দেন অন্য ধরনের লেখকের বিবরণ এটি। ভূমিকায় তিনি প্রতিবেদকের ভূমিকা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা শোনার মতো: "যে ঘটনা স্বাভাবিক নিয়মে ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ঘটা অসম্ভব নয়, তার বিবরণের সত্যাসত্য-ও সংবাদদাতার সত্যবাদিতার উপর নির্ভর করে; তার সত্যনিষ্ঠা আবার ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা জাতিগত বিদ্বেষ ও বৈরিতার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কোনও সংবাদদাতা নিজ স্বার্থে মিথ্যা খবর প্রচার করে, হয় নিজের সমাজ বা জাতিকে বড় করে, নয়তো বিপক্ষ জাতি বা সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করে এবং তদ্দ্বারা সে নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশা করে। স্পষ্টতঃ উভয় ক্ষেত্রেই লাভ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে সে এরূপ করে থাকে।... যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিহার করে সর্বদা সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকে, একমাত্র সেই-ই প্রশংসাভাজন। অন্যদের তো কথাই নাই, বিপক্ষদের কাছেও সে শ্রদ্ধেয়।..."

হাজার বছর আগে ভারত-পথিক আলবেরুণী সেই সত্যেরই সাধক। ভারত বিষয়ে তাঁর বই লেখার এক উদ্দেশ্য—আরব মুলুকে এ বিষয়ে ভাল বইয়ের অভাব মেটানো। "এ বিষয়ে পুস্তকাকারে (অর্থাৎ হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস এবং রীতি নীতি বিষয়ে) আজ পর্যন্ত যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তার প্রায় সবই দ্বিতীয় স্তরের",—লিখছেন 'আল ওস্তাদ'। সেগুলো তাঁর মতে নকলের নকল, তাতে না আছে সামঞ্জস্য, না বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা। অন্যত্র তার কিছু নমুনাও দিয়েছেন তিনি। যথা—পঞ্চতন্ত্রের আরবি অনুবাদ। খেদ করে লিখছেন—"পঞ্চতন্ত্র' পুস্তকের যদি আমি তর্জমা করতে পারতাম! পুস্তকটি আমাদের মধ্যে Kalila Wa Dimna নামে খ্যাত। ফারসি, হিন্দী এবং আরবীতে তর্জমা হয়ে পুস্তকটি নানা ভাষায় প্রচারিত হয়েছে। এমন সব লোকের দ্বারা এই সব তর্জমা হয়েছে, পাঠ পরিবর্তন করার অপবাদ থেকে যারা সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।..." আল ওস্তাদ অতএব স্থির করলেন হিন্দুদের সম্পর্কে তিনি নিজেই এবার বই লেখার কাজে হাত দেবেন। তাঁর ভারত-তত্ত্বের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, "যাতে হিন্দুদের সঙ্গে তর্কাভিলাষীদের তাতে সাহায্য হয় এবং যারা তাদের সাথে মেলামেশা করতে ইচ্ছুক তারাও যেন প্রয়োজনীয় তথ্যের সংগ্রহ হিসাবে পুস্তকটি ব্যবহার করতে পারে।" তিনি ঘোষণা করেছেন— "প্রতিপক্ষ হিসাবে বিদ্বেষ প্রযুক্ত হয়ে (আমি) তাদের (হিন্দুদের) যেমন কুৎসা আমি করি নি, বিবরণের সত্যতা প্রতিদানের জন্য তাদের নিজস্ব কাহিনীগুলো উদ্ধৃত করতেও আমি সংকোচ বোধ করিনি। সে কাহিনীগুলো ইসলাম ধর্মের বিপরীত মনে হলেও সত্যধর্মীদের কানে আপত্তিকর ঠেকলে কেবল এই কথা মনে রাখা উচিত যে, সে সব হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসের কথা এবং তার সত্যাসত্য ওরাই বোঝে ভাল।

এ রচনাটি তর্ক বা বাদানুবাদের পুস্তক নয়। প্রতিপক্ষের যুক্তি ও প্রমাণাদির ভ্রান্তি দেখানোর উদ্দেশ্যে আমি সে সবের উল্লেখ করিনি। আমার এ রচনাটি নিতান্ত বর্ণনামূলক।"

ভাবতে অবাক লাগে তিন হাজার বছর আগেকার পরদেশী দর্শক। এদেশের মাটিতে পা দিয়েছেন একটি বিজয়ী বাহিনীর সঙ্গে, এবং লিখতে বসেছেন পরাজিতদের নিয়ে।

লেখক হিসাবে অনেক সমস্যা ছিল তাঁর। ভাষার ব্যবধান, চলাফেরায় স্বাধীনতার অভাব, সংস্কৃত পুথি এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের অভাব। আলবেরুণী টানা বারো বছর ভারতে বাস করেছেন কি না সন্দেহ। অনেকের অনুমান সুলতান মামুদের মতো তিনিও হানা দিয়েছেন বারে বারে। অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। ভারতের মধ্যে একমাত্র পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরে ঘুরেছেন তিনি। হয়তো বা উত্তর ভারতের কোনও কোনও এলাকায়। তারই মধ্যে ভারত-তত্ত্বের জন্য যে বিপুল মাল-মশলা সংগ্রহ করেছেন তিনি তার সামনে দাঁড়ালে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। বিশেষত মনে রাখতে হবে তলোয়ারধারী পশ্চিমের অভিযাত্রীদের সম্পর্কে হিন্দুরা তখন রীতিমতো ভয়ার্ত। এই ভয় এবং বিদ্বেষের কারণ কী, আলবেরুণীর কাছে তাও গোপন ছিল না। তিনি লিখেছেন— "আমাদের সঙ্গে রীতিনীতির এত তফাৎ যে আমাদের নাম শুনিয়ে আমাদের পোশাক পরিয়ে, আমাদের চেহারার নকল করে এরা শিশুদের ভয় দেখায়।"...আলবেরুণীর সেটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কেননা, সবুক্তগীনের পথ ধরে সুলতান মামুদ তিরিশ বছরের বেশিকাল ধরে যা করেছেন তার তুলনা হয় না। আলবেরুণীর ভাষায়— "তিনি 'হিন্দুদের শস্যশ্যামল অঞ্চলগুলোকে মরুভূমিতে পরিণত করে দিলেন; এবং এমন সব আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখালেন যার ফলে হিন্দুরা উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণার মতন চতুর্দিকে উড়ে গেল... ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা অবশিষ্ট রইল তাদের মনে মুসলমানদের প্রতি নিদারুণ আক্রোশও বিতৃষ্ণা বদ্ধমূল হয়ে রয়ে গেল। এই জন্যই ওদের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিজিত অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে কাশ্মীর ও বারাণসীর মতন এমন সব স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে যেখানে আমাদের হাত পৌঁছায় না।" প্রায় পাঁচশো পাতায় বিস্তীর্ণ ভারত-কথা শেষ করার আগে তাঁর কথা— "এই রচনাতে অজ্ঞতাবশতঃ কোনও অসত্য কথা যদি এসে গিয়ে থাকে, আল্লাহ্ যেন আমায় ক্ষমা করেন এই আমার প্রার্থনা।"

এক দিকে উদার সহনশীলতা এবং এই সমবেদনাবোধ, অন্য দিকে বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তিবাদী আলোচনা। পড়তে পড়তে এক সময় মনে হয় আলবেরুণী কি হাজার বছর আগেকার মানুষ, না আধুনিককালেরই কেউ। হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রসঙ্গে তিনি প্রাচীন ইরানি প্রথার আলোচনা করে দেখিয়ে দেন প্রথাটি অভিনব কিছু নয়, বিবাহ পদ্ধতির আলোচনায় টেনে আনেন প্রাচীন আরব এবং ইহুদি রীতিনীতির কথা। মূর্তি পুজোও তাঁর চোখে ব্যাখ্যার অতীত কোনও কদাচার নয়। আলবেরুণী মনে করেন— "সবজাতির মধ্যেই জনসাধারণ ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। কারণ মার্জিত বুদ্ধি লোকের স্বভাব হল বিচার বিশ্লেষণ করা এবং তার দ্বারা মৌলিক নীতি আবিষ্কার করা; আর সাধারণ লোক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বাইরে যেতে চায় না।" সুতরাং ঈশ্বর 'শূন্য' বা 'বিন্দু' শোনা মাত্র তারা আসল তাৎপর্য না বুঝে মনে করে ঈশ্বর সত্যই হয়তো বিন্দুর মতো ছোট্ট একরত্তি কিছু!

জ্ঞানের জন্য এই ব্যাকুলতা, যুক্তির প্রতি এই নিষ্ঠার উৎস খুঁজতে গিয়ে গবেষকরা জানিয়েছেন আলবেরুণী প্রচলিত অর্থে 'ইসলামি দার্শনিক'দের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না, ইসলামে বিশ্বাসী হয়েও তিনি ছিলেন জ্ঞানের পথে মুক্ত পথিক, 'বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান'

এই আদর্শে বিশ্বাসী। আরবদের প্রতি বিদ্বেষের তাঁর সংগত কারণ ছিল। তবু বিজ্ঞান আলোচনায় তিনি আরবি ভাষা ব্যবহারে যেমন ইতস্তত করেননি, তেমনই ইসলামদের ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় নিজের বিদ্যাবুদ্ধিকে উজাড় করে দেওয়ার কথাও তিনি তেমনই ভাবেননি। সম্ভবত সে-সব কারণেই তাঁর রচনাবলি ছিল দীর্ঘকাল নিষিদ্ধপ্রায়। ভারতে ভারত-তত্ত্বের কোনও পুথি পাওয়া যায়নি,— এ তথ্যও নিশ্চয় তাৎপর্যহীন নয়। এ সম্পর্কে আলবেরুণীর বাংলা অনুবাদক শ্রীহবিবুল্লাহ তাঁর ভূমিকায় কিছু দরকারি কথা বলেছেন। আলবেরুণীকে বোঝার পক্ষে ওই খবরগুলোও অত্যন্ত মূল্যবান।

সর্ব বিষয়ে যিনি নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, এবং যুক্তিশীল ভারতের সব-কিছুকে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করবেন, তা আশা করা যায় না। জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা করেছেন তিনি, কিন্তু এ-শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশে দ্বিধা করেননি। জ্যোতিষীদের সম্পর্কে জানিয়ে গেছেন তাঁর অবিশ্বাসের কথাও। হিন্দুদের সমালোচনায় আলবেরুণী তাই কখনও কখনও নির্মম। শাস্ত্রের বক্তব্য এবং লোকাচারের পার্থক্য তিনি বুঝেছিলেন। কিন্তু টীকাভাষ্যে কণ্টকিত হিন্দুর জ্ঞানবিজ্ঞানের পুথি নেড়েচেড়ে তাঁর মন্তব্য— "এদের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে আমি তাই বলি যে, এদের অঙ্কশাস্ত্র ও জ্ঞানসাধন পদ্ধতিকে কর্দমাক্ত যুক্তি, গোময় মাখান মুক্তা অথবা অতি সাধারণ পাথরের টুকরার মধ্যে বহুমূল্য রত্নের সঙ্গেই একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে।" আর-এক জায়গায় লিখেছেন—"হিন্দুরা শৃঙ্খলা রক্ষায় খুবই উদাসীন, রাজাদের ঐতিহাসিক বর্ণনায় কালানুক্রমিক পরমার্থে তারা মোটেই যত্ন নেয় না এবং সংবাদের জন্য পীড়াপীড়ি করলে উত্তর দেবার মতো কিছু না পেয়ে ওরা গাল-গল্পের আশ্রয় নেয়।" এই সব অভিযোগ কি উড়িয়ে দেওয়ার মতো?

মধ্যযুগের বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক আলবেরুণীর শেষ জীবন কেটেছে গজনীতে। তাঁর তিরোভাব ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে। "ওস্তাদের বয়স তখন সাতাত্তর বছর সাত মাস। কারও কারও হিসাবে আরও বেশি। কেননা, শেষ বই ভেষজ-বিষয়ক সেই বৃহৎ গ্রন্থটি রচনা যখন শেষ করেন তখন তাঁর বয়স নাকি আশি। সুতরাং মৃত্যুর তারিখ ১০৫০ খ্রিস্টাব্দও হতে পারে বইকী! গজনী এখন আফগানিস্তানে। সেখানেই রয়েছে তাঁর কবর। মৃত্যুশয্যায় আলবেরুণীর কথা লিখেছেন একজন শিষ্য। একটি প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় নাকি ছটফট করছিলেন তিনি। ভক্তের সান্ত্বনার উত্তরে মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন 'ওস্তাদ'— "বিষয়টি সম্বন্ধে অজ্ঞতা নিয়ে মর্ত্য জগৎ ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে বিষয়টির জ্ঞান লাভ করে যাওয়া কি তুমি শ্রেয় মনে কর না?"

এই হচ্ছেন আলবেরুণী। মামুদের ছেলে মাসুদ পুথি উপহার পেয়ে হাতি বোঝাই অর্থ পাঠিয়েছিলেন নাকি আলবেরুণীকে। সে রাজকীয় দান প্রত্যাখ্যান করে উত্তর দিয়েছিলেন আলবেরুণী— 'এই উপহার বিজ্ঞানের কাছ থেকে লুব্ধ করে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাবে।' জ্ঞানীরা জানেন রৌপ্যখণ্ড থাকে না, থাকে শুধু বিজ্ঞান। ওঁকে রুপো দিয়ে ভোলানো যায়নি, কুযুক্তি, অপযুক্তি দিয়েও না।

পরিশিষ্ট

আলবেরুনির চোখে ভারত

ভারত এককালে সমুদ্র ছিল

"(পৃথিবীর) এই বাসযোগ্য অংশে সুউচ্চ পর্বতমালা পাইন গাছের শীর্ষের মত পৃথিবীর মধ্যদ্রাঘিমা ধরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতমালা চিন, তিব্বত, তুরস্কদেশ, কাবুল বাদাখশান, তুখারিস্তান, বামিয়ান, ঘোর, খুরাসান, 'জিবাল', আজরবাইজান, আরমিনিয়া হয়ে রূম, ফিরঙ্গ এবং Gallicias (...) দেশ পর্যন্ত চলে গেছে। দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তার প্রস্থও অনেক এবং পর্বতমালার অনেক বাঁক আছে যার বেষ্টনীর মধ্যে বহু দেশ ও জনপদ অবস্থিত এবং যার উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী বহু নদ-নদী প্রবাহিত। বাঁকের মধ্যকার এইরূপ একটি সমতল দেশ হচ্ছে ভারতবর্ষ।...

কিন্তু যদি তুমি ভারতের মাটি স্বচক্ষে দেখ, আর বস্তুতঃ খনন করে তার গভীরের যে সব গোলাকৃতি, বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায় তার কথা চিন্তা কর তাহলে তুমি অনুমান করতে বাধা হবে যে, ভারত এককালে সমুদ্র ছিল, যা নদীর স্রোতবাহিত পলিমাটি দ্বারা ক্রমশঃ ভরে গেছে।..."

সোমনাথ এবং জোয়ার ভাঁটা

"সিন্ধুদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দুদের উপাসনাগৃহে প্রায়ই এই বিগ্রহটি (শিবলিঙ্গ) দেখা যায় তবে এসবের মধ্যে সোমনাথই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। সেখানে প্রতিদিন ওরা গঙ্গার এক কলসী জল ও কাশ্মীরের এক ঝুড়ি ফল আন্‌ত। ওদের বিশ্বাস ছিল যে, সোমনাথ প্রত্যেক দুরারোগ্য রোগ ও চিকিৎসার-অতীত রোগীকে আরোগ্য করতে পারে।

সোমনাথের খ্যাতির কারণ হোল, এটি সমুদ্রগামী নাবিকদের একটি প্রধান বন্দর, হাবশী (...) দেশের সুফালা থেকে চীন পর্যন্ত যারা যাতায়াত করে, তাদের জন্য সোমনাথ এক অন্যতম ঘাট (...)।

এই সমুদ্রের জোয়ার-ভাটাকে ওদের ভাষায় 'ভর্ণ' (...) ও 'বুহর' (...) বলে। হিন্দু জনসাধারণের ধারণা এই যে, সমুদ্রে 'বাড়বানল' নামে এক প্রকার অগ্নি আছে, যা সর্বদাই শ্বাস ফেলছে। শ্বাসগ্রহণ করে বাতাসে তা ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস হয়, আর শ্বাস ত্যাগ করার দরুন বাতাসে ছড়ান বন্ধ হয় বলে সমুদ্রে ভাটা আসে।...

শিক্ষিত হিন্দুরা কিন্তু চন্দ্রের উদয় ও অস্ত থেকে দৈনিক জোয়ার-ভাটা নির্ণয় করে, আর মাসিক জোয়ার-ভাটা চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধি থেকে নির্ণয় করে।...

জোয়ার-ভাটার জন্যই সোমনাথের এই নামকরণ হয়েছে, যা আসলে চন্দ্রেরই নাম।...'

পৃথিবী ঘোরে কি?

"পৃথিবীর নিশ্চল থাকার প্রশ্ন পদার্থবিদ্যার এক প্রাথমিক সমস্যা, আর চূড়ান্ত সমাধান একরূপ দুঃসাধ্য। কিন্তু পৃথিবীর নিশ্চলতায় হিন্দুদের বিশ্বাস আছে। 'ব্রহ্ম সিদ্ধান্তে' ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন: 'অনেকের মত যে, পূর্ব থেকে পশ্চিমমুখী যে প্রাথমিক গতি (...) তা মধ্যরেখা (meridian)-র গতি নয়,— তা আসলে পৃথিবীর গতি। বরাহমিহির তাদের মত খণ্ডন করে বলেছেন, 'তাই যদি হত তাহলে পাখি একবার উড়ে পশ্চিম দিকে গেলে আবার তার বাসায় ফিরে আসতে পারত না।' বাস্তবিক পক্ষে বরাহমিহির যা বলেছেন তা-ই ঠিক।

এই পুস্তকেরই অন্যত্র ব্রহ্মগুপ্ত বলেছেন— 'আর্যভট্টের অনুগামীরা বলেন যে, পৃথিবী গতিশীল, আকাশ নিশ্চল। এ ধারণার জবাবে বলা হয়েছে যে তাহলে পৃথিবী থেকে প্রস্তর ও বৃক্ষাদি পড়ে যেত।' ব্রহ্মগুপ্ত কিন্তু জবাবের যাথার্থ্য মানতে পারেননি। তিনি বলেছেন, যে পাথর ও গাছপালা যে গতির দরুনে পড়ে যাবেই, এমন নয়। তার একথা বলার যুক্তি যেন এই যে সমস্ত ভারী বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়।...এ বিষয়ে (পৃথিবীর গতির বিষয়ে) নিঃসন্দেহ হওয়া খুবই দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।..."

আজব দৃশ্য: অবিশ্বাস্য নির্মাণ কৌশল

"যে সব স্থানে বিশেষ মাহাত্ম্য আরোপ করা হয়, সেখানে ওরা স্নানের জন্য কুণ্ড বা জলাশয় নির্মাণ করে। এই নির্মাণকার্যে ওরা এমন দক্ষতা অর্জন করেছে যে, আমাদের মুসলমানরা সে সব দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়। সেরূপ কিছু নির্মাণ করা ত দূরে থাক, তার বর্ণনা পর্যন্ত করতে পারে না। বিরাট বিরাট প্রস্তরখণ্ড দিয়ে ওরা এসব পুষ্করিণী নির্মাণ করে, তীক্ষ্ণ ও মজবুত লৌহ-বন্ধনী দিয়ে পরম্পরাবদ্ধ প্রস্তরখণ্ড পুষ্করিণীর চতুর্দিকে একটির উপর আর একটি সন্নিবেশ করে প্রশস্ত তাক বা চত্বর শ্রেণী নির্মাণ করে। এক একটি তাকের উচ্চতা মানুষের সমান হয়। এইরূপ দুইটি তাকের মধ্যেকার প্রস্তরগাত্রে শৃঙ্গমালার ন্যায় ঊর্ধ্বগামী সোপান নির্মাণ করে। প্রথমোক্ত তাকগুলি পুষ্করিণীর চতুর্দিকের পথ বা মার্গ, আর দ্বিতীয়গুলি হোল সোপান। যথেষ্ট সংখ্যক সোপান থাকায় বহু লোকের একই সময়ে নামা ওঠা করতে কেউ কারও সম্মুখে পড়ে না বা পথরোধ করে না; অবতরণকারীকে সহজেই পথ ছেড়ে উত্তরণকারী ঈষৎ ঘুরে সেই ধাপের অন্যত্র দিয়ে উঠে যেতে পারে।..."

সতীদাহ

"পুরুষ চারিটি পর্যন্ত একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। চারিটির বেশী স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ, তবে একটির মৃত্যু হলে সংখ্যা পূরণ করার জন্য আর একটি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সে সংখ্যা অতিক্রম করতে পারবে না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে তার স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না: তার জন্য দুইটি পথ মাত্র খোলা: হয় আমরণ বিধবা হয়ে থাকা, নয়ত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করা। শেষের পথই শ্রেষ্ঠ, কেননা বিধবাকে আজীবন কষ্টের মধ্যে বাস করতে হয়। ওদের আর একটি প্রথা হচ্ছে রাজার স্ত্রীগণকে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যতিরেকে

অগ্নিদগ্ধ করা, যাতে তাদের কেউ কলঙ্কনীয় কিছু না করতে পারে। কেবল বৃদ্ধা ও পুত্রবতী স্ত্রীদেরকে ওরা ছেড়ে দেয়, কারণ মাতার সম্ভ্রম রক্ষণাবেক্ষণ করা পুত্রের দায়িত্ব।...”

দেবদাসী

“আমাদের দেশের লোকদের ধারণা যে, বেশ্যাবৃত্তিকে হিন্দুরা অবৈধ মনে করে না। যেমন মুসলমানেরা কাবুল জয় করার পর সেখানকার ‘ইস্পাহবাদ’ (...) ইসলাম গ্রহণ করে শর্ত করেছিল যে তাকে গোমাংস ভক্ষণ ও পুরুষ অভিগমন করতে যেন বাধ্য করা না হয়। হিন্দুদের সম্বন্ধে লোকদের এ ধারণা কিন্তু ভ্রান্ত। আসল ব্যাপার হচ্ছে যে, হিন্দুরা পরদারগমন বা যৌন ব্যভিচারের তেমন কঠিন শাস্তি দেয় না। প্রকৃত দোষ কিন্তু হিন্দু জাতির নয়, তাদের রাজাদের। রাজাদের উৎসাহ না থাকলে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত কখনও কোনও নারীকে দেবালয়ে নৃত্য-গীত বা অভিনয় করার অনুমতি দিত না। কিন্তু রাজারা এইসব নারীকে তাদের নগরের আকর্ষণ হিসাবে প্রজাদের চিত্তবিনোদনের জন্য মন্দিরে স্থান দেয়। তাদের আসল উদ্দেশ্য অবশ্য রাজকোষের অর্থ সংগ্রহ, এই সব বারাঙ্গণা পালন করে অর্থদণ্ড ও কর থেকে যা আয় হবে তা দিয়ে সৈন্যের ব্যয় নির্বাহ করা। বুয়ায়হিদ সুলতান আদুদ্দওলা (Azucduddoulah) ও তা-ই করেছিলেন। তাঁর আর এক উদ্দেশ্যও ছিল: কামোন্মত্ত সৈন্যদের উৎপীড়ন থেকে গৃহস্থকে রক্ষা করা।”

রাহুর কবলে ভারতীয় পণ্ডিত

বরাহমিহিরের উক্তি:

“প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরানুগ্রহিত পণ্ডিতরা যেমন বলেছেন, পৃথিবীর ছায়ামণ্ডলে প্রবেশ করলেই চন্দ্রগ্রহণ হয়, আর সূর্যগ্রহণ হয় এইজন্য যে চন্দ্র তাকে আমাদের চোখ থেকে আড়াল করে দেয় আর এইজন্য চন্দ্রগ্রহণের আবর্তন কখনও পশ্চিমদিক থেকে হয় না, সূর্যগ্রহণও কখনও পূর্বদিক থেকে হয় না। বৃক্ষ-ছায়ার মত পৃথিবী থেকে একটি দীর্ঘ ছায়া উপরের দিকে বিস্তৃত হয়।...

গ্রহণের প্রকৃত ব্যাপার তিনি যা বুঝেছিলেন তা বর্ণনা করার পর যারা এ ব্যাপার জানে না, তাদের সম্বন্ধে অভিযোগ করে বরাহমিহির বলেছেন: ‘তবুও সাধারণ লোকেরা রাহুকেই গ্রহণের একমাত্র কারণ বলে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে যায়।...”

যে বরাহমিহির পূর্বোদ্ধৃত আলোচনায় বিশ্ব পরিচয়ের এমন সুষ্ঠু জ্ঞানের প্রমাণ দিয়েছেন, তাঁরই মুখ থেকে এই শেষের কথাগুলি অদ্ভুত শোনায়। নিজে ব্রাহ্মণ বলেই বোধ হয় তিনি ব্রাহ্মণদের সমাজ থেকে নিজকে পৃথক করতে পারেননি, তাঁদেরই পক্ষ সমর্থন করেছেন।...’

কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তকে দেখুন, ভারতীয় জ্যোতিষীদের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। তিনি ব্রাহ্মণ এবং তাঁদেরই একজন যারা তাদের পুরাণাদিতে পড়েন যে সূর্য চন্দ্রের নীচে থাকে এবং সেজন্য যারা সূর্যকে গ্রাস করার জন্য একটি রাহুর প্রয়োজনবোধ করে। সেইজন্য তিনি সত্যকে এড়িয়ে গিয়ে প্রতারণার সমর্থক হয়েছেন। যদিও এও সম্ভব যে, হয়

ঘৃণাভরে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বিদ্রূপ করার জন্যই এমন কথা বলেছেন, অথবা চিন্তাশক্তি-রহিত মুমূর্ষুর মত কোনও মানসিক অক্ষমতার দরুন বলেছেন।...”

নামবিভ্রাট

“...মৌলিক ও ব্যুৎপন্ন (Original & Derivative) উভয় প্রকারের বিশেষ্য পদে ভারতীয়দের ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। একটি বস্তুকে ওরা বহু নামে অভিহিত করে থাকে। আমি ওদিগকে বলতে শুনেছি যে ওদের ভাষায় সূর্যের সহস্র নাম আছে। প্রত্যেকটি নক্ষত্রের জন্য নিশ্চয় প্রায় অতগুলো নামই আছে কেননা অজস্র বিশেষ্য পদ না হলে ওদের চলে না।

...সূর্যের এইরূপ বহু নাম থাকাতে ওদের শাস্ত্রকাররা বহু সূর্যের অস্তিত্ব কল্পনা করেছে, সেজন্য ওদের ধারণা মতে, ১২টি সূর্য আছে এবং প্রতি মাসে এক একটি করে উদয় হয়।...”

“পৃথিবীর সংখ্যা বা ভূপৃষ্ঠের ভাগ নিয়ে ওদের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। ওদের মতভেদ শুধু সাতটি পৃথিবীর নাম ও সে নামগুলির পারম্পর্য নিয়ে। আমার বিশ্বাস, ওদের ভাষায় শব্দ বহুলতা (বা বাগাড়ম্বর) থেকে এ মতভেদের উৎপত্তি হয়েছে; কারণ ওরা একটি বস্তুকে বহু নামে অভিহিত করে থাকে, যেমন, ওদের নিজের উক্তি মতে ওদের ভাষায় সূর্যের সহস্রটি পৃথক নাম আছে, ঠিক যেমন আরবরা সিংহকে প্রায় অতগুলি নামেই অভিহিত করে থাকে। এসব নামের কতকগুলি মৌলিক, আবার কতকগুলি সিংহের বিভিন্ন অবস্থা, তার কার্যপ্রণালী ও স্বভাব থেকে গঠিত।’

শব্দের চাতুরি

“ভারতীয় এবং তাদের মত অন্য জাতিরাও শব্দ বহুলতার গর্ব করে থাকে বটে, কিন্তু আসলে তাদের (ভারতীয়দের) ভাষার এ এক প্রধান দোষ। কেননা, ভাষার কাজ হচ্ছে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু ও তার কর্ম ও গুণকে এমন এক সর্বসম্মত নাম দিয়ে চিহ্নিত করা যার উচ্চারণ মাত্রই অন্য লোকে উদ্দিষ্ট বস্তুকে চিনতে পারে। যদি একই শব্দ বা নাম নানা বস্তুতে প্রযুজ্য হতে থাকে, তাহলে ভাষার সংকীর্ণতাই প্রমাণিত হয়, এবং শ্রোতাকে শব্দের উদ্দীষ্ট অর্থ বোঝার জন্য বক্তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়। তখন হয় সেই শব্দ বাদ দিয়ে অনুরূপ অর্থের আরও শব্দ ব্যবহার করতে হয়, নয়ত ব্যাখ্যা করে তার অর্থ বোঝাতে হয়। যে ক্ষেত্রে একটি বস্তুর বহু নাম থাকে এবং তার প্রত্যেকটি বিভিন্ন সমাজ বা শ্রেণীর মধ্যে পৃথকভাবে ব্যবহৃত নাম না হয় এবং অর্থবোধের জন্য যদি তার একটি নামই সকলের জন্য যথেষ্ট হয়, তাহলে বাকী নামগুলি অনর্থক বাকচাতুরী ও কৌতুক বই আর কিছু নয়, যা দিয়ে বিষয়টিকে অস্পষ্ট ও রহস্যাবৃত করা হয় মাত্র, এবং এই শব্দসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে যে ভাষাটিকে আয়ত্ত করতে চায়, তার আয়ুক্ষয় ছাড়া আর কোনও লাভ হয় না।...’

হিন্দুদের মধ্যে সক্রেটিস নেই

"তিনি (সক্রেটিস) যখন জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে মূর্তিপূজার প্রতিবাদ করেছিলেন, এবং গ্রহনক্ষত্রকে ওদের ভাষায় ভগবান বলতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন এথেন্সের বারোজন বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে এগারোজনই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিতে একমত হয়েছিল। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রেটিসের মৃত্যু হয়েছিল। ভারতবর্ষে এইরূপ দার্শনিকের মত কোনও লোক জন্মায়নি যার দরুন জ্ঞানের তেমন উৎকর্ষ সাধন হতে পারত। সেজন্য তুমি দেখতে পাবে এদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো অত্যন্ত অসংলগ্ন অবস্থায় আছে এবং অজ্ঞ জনসাধারণের অন্ধ সংস্কার ও বিশ্বাসের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে রয়েছে: যেমন বিরাট বিরাট সংখ্যার ব্যবহার, অসম্ভব দীর্ঘকালের অনুমান ও শিশুসুলভ নানা রকমের ধারণা ও ধর্মবিশ্বাস, যার প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধ মন্তব্য ওরা সহ্য করে না।..."

হিন্দুদের বিদেশ ভ্রমণ করা দরকার

"জ্ঞান বিতরণে কার্পণ্য করা ওদের স্বভাব। ওদেরই মধ্যে যাদেরকে ওরা শিক্ষার অধিকারী মনে করে না তাদের থেকে জ্ঞানকে ওরা অত্যন্ত সাবধানতার সাথে রক্ষা করে। এ অবস্থায় বিদেশীর কাছ থেকে সে জ্ঞান কত বেশী পরিমাণ ওরা রক্ষা করে থাকে, তা সহজেই অনুমেয়। ওদের বিশ্বাস, ওদের দেশ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও দেশ নাই; ওরা ছাড়া আর কোনও মনুষ্য জাতি নাই, এবং সৃষ্টজীবদের মধ্যে ওরা ছাড়া আর কারোরই কোনও জ্ঞান-বিজ্ঞান নাই। ফলে যদি খুরাসান বা পারস্যের কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি বিজ্ঞানের কথা ওদের কাছে বলে তাহলে ওরা তার কথায় বিশ্বাস করে না, নিজ অহমিকার বশে ওরা তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে। হিন্দুরা যদি বিদেশ ভ্রমণ করত এবং অন্য দেশের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত তাহলে ওদের ঐ ভ্রান্ত ধারণা দূর হত। ওদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু এরূপ কূপমণ্ডূক ছিল না।..."

হিন্দুদের কাব্যপ্রীতি

"ব্যাকরণের পরই ছন্দের স্থান। কাব্যের মাত্রানীতির নাম 'ছন্দ', আমাদের ওরূজ (...)-এর মত। ছন্দ-জ্ঞান হিন্দুদের জন্য অপরিহার্য, কারণ ওদের সমস্ত পুস্তকই ছন্দোবদ্ধ কাব্যে রচিত, যাতে মুখস্থ করা সহজ হয় এবং যাতে একান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাউকেই লিখিত পুস্তক দেখতে না হয়। এর কারণ, ওরা মনে করে যে মানুষের মন স্বভাবতঃই সামঞ্জস্য (symmetry) ও বিন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিশৃঙ্খলাকে বর্জন করতে চায়। সেজন্য দেখা যায়, অধিকাংশ হিন্দুই কাব্যে আসক্ত, অর্থ না বুঝলেও কবিতা আবৃত্তিও করতে ভালবাসে, আনন্দে ও উৎসাহে করতালি দিতে থাকে। সহজবোধ্য হলেও গদ্যের প্রতি হিন্দুদের অনুরাগ নাই।

...শ্লোক সহজবোধ্য নয়, কারণ ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনা আয়াসসাধ্য, সেজন্য রচনা আড়ষ্ট হয়। তার দরুন কী যে গোলযোগ হয় তা ভারতীয়দের সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে। শ্লোকগুলো যদি আবার গদ্যের মত সরল অনাড়ম্বর হয় তাহলে হিন্দুরা আবার

অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়। ওদের সম্বন্ধে আমি এখানে যা বলছি তা সত্য না হলে আল্লা আমার বিচার করবেন।...”

চাই সরল ধর্মশাস্ত্র

“এদের (হিন্দুদের) ভাষায় আল্লার নাম ‘ঈশ্বর’, যিনি পরম দাতা, যিনি দান করেন কিন্তু প্রতিগ্রহণ করেন না। এদের মতে আল্লার ঐক্য হচ্ছে absolute এবং আপাতদৃষ্টিতে অন্যান্য বস্তু ভিন্ন মনে হলেও আসলে তারা একেরই বহুরূপ।

...(কিন্তু) হিন্দুদের চিন্তাশীল লোকদের ছেড়ে আমরা যদি জনসাধারণের কথায় আসি তাহলে এদের বিশ্বাস রীতির নানা বৈচিত্র্য দেখতে পাই। তার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা বীভৎস, যেমন প্রায় প্রত্যেক সমাজেই, এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও কিছুটা পাওয়া যায়। আল্লার প্রতি মানবীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির আরোপ, মানুষের উপর তাঁর যথেচ্ছাচারে বিশ্বাস পোষণ করা, কিংবা ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয়ের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে নিষিদ্ধ মনে করা, ইত্যাদি নানা প্রকারের কুরীতি ইসলামেও দেখা যায়। জনসাধারণের জন্য রচিত ধর্মসূত্রগুলো অবশ্য স্পষ্ট ও সরলভাবে লিখিত হওয়া দরকার।...”

হিন্দুরা গো-হত্যা করে না কেন

“হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ বলে থাকে ‘ভারতের’ (অর্থাৎ মহাভারতের যুদ্ধের) পূর্বে গোমাংস ভক্ষণের অনুমতি ছিল এবং এমন সব অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ ছিল গোহত্যা যার অন্যতম অংশ ছিল। কিন্তু কর্তব্যপালনে মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্য ‘ভারতের’, পর থেকে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

...গোহত্যা নিষিদ্ধ হওয়ার এই কৈফিয়ৎ কিন্তু তেমন যুক্তিসহ নয়। কেননা এই নিষেধ দ্বারা মানুষের দায়িত্বভার লাঘব হয় নাই, বরঞ্চ আরও কঠিনতর ও জীবনযাত্রা আরও সঙ্কুচিত করা হয়েছে।

অন্য হিন্দুদের বলতে শুনেছি যে, গোমাংস ভক্ষণ ব্রাহ্মণদের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ তাদের দেশ উষ্ণ, সেখানে দেহের অভ্যন্তরভাগ শীতল থাকে এবং পাকস্থলীর স্বাভাবিক তাপ ক্ষীণ হয়;...এই অবস্থার কারণে অতি গুরুপাক ও শীতল বলে ওরা গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

...তবে অর্থনৈতিক কারণও উপেক্ষণীয় নয়। গরু এমন এক পশু যে নানাভাবে মানুষের সেবা করে: ভ্রমণকালে তার ভার বহন করে, কৃষিকার্যে হালচালনা এবং বীজবপনে সহায়তা করে; আর দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত বস্তু দিয়ে গৃহস্থের পরিচর্যা করে। তা ছাড়া, তার গোময়, এমনকি শীতকালে তার নিঃশ্বাসও মানুষের উপকারে লাগে। সেজন্য তার গমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেমন সওয়াদ (ইরাক) অঞ্চলের কৃষিকর্মে ক্ষতি হচ্ছে শুনে হাজ্জাব বিন্ ইয়সুফ গো-হত্যা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।...”

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ অনূদিত ‘আলবেরুণীর ভারত-তত্ত্ব’, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৮৯২

ছাপা-বইয়ের আগে যে-বই
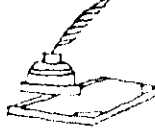
উরবিনোর ডিউক নাকি তাঁর পুথিশালে মুদ্রিত বইকে ঠাঁই দিতে রাজি হননি। কেন, সেটা বোঝা যায় পাণ্ডুলিপির মায়াবী জগতের দিকে তাকালে। বই শুধু পড়বার নয়, দেখবার জিনিসও বটে। হাতে-লেখা পুথিতে দেখবার জিনিস চারটি: লিপিকুশলতা, অলংকরণ, ছবি আর বাঁধাই। এই চার বৈশিষ্ট্যের ভারতীয় পুথি সেকালের পুথির দুনিয়ায় ভারতের মতোই অবাক-করা দ্রষ্টব্য। এখনও দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

অথচ ভারতে পুথির ঐতিহ্য খুব বেশি দিনের নয়। খ্রিস্টীয় ১০০০ অব্দের আগেকার পুথি বলতে গেলে প্রায় লুপ্ত। কুড়িয়ে বাড়িয়ে দু'চারখানা পাওয়া গেছে—এই যা। ভারতে লেখালেখির কথা প্রথমে শোনা যায় খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে, বৌদ্ধ সূত্রে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন হাতে-কলমে লেখা শুরু হয়েছে বড়জোর তার হাজার বছর আগে। বৈদিক ভারতের অনুচ্চারিত নির্দেশ যেন—শতংবদ, মা লিখ। আর্যদের ছিল মৌখিক ঐতিহ্য। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতকে বিদেশি সওদাগরদের সুবাদে লিপি যখন এল (কোনও এক অনির্দিষ্ট সেমিটিক ঘরানার) আর্যরা তখন কলম ধরলেন বটে, কিন্তু সে নিছক ব্যবসায়িক প্রয়োজন মেটাতে। প্রথম দিকে লিপিকে বই লেখার কাজে ব্যবহারের কথা ভাবেননি ওঁরা। হাজার হাজার বছর ধরে বেদ পর্যন্ত চলেছে মুখে মুখে। খ্রিস্টীয় হাজার অব্দে, ভারতে সংস্কৃতির যখন বিস্ময়কর বিকাশ, তখনও পুথি লেখার কাজে প্রাচীনেরা যেন কিছুটা লাজুক। পুথির যুগের সূচনা অবশ্য বুদ্ধ, মহাবীরের পরে। লেখালেখি শুরু হয়, মহানায়করা কী বলে গেছেন তা-ই নিয়ে ভক্তদের মধ্যে বিতর্কের অবসান ঘটাতে। বুদ্ধের বাণী প্রথম লেখা হয়েছিল নাকি সোনার পাতে। ক্রমে হিন্দুরাও প্রভাবিত হন। তবে ধর্মীয় শাস্ত্র নয়, প্রথম দিকে হিন্দুদের যাবতীয় পুথি ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত। অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ১২০০ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ মুসলিম আক্রমণের পর, হানাদারদের হাত থেকে নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষা করার তাগিদে। পুথি-রসিকেরা বলেন হিন্দুরা দীর্ঘকাল লেখালেখি এড়িয়ে চলেছেন বলেই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের হিন্দু-পুথি পর্যন্ত বৌদ্ধ বা জৈন পুথির তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ। নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে খুব কম হিন্দু-পুথিই চমকপ্রদ।

প্রাচীনেরা পুথি লিখেছেন নানা উপকরণে। কাঠের পাতে, বাঁশ কিংবা শোলার ফালিতে, কাপড়ে, গাছের ছালে, তালপাতায়, কীসে নয়। লেখাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য পাথর ও ধাতুর পাতের ব্যবহারও ছিল ব্যাপক। অশোকের শিলালিপির কথা তো সর্বজনবিদিত। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বলতে গেলে দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই সব শিলালিপি। খ্রিস্টপূর্ব ৮৮ সালে সিংহলে (অধুনা শ্রীলঙ্কায়) বৌদ্ধের বাণী খোদাই করা হয়েছিল সোনার পাতে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে মথুরায় তা করা হয় তামার পাতে। ১৬৯১ এবং ১৭১১ সালে কালিকটের জামোরিন আর ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে দুটি চুক্তিপত্র রচিত হয়। তার একটি লেখা হয়েছে দীর্ঘ সোনার পাতে, অন্যটি রুপোর পাতে। ধাতু খোদাই অনেক সময় সাজানো হত পুথির মতো একাধিক পাত দুই মলাটের মধ্যে। ১০২৪ সালে রাজেন্দ্র চোলের একটি দীর্ঘ দানপত্র খোদাই করা হয়েছিল পঞ্চান্নটি পাতে। তাতে লেখা হয় মোট আড়াই হাজার ছত্র। সব মিলিয়ে তার ওজন দাঁড়ায় ২১৬ পাউন্ড! আর একটি বিশিষ্ট লেখার জায়গা ছিল হাতির দাঁতের পাত। এই বৈচিত্র্য, বলা বাহুল্য অভূতপূর্ব।

প্রাণী হত্যা করে চামড়ায় পুথি লেখার কথা ভাবতে পারেননি ভারতের প্রাচীনেরা। হিংসায় অন্তরের সায় মেলেনি। উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে লেখালেখি চলত প্রধানত ভূর্জপত্র বা গাছের ছালে। নয়তো কাপড়ে। আলেকজান্ডারের সহযাত্রীরা এই দুই উপাদানের কথাই বলেছেন। তালপাতার চল ছিল দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতে। উত্তর ভারত তালপাতার সন্ধান পায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে, মৌর্যদের আধিপত্য সম্প্রসারিত হওয়ার পর। একসময় দক্ষিণ থেকে উত্তর ভারতে অন্যতম রপ্তানি পণ্য ছিল তালপাতা। কাগজের ওপর ব্যাপক লেখালেখি শুরু হয় বলতে গেলে ত্রয়োদশ শতকে, মুসলিম শাসন জাঁকিয়ে বসার পর। কাগজ আবিষ্কার করেন চিনারা, খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে। সেটা ১০৫ খ্রিস্টাব্দের কথা। আবিষ্কর্তা বলা হয় চাসাই লুন (Tsai Lun) নামে একজন চিনা। ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে সমরখন্দ জয়ের পর আরবরা চিনাদের কাছ থেকে সে বিদ্যা আয়ত্ত করেন। ক্রমে তা মধ্যপ্রাচ্য তথা পশ্চিম এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে৷ ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপে। ভারতেও আসে মুসলিম সূত্রে তুর্কিদের মারফতে। ইউরোপ আর ভারতে কাগজের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় প্রায় সমকালে। হালে অবশ্য গবেষকরা স্বীকার করছেন খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকেও ভারতে কাগজ ব্যবহৃত হয়েছে হিমালয় অঞ্চলে। গিলগিটে আবিষ্কৃত কিছু পুথি তার সাক্ষী।

ভারতের নানা প্রাচীন শাস্ত্রে চিত্রকলার কথা আছে। দেওয়ালচিত্র, চিত্রশালা ইত্যাদি বিষয়ে নানা সংবাদ। কিন্তু লিপি-শিল্প, কিংবা পুথি-শিল্প বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই। ফলে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু করে দশম শতক পর্যন্ত পুথিতে কোনও ছবি নেই। প্রথম ছবির সন্ধান মেলে দ্বাদশ শতকের পুথিতে। স্বাভাবিকভাবেই পুথিকে প্রথম চিত্রিত করার উদ্‌যোগ গ্রহণ করেন বৌদ্ধ এবং পরে জৈনরা। গৌরবের কথা, চিত্রিত পুথির আদিভূমি পূর্ব ভারত এবং নেপাল। সেখান থেকেই ক্রমে পশ্চিমে এবং দক্ষিণে তার প্রসার। এ-সব সিদ্ধান্ত, বলাই বাহুল্য, যে-সব পুথি একালের হাতে এসেছে তার ভিত্তিতে। অনেক প্রাচীন পুথিই লুপ্ত। এক শত্রু যদি প্রতিকূল জল-হাওয়া, আর-এক শত্রু তবে রাজনৈতিক আবহাওয়া। একাদশ-দ্বাদশ শতকের পালযুগের কিছু পুথি বেঁচে গিয়েছে, কারণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সেগুলি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন নেপালে। পশ্চিম ভারতে সমকালের কিছু জৈন পুথি রক্ষা পেয়েছে মন্দিরের 'ভাণ্ডারে' গোপন করে রাখা হয়েছিল বলেই। 'ভাণ্ডার'

সাধারণ দোকান হয়েছে পরে, আগে ‘ভাণ্ডার’ বলতে নাকি জৈনদের পুথিশালাকেই বোঝাত।

ভারতে পুথির-যুগের সত্যিকারের বিকাশ মুসলিম আমলে। বিদেশি আগন্তুকরা এক দিকে যদি পুথি ধ্বংস করে থাকে, তবে অন্য দিকে নবধারাও বয়ে এনেছেন আমাদের পুথির জগতে। তরাইয়ের যুদ্ধ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তী পাঁচশো বছর টানা মুসলিম আমল। শুধু যে ফিরোজ শা তুঘলকের প্রাসাদের দেওয়াল চিত্রিত ছিল তাই নয়, মুঘল-পূর্ব যুগের দিল্লির সুলতানরা ছিলেন চিত্রিত পুথির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। আরবি, ফারসি, উর্দু, সব ইসলামি পুথিই লেখা হয়েছে কাগজে। আরবরা পুথিতে দৈবাৎ ছবি আঁকত। চিত্র-চর্চা ছিল ওদের কাছে ধর্ম-বিরুদ্ধ। তা সত্ত্বেও ১২০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মিশর এবং ইরানে চিত্রিত পুথির দিব্যি সমাদর। লেখা এবং রেখায় সেখানকার পুথির বিশিষ্ট চেহারা। কারণ, চিত্রশিল্পে ও-সব দেশের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য। তা ছাড়া ত্রয়োদশ শতকে মোঙ্গল সূত্রে চিনের ছায়াপাত। ফলে চতুর্দশ শতকের ইরানি পুথি সৌন্দর্যে এবং সৌকর্যে অতুলনীয়। মুসলিম অভিযাত্রীরা সে-ঐতিহ্যই বহন করে নিয়ে এলেন ভারতে।

পুথির ব্যাপারে ওঁরা ছিলেন ইরান-পন্থী। প্রথম থেকেই তাঁরা কাগজ ব্যবহার শুরু করলেন। কাগজ আমদানি করা হত ইরান এবং ইরাক থেকে। তার পর শুরু হল ভারতে উৎপাদন। ১০৯৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির ওপর দিয়ে যায় তৈমুরি ঝড়। ফলে সুলতানি আমলের প্রথম দু'শো বছরের অনেক পুথিই লুপ্ত। দিল্লির বাইরে জৌনপুর, আহমদাবাদ, বাংলা, মালব, এবং দক্ষিণ ভারতেও স্থানীয় মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষণায় পুথি লেখা হচ্ছিল। তার কিছু বেঁচে গেছে, তার মধ্যে কিছু কিছু পুথি রীতিমতো দর্শনীয়। যথা: ‘সরফনামা’ (১৫৩৯ খৃ.), ‘হামজানামা’ (১৫৭০ খৃ.) এবং অধুনালুপ্ত ‘সিকেন্দরনামা’। পঞ্চদশ শতকের একটি চিত্রিত রান্নার বইও তাক লাগিয়ে দেয়। পুথিটির নাম— ‘নিমাতনামা-ই- নাসিরউদ্দিন’। এই নাসিরউদ্দিন ছিলেন মাণ্ডুর শাসক।

সুলতানি আমলের কোনও কোনও চিত্রিত পুথি দেখে চট করে বোঝা মুশকিল পুথিটি ইরানি, না ভারতীয়। কিছু পুথিতে অবশ্য ভারত সুস্পষ্ট, স্থানীয় প্রভাব চোখ এড়াতে পারে না। গুজরাতের কোরান, কিংবা হামজানামায় জৈন প্রভাব। আবার জৈন পুথিতেও মুসলিম প্রভাব। উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে একালেই ছুটি নেয় তালপাতা, কলাম-এর সংখ্যা তিন থেকে কমে আসে দুইয়ে, ছবির মানব-মানবী কিংবা দেবদেবীও মুখ ঘোরাতে শুরু করেন, বর্ণ প্রয়োগেও দেখা যায় রীতি বহুলাংশে পরিবর্তিত। পুথিতে বিজয়ী এবং বিজেতার মধ্যে এই ভাবের আদানপ্রদান অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। সেকালে চিত্রকর এবং লিপিকর সাধারণত একই শিল্পী। কোনও কোনও পুথিতে অবশ্য চিত্রকর দ্বিতীয় কোনও শিল্পী। চিত্রকরদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন বাংলার কায়স্থরা। অনেক পুথিতেই রয়েছে তাঁদের স্বাক্ষর। অনেক সময় হিন্দু শিল্পী জৈনদের পুথি আঁকতেন। এমনকী মুসলিম পুথিও। ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শা তুঘলকের যে ‘চন্দায়ন’ পুথিখানা উৎসর্গ করা হয় তাতে ইরান, সুলতানি দিল্লি, হিন্দু, জৈন—অনেক ঘরানারই ছাপ। মীর আলি নামে একজন শিল্পী একালেই প্রথম চালু করেন বিখ্যাত নাস্‌তালিক (Nasta'liq) লিপি। আরবি-লিপি পর্যন্ত প্রভাবিত হয়েছে, ভারতীয় জল-হাওয়ায়।

ভারতীয় পুথির পরিপূর্ণ বিকাশ মুঘল আমলে। আগ্রায় বসে লেখা বাবরের তুর্কি

পদ্যের পুথি রয়েছে এখনও রামপুর স্টেট লাইব্রেরিতে। তাঁর তহবিলে ছিল ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে চিত্রিত একখানা 'শাহনামা'। আউরঙ্গজেব অবধি সব মুঘল বাদশার শিলমোহর রয়েছে সে-পুথির পাতায়। রয়েছে জাহাঙ্গীর আর শাজাহানের স্বাক্ষরও। হুমায়ুন বাবার মতোই পুথি-প্রেমিক ছিলেন। দিল্লিতে তিনি পুথি লেখাবার জন্য চিত্রশালা বসান। হারানো পুথির বাক্স খুঁজে পেয়ে তিনি এমন আনন্দিত যেন হারানো রাজ্য হাতে পেয়েছেন। সবাই জানেন, এই পুথি-প্রেমিকের মৃত্যু শের শাহর তৈরি পুরনো কেল্লার একটি বাড়ির সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে। সেই বাড়িতেই ছিল তাঁর পুথিশালা।

পুথির সুবর্ণযুগ আকবরের আমলে। হুমায়ুন কয়েকজন ইরানি শিল্পীকে ভারতে এনেছিলেন। আকবর আগ্রায় জড়ো করলেন ভারতের নানা এলাকার দশ শিল্পীদের। গুজরাতি, লাহোরি, রাজস্থানি, কাশ্মীরি—কে নেই তাঁর স্টুডিওতে। প্রথম বই 'তুতিনামা'-য় (১৫৬০ খৃ.) বলতে গেলে সারা ভারতের স্বাক্ষর। তার পর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে শুরু হল বৃহৎ উদ্‌যোগ—'হামজানামা'। চোদ্দো খণ্ডের বিশাল পুথি। প্রতি খণ্ডে ছবি ছিল একশো খানা। কাপড়ে আঁকা। লেখা অবশ্য কাগজে। তবে সে-কাগজ কাপড়ের ওপর সাঁটা। অন্তত একশো শিল্পী কাজ করেছেন এই একখানা বইয়ের জন্য। শেষ করতে সময় লাগে দীর্ঘ পনেরো বছর। প্রধান শিল্পী ছিলেন মীর সৈয়দ আলি। পয়গম্বরের খুল্লতাত হামজা-র বিচিত্র অভিযানের কাহিনী। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ছবিই আজ লুপ্ত। খুঁজেপেতে সাকুল্যে পাওয়া গেছে নাকি মাত্র একশো ছবি।

আকবরের পুথি-লেখক এবং শিল্পীদের শতকরা সত্তর জনই ছিলেন হিন্দু। তাঁরা প্রতি সপ্তাহে বাদশাহকে চিত্রিত পুথি উপহার দিতেন। আকবর সে-সব পুথির কিছু কিছু বিলোতেন আমীর-ওমরাহদের মধ্যে। শিল্পীরা পেতেন বাদশাহী খেতাব—জারিন কলম, (সোনার কলম)। কিংবা অন্য কোনও সম্মানসূচক পদবি। মহাভারত, রামায়ণ, হরিবংশ, যোগবাশিষ্ঠ, অথর্ববেদ, লীলাবতী—অনেক সংস্কৃত পুথিকেই ফারসিতে অনুবাদ করিয়ে চিত্রিত করিয়েছিলেন এই মুঘল শাসক। অনূদিত রামায়ণ ও মহাভারত, পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি ছিল একশো পঞ্চাশটি করে। অথচ, তিনি নিরক্ষর ছিলেন। পুথি তাঁকে পড়ে শোনাতে হত। তাঁর মনের মতো পুথিগুলো তিনি যত্ন করে সাজিয়ে রাখতেন প্রাসাদের অন্দরে, খাস হারেমে।

পুত্র জাহাঙ্গীরও ছিলেন পিতার মতো পুথি-প্রেমিক। আকবর একসময় আগ্রার বদলে দরবার স্থানান্তরিত করেন লাহোরে। তাঁর স্টুডিও তখন স্বভাবতই লাহোরে। চৌদ্দ বছর সেখানে কাটাবার পর ১৫৯৮ সালে আকবর আবার আগ্রায় ফিরে আসেন। পরের বছর বাবার অনুমতি না নিয়েই যুবরাজ সেলিম চলে যান এলাহাবাদ। সেখানে তিনি ১৬০৪ পর্যন্ত ছিলেন। ১৬০৫ সালে তিনি জাহাঙ্গীর নামে সিংহাসনে বসেন। এলাহাবাদে যুবরাজ যথারীতি গড়ে তুলেছিলেন নিজের স্টুডিও। সেখানে ইরানি শিল্পীরা যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন ভারতীয় শিল্পীরাও। প্রথম দিকে তিনি ইরানি ঘরানার অনুরাগী ছিলেন। ক্রমে নব্য ভারতীয় ভাবধারার পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। জাহাঙ্গীর পিতার মতো পুথি অনুবাদে উৎসাহ বোধ করেননি। আর আকবরের মতো তিনি ব্যস্ত চিত্র-সংগ্রাহকও ছিলেন না। এলাহাবাদে তিনি ধীরেসুস্থে সম্পূর্ণ করিয়েছিলেন মাত্র তিনখানা পুথি। তার একটি 'আনওয়ার-ই সুহেইলি'। আকবর শেষ দিকে প্রতিকৃতি-চিত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন।

তিনি দরবারের আমীর-ওমরাহদের প্রতিকৃতি আঁকিয়েছিলেন। সে-সব ছবি নিয়ে অ্যালবামও তৈরি করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় তার অতি অল্পই আজ খুঁজে পাওয়া গেছে। জাহাঙ্গীরও পিতার মতোই প্রতিকৃতি আঁকিয়ে অ্যালবাম তৈরি করেছিলেন। অ্যালবামকে ওঁরা বলতেন 'মুরাক্কা'। তার দু'টি আজও রয়েছে। একটি তেহরানে, অন্যটি বার্লিনে।

জাহাঙ্গীরের স্টুডিওর শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন—আবুল হাসান, মনসুর, গোবর্ধন, বালচাঁদ, বিসনদাস, প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পী। জাহাঙ্গীর ছবিতে তাঁর চার পাশের জগৎকে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল প্রতিকৃতি, জীবনের নানা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা, নাটকীয় মুহূর্ত, জীবজন্তু, পাখি, ফুল ইত্যাদি। শিল্পী মনসুরকে দিয়ে তিনি বসন্তকালের কাশ্মীরের ফুল আঁকিয়েছিলেন। নতুন আমদানি জেব্রা, বা টার্কির ছবিও তাঁর নির্দেশেই আঁকা। আকবর আর জাহাঙ্গীর—পিতা-পুত্রের পৃষ্ঠপোষণাতেই মুঘল চিত্রকলায় সেদিন সুবর্ণযুগ।

শাহাজানও রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন সেই ঐতিহ্য। তবে অনেকটা নিয়মরক্ষার মতো। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লসকে তিনি উপহার পাঠিয়েছিলেন চিত্রিত 'গুলিস্তান'।

এতকাল ভারতীয় পুথিতে ইরান আর ভারত দুই দেশের মধ্যে ঘরানার লড়াই চলছিল। ষোড়শ শতকের শেষ দশকে পৌঁছে দেখা গেল ভারতে পুরোপুরি একটি নিজস্ব শৈলী প্রতিষ্ঠিত। ইরান, ভারতীয় এবং কিছু পরিমাণে ইউরোপীয় ভাবধারার সমন্বয়েই এই মুঘল পুথি-শিল্প। এই বিশেষ শৈলী আরও সুস্পষ্ট জাহাঙ্গীরের আমলে। এলাহাবাদে যুবরাজ সেলিম তাঁর নিজের পুথি-স্টুডিও গড়ে তুলেছিলেন। পুথি লেখা বা চিত্রিত করা ছাড়াও শিল্পীরা ছবি আঁকতেন তাঁর জন্য। সে-সব ছবি দিয়ে জাহাঙ্গীর তৈরি করেছিলেন 'মুরাক্কা' বা অ্যালবাম। তাঁর নির্দেশ ছিল ছবিতে বাস্তবকে ধরতে হবে, যিনি যেভাবে পারেন। মুসলিম চিত্রকলার ইতিহাসে সে-ই প্রথম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়জয়কার। শাজাহানের ঝোঁক ছিল পুথি নয়, স্থাপত্যের দিকে। তবু পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য রক্ষা করেছিলেন তিনি। তাতে ছেদ টানেন আউরঙ্গজেব। তিনি ছিলেন আজকের ভাষায় যাকে বলে 'ফান্ডামেন্টালিস্ট', অর্থাৎ, মৌল বা মোল্লাতন্ত্রী। তবে মুঘল-দিল্লিতে বাদশা ছাড়াও চিত্রিত পুথির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিছু অভিজাত পরিবার। তাঁরাও মাইনে-করা শিল্পী রাখতেন। তাঁদের গ্রন্থাগারের ছিটেফোঁটাই আজ অবশিষ্ট আছে। ১৭৩৯ সালে আফগান নাদির শাহের দিল্লি লুণ্ঠন। লুঠের তালিকায় ছিল অনবদ্য সব পুথিও। সংখ্যায়ও নিশ্চয় ছিল অনেক। কেননা, এক বাদশাহী পুথিশালেই পুথি ছিল চব্বিশ হাজার।

আগেই বলা হয়েছে পুথি শুধু রাজধানীর বিলাস ছিল না। সব যুগেই দেখা যায় পুথি লেখা হচ্ছে দেশ জুড়ে নানা কেন্দ্রে। মুঘল যুগও ব্যতিক্রম নয়। তবে মঠ-মন্দিরের পাশাপাশি আবির্ভূত হয়েছেন অন্য পৃষ্ঠপোষকের দল, সামন্ত প্রভুবর্গ। দিল্লির পাশাপাশি অতএব পুথি চিত্রিত হচ্ছে তখন রাজস্থান, কাশ্মীর, দক্ষিণ ভারত, বিহার এবং বাংলায়। এমনকী দূর সিন্ধুতেও। মুঘল চিত্রকলার সঙ্গে রাজপুত চিত্রকলার আত্মীয়তার কথা সকলের জানা। তবে পুথির ব্যাপারে রাজপুতরা একটু অন্যরকম। ওঁরা পুথিতে ছবি আঁকাতেন অনেক বেশি। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'বালকাণ্ড'-এর একটি পুথিতে দেখা যায় দু'শো বারো পাতায় দু'শো এক পাতা ছবি। যেন ছবির বই। 'ভাগবত গীতার' একটি

মুঘল দরবারের বিখ্যাত দুই চিত্রকর। লিপিকর: আবদার রহিম ও দৌলত। জাহাঙ্গীরের আমল। ১৬০৫।

রাম ও লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যার অরণ্যপথে। বাঁদররা তাঁদের দেখছে। রাজস্থানি পুথিচিত্র। উদয়পুর, ১৬৫৩।
ছাপা-বইয়ের আগে যে-বই
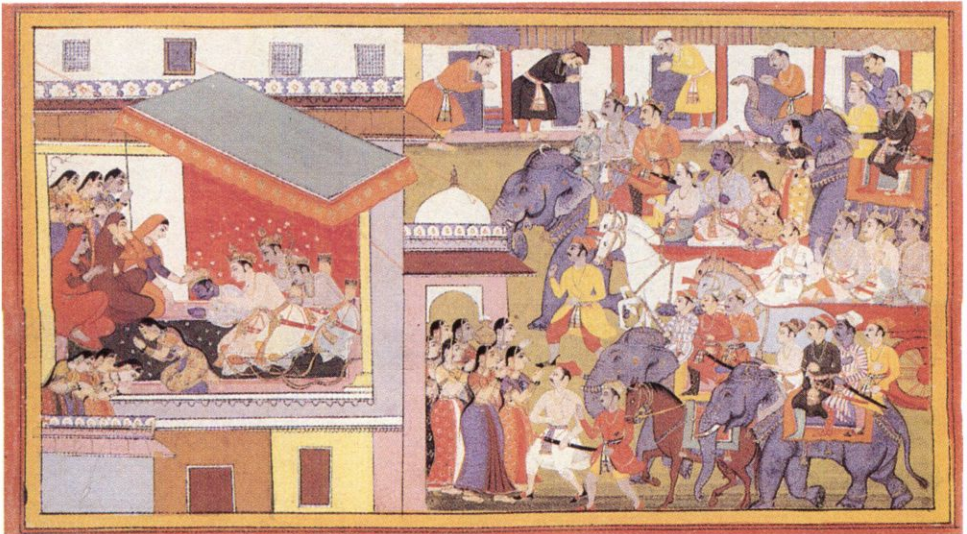
যুদ্ধকাণ্ড, রামায়ণ। রাবণকে পরাজিত করার পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরছেন। রাজস্থানি পুথি। শিল্পী সাহিব দিন। ১৬৫২-১৭০৯।

পুথিতে সাতশো দশ খানা ছবি। মহাভারতে চার হাজার খানা। তবে রাজপুতরা তখন আড়াআড়ি পুথির বদলে মুঘলদের মতো খাড়া পুথি লিখছেন। তা ছাড়া হিন্দুশাস্ত্র বা কাব্য চিত্রিত করার জন্য নির্দ্বিধায় নিয়োগ করছেন মুসলিম শিল্পী।

মুঘলদের পতনের পর দিল্লির বদলে পুথি লেখার কেন্দ্র ছড়িয়ে পড়ে ওদিকে হায়দরাবাদ গোলকুণ্ডা, এদিকে লখনউ কিংবা মুর্শিদাবাদের মতো প্রায় স্বাধীন নরপতিদের রাজধানীগুলোতে। তখন দিল্লির শিল্পীদের এঁরাই প্রধান আশ্রয়দাতা। তার মানে এই নয়, সবাই দিল্লির-কলম রোপণ করেছেন সর্বত্র। স্থানীয় আবহাওয়ার প্রভাব এড়াতে পারেননি কেউ। হায়দরাবাদের পুথিতেও অতএব দেখা যায় প্রথাগত দক্ষিণী চিত্রের প্রভাব। গোলকুণ্ডার প্রতিকৃতিতে ইউরোপের ছাপ। মুর্শিদাবাদে পুথিশালা গড়ে তুলেছিলেন আলিবর্দি। সেখানকার বিখ্যাত পুথি 'দস্তুর-ই হিম্মত' এবং 'নলদমন'। দুই পুথিতেই ইউরোপের ছায়াপাত। লেনদেন চিরকালই চলেছে। বাংলার পুথিতে রাজপুত কিংবা মুঘল শিল্পীরা যেমন প্রভাব বিস্তার করেছেন, আসামের পুথিতেও তেমনই খুঁজে পাওয়া যাবে বাংলা এবং কোচবিহারের প্রভাব। এমনকী চুনার কিংবা ওড়িশার কোনও কোনও পুথিতেও রাজপুত প্রভাব দেখা যায়। ওই দুই অঞ্চলেই একসময় ছিলেন দু'জন শৌখিন রাজপুত। তবে অষ্টাদশ শতকে যে প্রভাব ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটা পশ্চিমি। অর্থাৎ ইউরোপীয়। ষোড়শ শতক থেকেই এ দেশে তাঁরা আনাগোনা করছে। গোয়া থেকে আকবরের কাছে উপহার যেত ইউরোপীয় ছবি এবং প্রিন্ট। অনেক ইউরোপীয় স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে ছবি আঁকাতেন। কেউ কেউ পুথিও লেখাতেন। শিল্পীরা অনেক সময় কাজ করতেন বিদেশি পৃষ্ঠপোষকদের মর্জিমাফিক। কেউ কেউ সরাসরি বিদেশি চিত্রকরদের ছবির নকলও করতেন। এভাবেই ধীরে ধীরে চালু হয় যাকে ইদানীং বলা হচ্ছে 'কোম্পানি স্টাইল'। ভারতীয় শিল্পী একই সঙ্গে স্বদেশি এবং বিদেশি স্টাইলে কাজ করেছেন এমন প্রমাণও আছে। গোলাম আলি খান মুঘল-পৃষ্ঠপোষকদের জন্য যেভাবে পুথি চিত্রিত করেছেন, দেখা গেল জেমস স্কিনারের জন্য আঁকছেন অন্যভাবে।

প্রসঙ্গত পরবর্তীকালের বাংলার চিত্রিত পুথি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। মুর্শিদকুলি খান ঢাকা থেকে মুকসুদাবাদে নিজের রাজধানী সরিয়ে আনেন ১৭০৪ সালে। সেই মুকসুদাবাদ-ই মুর্শিদাবাদ। তাঁর উত্তরাধিকারী আলিবর্দি খান (১৭৪০-১৭৫৬) বলতে গেলে লখনউর নবাবের মতোই ছিলেন দিল্লির বাদশাহের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তাঁর আমলে মুর্শিদাবাদ ছিল বেশ-কয়েকজন দিল্লির আশ্রয়হীন শিল্পীদের ঠিকানা। তাঁদের সহযোগিতায় নবাবি পৃষ্ঠপোষণায় বেশ-কয়েকটি সচিত্র পুথি প্রকাশিত হয়েছিল। ছবিতে অবশ্য ইংরেজ-প্রভাবও সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্ত 'দস্তুর-ই-হিম্মত' নামে একটি পুথি। এটি এবং ওই আমলের আর-একটি চিত্রিত পুথি 'নলদমন'—মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের বাহাদুরির নমুনা হিসাবে স্বীকৃত। পুথি দুটি রয়েছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সংগ্রহে। নৈপুণ্যে এবং নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে তার সঙ্গে নাকি তুলনা হয় না সমসাময়িক লখনউ কিংবা হায়দ্রাবাদের শিল্পকর্মের। এমনকী কলকাতায় ইংরেজ প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাজা ইম্পের উদ্‌যোগ ও পৃষ্ঠপোষণায় রচিত 'রাজমনামা'-ও নাকি এক অতুলনীয় পুথি।

শাজাহানের পরে দ্রুত মুঘল স্টুডিওর বিলুপ্তি। দিল্লি-আগ্রার শিল্পীরা ছড়িয়ে পড়েন

দিকে দিকে—অযোধ্যায়, দক্ষিণ ভারতে, বাংলায়। বাংলায় বলতে মুর্শিদাবাদ তো বটেই, ওড়িশা ও অসমকেও বোঝায়। ওড়িশার চিত্রিত পুথি সম্পর্কে অনেকেই কম বেশি অবহিত। সেখানে উনিশ শতকেও রচিত হয়েছে, নয়ন-নন্দন নানা তালপাতার পুথি। তুলনায় স্বল্পজ্ঞাত অহম-কাহিনী। এই বই থেকে সংক্ষেপে তার একটা রূপরেখা।

অসমের পুথি সম্পর্কে প্রথম খবর শোনা যায় সম্রাট হর্ষবর্ধনের আমলে (৬০৬-৬৪৬)। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা তাঁকে কিছু উপহার পাঠিয়েছিলেন। তাতে ছিল ভূর্জপত্রে লেখা চমৎকার হস্তাক্ষরের নমুনা-সমন্বিত কিছু পুথি। অসমে পুথি লেখার জন্য পরে এক অদ্ভুত ধরনের কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। তাকে বলা হত—'তুলাপাট'। তুলোর মণ্ড করে তার আঁশ দিয়ে তৈরি হত সে-কাগজ। ভাস্করবর্মার ওই উপহারের পরে অসমে বিশিষ্ট চিত্রিত পুথি স্বনামধন্য বৈষ্ণব আচার্য শঙ্করদেবের একটি জীবনী (১৪৪৯-১৫৫৮)। বলা হয় স্বর্গীয় দেবদেবীর চিত্র তিনিই এঁকেছিলেন তুলাপাটে। তার পর সে-পুথি একটি কাঠের বাক্সে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক কোচবিহারের রাজাকে। তার পর অসমের যে-সব চিত্রিত পুথির সন্ধান মিলেছে সেগুলি রচিত হয়েছে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি। যদিও তুলাপটে আঁকা নওগাঁওয়ের ভাগবতপুরাণের তারিখ বলা হয়েছে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দ। অসমের তখনকার শিল্পীরা প্রায় সবাই ছিলেন কোচবিহারের আগন্তুক। দারং এবং কোচবিহারের শাসকরা দুই-ই ছিলেন এক বংশের, সেই সুবাদে কোচবিহারের শিল্পীদের অসমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

অসমের নিজস্ব বিশিষ্ট চিত্রঘরানা গড়ে ওঠার পিছনে বাংলার শিল্পীদেরও অবদান ছিল। পাল যুগের শিল্পীরা কখনও পুবের দিকে পা বাড়াননি, এমন না ঘটারই সম্ভাবনা। বিশেষ করে ১২০০ সাল নাগাদ বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর বৌদ্ধরা অনেকে যেমন পালিয়েছিলেন নেপালে, হিন্দুরাও তেমনি নিশ্চয় আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রতিবেশী হিন্দুরাজ্য অসমে। উল্লেখ্য, অসমে মুসলিম অনুপ্রবেশ অনেক পরে। বিশেষজ্ঞরা প্রাক্-মুসলিম পর্বে অসমের পুথি-চিত্রে বাংলার সুস্পষ্ট প্রভাব চিহ্নিত করেছেন। যদিও ওইসব পুথির অধিকাংশই ছিল বৈষ্ণব শাস্ত্র এবং মঠ-সম্পর্কিত তবু অসমের শৈব/শাক্ত রাজা রুদ্র সিং (১৬৯৬-১৭১৪) তার পৃষ্ঠপোষণা করতে ইতস্তত করেননি। তাঁর পরবর্তী শাসক শিব সিংহ-এর (১৭১৪-৪৪) আমলে লিখিত হয় 'গীতগোবিন্দ' পুথি। সে-সব পুথিতে বাংলাব প্রভাব থাকলেও ক্রমে স্থানীয় পরিবেশের ছাপও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওই আমলের আর-একটি পুথি 'আনন্দলহরি' (১৭৩০)।

অসমের শাসকরা দীর্ঘকাল মুঘলদের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা প্রতিহত করেছেন। অবশেষে ১৬৬২ সালে মিরজুমলা এক অভিযানে রাজধানী গরগাঁও দখল করেন। অসমরাজ বাধ্য হন মুঘল বাদশাকে কর দিতে। পরবর্তী দুই দশকে অসমরাজ অবশ্য মুঘলদের হাত থেকে নিজেদের রাজত্ব উদ্ধার করতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁরা শেষরক্ষায় ব্যর্থ হন। ১৬৮১ সালে অসম মুঘল আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, অসমে মুঘল-অভিযানে একজন সেনাপতি ছিলেন—অম্বরের রাজা রাম সিং। ১৬৭৬ সালে তাঁকে যখন অসম থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তখন তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন অসমের বেশ-কিছু চিত্রিত পুথি। সেগুলো এখনও রয়েছে অম্বরের (জয়পুরের) রাজকীয় সংগ্রহশালায়। সেগুলো লেখা হয়েছে লালচে *'সাঞ্চিপাটে'*, পাতার ধারে ধারে সুন্দর 'পার্শ্বচিত্র' বা মণ্ডন-অলংকরণ।

সার কথা এই যে, মুঘলদের অসমে আধিপত্য বিস্তারের উদ্‌যোগের সূত্রে অসমের সামনে বাইরের দরজা না হোক, জানালাগুলো খুলে যায়। বহিরাগত শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটে স্থানীয় পুথির পরিমণ্ডলে। অনুমান মিরজুমলাই দিল্লি থেকে কিছু শিল্পী নিয়ে এসেছিলেন অসমে। তাঁরা সেখানেই থেকে যান। ফলে রুদ্র সিংহ-এর রাজত্বকালে দেখা যায় রাজকীয় পোশাকে দিল্লির দরবারি স্টাইল। পরবর্তী রাজা শিব সিং এবং তাঁর চার রানির উৎসাহে, বলতে গেলে অসমের সাহিত্য ও শিল্পে সৃজনশীলতার তরঙ্গ। অসমের বেশ-কিছু চিত্রিত পুথি ওই আমলের। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণায় কবিচন্দ্র চক্রবর্তী বৈষ্ণব 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' অনুবাদ করেন অসমিয়ায়। তাঁর প্রেরণা ছিলেন প্রথম রানি রত্নকান্তি। দ্বিতীয় রানি ফুলেশ্বরীর উৎসাহে রচিত হয় তান্ত্রিক পুথি—'আনন্দলহরি'। এই রানি ছিলেন অসমে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে অতিশয় উৎসাহী এবং প্রেরণাময়ী। ১৭৩১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর রাজা বিয়ে করেন তাঁরই দূর সম্পর্কিত বোন রানি অম্বিকাকে। তাঁর প্রেরণায় রচিত হয় বিখ্যাত 'হস্তিবিদ্যার্ণব' বা হাতি সম্পর্কিত বিশাল পুথি। লেখক— সুকুমার বরকাথ। রচনাকাল—১৭৩৪। দু'বছর পরে (১৭৩৬) প্রকাশিত হয় কবিচন্দ্রের 'ধর্মপুরাণ'। এই পর্বের আরও কিছু কিছু সচিত্র পুথি অতীতের সাক্ষী হয়ে এখনও রক্ষিত আছে নানা সংগ্রহশালায়। পুথি লেখা হয়েছে সাধারণত ভূর্জপত্রে বা গাছের ছালে, সুন্দর হস্তাক্ষরে। কখনও কখনও লিপিকররা নিজেরাই শিল্পী। ছবিতে শুধু মুঘল পোশাক, বাংলার স্থাপত্যরীতি নয়, এমনকী রয়েছে রাজা-রানিদের প্রতিকৃতি পর্যন্ত। কিন্তু অসমের পুথির চিত্রাবলিতে নিজস্বতার ছাপ সর্বত্র। আদি লৌকিক পুথির সঙ্গে কখনও শিল্পীরা মুখোমুখি হয়েছেন প্রাচীন ভারতীয় পুথির ধারার সঙ্গে, কখনও পালযুগের বাংলার চিত্রশিল্পের সঙ্গে, কখনও মুঘল দরবারি ছবির সঙ্গে, এমনকী অসমের শেষ রাজা পুরন্দর সিং-এর (১৮১৮ এবং ১৮৩২-৩৮) তিরোভাবের পর ছবিতে ইউরোপিয়ানদের আবির্ভাব ঘটলেও, অসমে বাংলার মতো কোনও 'কোম্পানি স্কুল' গড়ে ওঠেনি, অসমিয়া ঘরানা শেষ পর্যন্ত অসমিয়াই থেকে গেছে। দৃষ্টান্ত ১৮৩৬ সালে লিখিত ও চিত্রিত 'ব্রহ্মখণ্ড'। তাতে ব্রিটিশ সৈন্য এবং ইংরেজবাহিনীর পোশাক-পরা ভারতীয় সিপাহিরা রয়েছে, তবু ছবির স্টাইল একান্তভাবেই অসমীয়।

সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত পুথির ইতিহাস অতএব বিচিত্র। শুধু চিত্রকলায় নয়, পুথির উপাদান, চেহারা, বাঁধাই—সব-কিছুতে খুঁজে পাওয়া যায় দেশ-বিদেশের রকমারি ধারা। সমাজে যেমন, পুথিতেও তেমনই সংঘাত, সমন্বয়। সেদিক থেকে বিচার করলে পুথির ইতিহাস ভারতের সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতার ইতিহাসও বটে। সেই ইতিহাসকেই দর্শকদের সামনে মেলে ধরার চেষ্টা করেছেন লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ। 'ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল' বা ভারত উৎসব উপলক্ষে যে-সব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে তার মধ্যে একটি পুথি প্রদর্শনী। নিজেদের ভাণ্ডার ছাড়াও বিশ্বের নানা গ্রন্থাগার থেকে ধার করে এনে ব্রিটিশ লাইব্রেরি যে প্রদর্শনী সাজিয়েছেন তাতে পুথি আছে মাত্র একশো চল্লিশ খানা। কিছু ওঁরা সংগ্রহ করেছেন এ-দেশ থেকেও। তবে কলকাতা থেকে একখানাও নয়। তার মানে এই নয় যে, কলকাতায় কোনও পুরনো সচিত্র পুথির সঞ্চয় আদৌ নেই। অবশ্যই তা নয়। এশিয়াটিক সোসাইটিতে রয়েছে দুষ্প্রাপ্য চিত্রিত বৌদ্ধ পুথি, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মুর্শিদাবাদের অত্যন্ত মূল্যবান দুটি পুথি। এমনকী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

আশুতোষ মিউজিয়ামে রয়েছে বিষ্ণুপুর এবং মেদিনীপুরের কিছু সচিত্র পুথি। আশুতোষ মিউজিয়ামের ১৭৫০ সালে আঁকা মেদিনীপুরের তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'-এর কথা লেখক নিজেও উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করেছেন বাংলার পটের কাঠের আবরণ অসাধারণ সুন্দর 'পাটা'-র কথাও।

প্রশ্ন উঠতে পারে হাজার হাজার পুথি থেকে মাত্র একশো চল্লিশখানা পুথি দেখিয়ে কি ভারতের লিখিত ঐতিহ্যকে তুলে ধরা সম্ভব? বলা বাহুল্য, ওঁরা পুথির বিষয় বা ভাব-বৈচিত্র্য নয়, দর্শকদের সামনে উপস্থিত করতে চেয়েছেন পুথি হিসাবেই পুথির বৈশিষ্ট্য। সেদিক থেকে এই প্রদর্শনী নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। যাঁদের পক্ষে এই আয়োজন চোখে দেখা সম্ভব হয়নি তাঁদের জন্য ব্রিটিশ লাইব্রেরির প্রাচ্য-পাণ্ডুলিপি বিভাগের সহকারী রক্ষক জেরোমিয়া পি লসটি উপহার দিয়েছেন একটি মনমাতানো নয়নলোভন পুথি। (দ্য আর্ট অব দ্য বুক ইন ইন্ডিয়া: জেরেমিয়া পি লসটি, ব্রিটিশ লাইব্রেরি।) এ-পুথি অবশ্য মুদ্রিত। কিন্তু চিত্রে এবং কথায় এ-বই অনায়াসে টেনে নিয়ে যায় ভারতীয় পুথির সেই আশ্চর্য ভুবনে। হারানো অতীত জ্বলজ্বল করে চোখের সামনে। আমরা নিমেষে চলে যাই মহীপাল কিংবা জাহাঙ্গীরের যুগে। পাঠক এই যদি দক্ষিণ ভারতে, এই তবে পশ্চিমে, পরক্ষণেই হয়তো অসমের পুথি-বিলাসিনী রানিদের সামনে। বিচ্ছিন্নভাবে ভারতের চিত্রিত পুথি নিয়ে অনেক আলোচনাই হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র কিংবা মুনশী আবদুল করিম থেকে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী অনেকেই পুথির মূল্যবান তালিকা রচনা করেছেন। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য একক চেষ্টায় রচনা করেছেন বাংলা পুথির তালিকা-সমন্বয়। দেশবিদেশে যত বাংলা পুথির সন্ধান মিলেছে যতীন্দ্রমোহন তালিকাবদ্ধ করেছেন।

অন্যত্র অন্যরা হয়তো কেউ কেউ বিশেষ পুথির চিত্রাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন। পালযুগের চিত্রাবলী নিয়ে বাংলায় গভীর এবং রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন সরসীকুমার সরস্বতী, কিন্তু লসটি যা করেছেন তার ব্যাপ্তি বিশ্লেষণ এবং বিচার আমাদের বিস্ময়ে বিস্ময়াভিভূত করে। ভারতের পুথিকে তিনি স্থাপন করেন এই উপমহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর পটভূমিতে। সেখানে শুধু নেপাল বা ইরান নয়, মধ্য এশিয়াও অন্তর্ভুক্ত। যেভাবে অবলীলাক্রমে তিনি ভারতের পুথিশিল্পে আঞ্চলিক ঘরানাগুলো সনাক্ত করেন এবং পাঠক-দর্শকের হাতে ধরিয়ে দেন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সূত্রগুলো তা সত্যিই চমকপ্রদ। প্রসঙ্গত পূর্বাঞ্চল তথা বাংলার পুথির ঐতিহ্য এবং ধারাবাহিকতার যে ইতিবৃত্ত তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাও উল্লেখযোগ্য। পালযুগ থেকে পলাশি— কত ধারাই না এসে মিলেছে এই বাংলায়। এখন থেকে বায়ু কখনও পূর্বমুখী, কখনও বা পশ্চিমের দিকে। সে-ইতিহাসই বা আমরা লিখতে পারলাম কই। বিদেশি গবেষক পথের নিশান ধরিয়ে দিলেন. তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা আমাদের অভিভূত করে। পুথি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল পণ্ডিত হয়তো আমাদের দেশেও অনেকে আছেন। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সামগ্রিকতা দৈবাৎ চোখে পড়ে। এমন নয়, এই বিদেশি পুথিবিশারদ শুধু পুথির ছবি নিয়েই চিত্রসমালোচকের মতো বিচারে বসেছেন, উপাদান, আকারপ্রকার, লিপি কিছুই তাঁর চোখ এড়ায়নি। আধুনিক বইয়ের স্টাইলে সেলাই কবে কোথায় শুরু হল, কী ধরনের সেলাই, সেটা পর্যন্ত তিনি পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর কাছেই আমরা প্রথম জানতে

পারলাম হিন্দুর পুথি প্রথম চামড়া বাঁধাই আধুনিক বইয়ের চেহারা নেয় কাশ্মীরে। এই সব খবর পরিবেশন করতে গিয়ে লসটি কোন পুথিতে কী আছে, কী তার বিষয় তাও কিন্তু সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, এই বিশেষ পুথি এখন কোথায়, খণ্ডিত হলে কোন দেশে কত পাতা আছে, তা নিয়ে কোথাও কেউ আলোচনা করেছেন কি না, কিংবা কোনও ছবি কোথাও ছাপা হয়েছে কি না, তারও সন্ধান দিয়েছেন তিনি। তাই বলছিলাম, সামগ্রিকতায় এ-বই তুলনাহীন। পুথি, বিশেষত ভারতীয় চিত্রিত পুথি সম্পর্কে এই মুদ্রিত পুথি 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা', 'চৌরপঞ্চাশিকা' কিংবা 'রাজানামা'র মতোই দীর্ঘকাল দর্শনীয় হয়ে থাকবে। এবং পুথি-রসিকদের কাছে অবশ্যপাঠ্য হয়ে।*

জেরেমিয়া পি লসটি, 'দা আর্ট অব দ্য বুক ইন ইন্ডিয়া', দ্য ব্রিটিশ লাইব্রেরি, লন্ডন, ১৯৮২।

প্রথম যখন

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ। পলাশির পরে একুশ বছর কেটে গেছে। দেওয়ানির পর তেরো বছর। সময়টা তবু শান্তিপূর্ণ নয়। ১৭৭০-এ নৈরাজ্যের আর-এক চেহারা দেখা গেছে মন্বন্তরে। মাত্র দেড় মাসের মধ্যে বাংলার তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ সে-বছর মারা যান না খেতে পেয়ে। তার পর সেই শ্মশানে শুরু হয়েছে হেস্টিংস-এর আমল। ছ' বছর আগে মাদ্রাজ থেকে গভর্নর হয়ে কলকাতায় এসেছেন ওয়ারেন হেস্টিংস। পরের বছর (১৭৭৩) লর্ড নর্থ-এর বিখ্যাত রেগুলেটিং অ্যাক্ট, কোম্পানির যদৃচ্ছ শাসনের ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের খবরদারির বন্দোবস্ত। নতুন আইন অনুসারে প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন, ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁর হাতে অনেক কাজ। এক কাজ যদি সাম্রাজ্য গড়ার, আর-এক কাজ তবে নিজের ভাবমূর্তিটিকে উজ্জ্বল করা। ১৭৭৪-এ রোহিলা-যুদ্ধ। '৭৫ থেকে চলেছে ইংরাজ আর মারাঠাদের মধ্যে লড়াই। সে-বছরই সুপ্রিম কোর্টের বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসির ঘটনা। বাঙালি-টোলায় হেস্টিংস-এর নামে সেদিন অসংখ্য প্রজার মনে নিশ্চয় অনুচ্চারিত ধিক্কার। সাহেব পাড়ায় কানাকানি আবার তদুপরি মিসেস ইমহফ-কে নিয়ে। স্বামীর সঙ্গে তাঁর তখনও বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর হয়নি। কলকাতার সাহেব-বিবিরা ভেবে পান না কীভাবে সম্বোধন করা যায় গভর্নর জেনারেলের দ্বিতীয় পক্ষকে;— 'মিলেডি হেস্টিংস', 'লেডি হেস্টিংস', না 'লেডি গভর্নেস।' হেস্টিংস অন্যভাবেও বিব্রত শাসক। রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী গঠিত কাউন্সিল প্রতি পদে তাঁর সমালোচনায় মুখর। বলতে গেলে সেখানে তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠ। বিগত বছরে তাঁর পক্ষে স্বস্তিকর ঘটনা দুটি। এক— জার্মান আদালতে ব্যারন ইমহফ-এর বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনা মঞ্জুর। দ্বিতীয়— কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মনসন-এর মৃত্যু। অস্বস্তিকর স্মৃতি— জুনে আর-এক সদস্য ক্লেভারিং-এর সেই চিঠিটি। গভর্নর জেনারেল পতদ্যাগ করেছেন এই অজুহাত দেখিয়ে ক্লেভারিং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেল্লার চাবি দাবি করেছিলেন তাঁর কাছে।

'৭৮-এর কলকাতা অতএব ডানিয়েল-হজেস কিংবা অষ্টাদশ শতকের শেষদিককার ইউরোপীয় চিত্রকরদের আঁকা ছবির মতো শান্তিপূর্ণ নয়। বাইরে ঝড়। সে-বছরই শুরু

হয়েছে দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ। ঝড় প্রতিদিন কাউন্সিল হাউসের ভেতরেও। তারই মধ্যে জানুয়ারির ৯ তারিখে গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের সামনে পেশ করলেন একটি মুদ্রিত বইয়ের আংশিক নমুনা। তিনি জানালেন— বইটি একটি বাংলা ব্যাকরণের নমুনা। এটি লিখেছেন মিঃ হালেদ। ছাপতে চাইছেন মিঃ উইলকিনস। তাঁর মতে এই প্রশংসনীয় উদ্‌যোগ বোর্ডের পৃষ্ঠপোষণার দাবি রাখে। এ-কাজে ইতিমধ্যেই প্রভূত পরিশ্রম ছাড়াও বেশ-কিছু অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। বোর্ড যদি তার উপযোগিতা স্বীকার করেন তবে নিশ্চয়ই তাঁরা সে-অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নেবেন। ইত্যাদি।

সে-বছরই ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখে হেস্টিংস এক দীর্ঘ 'মিনিট' পেশ করেন কাউন্সিলের দরবারে। বক্তব্য : গত মাসে একটি বইয়ের পৃষ্ঠপোষণায় সম্মত হওয়ার জন্য আমি বোর্ডের কাছে সুপারিশ করেছিলাম। কারণ, আমার ধারণা এ-বই রাজকর্মচারীদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। তখন আমি নমুনা হিসাবে বইটির অংশবিশেষ পেশও করেছিলাম। মোটামুটি তা প্রস্তাবিত বইয়ের অর্ধেক। 'মিনিট'-এ হেস্টিংস আরও বলেন— তাঁর ধারণা, সদস্যরা তাঁর সঙ্গে একমত হবেন এ-বই শুধু কাউন্সিলের উৎসাহ নয়, সরকারি আর্থিক আনুকূল্য লাভেরও দাবি রাখে। বইটির লেখক এবং মুদ্রাকরকেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন হেস্টিংস। বলেছেন— তাঁদের কৃতিত্ব প্রশ্নাতীত। এ দেশে এ-জাতীয় উদ্‌যোগ এই প্রথম। একমাত্র দীর্ঘদিনের অনুশীলন এবং ধাপে ধাপে উন্নয়নের ফলেই যা সম্ভব ওঁরা প্রথম উদ্‌যোগেই সেই উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। নিজের পৃষ্ঠপোষণার কথাও গোপন রাখেননি হেস্টিংস। বলেছেন— উদ্যোক্তাদের তিনি সাধ্যমতো সাহায্য করেছেন। বস্তুত কাজটি শুরু হয়েছে তাঁরই পরামর্শে এবং অনুরোধে। এ-কাজে অনেক বাধাবিঘ্ন পার হতে হয়েছে ওঁদের, খরচও কম হয়নি। সুতরাং, তিনি মনে করেন সরকারের উচিত এই উদ্‌যোগকে অনুমোদন করা, এবং ওঁরা যে এক হাজার কপি বই ছাপতে যাচ্ছেন প্রতি কপি ত্রিশ টাকা দরে তা কিনে নেওয়া। তার পর কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে একই দামে বইগুলো বিতরণ করা। তিনি লেখক এবং মুদ্রাকরকে অগ্রিম তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্য সওয়াল করলেন। পরে যদি কোনও কারণে এই প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ নাকচ করে দেন, তার কথা ভেবে হেস্টিংস জানিয়ে দিলেন এই অর্থের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে জামিন থাকতেও রাজি।

ফিলিপ ফ্রান্সিস এবং কাউন্সিলের আর-একজন সদস্য, মি. হুইলার প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন। তবে সংশোধনী সহ। ফ্রান্সিস বললেন— এর জন্য গভর্নর জেনারেল একা ব্যক্তিগত ঝুঁকি নেবেন কেন? তিনি এই উদ্‌যোগ অনুমোদন করছেন। এ-বিষয়ে তাঁর সংশয় নেই যে, কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সও নিশ্চয়ই কাউন্সিলের পৃষ্ঠপোষণার সিদ্ধান্তটি অনুমোদন করবেন। তবু তাঁদের আগে অবহিত করা দরকার। ফ্রান্সিস প্রস্তাব করলেন—গভর্নর জেনারেলের সুপারিশের ভিত্তিতে আপাতত পাঁচশো কপি বই সরাসরি কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। বাকি পাঁচশো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রস্তাবটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার জন্য পাঠানো হোক লন্ডনে— কোম্পানির কর্তাদের কাছে।

সভায় স্থির হল তা-ই করা হবে। প্রতি খণ্ড ত্রিশ টাকা দরে সরকার পাঁচশো কপি বই প্রকাশ হওয়া মাত্র কিনে নেবেন। তার জন্য লেখক এবং মুদ্রাকরকে আগাম পনেরো হাজার টাকা দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। সেইসঙ্গে কলকাতা কাউন্সিলের বক্তব্য জানিয়ে এই বিশেষ উদ্‌যোগটি অনুমোদনের জন্য অনুরোধ পত্র পাঠানো হল লন্ডনে।

এপ্রিলের ২৮ তারিখে গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের সভায় জানালেন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে। ২৫ এপ্রিল কাউন্সিলের প্রস্তাব লন্ডনে পাঠানো হয়েছে। সেইসঙ্গে পাঠানো হয়েছে বইটির মুদ্রিত ভূমিকা এবং একশো পৃষ্ঠা।

সে-বছরই বর্ষার পরে হেস্টিংস-এর উৎসাহ এবং কোম্পানির আর্থিক আনুকূল্যে প্রকাশিত হল সেই বই। সঠিক দিনক্ষণ বলা শক্ত। তবে বইটির আত্মপ্রকাশ বর্ষার পরে সে-সম্পর্কে তর্কের অবকাশ অল্প। বইটিতে একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে এর মুখ্য অংশ বর্ষার মধ্যে ছাপা। দ্বিতীয়ত, বইয়ের পরিশিষ্টে একটি বাংলা চিঠির প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে। তাতে লেখা আছে,'শন ১১৮৫ সাল তারিখ ১১ শ্রাবণ।' হিসাব করলে ইংরেজি পঞ্জিকা অনুসারে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্ট। তৃতীয়ত, গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলকে জানিয়েছিলেন— এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ভূমিকা ছাড়াও মুদ্রিত একশো পৃষ্ঠা পাঠানো হয়েছিল বিলাতে। ভূমিকা ইত্যাদি বাদ দিলে মূল বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২১৬। সুতরাং বর্ষার মধ্যে তা ছাপা হয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব। ধরে নিতে অসুবিধে নেই বাদল পুরোপুরি ছুটি নিতে-না-নিতে একসময় রোদ ফুটেছিল বাংলার আকাশে। প্রকাশিত হয়েছিল একটি ঐতিহাসিক বই নাম যার— 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ।' লেখক— নাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ। মুদ্রাকর—চার্লস উইলকিনস। মুদ্রণ স্থান—হুগলি। খ্রিস্টাব্দ ১৭৭৮।

'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' নানা লক্ষণে এক ঐতিহাসিক বই। তার প্রকাশ আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নানা কারণে এক স্মরণীয় ঘটনা। সে-সব কথা আলোচনার আগে লেখক এবং মুদ্রাকরকে একবার মুখোমুখি দেখে নেওয়া ভাল।

নাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ অক্সফোর্ডশায়ারের এক সম্পন্ন ঘরের সন্তান। তাঁর জন্ম— ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে। জন্মস্থান—ওয়েস্টামিনিস্টার। ঠাকুর্দা নাথানিয়েল হালেদ ছিলেন শেয়ার বাজারে দালাল। বিস্তর ধন সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিনি। বাবা উইলিয়াম হালেদ ছিলেন দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের একজন ডাইরেক্টর। হালেদ মায়ের দিক থেকেও উচ্চবংশীয়। মায়ের পূর্বপুরুষদের একজন ছিলেন ক্রমওয়েল-এর কালে হাউস অব কমনস-এর স্পিকার। সুতরাং তৎকালের উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের রীতি অনুযায়ী উইলিয়াম হালেদ তাঁর তিন ছেলের মধ্যে বড় নাথানিয়েল ব্রাসিকে পাঠিয়েছিলেন হ্যারোতে। সেখানে ড. সামার-এর কাছে দশ বছর পাঠ নেওয়ার পর তাঁকে পাঠানো হয়েছিল অক্সফোর্ডে, ক্রাইস্টচার্চ কলেজে। হালেদ অক্সফোর্ডে পড়েছেন দু' বছর। হ্যারোতে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল পরবর্তীকালের বিখ্যাত নাট্যকার, হুইগ রাজনীতিক এবং বাগ্মী রিচার্ড ব্রিনসলি শেরিডন-এর (১৭৫১—১৮২৮)। অক্সফোর্ডে তিনি বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন ভবিষ্যতে বিশ্ববন্দিত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ উইলিয়াম জোন্সকে (১৭৪৬-১৭৯৪)। আনুষ্ঠানিকভাবে পড়াশুনা শেষ হয় তাঁর ১৭৭০ সনে।

হালেদ উইলিয়াম জোন্স-এর মতো প্রবাদ-তুল্য প্রতিভা ছিলেন না বটে, কিন্তু একেবারে অবহেলাযোগ্য মেধাও নাকি ছিল না, অক্সফোর্ডে থাকাকালেই তাঁর মধ্যে সাহিত্যপ্রতিভার আভাস মেলে। শেরিডন-এর সহযোগিতায় তিনি 'অ্যারিস্তেনেতোস' অনুবাদ করেন ইংরেজি

পদ্যে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে। হালেদ-এর সেটিই প্রথম বই। নামপত্রে লেখক হিসাবে ছিল 'এইচ' আর 'এস'। এইচ মানে— হালেদ, এস—শেরিডন। এই অনুবাদটি পরবর্তীকালেও বেশ জনপ্রিয় ছিল। অনেক বছর পরে (১৭৯৩) তাঁর আরও একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি লাতিন এবং ইংরাজিতে মারতিয়াল-এর অনুকরণে লেখা কিছু শ্লেষাত্মক পদ্য। বইয়ে লেখকের নাম ছিল না। কবির লক্ষ্য ছিলেন সমসাময়িক নানা ব্যক্তি। সুতরাং হালেদ নাকি বইটি শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীকালেও অজস্র পদ্য লিখেছেন তিনি। কিন্তু বই হিসাবে সেগুলো কখনও প্রকাশিত হয়নি। তাঁর অধিকাংশ কবিতার পাঠক তখন কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধু।

অক্সফোর্ডে থাকাকালেই হালেদ বন্ধু শেরিডন-এর সঙ্গে মিলে 'জুপিটার' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ড্রুরি লেনের নাট্যশালার জন্য তিনি নাকি গেরিকের সঙ্গে কথাবার্তাও শুরু করতে যাচ্ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল এতে অন্তত দু'শো পাউন্ড হাতে আসার সম্ভাবনা। উইলিয়াম জোন্সকে এক চিঠিতে পরিকল্পনার কথা জানিয়ে হালেদ এ-ব্যাপারে তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন। জোন্সও উৎসাহিত করেছিলেন তাঁকে। কিন্তু পরিকল্পনাটি আর বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। শেরিডন অবশ্য পরে প্রহসনটি সংস্কার করে তার নাম দিয়েছিলেন— 'আইক্সিয়ন'। হালেদ আর তখন তাঁর সঙ্গে নেই। তার আগেই দুই বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।

শোনা যায়, এই মনান্তরের পেছনে উপলক্ষ ছিলেন তৎকালের প্রখ্যাত গায়িকা এবং রূপসী হিসাবে বন্দিত এলিজাবেথ অ্যান লিনলে (১৭৫২-৯২)। হালেদ তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি জানতে পারেন লিনলের হৃদয়ের রাজা তিনি নন,— শেরিডন। শেরিডন প্রণয়ীর জন্য আর-এক প্রতিদ্বন্দ্বী টমাস ম্যাথুর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ক' বছরের মধ্যেই (১৭৭৩) লিনলে আর শেরিডনের বিয়ে। ততদিনে প্রেমে পরাজিত হালেদ অবশ্য সাত সমুদ্র পেরিয়ে পূর্বদেশে।

হালেদ-এর ভারত-যাত্রাকে অনেকেই মনে করেন— 'লাভারস লিপ', ব্যর্থপ্রণয়ীর পলায়নী-লম্ফ। তিনি যে তখন নিদারুণ মনঃকষ্টে ছিলেন তার ইঙ্গিত মেলে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে লেখা উইলিয়াম জোন্স-এর একটি চিঠিতে। তিনি লিখছেন— দোহাই তোমার লাতিনে লিখো। এবং খোশ মেজাজে। যে মনঃকষ্ট তোমাকে পীড়া দিচ্ছে আমাদের তা দূর করার চেষ্টা করতেই হবে।

কোম্পানির লন্ডনস্থ কর্তৃপক্ষ ফোর্ট উইলিয়ামে তাঁর নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। পদ তাঁর— 'রাইটার'-এর। তিনি মুহুরি, বা আজকের পরিভাষায় যাকে বলে— কেরানি। 'রাইটার' মাত্রই তখন পদাধিকারে সমান নন। তাঁদের মধ্যেও মর্যাদার হেরফের ছিল। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিচ্ছেন— নিযুক্ত কর্মীদের মর্যাদা তালিকার ক্রমিক নম্বর অনুসারী। দীর্ঘ তালিকায় দেখা যায় নাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ-এর স্থান নবম। সে-বছরই (১৭৭২) নভেম্বরে ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ বিলাতে কোম্পানির সদর দপ্তরে জানিয়ে দিলেন নতুন কর্মীদলের পৌঁছনোর সংবাদ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এটাও জানিয়ে দিলেন—হালেদকে নিযুক্ত করা হয়েছে ফারসি অনুবাদকের অফিসে। হালেদ কলকাতায় তখন 'রাইটার' মাত্র।

তৎকালে 'রাইটার'-এর নগদ মাইনে ছিল যৎসামান্য। শিক্ষানবিশরা পেতেন বছরে মাত্র

পাঁচ পাউন্ড। ওয়ারেন হেস্টিংস এই মাইনে নিয়েই একদিন এসেছিলেন ভারতে। তবু এই সামান্য চাকুরির জন্য সেদিন সে কী কাড়াকাড়ি, মারামারি। কারণটি বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই। এদেশে তখন পথের দু'ধারে টাকার-গাছ। ওঁরা বলতেন— 'প্যাগোডা-ট্রি'— ঝাঁকি দিলেই টাকা। কোম্পানির কর্মচারীদের পক্ষে ব্যক্তিগত বাণিজ্য তখনও নিষিদ্ধ হয়নি। তা ছাড়া উপঢৌকন তথা উৎকোচের সুযোগও অফুরন্ত। সুতরাং, পলকে তখন অনেক রাইটারই যাকে বলে আঙুল ফুলে কলাগাছ; কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে তাঁরা পাড়ি দিতেন স্বদেশে। মনে হয় হালেদ এ-ব্যাপারে খুব ভাগ্যবান নন। কেননা, ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে, অর্থাৎ কলকাতায় নামবার ঠিক এক বছর পরে একটি চিঠিতে তিনি খেদ করেছেন— সোনার ভারত ধ্বংস হয়ে গেছে। তার ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার আজ শূন্য। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি এবং যোগ্যতা বলে তিনি এমনকী ভদ্রভাবে জীবন নির্বাহের মতো অর্থও রোজগার করতে পারছেন না!

হালেদ কলকাতায় নানা সময়ে নানা ধরনের কাজ করেছেন। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি অ্যল্ডারম্যান-এর কোর্টে ছিলেন। সে-বছরই তাঁকে কোর্ট অব রিক্যুয়েস্ট-এ পাঠাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু হালেদ সম্মত হননি। তাই নিয়ে কিছু বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছিল। আপত্তির প্রধান কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন— সবে তাঁকে কোর্ট অব অ্যল্ডারম্যান থেকে ছাড়া হয়েছে। তাঁর হাতে অনেক সরকারি কাজ। তা ছাড়া আরও অনেকেই তো রয়েছেন, তবু তাঁকে নিয়ে টানাটানি করা কেন। মনে হয় হেস্টিংস-এর হস্তক্ষেপে হালেদ শেষ পর্যন্ত রেহাই পেয়েছিলেন। পরের বছর, ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে দেখি তিনি সুপ্রিম কোর্টে দোভাষীর পদপ্রার্থী। সুপ্রিম কোর্টে দোভাষী তখন বিচারপতি চেম্বার্স-এর ভাই। তিনি ছুটিতে যাচ্ছেন শুনেই হালেদ দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর কর্তৃপক্ষ চেম্বার্সকে জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা— তাঁর ভাই ফিরে না-আসা পর্যন্ত হালেদকেই যেন বহাল করা হয় দোভাষী হিসাবে। উল্লেখ্য— তার আগেই নন্দকুমারের বিচারপর্ব শেষ হয়ে গেছে। তখন সুপ্রিম কোর্টে দোভাষী হালেদ নন— ইলিয়ট। পরের বছর (১৭৭৬) নভেম্বরে দেখা যায় হেস্টিংস-এর সুপারিশক্রমে হালেদ লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডাও-এর জায়গায় 'কমিশারি জেনারেল'। হেস্টিংস প্রস্তাবটি যখন উত্থাপন করেন তখন ক্লেভারিং মন্তব্য করেছিলেন— আমরা শুনেছি মি. হালেদ ফারসি জানেন, লোকে বলে তিনি ভাল কবিও; কমিশারি জেনারেলের কাজের পক্ষে এ-সব দরকারি গুণ হলে আমি সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাতাম। তবু হেস্টিংসকে ঠেকাতে পারেননি। হতে পারে সাময়িকভাবে, তবে হালেদ যে কমিশারি জেনারেল হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

পদাধিকারে তিনি যা-ই হন-না-কেন, 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' যখন প্রকাশিত হচ্ছে হালেদ তখন বিখ্যাত ব্যক্তি। কেননা, দু' বছর আগে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে বিলাত থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত বই—'এ কোড জেন্টু লজ'। ইউরোপের বিদ্বৎমহল আলোড়িত সে-বই হাতে নিয়ে। ইতিমধ্যেই তার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। আগের বছর (১৭৭৭) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। (তৃতীয় সংস্করণ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে)। সে-বছরই (১৭৭৮) প্রকাশিত হয় ফরাসি অনুবাদ। জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয় একই বছরে। হেস্টিংস-এর নির্দেশে এগারো জন পণ্ডিতকে নিয়ে কুড়িটি হিন্দু আইনের বই অনুবাদের কাজ হালেদ শুরু করেন ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। প্রথমে সংস্কৃত পুথির সার ভাষান্তরিত

করা হয় ফারসিতে। তার পর ফারসি থেকে হালেদ সেগুলো অনুবাদ করেন ইংরাজিতে। অনুবাদ ছাড়াও তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব বইটির ভূমিকা হিসাবে মুদ্রিত একটি বিরাট প্রবন্ধ। সেটি নাকি তিনি লিখেছিলেন মাত্র পনেরো দিনে। ভূমিকার পরেই গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে যা আছে হালেদ জানিয়েছেন তা সহযোগী পণ্ডিতদের বক্তব্য। তাঁদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি এখনও চমকিত করে।

হালেদ সহযোগী হিসাবে যে পণ্ডিতদের পেয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণন্যায়ালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, সীতারাম ভট্ট, কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ এবং শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত। কুড়িটি পুথির তালিকায় ছিল : মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কীর্তিকল্পতরু, পারিজাত, বিবাদরত্নাকর, বিষাদচিন্তামণি, নীতি চিন্তামণি, ধর্মরত্ন, মনু টীকা, দয়াতত্ত্ব, ব্যবহার রত্নাকর।... যাজ্ঞবল্ক্য টীকা, মিতাক্ষরা, দায়তত্ত্ব, ব্যবহারতত্ত্ব, দায়াধিকারিকর্ম সংগ্রহ এবং রত্ন টীকা ইত্যাদি। কোনটির আলোচ্য বিষয় কী, এবং লেখক বা টীকাকার কে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া অন্যান্য টীকাকার যাঁদের উদ্ধৃত করা হয়েছে বইটিতে তাঁদের নামের একটি স্বতন্ত্র তালিকাও রয়েছে। রয়েছে ব্যবহৃত সংস্কৃত, ফারসি এবং বাংলা শব্দের একটি দীর্ঘ তালিকাও। সব মিলিয়ে এক বৃহৎ ব্যাপার। অনুবাদ শেষ হয় প্রায় দু' বছর পরে, ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। হেস্টিংস-এর সুপারিশপত্র-সহ বইটির পাণ্ডুলিপি কোর্ট অব ডাইরেক্টরস-এর হাতে পৌঁছয় ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। কোম্পানির উদ্‌যোগে সে-বছরই তার প্রকাশ। পাণ্ডুলিপির প্রাপ্তিসংবাদ জানিয়ে তাঁরা কলকাতার কর্তৃপক্ষকে লিখেছিলেন— আমরা এই দেখে অতিশয় প্রীতি হলাম যে, আমাদের জুনিয়ার কর্মীদের মধ্যে ফারসি ভাষায় এমন সুদক্ষ কেউ রয়েছেন। তাতে যথোপযুক্তভাবে উৎসাহিত করা সংগত বোধ করি।

উইলকিনস-এর 'গীতা'র ভূমিকা থেকে আমরা জানতে পারি অনুবাদে সাহায্য করার জন্য পণ্ডিতেরা কিছু নগদ পুরস্কার পেয়েছিলেন। ফরাসি অনুবাদক নাকি অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন হেস্টিংস ভয় দেখিয়ে এবং উৎকোচ দিয়ে পণ্ডিতদের বাধ্য করেছেন তাঁদের পবিত্র এবং সযত্নে গোপন রাখা শাস্ত্রাদি ইংরাজদের হাতে তুলে দিতে। হেস্টিংস অভিযোগটি অলীক বলে ঘোষণা করেছেন। বলেছেন— পণ্ডিতেরা দু' বছর ধরে দৈনিক মাত্র এক টাকা হারে দক্ষিণা গ্রহণ করেছেন, আর কিছু নয়। দিতে চাইলেও তাঁরা নিতে রাজি হননি। পরিবর্তে তাঁরা চেয়েছিলেন তিনি যেন তাঁদের টোলগুলোকে সাহায্য করেন। পরবর্তীকালে হেস্টিংস একটি চিঠিতে লিখেছেন তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেননি। অনুবাদক হিসাবে হালেদ কত পেয়েছিলেন আমরা তা সঠিক জানি না। শুধু দেখতে পাচ্ছি নতুন দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে তাঁর ওপর। এবং এবারও যথেষ্ট যোগ্যতা সহকারে তিনি সে-দায়িত্ব পালন করেছেন। 'জেন্টু লজ'-এর খ্যাতি স্তিমিত হতে-না-হতে স্বদেশবাসীর হিতার্থে তিনি তাঁদের হাতে তুলে দিচ্ছেন আর-একটি অভিনব বই— 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ।'

সে-বই ছাপা শেষ হতে-না-হতে হালেদকে দেখি আমরা তিনি ছুটির দরখাস্ত পেশ করছেন স্থানীয় কর্তাদের কাছে। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই তিনি জানাচ্ছেন— তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছে। ইচ্ছে ছিল কলকাতা থেকে দূরে কোথাও গিয়ে কিছুদিন জাহাজের জন্য অপেক্ষা করবেন। কিন্তু তা আর হচ্ছে না। কেননা, বিলেত থেকে যে-সব খবর আসছে

তাতে পারিবারিক প্রয়োজনে অগৌণে তাঁর দেশে ফেরার দরকার। ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল। এবং ছ' বছর এদেশে কাটাবার পর ভারত-ত্যাগ করলেন হালেদ। তাঁর ব্যাকরণ তখন সবে ছাপা হয়েছে। কিংবা ছাপা শেষ পর্যায়ে। দ্বিতীয় অনুমানটিও সত্য হতে পারে। কেননা, ব্যাকরণের কোনও কোনও খণ্ডে দেখা যায় একটি অতিরিক্ত শুদ্ধিপত্র যুক্ত। তার শীর্ষে লেখা— বইটি ইংল্যান্ডে পৌঁছবার পর যে-সব ভুল আবিষ্কৃত হয়েছে তার শুদ্ধিপত্র এটি। নির্দ্বিধায় বলা চলে শুদ্ধিপত্রটি হালেদ-এরই সংযোজন এবং বিলাতে ব্লকযোগে ছাপিয়ে এদেশে পাঠানো। শুধু তাই নয়, হালেদ-এর বাংলা হস্তলিপির কিছু কিছু নমুনা দেখার পর আমাদের মনে হয় এ-শুদ্ধিপত্রের লিপিকরও তিনিই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, হালেদ যদিও এসেছিলেন একা, কিন্তু ফিরেছিলেন সস্ত্রীক। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল নাকি ভারতে তিনি বিয়ে করবেন না। কিন্তু সে-পণ তিনি রক্ষা করতে পারেননি। কেউ কেউ মনে করেন সেটা ব্যাকরণের কৃতিত্ব। হুগলিতে যখন তাঁর ব্যাকরণ ছাপা হচ্ছে তখনই তাঁর সঙ্গে পরিচয় চুঁচুড়ার ডাচ-গভর্নর জোহানেস ম্যাথুস রস সাহেবের কন্যা হেলেনা লুইসা রিবোঁর সঙ্গে। পরিচয়ের পর প্রণয় এবং বিয়ে। বিয়ের সঠিক তারিখ আমরা জানি না। তবে হেস্টিংস-এর একটি চিঠি দেখে মনে হয় বিয়ে হয়েছিল ভারত-ত্যাগের আগেই। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে হেস্টিংস সার জন ম্যাকফারসনকে এক চিঠিতে লিখছেন— দোহাই তোমার, যদি পার হালেদ-এর পুস্তিকাটির এক কপি আমাকে পাঠাও। বেচারা বুড়ো রসকে আমি কথা দিয়েছি বইটি তাঁকে দেখাব। তাঁর জামাতার যোগ্যতা এবং আত্মীয়তার এমন একটি প্রমাণ পেলে নিশ্চয়ই তিনি শান্তি পাবেন। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে হালেদ বিলেতে বসে দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। একটির নাম— 'এ লেটার টু গভর্নর জনস্টোন অন ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স।' লেখক— 'ডিটেকটার'। দ্বিতীয়টির নাম— 'দি লেটারস অব ডিটেকটার অন দি সেভেনথ অ্যান্ড এইটথ রিপোর্টস অব দি লাইবেল কমিটি'। হেস্টিংস সম্ভবত প্রথমটিই চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। হালেদ ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের আগে আর ভারতে ফিরে আসেননি। সুতরাং, এই চিঠিটি থেকে বোঝা যায় বিয়ে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দের আগেকার ঘটনা।

ভারত-ত্যাগের ছ' বছর পরে হালেদরা আবার কলকাতায় ফিরে আসেন ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। সেপ্টেম্বরে দেখা যায় কলকাতায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে হালেদ এবং তাঁর স্ত্রী হাজির। দীর্ঘকাল ছুটি উপভোগ করলেও কিন্তু কোম্পানির খাতা থেকে কখনও হালেদ-এর নাম কাটা পড়েনি। দ্বিতীয়বার কলকাতায় আসার আগের বছর, ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে লন্ডন অফিস থেকে কলকাতার কর্তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়— সরকারি অনুমতি নিয়েই পরবর্তী 'মরশুম' পর্যন্ত হালেদ দেশে থেকে যাচ্ছেন। ২৮ জানুয়ারি (১৭৮৪) তাঁদের নির্দেশ— হালেদ যাচ্ছেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল হয়ে গেছে। তাঁর পদমর্যাদা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। দ্বিতীয়ত, এই ভদ্রলোক অসাধারণ প্রতিভাবান। সুতরাং আমরা মনে করি সুযোগ পাওয়া মাত্র তাঁকে রেভেনিউ কাউন্সিলের আসনে বসানো উচিত। কিন্তু পরের বছর (১৭৮৫) জানুয়ারিতে কলকাতার কর্তৃপক্ষ সখেদে জানাচ্ছেন— হালেদ পদত্যাগ করেছেন। তিনি বলছেন— তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না, দেশে ফিরে যাবেন। খুব বেশি দিন আগে তিনি এখানে আসেননি। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে তোমাদের ইচ্ছানুসারে কাজটি দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে আমরা যারপরনাই দুঃখিত। চিঠির মোটামুটি বক্তব্য অনেকটা

এইরকম। অর্থাৎ হালেদ তখন-তখনই রেভেনিউ কাউন্সিলে ঠাঁই পেলেন না; এবং আর অপেক্ষা করে বসে না থেকে তক্ষুনি ইস্তফা দিয়ে জাহাজে চাপলেন। সেই ডেনিস জাহাজটির নাম ছিল নাকি 'দি হাসার'।

শরীর যে তাঁর ভাল যাচ্ছিল না সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। প্রথমবার ফিরে যাওয়ার সময়ও দেখি তিনি বলছেন— আমার শরীর ভেঙে পড়েছে। কলকাতার জল-হাওয়া আমার মোটে সহ্য হচ্ছে না। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ছবিটি দেখলেও মনে হয় হালেদ যেন অকালে বুড়িয়ে গেছেন। মাথার বিরাট টাক, চোখও যেন কিছুটা বসে গেছে। অথচ তাঁর বয়স তখন মোটে চুয়াল্লিশ। ছবিটি দেখলে এ. ডব্লিউ. ডেভিস-এর আঁকা উইলিয়াম জোন্স-এর ছবির কথা মনে পড়ে যায়। সেই শীর্ণকায় জোন্সকে ডেভিস এঁকেছিলেন কলকাতায়, তাঁর এখানে পদার্পণের ক' বছর পরে। অথচ মাত্র ক' বছর আগে (১৭৬৯) 'রেনোল্ড-এর উইলিয়াম জোন্স' যেন অন্য মানুষ। সুতরাং, স্বাস্থ্যের অজুহাত সাজানো নয়। তবে অনেকের ধারণা ছ' মাসের মধ্যে হালেদ-এর এভাবে কলকাতা ত্যাগের পেছনে পদোন্নতির প্রশ্ন নয়, অন্য কারণ রয়েছে। কলকাতায় এসেই তিনি জানতে পেরেছিলেন হেস্টিংস পদত্যাগ করছেন। হেস্টিংস তখন কলকাতায় নেই। তিনি বেনারসে গেছেন। তাঁকে ধরতে হালেদ সেদিকে ছুটলেন। পথে মজঃফরপুর থেকে তাঁর ভারত-ত্যাগ উপলক্ষে হেস্টিংসকে পদ্য লিখে পাঠালেন তিনি। হেস্টিংস-এর চেষ্টায় অযোধ্যায় একটা কূটনৈতিক কাজের ব্যবস্থাও হল। তার পর প্রিয় পৃষ্ঠপোষক এবং মান্য বান্ধবের প্রতি আনুগত্য দেখাতে তাঁর পিছু পিছু স্বদেশের পথে। বিলেতে তখন হেস্টিংসকে ঘিরে রচিত হচ্ছে আক্রমণের ব্যূহ। আরও কিছু কিছু হেস্টিংস-অনুরাগীর মতো হালেদ-এর ইচ্ছে সংকটকালে তিনি তাঁর পাশে থাকবেন, তাঁর হয়ে লড়াই করবেন। হঠাৎ কলকাতা ত্যাগের পেছনে রহস্য নাকি এটাই।

তাঁর পরবর্তী জীবন বৃত্তান্ত এক দিক থেকে যেমন দীর্ঘ, অন্য দিকে তেমনই অতি সংক্ষিপ্ত। দীর্ঘ, কারণ হালেদ, অনেক দিন বেঁচেছিলেন। হ্রস্ব, কারণ, করুণ বিষণ্ণ হতাশায় আচ্ছন্ন সেই বছরগুলো অনেকের বিচারেই নাকি নিতান্ত নিষ্ফল। বন্ধু ইম্পের পুত্র ই. বি. ইম্পে তাঁর পিতার স্মৃতিচারণ করতে বসে হালেদ সম্পর্কে অনেক প্রশংসামূলক বাক্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর শেষ কথা : দুঃখ এই, হালেদ এমন কিছু রেখে যেতে পারেননি যা একদিন বিস্মৃতি থেকে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভাকে উদ্ধার করতে পারে। আর-একজন সখেদে লিখছেন— মানুষ ছিটগ্রস্ত হলে কী হয় তার এক বিষণ্ণ এবং স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হালেদ-চরিত্র।

দেশে ফিরে কিছুদিন যে তিনি লন্ডনে অযোধ্যার নবাবের এজেন্ট বা কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছেন তার প্রমাণ আছে সরকারি কাগজপত্রে। ১৭৮৫-১৭৯০ এই পাঁচ বছর সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর জীবন তাঁর। তিনি হার্লে স্ট্রিটে বাড়ি কিনেছেন। সেখানে তিনি সুখী সম্পন্ন স্বাধীন ইংরেজ ভদ্রলোকের জীবন যাপন করছেন। ছবি কিনছেন, বই কিনছেন, পদ্য লিখছেন, হিন্দুদের যুগ-গণনা পদ্ধতি নিয়ে মশগুল হয়ে আছেন। তার পরেই দেখি ধীরে ধীরে নেমে আসছে অন্ধকার। হালেদ তাঁর মান্য বন্ধু হেস্টিংসকে বাঁচাতে দেশে ছুটে এসেছিলেন। সেটা সম্ভব হয়নি। তাঁর প্রয়াস হেস্টিংস-বিরোধী আন্দোলনের মুখে বালির বাঁধের মতো ভেসে গিয়েছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল বুঝিয়ে বলতে পারলে শেরিডন অন্তত হেস্টিংস-এর চরিত্র-হনন থেকে বিরত হবেন। সেজন্য শেরিডনের কাছে নাকি তিনি

সওয়াল করতেও গিয়েছিলেন। কিন্তু স্কুলের-বন্ধু তাঁকে হতাশ করেন। হালেদ তখনও জানতেন না আরও হতাশা অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য।

পার্লামেন্টে সদস্য হওয়ার বাসনায় ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে লিস্টার থেকে প্রার্থী হলেন হালেদ। বিস্তর অর্থব্যয়ের পর যখন বুঝতে পারলেন হাওয়া প্রতিকূল, তখন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পরামর্শ করে সরে দাঁড়ালেন। পরের বছর অবশ্য বিজয়লক্ষ্মী ধরা দিলেন তাঁকে লাইমিংটন-এর নির্বাচনী রণাঙ্গনে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জীবন তাঁর উচ্চমধ্যবিত্তের স্বপ্নের সড়ক ধরেই এগোচ্ছে। কিন্তু হালেদ-এর বেলায় দেখা গেল পথিক অচিরেই দুর্লঙ্ঘ্য এক বাধার প্রাচীরের মুখোমুখি। রাজনীতিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের আগেই হালেদ সহসা পতিত। পতনের হেতু রিচার্ড ব্রাদার্স (১৭৫৭-১৮২৫) নামে এক হঠাৎ-অবতার, যিনি নিজেকে বলতেন ডেভিড-এর বংশধর, সর্বশক্তিমানের ভাগিনেয় অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর মুখে চমকপ্রদ সব ভবিষ্যদ্‌বাণী। ব্রিটেনে রাজতন্ত্র থাকবে না, লন্ডনে স্থাপিত হবে ইজরায়েল,—ইহুদিরাজ। ইত্যাদি। হালেদ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও তুলনামূলক উপকথা ইত্যাদি অধ্যয়ন করেছেন। 'জেন্টু লজ' অনুবাদ করতে করতে আকৃষ্ট হয়েছেন হিন্দুদের যুগ গণনা পদ্ধতি এবং অবতারবাদ সম্পর্কে। শাস্ত্রীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ বেশ-কিছুকাল ধরেই প্রবল। সেটা তাঁর অন্যতম চর্চার বিষয়। সুতরাং রিচার্ড ব্রাদার্স চুম্বকের মতো আকর্ষণ করলেন তাঁকে। তিনি কান পেতে সব শুনলেন, মনে মনে বিচার করলেন, এবং বলতে গেলে ব্রাদার্সের একজন অনুরাগীতে পরিণত হলেন। তাঁরও কথা নাকি তখন— আদম হচ্ছেন প্যান, ইভ— প্যানডোরা, আর বরাহঅবতার বিষ্ণু হচ্ছেন জগতের ত্রাতা।

ইউরোপে তখন ফরাসি বিপ্লবের উত্তেজনা। হাওয়ায় শুধু বারুদের গন্ধ নয়; মিশে আছে আতঙ্ক আর সন্দেহ। রিচার্ড ব্রাদার্স-এর উদ্দাম ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনে সরকার সতর্ক হলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে। সেটা ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ মার্চের কথা। হালেদ-এর মনে হল এ ঘোরতর অন্যায়।— ভবিষ্যদ্‌বাণী কি খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত? তার চেয়েও বড় কথা মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে না কেন এদেশে? বন্ধুদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে হালেদ মার্চের ৩১ তারিখে হাউস অব কমনস-এ উঠে দাঁড়ালেন ব্রাদার্সের পক্ষে সওয়াল করতে। টানা তিন ঘণ্টা বক্তৃতা করেছিলেন নাকি সেদিন। সাক্ষ্য দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী ইলাইজা ইম্পে। গোটা সভাকক্ষ নিস্তব্ধ, হাত থেকে আলপিন পড়লে শব্দ শোনা যায়। পার্লামেন্টে এমন বাগ্মিতা নাকি কদাচিৎ শোনা গেছে। নিশ্ছিদ্র হালেদ-এর যুক্তি। কিন্তু তাঁর সমর্থনে কেউ উঠে দাঁড়াতে সাহসী হলেন না। ফলে হালেদ-এর প্রস্তাব খারিজ। শুধু তাই নয়, চার দিকে রির্চাড ব্রাদার্স-এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়েও নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কৌতুক। তাঁর পরিবার-পরিজনেরাও ব্যাপার দেখে যারপরনাই ক্ষুণ্ণ। শোনা যায়, তাঁকে তখন উন্মাদ হিসাবে আটক করার কথাও উঠেছিল।

আহত হালেদ অতএব পার্লামেন্ট থেকে বেরিয়ে এলেন। পালিয়ে এলেন পরিচিত সমাজ থেকেও। ১৭৯৬ থেকে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি দীর্ঘ এক যুগ তিনি স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি। নির্বাসিতের জীবন তাঁর। তারই মধ্যে আর-এক বিপর্যয়। নিদারুণ অর্থকষ্ট। হালেদ তাঁর সঞ্চয়ের সর্বস্ব লগ্নি করেছিলেন ফরাসি দেশে। পরিমাণে সে-অর্থ সামান্য নয়, প্রায় তিরিশ হাজার পাউন্ড। কার্যত তা জলে গেল। হালেদ তখন সব দিক থেকেই বিপন্ন। অর্থাভাবে এ-

সময়ে তাঁকে বাড়ি বিক্রি করতে হয়েছে। দফায় দফায় বেচে দিতে হয়েছে ভারত থেকে বয়ে আনা নানা মূল্যবান পুথির সংগ্রহ। এমনকী মুদ্রিত দুষ্প্রাপ্য সব বইপত্র। উল্লেখ্য—বিক্রিত বইয়ের তালিকায় তাঁর নিজের লেখা এক কপি 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'ও ছিল।

তবু এই 'দরিদ্র অথচ গর্বিত' মানুষটি সংকল্পচ্যুত হননি। যত দিন না পূর্ণ মর্যাদাসহ আবার সমাজে ফিরে যেতে পারবেন তত দিন এভাবেই একান্তে নির্বাসিতের জীবন কাটাবেন এই ছিল তাঁর পণ। এ সময়ে তাঁর একমাত্র সঙ্গী মিসেস হালেদ। তিনি তাঁর বন্ধু, সচিব, এবং সখা। ওঁদের বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্বে নাকি আশাভঙ্গের কাহিনীও কিছু কিছু ছিল। কিন্তু এই অন্ধকার অধ্যায়টিতে আমরা দেখি মিসেস হালেদ এক উজ্জ্বল রমণী। বন্ধুরা তখনও হালেদ-এর খোঁজখবর রাখতেন। বিশেষ করে হেস্টিংস, ইলাইজা ইম্পে প্রভৃতি পুরনো কলকাতাওয়ালারা। হেস্টিংস নিয়মিত চিঠি লিখতেন ওঁকে। হালেদ-এর তরফে অধিকাংশ চিঠিরই উত্তর দিতেন কিন্তু লুসি হালেদ। তাঁর একটি চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি— তিনিই স্বামীর একটি কবিতার খাতা রক্ষা করেছেন আগুন থেকে। হালেদ নাকি অনেক লেখাই সমর্পণ করছেন তখন অগ্নিকুণ্ডে। তৎকালে অবজ্ঞার অজ্ঞাতবাসে নিক্ষিপ্ত, অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হালেদ নিজের সম্পর্কে পদ্য লিখেছেন।

অবশেষে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে মৌনভঙ্গ। সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে পলমল থেকে তদানীন্তন সেক্রেটারি অব স্টেট 'দি রাইট অনারেবল জর্জ ক্যানিং'কে যে-কোনও একটি চাকুরি প্রার্থনা করে দরখাস্ত পাঠালেন হালেদ। কোনও সুপারিশ নেই। সরাসরি একটি আবেদন-পত্র। তিন দিন পরে সে-সংবাদ জানিয়ে হেস্টিংসকে পাঠালেন নিজের হাতে লেখা এক দীর্ঘ রূপক। তার পর চিঠি লিখতে বসলেন সার ইলাইজা ইম্পের কাছে। ইম্পে ছুটে এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। হালেদ আবার সমাজে প্রত্যাবর্তন করতে চাইছেন, এ-সংবাদে সবাই আনন্দিত। তাঁর এই সিদ্ধান্তের হেতু সম্পর্কে হালেদ লিখছেন নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই তাঁকে নির্বাসিতের জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে। এই দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন তিনি অংশত আশার ওপর নির্ভর করে, অংশত গুহাবাসী ভালুকের মতো নিজের থাবা চেটে। আর পারা যায় না।

ক্যানিং চিঠির উত্তর দিলেন ২৮ সেপ্টেম্বর। এক ছত্রের সেই সরকারি চিঠির বক্তব্য তাঁকে দেওয়া যায় উপস্থিত তিনি সে-রকম কোনও কাজ দেখতে পাচ্ছেন না। এই চিঠির উপরেই তখনকার মতো হালেদ নির্মাণ করতে বসলেন আশার বাংলো। ক্যানিংকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি দ্বিতীয় চিঠি পাঠালেন। এদিকে চলল বন্ধুদের সঙ্গে শলাপরামর্শ। কিন্তু অন্ধকার সুড়ঙ্গ যেন আর শেষ হয় না। আশার আলো দেখা গেল পরের বছর জুলাইয়ে। ইন্ডিয়া হাউসে তিনটি পদ খালি আছে জেনে হালেদ আবার দরখাস্ত পাঠালেন। ১৪ জুলাই তিনি জানাচ্ছেন— ইনটারভিউ হয়ে গেছে। মি. গ্রান্ট তাঁকে জানিয়েছেন তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে আবার চাকুরি পেলেন হালেদ। পদ— চিফ অ্যাসিসট্যান্ট টু দি এক্সামিনার অব করসপনডেন্স অ্যাট ইন্ডিয়া হাউস। মাইনে বছরে ৬০০ পাউন্ড।

আবার বেপরোয়ার মতো আপন কক্ষপথে ফিরতে চাইলেন হালেদ। কিন্তু তা আর হল না। হালেদ আর যৌবনের সেই গর্বের দিন ফিরে পাননি। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, তিনি জ্ঞানের জগৎ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। বরং তার বিপরীত। চরম অন্নচিন্তার মধ্যেও দেখা গেছে হালেদ কোনও-না-কোনও বিষয় নিয়ে অন্য ধরনের চিন্তায়ও মগ্ন।

এ-চরিত্র তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত প্রসারিত। হালেদরা তখন চার্চ স্ট্রিটে বাড়ি নিয়েছেন। সেখানেও চলেছে কবিতা লেখা। কখনও বা নিবিড়ভাবে কোনও বিষয়ের চর্চা। শেষ জীবনে তিনি কানে ভাল শুনতে পেতেন না। সে-সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা একটি সনেটে।

মৃত্যু তার চোদ্দো বছর পরে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি। তখন তাঁর বয়স উনআশি বছর। তিনি শেষ নিশ্বাস ফেলেন সারে-র ওয়েস্ট স্কোয়ারে। দেহ সমাধিস্থ করা হয় পিটার্স হাম-এ পারিবারিক গোরস্থানে। নিঃসন্তান মিসেস হালেদ মারা যান আরও বছর-দেড়েক পরে। উল্লেখযোগ্য, কলকাতার সমাজ কিন্তু ইতিমধ্যে ভুলে যায়নি হালহেড সাহেবকে। এশিয়াটিক জার্নাল-এ প্রকাশিত হয়েছিল শোকসংবাদ। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর 'সমাচার দর্পণ' লিখছে '...অপর পূর্বে ভারতবর্ষে বাসকারি অন্য একজন সাহেবের মৃত্যু সম্বাদ আমারদের প্রকাশ্য হইয়াছে বিশেষতঃ ইংলন্ডদেশাগত সম্বাদপত্রে লেখেন যে হালহেড সাহেব অতি বৃদ্ধ হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনুমান হয় যে উক্ত সাহেব ইংলন্ডীয়দের মধ্যে প্রথমেই বাঙ্গালা ভাষায় সুশিক্ষিত হন এবং ঐ ভাষায় যে প্রথম গ্রামার হয় তাহা তিনিই প্রথমে প্রস্তুত করিয়া হুগলি নগরে ১৭৭৮ সালে মুদ্রিত করেন। এবং সেই পুস্তক যে বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত তাহা ভারতবর্ষে প্রথম প্রস্তুত অক্ষরেতে হয়।...'

বাঙালি পাঠকরা নিশ্চয় সেদিন মনে মনে স্মরণ করেছিলেন তাঁদের বিদেশি বৈয়াকরণকে। যাঁরা কোনওদিন তাঁর নাম শোনেননি সম্ভবত তাঁরাও।

'বেঙ্গল গ্রামার'-এর মুদ্রাকর চার্লস উইলকিনস বয়সে হালেদ-এর প্রায় সমান। জন্ম— ১৭৪৯ কিংবা ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে। সমরসেট-এর ফ্রোম-এ। তিনি ভারতে আসেন হালেদ-এর দু'বছর আগে, ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে। কর্মজীবনের শুরুতে তিনিও ছিলেন 'রাইটার' বা সামান্য মুহুরি। পরে অবশ্য কিছুটা পদোন্নতি হয়েছিল তাঁর। এক সময় উইলকিনস ছিলেন মালদহে কোম্পানির ফ্যাক্টরির সুপারিনটেনডেন্ট। উইলকিনস হালেদ-এর মতো কলেজে-পড়া আমলা ছিলেন না। এদেশে আসার আগে ছাপাখানার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগের কথাও জানা যায় না। মায়ের দিক থেকে তিনি তৎকালের বিখ্যাত খোদাই শিল্পী রবার্ট বেটম্যান উইরি-র সম্পর্কিত, এই যা। তবু উইলকিনস এক আশ্চর্য কীর্তিমান পুরুষ। এদেশে এসে তিনি বাংলা শিখেছিলেন, ফারসি শিখেছিলেন, অবশেষে হালেদ-এর উৎসাহে এক সময় শুরু করলেন সংস্কৃত শিখতে। সেটা 'বেঙ্গল গ্রামার' প্রকাশিত হওয়ার সময়কার কথা। উইলকিনস নিজেই লিখেছেন— সংস্কৃতের প্রতি তাঁর কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল বন্ধু হালেদ-এর দৃষ্টান্ত। ক'য়েক বছরের মধ্যেই দেখা যায় তিনি সংস্কৃতে সুদক্ষ। ১৭৮৪ সনে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠায় তিনি সার উইলিয়াম জোন্স-এর অন্যতম সহযোগী। তার এক বছর পরেই প্রথম সংস্কৃত থেকে সরাসরি ইংরাজিতে অনুবাদের কৃতিত্বে তিনি স্বনামধন্য। ক'পুরুষের মধ্যে আর কোনও ইউরোপিয়ান এমন বাহাদুরি দেখাতে পারেননি— মন্তব্য করেছেন একজন। উইলিয়াম জোন্সও স্বীকার করেছেন— উইলকিনস না থাকলে তাঁরও সংস্কৃত শেখা হত না। শুধু তাই নয়, ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম জোন্স মনুসংহিতার যে ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন তার তিন ভাগের এক

ভাগই অনুবাদ করেছিলেন উইলকিনস। উইলকিনস-এর ওপরই ভার দিয়েছিলেন তিনি 'কামদেবের প্রতি প্রার্থনা-গীতি' সংশোধনের জন্য।

উইলকিনস 'ভগবদ্‌গীতা' ছাড়াও সংস্কৃত থেকে আরও কিছু কিছু বিষয় অনুবাদ করেছেন। তালিকায় আছে—'হিতোপদেশ' (১৭৮৭) এবং 'স্টোরি অব শকুন্তলা' (১৭৯৩)। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি রিচার্ডসনের 'ফারসি-আরবি-ইংরেজি অভিধান'-এর একটি নতুন সংস্করণ বের করেন। দু'বছর পর (১৮০৮) প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ,— গ্রামার অব দি স্যাংস্ক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ। তার সাত বছর পরে (১৮১৫) সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত আরও একখানি বই— র‍্যাডিক্যালস অব দি স্যাংস্ক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ।

শুধু তাই নয়, ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে উইলকিনস অপ্রচলিত নাগরী লিপির পাঠোদ্ধার করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। দেবনাগরীর সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও লিপিই নাকি অতঃপর আর তাঁর কাছে দুর্বোধ্য নয়। এশিয়াটিক সোসাইটি-কর্তৃক প্রকাশিত বিখ্যাত এশিয়াটিক রিসার্চেস-এর প্রথম দিককার খণ্ডগুলোতে লেখা তাঁর পাঁচটি রচনার মধ্যে চারটির বিষয়বস্তুই লিপি। প্রথমে যে লিপির তিনি মর্মোদ্ধার করেন সেটি কুটিলা লিপিতে লেখা দেবপালের মুঙ্গেরলিপি। বলা হয়, তার পাঠোদ্ধারের ফলেই পরবর্তীকালে গুপ্তযুগের ব্রাহ্মীর পাঠোদ্ধার কিছুটা সহজ হয়ে যায়। সুতরাং, উইলকিনস সর্বসম্মতভাবেই প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের অগ্রণী পুরুষ।

তাঁর জীবন সব দিক থেকেই সফল এবং সার্থক। তিনি দেশে ফিরে যান হালেদ-এর এক বছর পরে, ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে। তার পর বাথ-এ নিজের বাড়িতে বসে নিভৃতে সংস্কৃতচর্চা। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কোম্পানির কর্তারা স্থির করলেন তাঁদের বিভিন্ন বাড়িতে এবং গুদামে যে-সব পুথিপত্র এবং 'কৌতূহলোদ্দীপক দ্রব্যাদি' রয়েছে সেগুলো নিয়ে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে। পুথিপত্রের বেশির ভাগই সংগৃহীত হয়েছিল শ্রীরঙ্গপত্তমে টিপুর পরাজয়ের পর। যা হোক, এডোয়ার্ড প্যারির সুপারিশক্রমে উইলকিনস নিযুক্ত হলেন কোম্পানির পুথিশালার প্রথম গ্রন্থাগারিক। বার্ষিক মাহিনা এক হাজার পাউন্ড। সেই ভ্রূণ থেকেই পরবর্তীকালের বিখ্যাত ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি। মৃত্যুকাল পর্যন্ত উইলকিনস এই পদেই আসীন ছিলেন। সেইসঙ্গে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে হেলিবারিতে কোম্পানির কলেজে তিনি অবশ্য পরীক্ষক এবং পরিদর্শকের কাজও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তার অনেক আগেই, ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে রয়াল সোসাইটি তাঁকে ফেলো মনোনীত করেছেন। মৃত্যুর তিন বছর আগে শিরে তাঁর আরোপিত হয়েছে 'নাইটহুড'। সার চার্লস উইলকিনস-এর মৃত্যু ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে। তাঁর দুই বিয়ে। তিন কন্যা।

তাঁর সম্পর্কে একজনের মন্তব্য : উইলকিনস-এর মতো সৌভাগ্যবান অতি অল্পই দেখা যায়। সবই ছিল তাঁর— সুস্বাস্থ্য, খ্যাতি, যোগ্যতা। পরিবার-পরিজনের সেবাযত্ন পেয়েছেন তিনি, স্ত্রীর ভালবাসা পেয়েছেন, পেয়েছেন বন্ধুদের সাহচর্য। এমন সুখের জীবন ক'জনের মেলে।

উইলকিনস-এর আর-এক পরিচয় তিনি আমাদের ক্যাক্সটন। 'ক্যাক্সটন অব ইন্ডিয়া।' তাঁর সম্পর্কে পদ্যও লিখেছেন একজন।

হালেদ তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় উইলকিনস-এর কৃতিত্বের কথা সবিস্তার আলোচনা

করেছেন। উইলকিনস সেদিন যেন চতুর্ভুজ বিশ্বকর্মা। একাধারে তিনি 'ধাতুবিদ্যা বিশারদ, খোদাই শিল্পী, ঢালাইকর এবং মুদ্রাকর।' এজন্য তাঁকে শুধু মস্তিষ্ক নয়, হালেদ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, শারীরিক পরিশ্রমও করতে হয়েছে। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা মনে করেন এ-কাজে তিনি সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন পঞ্চানন নামে একজন কুশলী বাঙালি কারিগরকে। পঞ্চানন নিশ্চয়ই কোনও কাল্পনিক কারুশিল্পী নন। ক'বছরের মধ্যেই দেখা যায় শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে তিনি যথার্থই বিশ্বকর্মার ভূমিকায়। অপুত্রক পঞ্চানন এই নবীন বিদ্যার উত্তরাধিকার অর্পণ করেছিলেন তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকারকে। মনোহর নিঃসন্দেহে বাংলা হরফ শিল্পের ইতিবৃত্তে পঞ্চাননের আর-এক স্মরণীয় অবদান। গিলখ্রিস্ট ব্যাকরণ ছাপা প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন শেফার্ড নামে একজন শিল্পীকে। বস্তুত শেফার্ডও কোনও কাল্পনিক অস্তিত্ব নন। আমরা একজন জোসেফ শেফার্ড-এর সন্ধান পেয়েছি যিনি ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে চৌত্রিশ বছর বয়সে কলকাতায় মারা যান। দক্ষিণ পার্ক স্ট্রিটে তাঁর কবরের ফলকে লেখা আছে শেফার্ড 'এনগ্রেভার' ছিলেন। হতে পারে পঞ্চাননের মতো তিনিও সত্যই উইলকিনসকে সাহায্য করেছিলেন। তাতে কিন্তু উইলকিনস-এর কৃতিত্ব বিন্দুমাত্র খর্ব হয় না। তিনি যে ধাতব হরফ তৈরির কাজে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ ভূরি ভূরি। হালেদ-এর ব্যাকরণে বাংলা লিপি ছাড়াও কিছু কিছু আরবি বা ফারসি লিপিও রয়েছে। ব্লকযোগে মুদ্রিত বাংলা চিঠির তলায় খোদাইকারী হিসাবে রয়েছে স্বয়ং উইলকিনস-এর স্বাক্ষর। মুদ্রাকরের নাম ধাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখিত না হলেও নির্দ্বিধায় ধরে নেওয়া যায় 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'-এ ব্যবহৃত বাংলা এবং আরবি হরফের সৃষ্টিকর্তা চার্লস উইলকিনস। হালেদ অহেতুক বন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ নন, বইটির মুদ্রাকরও উইলকিনস।

ধাতুর হরফ তৈরির কাজে উইলকিনস-এর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সাক্ষী বালফোর-এর 'ফরমস অব হারকেরু' বা হরকরা। অনেকেই বলেছেন ফারসি বইটির হরফ উইলকিনস-এর গড়া। আরবি ফারসি হরফ তৈরি সম্পর্কে একজন বাঙালি ঐতিহাসিক লিখেছেন—'পারসী ও আরবী অক্ষরের ছেনী কলিকাতাস্থ সিমুলিয়া নিবাসী রাধামোহন কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তিই প্রস্তুত করেন। ঐ ব্যক্তির ৬০ কিম্বা ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। পারসীর তিন প্রকার ছাঁদ: যথা, মৌলবী আপ্তাবুদ্দী, এলাদাদী এবং মহানন্দী। তন্মধ্যে মহানন্দী ছাঁদ অধিকাংশ লোকের মনোনীত। মহানন্দ নামক একজন পণ্ডিতের হস্তলিখিত সুছাঁদ দৃষ্টে ইহার সৃষ্টি হয়, তজ্জন্য ইহা তাঁহারই নামে খ্যাত। উক্ত অক্ষরের ছেনী সংখ্যা ২৫০। আরবী অক্ষরও রাধামোহন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আরবীর ছেনী সংখ্যা দুই শত।' রাধামোহন কবেকার মানুষ, কিংবা কার ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আমরা সঠিক জানি না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে জানাচ্ছেন—ফারসির জন্য 'নাস্তালিক' হরফ প্রথম তৈরি করেন উইলকিনস। অনেক দিন পর্যন্ত সকলে সে-হরফই ব্যবহার করেছেন। সৌন্দর্যে সেগুলো এমনই অনুপম যে তার কোনও সংস্কারের কথা ভাবাই যায় না।

হরফ তৈরির ব্যাপারে উইলকিনস-এর আর-এক কৃতিত্ব দেবনাগরীর শাট তৈরি। দেবনাগরী শাট তৈরির বাসনা তাঁর অনেক দিনের, এদেশে থাকাকালেই। কিন্তু সময় এবং সুযোগ আসে দেশে ফেরার পর। সেখানেও ইচ্ছেমতো সাফল্য জোটেনি তাঁর ভাগ্যে। সামনে সহসা দেখা দেয় বিপর্যয়। তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূমিকায় তিনি বিস্তারিত

সে-কাহিনী বিবৃত করেছেন। বাথ-এর বাড়িতে বসে অবসরে তিনি দেবনাগরীর এক শাট তৈরি করেন। সাহায্যকারী বলতে ছিল গ্রামের সাধারণ কারিগররা। তাঁদের সহযোগিতায় তিনি বইটি ছাপাবার সব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ করেন। এমন সময় হঠাৎ বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড। আগুনে সব ছাই হয়ে যায়, কোনও মতে বেঁচে যায় শুধু হরফের ছাঁচ। কোম্পানির কর্তৃপক্ষের উৎসাহে এবং পৃষ্ঠপোষণায় আবার তিনি নতুন করে ঢালাই শুরু করেন, এবং তৈরি হরফ পাঠিয়ে দেন লন্ডনের ছাপাখানায়। তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণ সে-হরফেই ছাপা। বইটিতে দেবনাগরী হরফের সুন্দর কয়েকটি প্লেট আছে। তলায় লিপিকর হিসাবে উইলকিনসের স্বাক্ষর। উইলকিনসকে অতএব শৌখিন হরফ-শিল্পী বলা যায় না। কৃতিত্ব তাঁর ক্যাক্সটন-এর চেয়ে কম নয়, বরং কিছু বেশিই।

শুধু তাই নয়, উইলকিনস কলকাতায় প্রথম সরকার-সমর্থিত ছাপাখানার পরিচালক। তাঁকে বলা হয় পরবর্তীকালের 'কনট্রোলার অব প্রিন্টিং'-এর আদিপুরুষ। শ্রীরামপুরের মিশনারিদের ধারণা হুগলিতে যে ছাপাখানায় হালেদের ব্যাকরণ ছাপা হয় তার পরিচালক ছিলেন মি. অ্যানড্রুজ নামে একজন বইয়ের কারবারি। সেটা অনুমানমাত্র। আসল ঘটনা অন্য রকমও হতে পারে। হেস্টিংস-এর একজন জীবনীকার লিখেছেন— ছাপাখানাটি ছিল হালেদের ব্যক্তিগত ছাপাখানা। এই উক্তির ভিত্তি কী, সেটা খুব স্পষ্ট নয়। তবে হুগলির ওই ছাপাখানার যে হালেদ কিংবা উইলকিনস-এর কর্তৃত্ব ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প। ছাপাখানার প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহের কথা মনে রাখলে বিশ্বাস করার প্রবণতা জন্মায়, আসলে হয়তো উইলকিনসই ছিলেন তার মালিক। লক্ষণীয়, ব্যাকরণ ছাপার জন্য সরকার টাকা দিয়েছেন হালেদ-উইলকিনস জুটিকে, অ্যানড্রুজ নামে কোনও মুদ্রাকরকে নয়। তা ছাড়া, ব্যাকরণ ছাপা শেষ হতে-না-হতে আমরা দেখি উইলকিনস সরকারের কাছে এক পরিকল্পনা পেশ করছেন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি কি তখন নিছক নিধিরাম সর্দার?

উইলকিনস তাঁর যোজনার খসড়া পেশ করেন ১৭৭৮ সনের ১৩ নভেম্বর। তাতে বলা হয়েছে তাঁর পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হলে এক পৃষ্ঠা ইংরেজি ছাপতে সরকারের খরচ পড়বে ৩ টাকা, এ-পিঠ ও-পিঠ ছাপলে ৫ টাকা। বাংলা আর ফারসি ছাপতে হলে খরচ কিছু বেশি পড়বে; এক পৃষ্ঠার জন্য দিতে হবে ৫ টাকা, দু' পৃষ্ঠার জন্য ৭ টাকা। ছাপাখানার জন্য ক'জন কর্মী লাগবে, তাঁদের কী হারে মাইনে দিতে হবে তাও বিস্তারিত জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বাংলা আর ফারসি কম্পোজিটারের মাস মাহিনা পড়বে ৭৫ টাকা, ইংরেজি কম্পোজিটারের ১০০ টাকা। সর্দারের মাইনে পড়বে মাসিক ২০ টাকা, একজন পণ্ডিত এবং একজন মুনশিকে দিতে হবে মাসে ৩০ টাকা। বাইন্ডারের মাইনে মাসে ১৫ টাকা। ইত্যাদি। হেস্টিংস বোর্ড-এর বৈঠকে প্রস্তাবটি পেশ করলেন। যথারীতি তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সমর্থনের কথাও জানালেন। কিন্তু বোর্ড তৎক্ষণাৎ সেটি গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। তাঁরা বললেন— উইলকিনস যে 'রেট' দিয়েছেন সেই হারে তাঁকে ছাপার কাজ দিতে তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু ছাপাখানার লোকজন এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদির দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে। সে-বছরই (১৭৭৮) ডিসেম্বরের ২২ তারিখে গভর্নর জেনারেল বোর্ড-এর সভায় আবার ছাপাখানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তাঁর অভিমত ছাপাখানাটি সরকারের পরিচালনাধীন রাখতে হবে। তিনি চান মাসিক ৩৫০ টাকা মাহিনায় উইলকিনসকে নিযুক্ত করা হোক তার তত্ত্বাবধায়ক। এবং তাঁকে বাড়িভাড়া খাতে মাসে আরও ৩৫০ টাকা দেওয়া হোক। কোনও কোনও সদস্য

এবারও হেস্টিংস-এর প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করতে নারাজ। কিন্তু সেদিনকার সভায় হাজির ছিলেন হেস্টিংস-বান্ধব বারওয়েল। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব গৃহীত হল: উইলকিনস-এর পরিচালনাধীনে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেজন্য উইলকিনস প্রতি মাসে মাইনে এবং ভাতা পাবেন। সরকারি কাগজপত্র ছাপার জন্য তাঁকে 'রেট' মতো অর্থও দেওয়া হবে। তবে এই বন্দোবস্ত করা হচ্ছে এক বছরের জন্য। এক বছর পরে বিষয়টি আবার খতিয়ে দেখা হবে।

উইলকিনস-এর 'ভগবদ্‌গীতা' উপলক্ষে নাথানিয়েল স্মিথ-এর কাছে লেখা চিঠিতে হেস্টিংস তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন— কোম্পানির ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা তাঁর জন্যই সম্ভব হয়েছে। আজ তা কত দরকারি সরকারি কাজেই না লাগছে। ব্যবহারের ব্যাপকতায় ইউরোপেও বুঝি বা তার তুলনা নেই। সে-চিঠির তারিখ ৪ অক্টোবর, ১৭৮৪। বোঝা যায়, উইলকিনস তখনও কোম্পানির ছাপার কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তবু এটা ধরে নিলে কিন্তু ভুল হবে যে, উইলকিনস-পরিচালিত সেই ছাপাখানার মালিক ছিলেন জন কোম্পানি। 'অনারেবল কোম্পানিস প্রেস' বলে পরিচিত হলেও কোম্পানি ছিলেন আসলে সে-ছাপাখানার পৃষ্ঠপোষক, মালিক নন। মালিক— চার্লস উইলকিনস। কেননা, আমরা দেখি কাউন্সিলে উইলকিনস-এর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার এক যুগ পরে ওয়েলেসলি বিলাতের কর্তৃপক্ষের কাছে পরিকল্পনা পাঠাচ্ছেন কোম্পানির নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্য। সে-পরিকল্পনার রচনাকাল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল। ওয়েলেসলি সেটি লন্ডনে পাঠান পরের বছর। তাতেও নানা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে হিসাবপত্রাদি রয়েছে। ছাপার কাজের জন্য বিভিন্ন মুদ্রাকরকে সরকার কী পরিমাণ অর্থ দিয়ে থাকেন সে-সব খবরও আছে। আছে কর্মীদের সম্ভাব্য বেতনের ফর্দও। সুতরাং ধরে নিতে অসুবিধে নেই, হেস্টিংস যাকে বলেছেন কোম্পানির ছাপাখানা, সেটি আসলে কোম্পানি-নিয়ন্ত্রিত এবং কোম্পানির অনুগ্রহধন্য ছাপাখানা মাত্র। যেমন ছিল অগস্টাস হিকি, কিংবা ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন-এর ছাপাখানা। উইলকিনস-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এখানেই যে, সরকারি কাজে ছাপাখানার ব্যাপক ব্যবহারের তিনিই প্রথম প্রবক্তা এবং উদ্যোক্তা। শুধু তাই নয়, সরকারিভাবে তিনিই প্রথম কোম্পানির মুদ্রাকর। তাঁর হাতেই ছাপার কাজে কোম্পানির হাতেখড়ি।

যদিও বন্ধু উইলকিনস-এর তুলনায় নাম-যশ তাঁর কিছুটা কম, তবু হালেদ কিন্তু ভাষাতত্ত্ব এবং ভারত-তত্ত্বের ক্ষেত্রে অবহেলাযোগ্য সন্ধানী নন। নানা অঙ্গনে তাঁর কৃতিত্বও অসামান্য। বলা হয়, ইউরোপের কাছে ভারত-তত্ত্বের সূচনা ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার শুভলগ্নে। অন্য দল মনে করেন ভারত-তত্ত্বের জন্মদিন আরও এক বছর পরে, ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে, চার্লস উইলকিনস-এর 'ভগবদ্‌গীতা'-র প্রকাশ মুহূর্তে। কেননা, সেদিনই প্রথম একজন ইউরোপিয়ান বিশ্বজনকে জানিয়েছিলেন সংস্কৃতের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সফল সংবাদ। বলা বাহুল্য, উইলকিনস-এর আগে কোনও ইউরোপিয়ান সংস্কৃত ভাষার কোনও খোঁজই রাখতেন না এমন নয়। জে মার্শাল নামে কাশিমবাজার কুঠির একজন কর্মচারী তার অনেক আগেই নাকি 'ভাগবত পুরাণ' সংস্কৃত থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। সে-পুথি অপ্রকাশিত। ফলে, মার্শাল-এর সংস্কৃত জ্ঞান

কেমন ছিল তা বলা শক্ত। পথিকৃতের গৌরব উইলকিনসই পেয়ে আসছেন।

হালেদ কিন্তু তাঁর সহযোগীর আগে থেকেই ভারত-পথিক। তিনি ইউরোপীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের ছাত্র। গ্রিক লাতিনে পারদর্শী ছিলেন। যদিও একটি চিঠিতে তিনি খেদ করেছেন— প্রথম যৌবনের চাপল্যে ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের দিনগুলোতে অনেকটা সময় অহেতুক অপচয় করেছিলাম বলেই আমার গ্রিক-বিদ্যায় ফাঁক রয়ে গেল। হিব্রুও নাকি তাঁর পুরোপুরি অজানা ছিল না। অক্সফোর্ডে থাকাকালে উইলিয়াম জোন্স-এর প্রেরণায় তিনি আরবি শিখতে শুরু করেছিলেন। ভারতে আসার পথে জাহাজে শিখতে বসলেন ফারসি। উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে জোন্সকে চিঠি লিখছেন তিনি অর্ধেক ফারসিতে, অর্ধেক লাতিনে। সেইসঙ্গে জানাচ্ছেন জাহাজে তিনি ভাষা ছাড়াও বিশেষভাবে চর্চা করছেন জ্যোতির্বিদ্যা। কিছুদিনের মধ্যেই ফারসিতে যে তিনি অতিশয় পারংগম হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ—'এ কোড অব জেন্টু লজ', কোড-এর বিস্তৃত ভূমিকাটি পড়লে বোঝা যায় হালেদের বিদ্যার পরিধি ছিল অতি ব্যাপক। তাঁর আগে ভারত সম্পর্কে যাঁরা উল্লেখযোগ্য কিছু লিখেছেন তাঁদের প্রায় সকলের রচনার সঙ্গেই পরিচয় ছিল তাঁর। ব্যাকরণের ভূমিকাতেও রয়েছে একই ইঙ্গিত। 'কোড'-এর ভূমিকায় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, গাথা এবং পুরাণের আলোচনা রীতিমতো উপভোগ্য। উপভোগ্য 'হিন্দুস্থান', 'জেন্টু'— এইসব শব্দের উৎস এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের তাৎপর্য, কিংবা দেবদাসী, সতীদাহ— ইত্যাদি প্রথার বিস্তৃত আলোচনাও। এই বিশাল প্রবন্ধটি হালেদ লিখেছিলেন মাত্র পনেরো দিনে। একটি চিঠিতে লিখেছেন— সুযোগ পেলে ভূমিকাটি আবার নতুন করে লিখতাম। ভূমিকায় সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, ছন্দ, মাত্রা এমনকী দেবনাগরী এবং বাংলা লিপি বিষয়েও আলোচনা রয়েছে। মনে হয় বাংলা ব্যাকরণে ছন্দ-প্রসঙ্গের মূল সূত্রটি এখানেই কুড়িয়ে নেওয়া। তবে, ভূমিকাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য, আমাদের মতে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে হালেদের উদার এবং সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গি।

হালেদের ধর্মমত সম্পর্কে তাঁর সমকালেও কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন এমন একজন পাদ্রি সাক্ষ্য দিয়েছেন: তাঁর ধর্মীয় মতামত ছিল যদৃচ্ছ, 'ওয়াইল্ড'। তাঁর আদৌ কোনও ধর্মমত আছে কি না কারও কারও সে-বিষয়েও নাকি ঘোরতর সন্দেহ ছিল। তবে পাদ্রির ধারণা, হালেদ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি বাঁধাধরা কোনও সড়ক ধরে চলেননি। গাঁয়ের বৃদ্ধাদের মতো তাঁর কোনও কুসংস্কার ছিল না, কিন্তু আপন বিশ্বাসে তিনি ছিলেন আবার শিশুর মতো সরল। একালের একজন গবেষক মনে করেন— হালেদ ছিলেন হিউম-এর মতো সংশয়বাদী। যদিও তিনি অ্যাঙ্গলিকান চার্চ-এর অনুগত ছিলেন তবু 'কোড'-এর ভূমিকায় তিনি তৎকালে প্রচলিত দুই ধরনের খ্রিস্টীয় মতবাদের কোনওটিকেই সমর্থন করেননি। এই সংশয়বাদ পরবর্তীকালে পরিণত হয়েছিল হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগে। পরবর্তীকালে উপনিষদ নাকি তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এবং হিন্দুধর্মের ব্যাপক অনুশীলনের ফলেই তিনি একসময় অতীন্দ্রিয়বাদ এবং রহস্যবাদের মায়ায় আবদ্ধ হন। হঠাৎ অবতার রিচার্ড ব্রাদার্স-এর প্রতি তাঁর আকর্ষণের সূত্র নাকি সেখানেই।

বার্ক তাঁর 'জেন্টু লজ'কে বলেছেন— সম্ভবত বিশ্বের প্রাচীনতম আইনের সংকলন গ্রন্থ। বেন্থাম নাকি এর একটি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। ঐতিহাসিক উইলিয়াম রবার্টসন ঘোষণা করেছিলেন— এ পর্যন্ত ভারতীয়দের রীতি-নীতি এবং শাসনপদ্ধতি

সম্পর্কে ইউরোপে যে-সব বিবরণ এসে পৌঁছেছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সব চেয়ে মূল্যবান এবং বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত এটি। সমসাময়িক আর দু'জন ভারত-বিশারদ জন জোসেফিন হলওয়েল এবং আলেকজান্ডার ডাও-এর রচনার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে এই উক্তি কতখানি যথার্থ। ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম জোন্সকে অনুরোধ করা হয়েছিল বইটির একটি সমালোচনা লেখার জন্য। জোন্স উত্তর দিয়েছিলেন— তিনি অতিশয় ব্যস্ত। সমালোচনা লেখা তো পরের কথা, তিনি তখন তাঁর 'বন্ধুর বইটি' পড়ার সময় পর্যন্ত করে উঠতে পারেননি। অনেক পরে, ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগর থেকে তিনি বলছেন— হালেদের অনুবাদ নয়, মূল ফারসি সংকলনটি তিনি পড়েছেন। যে-সব পণ্ডিত সেগুলো সংগ্রহ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মাত্র তখন জীবিত। সংস্কৃত থেকে ফারসি অনুবাদ করার কাজে সাহায্য করেছিলেন একজন বাঙালি মুসলমান। যে-পণ্ডিত তাঁকে বিষয়টি বোঝাবার দায়িত্ব নেন তিনিই নাকি জোন্স-এর সংস্কৃত লেখা সংশোধন করে দিচ্ছিলেন। যা হোক, জোন্স মনে করেন এ-অনুবাদ খুব মূল্যবান নয়। কেননা, বইটি অনুবাদের অনুবাদ— 'এ ট্রানস্লেশন ইন দি থার্ড ডিগ্রি ফ্রম দি ওরিজিন্যাল'। তবু জোন্স-এর জীবনীকার এবং তাঁর পত্রাবলীর সম্পাদক গারল্যান্ড ক্যাননা মনে করেন—জোন্স-এর জীবনে 'এ কোড অব জেন্টু লজ'-এর প্রভাব প্রভূত। অথচ হালেদ যখন 'জেন্টু লজ' অনুবাদ করতে বসেছেন তখন তাঁর বয়স মোটে বাইশ। আর 'বেঙ্গল গ্রামার' যখন প্রকাশিত হয়েছে আমাদের বৈয়াকরণের বয়স তখন সাতাশ।

'জেন্টু লজ'-এর হালেদ ইউরোপকে প্রথম সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে কিছু পাকা খবর পরিবেশন করলেও নিজে তিনি কোনও দিনই সংস্কৃত ভাল করে আয়ত্ত করতে পারেননি। ভূমিকায় তিনি সবিনয়ে বলেছেন সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে সামান্য যেটুকু সংবাদ পেশ করা হয়েছে তা 'ত্রুটিপূর্ণ'। এই যৎসামান্য সংবাদ সংগ্রহ করতেও তাঁকে হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছে। কেননা, পণ্ডিতেরা খুবই রক্ষণশীল, তাঁরা সংস্কৃতের রহস্যলোকে সহসা অন্যদের প্রবেশের ছাড়পত্র দিতে চান না। তবে তাঁর ভাগ্য ভাল তিনি একজন 'উদারচেতা' ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং আশা করছেন সেই যোগ্য শিক্ষকের সাহচর্যে তিনি লাভবান হবেন। কে এই ব্রাহ্মণ? তিনি কি একাদশ পণ্ডিতেরই একজন? তাঁর সহযোগিতায়ই কি বাংলা ব্যাকরণ লিখিত? জানি না। তবে এটুকু জানা যাচ্ছে সেই উদার ব্রাহ্মণও হালেদ-কে সব বিদ্যা দান করেননি। ব্যাকরণের ভূমিকায় হালেদ জানাচ্ছেন— পণ্ডিত ব্যাকরণের নিয়মনীতি তাঁকে বোঝালেও সংস্কৃতের কণামাত্রই তাঁকে দান করেছেন। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে কস্টার্ড-এর কাছে লেখা চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি হালেদ সংস্কৃত শেখার আগেই তাঁর পণ্ডিত মারা যান। এজন্য তিনি নিরতিশয় দুঃখিত। পরের বছর, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে চার্লস স্ট্রিট থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি হেস্টিংস-এর কাছে খেদ করছেন— মূল সংস্কৃত থেকে মহাভারত পড়বার মতো সংস্কৃত শিখতে পারলাম না। এ দুঃখ আমার রয়েই গেল। হালেদ যে-সব সংস্কৃত পুথি অনুবাদ করেছেন সবই কিন্তু করেছেন ফারসি থেকে।

তবে ভাল সংস্কৃত না-জানলেও ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর কালের ইউরোপীয়দের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ। পুব আর পশ্চিমের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের জনক বলা হয় সার উইলিয়াম জোন্সকে। সংস্কৃত, গ্রিক এবং

লাতিনের সাদৃশ্য বিচার করে জোন্স ইন্দো-আর্য ভাষা গোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁর প্রসিদ্ধ তত্ত্ব প্রকাশ করেন ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে। তার বেশ আগে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা-ব্যাকরণের ভূমিকায় হালেদ ইঙ্গিত করেছেন এ-বিষয়ে। ফারসি আরবির সঙ্গে তো বটেই, গ্রিক এবং লাতিনের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য দেখে আমি বিস্ময়-বিমূঢ়—লিখেছেন হালেদ। সত্য, এ-ব্যাপারে তাঁরও পূর্বসূরি ছিল। আরও কারও কারও নজরে পড়েছিল সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রিক লাতিনের সাদৃশ্য। সুদূর ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ জেসুইট পাদ্রি টমাস স্টিভেনস এবং ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে গোয়ার ইতালিয়ান ব্যবসায়ী ফিলিপো সাসেত্তি সেদিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। তার পর পন্ডিচেরির ফরাসি জেসুইট পাদ্রি কোউরডু-র প্রসিদ্ধ ঘোষণা। সেটাও জোন্স-এর তত্ত্ব প্রকাশের কুড়ি বছর আগেকার ঘটনা—(১৭৬৮)। হালেদের কৃতিত্ব তবু অনস্বীকার্য। কেননা, অনুমান তাঁর কাউকে অনুসরণ করে নয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব।

পরের বছর কস্টার্ড-এর কাছে লেখা চিঠিটিতে তিনি আরও বিশদ করেছেন তাঁর বক্তব্য।

উইলিয়ম জোন্স-এর বক্তব্য ছিল—সংস্কৃত, গ্রিক এবং লাতিন তথা ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মূল এক এবং এদের জননীকে আজ খুঁজে পাওয়া শক্ত। হালেদ কিন্তু এগিয়ে গিয়েছিলেন আরও এক ধাপ। তাঁর অনুমান—হতে পারে সংস্কৃতই গ্রিক অথবা লাতিনের জননী। সংস্কৃত ভাষার মর্যাদাকে ইউরোপীয় পণ্ডিত মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত করার গৌরব তবু সার উইলিয়াম জোন্স-এর। কেননা তিনি ভাল সংস্কৃত জানতেন। ফলে তাঁকে অনুমানের স্তরে পড়ে থাকতে হয়নি। তা ছাড়া, শুধু বিদ্যা বুদ্ধি আর যুক্তি নয়, নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার মতো ব্যক্তিত্ব এবং যশও তাঁর ছিল।

শুধু এই একটি তত্ত্বের সূত্র আর 'জেন্টু লজ'-এর ভূমিকায় ছড়ানো-ছিটানো টুকরো টুকরো তত্ত্বকথা নয়, ভারত-চর্চায় হালেদের আরও কিছু কিছু অবদান আছে। দুঃখের কথা দীর্ঘকাল কেউ সে-সবের বড়-একটা সন্ধান রাখতেন না। হালেদের পাণ্ডিত্য সমসাময়িক অনেকেরই বিস্ময় উৎপাদন করেছে। ইম্পে-তনয় লিখেছেন— হালেদের মতো এত বিষয়ে এত জানেন, এমন মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। আরও অবাক কাণ্ড হালেদ যা জানেন, সবই তাঁর নখাগ্রে যেন। 'কোড'-এর ভূমিকায় হালেদ দারাশিকো-অনূদিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেও কিন্তু দারাশিকোর বিশাল ফারসি উপনিষদ সংগ্রহ অনুবাদ করেছিলেন ইংরেজিতে। সন্ধানীরা বলেন উপনিষদ প্রথম ইউরোপের গোচরে আনেন অন্যরা। আব্রাহাম অ্যানকুইতিল দু পেরো-কৃত লাতিন অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮০১-০২ খ্রিস্টাব্দে। তার চোদ্দো বছর আগে (১৭৮৭) হালেদ শেষ করেন তাঁর ইংরেজি অনুবাদ। হালেদ তবু অগ্রপথিকের সম্মান পেলেন না, কারণ, তাঁর বিরাট পাণ্ডুলিপি আজও অপ্রকাশিত।

হালেদের অপ্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে আছে রাধাকান্তের 'পুরাণার্থপ্রকাশ'-এর সম্পূর্ণ অনুবাদ (১৭৮৮), 'ভাগবতপুরাণ'-এর সম্পূর্ণ অনুবাদ (১৭৯১), 'শিবপুরাণ' এবং 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এর সার এবং আংশিক অনুবাদ, এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত অনূদিত 'মহাভারত'-এর বিশাল পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপিটি অত্যন্ত জীর্ণ, নাড়াচাড়া করা অতিশয় শক্ত। তবু মনে হল, এটি বোধহয় অষ্টাদশ পর্বের সম্পূর্ণ অনুবাদ। যথাস্থানে 'গীতা'ও অন্তর্ভুক্ত। ছোট ছোট টানা হরফে লেখা। এখানে ওখানে দু'-চারটে ফারসি বাক্য। ৭৬ নম্বর পৃষ্ঠায় বাংলায় তিনি পর্বগুলোর নাম লিখেছেন নিজের হাতে। মাঝে মাঝে

অনুবাদের তারিখও রয়েছে। সে-সব দেখে মনে হয় অনুবাদ শুরু করেছিলেন তিনি ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে। শেষ করেন ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে। এটিও অপ্রকাশিত।

এ ছাড়াও হালেদ নানা পুথির মার্জিনে এবং তাঁর নোট বইয়ে ভারত-তত্ত্ব সম্পর্কে রাশি রাশি মন্তব্য লিখে রেখে গেছেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকে জন হাডেন সে-সব থেকে একটা সংকলন তৈরি করেছিলেন। তিনি তার কিছু কিছু নাকি প্রকাশও করেছিলেন।

যথা : লীলাবতীর একটি পুথি। তার ওপরে নীচে, ডাইনে বাঁয়ে নাকি নানা ধরনের অঙ্ক আর মন্তব্যের ছড়াছড়ি। হালেদ-এর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের হাতে যে-সব পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য কাগজপত্র আসে নাকি দেখা যায় তিনি পুরাণ, ইতিহাস, গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা— নানা বিষয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তার প্রমাণ রেখে গেছেন। তাঁর চিন্তার বিশেষ এক উপলক্ষ ছিল ব্রহ্মাণ্ড। তার জন্য তিনি নিজের হাতে অনেক চিত্র এবং নকশা রচনা করেছিলেন। সৌভাগ্যবশত, এ-ধরনের আঁকিবুকি-খচিত একটি বই দেখার সুযোগ আমাদেরও জুটেছিল। প্রবন্ধটি ১৭৯০ সালের ২৪ জুন রয়াল সোসাইটির সভায় পড়া হয়। একই সঙ্গে বাঁধাই করা হয়েছে— হেনরি ক্যাভেনসিডস-এর লেখা আর একটি পুস্তিকা।

উইলিয়াম মার্সডেন উইলকিনস-এর জামাতা। উইলকিনস-এর তিন কন্যার একজনের পাণিগ্রহণ করেছিলেন তিনি। হালেদকে তিনি তাঁর বইয়ের একটি কপি উপহার দিয়েছিলেন। পুরনো বইয়ের গতি-প্রকৃতি বিচিত্র। বইটি বিলাত থেকে আঁকাবাঁকা পথে চলে আসে কলকাতায়। এখানকার হাটেই সম্প্রতি সেটি খুঁজে পেয়েছেন একজন সংগ্রাহক। বিষয়— হিন্দুদের কালগণনা, সুতরাং এ-বইটির মার্জিনে হালেদ-এর হাতে রচিত হয়েছে নানা নকশা, কখনও বা প্রাসঙ্গিক নানা মন্তব্য। তারই মধ্যে ১৩ নম্বর পৃষ্ঠার মার্জিনে অনভ্যস্ত হাতে লেখা চারটি বাংলা হরফ— শাকামুনি। হালেদ লিখতে চেয়েছিলেন বলাই বাহুল্য, শাক্যমুনি।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে জন হাডেন হালেদ-এর নোটবইগুলো এবং অন্যান্য মন্তব্য থেকে একটা সংকলন সাজিয়েছিলেন। তার কিছু কিছু তিনি প্রকাশও করেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় হালেদ এখনও অপ্রকাশিত এবং অপঠিত। ক'জন পড়েছেন হিন্দুর দশ অবতার বিষয়ক তাঁর সনেটগুলো? ডা. গ্রান্ট-এর উদ্‌যোগের ফলে তার মধ্যে একটিমাত্র পড়ার সুযোগ পেয়েছি আমরা। সেটি বামন অবতার বিষয়ে।

হেস্টিংস খেদ করেছেন, কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া, হায় হালেদ-এর কবিতা অন্যরা কেউ পড়ার সুযোগ পেল না। একজন সাধারণ বারবনিতা সম্পর্কে লেখা হালেদ-এর একটি পদ্য ছাপিয়ে তিনি ব্রিটেনের প্রতিটি গির্জা, প্রতিটি বাজারের তোরণে ঝুলিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন একবার। কিন্তু হালেদ তখন নিজেকে আপন ঘরে গুটিয়ে নিয়েছেন। প্রচারের দিকে কোনও আকর্ষণ নেই তাঁর। তাঁর খ্যাতির স্বল্পতার পেছনে এক কারণ যদি এই প্রচারবিমুখতা, অন্য আর-একটি কারণ তবে একাগ্রতার অভাব। হালেদ-এর প্রতিভা একবর্গী নয়— বিক্ষিপ্ত। রেভেরেন্ড কেন নামে একজন অনুরাগী তাঁর প্রশস্তি রচনা করায় হালেদ রসিকতা করে উত্তর দিয়েছিলেন— হুডিডডি-র হাতে কলম আর কী খেলা দেখাতে পারে। সন্দেহ নেই, প্রতিভাবান এই মানুষটি অনেক কৃতিত্বই দেখিয়েছেন। জীবৎকালে অন্ততপক্ষে পনেরোটি নানা মাপের বই প্রকাশ করেছেন তিনি। তার মধ্যে ভারতীয় সমাজ বা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ যেমন আছে তেমনই আছে কাব্য ভবিষ্যদ্‌বাণী, সমসাময়িক

ইতিহাস এবং রাজনীতি-বিষয়ক বইও। তাঁর প্রতিভা অস্থির। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি। সে-কারণেই আজও ভারত-তত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি বলতে গেলে প্রায় অপরিচিত নাম। ইংরেজ প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের অনেক তালিকাতেই উল্লেখ নেই তাঁর। অবশ্য এই অবহেলার পিছনে আরও একটি কারণ ছিল। কিছু বুদ্ধিমান রাজ-কর্মচারী এবং শৌখিন ভাষাবিদ বাংলার পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেও অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে বাংলা ভাষার খাতির ছিল খুবই কম। তুলনায় 'রাজভাষা'— এই পরিচয়বশত ফারসির মর্যাদা তখন অনেক বেশি। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর পণ্ডিতদের মনোযোগ প্রবাহিত প্রধানত সংস্কৃতের উৎস অভিমুখে। অথচ গবেষণাক্ষেত্রে হালেদ-এর সবচেয়ে মৌলিক অবদান যা, সেই ব্যাকরণটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। আপন কালের চোখে ঔদাসীন্য অতএব অপ্রত্যাশিত নয়।

হালেদ সম্ভবত ভারতীয় পুথি সংগ্রহের ব্যাপারেও ইউরোপে অন্যতম অগ্রপথিক। এদেশে থাকাকালে তিনি অনেক পুথি সংগ্রহ করেছিলেন। 'জেন্টু লজ' এবং 'বেঙ্গল গ্রামার'-এ যে-সব পুথির উল্লেখ আছে সেগুলো ছাড়াও বিস্তর সংস্কৃত ফারসি হিন্দি এবং বাংলা পুথি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে। হালেদ-সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য পুথিগুলো এলোপাথাড়িভাবে কুড়িয়ে নেওয়া নয়, তিনি কী সংগ্রহ করছেন তা তিনি জানেন। অনেক পুথি বিশেষ করে তাঁর জন্যই নকল করা। তিনি যখন পরিকল্পনা করে এদেশে পুথি সংগ্রহ করছেন তখন বাংলা তো বটেই, সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কেও ইউরোপে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চারিত হয়নি। হালেদ সে-কারণেও আজকের গবেষকদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

অর্থাভাবে পীড়িত হালেদ পুথি বিক্রি শুরু করেন ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে। সে-বছর একজন বই ব্যবসায়ীর হাত দিয়ে তিনি ৬২ খানা পুথি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাছে বেচে দেন। অন্য এক জনের হিসাব অনুযায়ী ৬৯ খানা। বিনিময়ে দাম পান—২৫০ পাউন্ড। পরের বছর নিজে সরাসরি বিক্রি করেন আরও ২৪ খানা পুথি। সঙ্গে কিছু দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত বইও। তালিকাও চমকপ্রদ। আগেই বলেছি, তাতে একখণ্ড 'বেঙ্গল গ্রামার'ও ছিল। এবার দাম পান তিনশো পাউন্ড। এখানেই শেষ নয়। পরবর্তীকালে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে হালেদ এবং আরও অনেকের ৪০টি পাণ্ডুলিপি মি. উইলিয়মসনস নামে এক ভদ্রলোক ব্রিটিশ মিউজিয়ামকে দান করেন।'

হালেদ মারা যাওয়ার পর তাঁর তহবিলে যে-সব পুথি পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য কাগজপত্র ছিল সেগুলোর উত্তরাধিকারী হন তাঁর ভাইপো। তিনিই কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিকে মহাভারতের ইংরাজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপিটি দান করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কোম্পানির মেডিকেল সার্ভিসের ডা. জন গ্রান্ট আইন অনুসারে হালেদ-এর কাগজপত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইম্পের পুত্র লিখেছেন— এবার আশা করা যায় তাঁর সম্পাদনার কাগজপত্রগুলো সাধারণের জন্য প্রকাশিত হবে। আমরা যতদূর জানি ডা. গ্রান্ট 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করতে পারেননি। তাতে হালেদ সম্পর্কে অনেক সংবাদ আছে, কিন্তু তাঁর পুথিপত্রের কোনও খবর নেই। কে জানে, ঘরে তখনও কিছু ছিল কি না।

ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে হালেদ-এর যে-সব পুথি রয়েছে তার মধ্যে সংখ্যায় ফারসি পুথিই বেশি। ফারসির মধ্যে আছে: ফেরিস্তা, আবুল ফজল, গোলাম হোসেন প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের ইতিহাস, মুঘল বাদশাহের রাজত্বকালের নানা বিবরণ এবং দারাশিকোর

উপনিষদ সহ নানা সংস্কৃত পুথির ফারসি অনুবাদ। তা ছাড়া ফারসি ‘লীলাবতী’ ইত্যাদি। সংস্কৃত পুথির মধ্যে আছে: মহাভারত, ভগবদ্গীতা, পঞ্চরত্ন গীতা, মহাবাক্যবিবরণ, সিদ্ধান্ত কৌমুদী, সারস্বত প্রক্রিয়া, মুগ্ধবোধ ইত্যাদি। হিন্দির তালিকায় আছে: জয়সীর পদ্মাবতী, তুলসীদাসের রামচরিতমানস, এমনকী কোকমঞ্জুরী ইত্যাদি।

আমাদের কাছে আরও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় হালেদ-এর বাংলা পুথির সংগ্রহটি। হালেদ সংগ্রহে বাংলা পুথি আছে বারোটি। তাঁর কাছে বাংলার কবি ও তাঁদের রচিত কাব্যের একটি তালিকা ছিল। তালিকাটি বলতে গেলে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকা। তাতে কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস থেকে শুরু করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সাত জন বিশিষ্ট বাঙালি কবির নাম এবং তাঁদের রচনার উল্লেখ রয়েছে। হালেদ এই তালিকা হাতে নিয়ে পুথি সংগ্রহে উদ্‌যোগী হন। তাঁর ‘বেঙ্গল গ্রামার’-এ এ-সব পুথিরই ব্যবহার দেখা যায়। সংগ্রহে ‘কালিকা মঙ্গল’-এর পুথি আছে তিনটি। একটির লিপিকাল ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দ। গবেষকরা মনে করেন ‘কালিকা মঙ্গল’-এর তারিখযুক্ত পুথির মধ্যে এটি প্রাচীনতম এবং বিশুদ্ধতম।

এই সব বাংলা পুথি ছাড়াও হালেদ-সংগ্রহে আছে : বাংলা ফারসি শব্দকোষ: হিন্দু সম্প্রদায়ের নানা বর্ণ ও শ্রেণীর তালিকা, মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণী, বাংলা মাসের নাম-তালিকা আত্মীয়-বাচক নাম আমিন বা গোমস্তাদের প্রতি নির্দেশাবলী, দোভাষীর পুথি এবং চিঠি, চুক্তিনামা, বন্ধকী দলিল ইত্যাদির নমুনা। উদ্‌যোগ আয়োজন দেখে বোঝা যায় হালেদ নিষ্ঠাবান ছাত্রের মতো বাংলা ভাষা শেখার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তৎকালের কেতা অনুযায়ী ‘মুনসী’ নিয়োগ করে বাংলা শিখতে শুরু করেছিলেন। একজন গবেষক মনে করেন—সেই অনামা মুনশী ছিলেন পূর্ববঙ্গের কোনও বাঙালি মুসলমান। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তিনি বিশেষ করে বাংলা ফারসি শব্দকোষটি বিচার ক’রে। আমাদেরও মনে হয় এ-সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত। উইলিয়াম জোন্সও কিন্তু বলেছেন ‘জেন্টু লজ’ অনুবাদের সময় হালেদ একজন বাঙালি মুসলমানের সাহায্য নিয়েছেন। শব্দকোষটি তাঁরই লেখা হলে মনে হওয়া স্বাভাবিক তিনি পূর্ববঙ্গের সন্তান। ব্যাকরণেও কিন্তু দেখা যায় সব বাংলা শব্দের, বিশেষ করে শতকিয়া বর্ণনের সময়, উচ্চারণ অন্য রকম।

হালেদ ‘জেন্টু লজ’-এ যে শব্দ তালিকা যোগ করেছেন তাতেও অনেক বাংলা শব্দ আছে। সেগুলোর ওপর চোখ বুলালে মনে হয় বাংলা শব্দের উচ্চারণ তখনও তাঁর অনায়ত্ত। বাংলা ভাষায় তখনও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। পরে নিশ্চয়ই তিনি বাংলায় তাঁর দখল বিস্তার করেন। তার সপক্ষে পরোক্ষ প্রমাণ যদি এইসব পুথি এবং কাগজপত্র, প্রত্যক্ষ প্রমাণ তবে ‘বেঙ্গল গ্রামার’ ব্যাকরণে ভুল-ভ্রান্তির অভাব নেই, কিন্তু অবাক হয়ে যেতে হয় বাংলা ভাষার রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর বোধের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা দেখে। শুধু পণ্ডিত আর মুনশীর সহযোগিতা পেলেই বোধহয় এ ধরনের বর্ণনাত্মক এবং বিশ্লেষণমূলক বই লেখা যায় না। পরিমাণে যৎসামান্য হলেও এখানে-ওখানে তাঁর নিজের হাতে লেখা কিছু বাংলা লিপি যদি তাঁর বাংলা লেখার সামর্থ্যের কথা আমাদের জানাতে চায় তবে তাঁর নিজের লেখা একটি চিঠি কিন্তু সগর্বে ঘোষণা করে বাংলা ভাষায় তাঁর অধিকারের কথা। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা একটি স্মারকলিপিতে তিনি দাবি জানিয়েছেন কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই

বাংলা চিঠিপত্র পড়তে বা লিখতে পারতেন। বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ অতএব সম্পূর্ণ অনধিকারীর কলমে লেখা নয়।

বাঙালির সেদিন দুঃখের অন্ত ছিল না। পলাশির পরে যে লুঠের মরশুম শুরু হয়েছিল তা তখনও অব্যাহত। আগের বছর (১৭৭৭) বাংলার পরাজিত নবাব মীরকাশিম চিরবিদায় নিয়েছেন। মুর্শিদাবাদে পুতুলের সংসার। আইনের শাসনের নামে দেশি-বিদেশি আমলা গোমস্তার দল তখনও চালিয়ে যাচ্ছে যদৃচ্ছ লুঠতরাজ। প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার করতে গিয়ে স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস নাস্তানাবুদ। সত্য, বাঙালিটোলায়ও তখন কেউ কেউ 'আঙুল ফুলে কলাগাছ'। কিছু দেওয়ান বেনিয়ান দালাল আর মুৎসুদ্দি রাতারাতি বড় মানুষ বনে যাচ্ছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, সে-সৌভাগ্য সর্বজনীন নয়। সামগ্রিক বিচারে বরং বাঙালির পক্ষে অনেক বড় প্রাপ্তিযোগ বলে মনে হয় এই মুদ্রিত বইখানি। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে ভারতে ইংরেজের অন্যতম অবদান— আইনের শাসন। বাংলা-এলাকায় তৎসহ স্মরণীয় বোধ হয় ছাপাখানার কথাও। যদিও সেটি মোটে আমাদের জন্য লেখা নয়, তবু দুঃখী বাঙালি পরোক্ষে সেদিন যা পেয়েছিল তার মূল্য অনেক। না, শুধু ছাপার কলের কথা বলছি না। এই বইয়ের পাতায়ই কিন্তু প্রথম শোনা গিয়েছিল বাংলা ভাষার পক্ষে প্রথম জোরালো সওয়াল। পরবর্তী দশকগুলোতে রাজা-প্রজা দু'তরফের কাছেই বাংলা ভাষার যে-মর্যাদা তার শুভ সূচনা এ-বইয়েরই পাতায়। যথাসময়ে সে-প্রসঙ্গ আলোচনা করা যাবে। আপাতত এটুকুই জানা গেল বাংলা ভাষার প্রথম বৈয়াকরণ এবং প্রথম মুদ্রাকর দু'জনের কেউই আপন ক্ষেত্রে শৌখিন অভিযাত্রী নন। দু'জনেই তাঁরা সেদিনের কলকাতায় অসাধারণ প্রতিভাধর দুই পরদেশি যুবা। তাঁদের হাত ধরে যাত্রা শুরু করতে অগৌরবের কিছু নেই। লজ্জার কোনও হেতু নেই তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে।

হালেদ আর উইলকিনস আজীবন বন্ধু ছিলেন। নিজের ব্যাকরণের ভূমিকায় হালেদ যদি উইলকিনস-এর কৃতিত্বের কথা সবিস্তার বর্ণনা করে থাকেন, উইলকিনস তবে তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূমিকায় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন তাঁর ওপর হালেদ-এর প্রভাবের কথা। এ-সব নিছক সৌজন্য-বিনিময় নয়। পরবর্তীকালেও আমরা দেখি দ্বিতীয়বার ভারতে এসে হালেদ বন্ধু উইলকিনস-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে সমান কৌতূহলী। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে মজঃফরপুর থেকে এক চিঠিতে হেস্টিংসকে তিনি উইলকিনস-এর আবিষ্কার সংবাদ জানিয়ে লিখছেন— উইলকিনস চুনারে তিনটি অতি প্রাচীন হিন্দু শিলালেখ আবিষ্কার করেছেন। তার পাঠোদ্ধার হওয়া মাত্র আপনাকে পাঠিয়ে দেব। অবশ্য পাঠোদ্ধার যদি সম্ভব হয়। তার প্রায় দুই দশক পরে, ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের একটি চিঠি থেকে জানা যায় হালেদ যখন ক্যালডিয়ান লিপি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন উইলকিনস তখন তাঁকে সরবরাহ করেছিলেন সে-লিপির প্রতিলিপি। পাঁচ বছর পরে, ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে হালেদ যখন চাকুরির জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তখন সম্ভাব্য চাকুরিদাতাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য উইলকিনস-এর পরামর্শেই তিনি লর্ড ভ্যালেনসিয়ার 'ট্রাভেলস'-এর সমালোচনা করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 'চাবুক হাতে'। হেস্টিংস নিষেধ করেছিলেন সেটি প্রকাশ করতে। তার অবশ্য প্রয়োজন হয়নি। কেননা হালেদ আগেই চাকরিটি পেয়ে যান।

'মাছ যখন ধরা পড়ে গেছে তখন জালটি আর হাতে রাখা কেন?'—এই বলে তিনি প্রবন্ধটি নিজের কাছেই রেখে দেন।

হালেদ উইলকিনস সহযোগিতা কিন্তু তার পরেও অব্যাহত। উইলকিনস তাঁর সংস্কৃত ভাষা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য হালেদ-এর কাছ থেকে অনেক বার পাণ্ডুলিপি ধার করেছেন, হালেদ-এর জন্য নিজের উদ্‌যোগে পাণ্ডুলিপি নকল করিয়ে দিয়েছেন: অন্য দিকে হালেদও দরকারমতো পাণ্ডুলিপি ধার করেছেন উইলকিনস-এর কাছ থেকে। ইন্ডিয়া অফিসে নতুন করে চাকরি হওয়ার পর হালেদ আবার ভারতচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি মহাভারত অনুবাদে উদ্‌যোগী হন। ততদিনে তাঁর নিজের পুথি বিক্রি হয়ে গেছে। বাধ্য হয়েই হাত পাততে হয় উইলকিনস-এর কাছে। উইলকিনস বন্ধুকে প্রত্যাখ্যান করেননি। তাঁর পুথি সামনে রেখেই মহাভারতের হালেদ-কৃত অনুবাদ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অভাবের তাড়নায় হালেদ যখন দ্বিতীয়বার তাঁর পুথি-সংগ্রহ বিক্রি করতে মনস্থ করেন ব্রিটিশ মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ তখন বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরামর্শ চেয়েছিলেন উইলকিনস-এর কাছে। উইলকিনস পুথিগুলো কেনার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন বলেই হালেদ সেদিন হাতে কিছু নগদ পয়সা পেয়েছিলেন।

তবু বলব, এই দুই প্রতিভাবানের সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বের নিবিড়তম অধ্যায় দেখা গেছে বাংলা-প্রবাস কালেই। জুটি হিসাবে ওঁদের জীবনের সুবর্ণসুযোগ 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' লেখা এবং ছাপার দিনগুলো। হুগলি এবং কলকাতায় সেই প্রত্যাশায় উন্মুখ প্রত্যূষ; উৎকণ্ঠিত, কখনও বা সাফল্যে উদ্ভাসিত দুপুর, উচ্ছ্বসিত আনন্দিত সন্ধ্যা বোধহয় একসঙ্গে দু'জনের জীবনে কোনওদিন আর ফিরে আসেনি।

'বেঙ্গল গ্রামার'-এর সাফল্য বা ব্যর্থতার দায়, বলাই বাহুল্য, ওঁদের দু'জনের—আর কারও নয়। কিন্তু এই বইয়ের পটভূমি রচনার কৃতিত্ব এককভাবে যাঁর প্রাপ্য তিনি—ওয়ারেন হেস্টিংস। হালেদ এবং উইলকিনস দু'জনেই প্রকাশ্যে জানিয়ে গেছেন হেস্টিংস-এর প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতার কথা। উইলকিনস তাঁর ভগবদ্গীতা'র ভূমিকায় আগেই স্বীকার করেছেন হেস্টিংস তাঁর প্রেরণা। হেস্টিংস তাঁর পৃষ্ঠপোষক এবং শিক্ষক, তিনি তাঁর কাছে ছাত্রের মতো। সে-কারণেই কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসাবে বইটি তিনি বিনীতভাবে তাঁর পাদপদ্মে নিবেদন করছেন। মনে রাখতে হবে, সাধারণ ভাবে পৃষ্ঠপোষণা বলতে যা বোঝায় হেস্টিংস 'ভগবদ্গীতা' উপলক্ষে তার চেয়ে বেশি কিছু করেছিলেন। নাথানিয়েল স্মিথ-এর কাছে লেখা চিঠিটিতে তিনি লিখেছেন— উইলকিনসকে তিনি বেনারসে গিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধার সেইসঙ্গে সংস্কৃত চর্চার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁকে কথা দিয়েছেন সেজন্য তাঁর সরকারি পদটি যাতে কোনওমতে খোয়া না যায় তার জন্য তিনি যথাসাধ্য করবেন। 'ভগবদ্গীতা' আইনের বই নয়, তবু যে কোম্পানি তা নিজের নামে প্রকাশে সম্মত হয়েছিলেন এবং প্রকাশনা খাতে দু'শো পাউন্ড মঞ্জুর করেছিলেন সে শুধু হেস্টিংস-এর সুপারিশের জন্যই।

'জেন্টু লজ'-এর ভূমিকায় হালেদ একই ভক্তিনম্র ভঙ্গিতে নিবেদন করেছেন হেস্টিংস-এর কাছে তাঁর ঋণের কথা। তিনি লিখেছেন— আপনার কৃপাতেই আমি সাবালক হতে-না-হতে রাতারাতি লেখকে পরিণত। হেস্টিংস যে ইচ্ছা করলে অনুবাদের দায়িত্ব অন্যদেরও দিতে পারতেন হালেদ সে-সংবাদটিও গোপন রাখেননি। বলেছেন—যোগ্য

প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে এ কাজের জন্য আপনি আমাকেই বেছে নিয়েছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। ব্যাকরণের ভূমিকায়ও একই প্রেরণা আর পৃষ্ঠপোষণার সরব স্বীকৃতি।

হালেদ তার প্রতিদান দিতে চেয়েছিলেন নাকি ভারত ত্যাগ করে। বিলাতে গিয়ে তিনি নিজেকে হেস্টিংস-বিরোধী আন্দোলনকে প্রতিহত করার কাজে সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা কাঠবিড়ালির সেতু-বন্ধনের চেষ্টার মতো। তিনি প্রভুকে রক্ষা করতে পারেননি। সবাই জানেন, শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল ওয়ারেন হেস্টিংসকে। দীর্ঘ আট বছর চলেছিল তাঁর বিচার। অবশেষে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে মুক্তি। বিচারে নির্দোষ ঘোষিত হয়েছিলেন হেস্টিংস। কিন্তু তিনি যেন রক্তশূন্য। প্রভাব প্রতিপত্তি তাঁর অনেক কমে গেছে, হেস্টিংস রীতিমতো বিবর্ণ। আর্থিক সামর্থ্যেও তিনি আর সম্পন্ন নন, বলতে গেলে তখন তিনি রিক্তপ্রায়। সত্তর হাজার পাউন্ড নাকি খরচ হয়েছিল বিচার উপলক্ষে। মন্ত্রশিষ্য এবং অনুরাগী হালেদও ততদিনে বলতে গেলে খ্যাতির এক ধ্বংসস্তূপ মাত্র। সে বছরই রিচার্ড ব্রাদার্স-এর ঘটনা। সে বছরই দেখি, হালেদ তাঁর পুথি-সংগ্রহ বিক্রি করেছেন, অচিরেই তিনি দুয়ারে খিল আঁটতে যাচ্ছেন।

ডাইলেসফোর্ড-এ নিজ খামারে মগ্ন ভূতপূর্ব গভর্নর জেনারেল আর তাঁর অনুগত অনুরাগী বন্ধু স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি হালেদ—দু'জনের মধ্যে তার পরও কিন্তু গভীর অন্তরঙ্গতা। হেস্টিংস-এর দুঃসময়ে তাঁকে যাঁরা ত্যাগ করেননি, হালেদ তাঁদের অন্যতম। তেমনই হালেদ-এর চরম দুর্দিনে যাঁরা সর্বক্ষণ তাঁর কথা মনে রেখেছিলেন হেস্টিংস সেই গোনাগুনতি বন্ধুদের একজন। আর-একজন স্যার ইলাইজা ইম্পে। তবে দু'জনের মধ্যে হালেদ-এর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা যেন হেস্টিংস-এরই বেশি। তিনি হালেদ-প্রতিভার চিরঅনুরাগী। অন্য দিকে তাঁর প্রতি আনুগত্য হালেদ তুলনাহীন। একজন লিখেছেন—হালেদ আনুগত্যেরই আর-এক নাম!

অনেক চিঠির আদানপ্রদান হয়েছে তৎকালে তাঁদের মধ্যে। সেগুলো সত্যই পড়বার মতো। দু'জনের চিঠিতেই থেকে থেকে উঁকি দেয় ভারত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, পরীক্ষিৎ, দ্রুপদ রাজা—মহাভারতের নানা চরিত্র। হেস্টিংসকে হোলির সঙ্গে মে-দিবসের মিল বোঝান হালেদ। হেস্টিংস হালেদকে শোনান লখনউর ঘটনা, কবে একজন ভারতীয় গোমতীর জল হেঁটে পার হয়েছিল। ফাঁকে ফাঁকে চলে বড়দিন বা অন্য কোনও উৎসব উপলক্ষে উপহার বিনিময়। চলে সাহিত্য বিষয়ে নানা আলোচনা, নিজেদের লেখা পদ্যের লেনদেন। হালেদ বরাবরই কবি। ভারতেও দেখা গেছে বেনারসের পথে পালকিতে বসে তিনি পদ্য লিখে পাঠাচ্ছেন হেস্টিংসকে। কানপুরে কার যেন বাংলোয় বসে খাবার তৈরি হতে হতে আবার রচিত হচ্ছে পদ্য। হেস্টিংস-এর ভারত-ত্যাগের সম্ভাবনার কথা মনে রেখে তিনি তখন লিখেছিলেন— একটি দীর্ঘ পদ্য। এখন বিষয় বিবিধ। তাঁর সঙ্গে তাল রেখে হেস্টিংসও লিখে চলেছেন একের পর এক কবিতা। একটির বিষয়— ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কবিতাটির কথা সুজ্ঞাত। সম্ভবত হালেদই এই কবিতার প্রথম পাঠক। হালেদ আবার মাঝে মাঝে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় হেস্টিংসকে লিখে পাঠান। পার্লামেন্টের কাজকর্মের ধারা-বিবরণ। আপাতদৃষ্টিতে সেগুলো গদ্য হলেও ভেতরে ভেতরে পদ্যের মতো ছন্দোবদ্ধ রচনা। রীতিমতো উপভোগ্য। বিশেষত, হালেদ তখন মৌনী। তাঁর হয়ে হেস্টিংস-এর সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান চালাচ্ছিলেন স্ত্রী লুসি।

শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাস ত্যাগ এবং আবার নিজের অধিকারবলে সমাজে ফিরে আসার চেষ্টা। চাকরির জন্য ক্যানিং-এর কাছে দরখাস্ত পাঠিয়েই হালেদ কিন্তু হেস্টিংস-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন একটি দীর্ঘ-রূপক। তির্যক চোখে দেখা চলতি রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির সমালোচনা। সেইসঙ্গে নিজের কাহিনী। সেই কল্পলোকের সুলতানের রইস এফেন্দি একদিন রাজধানী শয়তানপুরের বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি একটা হিজিবিজি বিক্রি করে এক দোকানে গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে একটি যন্ত্রপাতির বাক্স তাঁর নজরে পড়ল। সেটি ধুলোয় আচ্ছন্ন। চার পাশে মাকড়সার জাল। তবু দেখলে মনে হয় বাক্সটি এক সময় বেশ ভাল ছিল, যাকে বলে কাজের বাক্স ছিল। দোকানি সবিনয়ে জানাল এটির মালিক ছিলেন বঙ্গদেশের হস্তিনাপুরের পাশা। তিনি ভাইসরয়ের আসন থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর মুখে এই বাক্সের যন্ত্রপাতির তীক্ষ্ণতা এবং অন্যান্য গুণাবলির কথা অনেক শোনা গেছে। তিনি নিজেও অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এগুলো ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এখন আর তাঁর কোনও ক্ষমতা নেই। সেজন্যই বাক্সটির আজ এমন অবস্থা। কাজ না-করতে-করতে যন্ত্রপাতিতে জং ধরে গেছে। তাই শুনে রইস এফেন্দি আবু বেগ বললেন— এটি সাফ করে একপাশে রাখো। সস্তায় পাওয়া গেলে পরে তিনি ভেবে দেখবেন এটা কেনা যায় কি না! ইত্যাদি। হেস্টিংস উপাখ্যান পড়ে লিখছেন— হায়, আজ আমি অক্ষম। বাক্সওয়ালা নিজেই গহ্বরে পড়ে হাত-পা ভেঙে বসে আছে, তাঁর করার কিছুই নেই! অসহায় হেস্টিংস লিখেছেন— তিনি সরকারি কর্তাব্যক্তিদের নামের তালিকার ওপর চোখ বুলিয়ে দেখেছেন, কিন্তু তাতে চেনাজানা কারও নাম নেই! চাকরি হওয়ার খবর পেয়ে হেস্টিংস স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। চিঠিতে লিখছেন— কিছু করতে পারিনি বটে, তবে মনে রেখো আমিও চুপচাপ বসে ছিলাম না।

হালেদ-এর কোনও সংকটেই হেস্টিংস চুপচাপ থাকতে পারতেন না। তাঁর আর্থিক দৈন্য যখন চরমে তখন নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেছেন তিনি হালেদকে। হালেদ-এর আত্মসম্মানবোধ অতিশয় তীক্ষ্ণ। চাকরি পাওয়ার পর কড়ায় গণ্ডায় ফিরিয়ে দিয়েছেন বন্ধুর দান। হেস্টিংসকে প্রাপ্তিস্বীকার করে নিজের হাতে লিখে দিতে হয়েছে রসিদ। হালেদ-এর কাগজপত্রে সেই চিরকুটগুলো নাকি ছিল।

শেষ দিন পর্যন্ত অনুগত বন্ধুর সঙ্গে এই সম্পর্ক বাঁচিয়ে রেখেছিলেন হেস্টিংস। ডাইলেসফোর্ড থেকে মাঝে মাঝে লন্ডনে আসতে হত তাঁকে। যত ব্যস্ততাই থাক-না-কেন, সুযোগ পেলেই উঁকি দিতেন হালেদদের বাড়িতে। হেস্টিংস-এর মৃত্যু ১৮১৮ সালের আগস্টে। তাঁর বয়স তখন পঁচাশি। হালেদ-এর সাতষট্টি। সে-বছরও দেখি দু'জনের মধ্যে চলেছে কবিতার আদানপ্রদান। জুনে লেখা হেস্টিংস-এর দীর্ঘ চিঠির বিষয় মার্স ডেন-এর মার্কোপোলোর ভ্রমণ কাহিনী!

হালেদ-এর সঙ্গে বিশেষ প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠলেও ভারত-চর্চার ক্ষেত্রে হেস্টিংস কিন্তু শুধু তাঁরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। তাঁর আমলে বেশ-কিছু তরুণ আমলা ভারত-তত্ত্ব নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। হালেদ আর উইলকিনস ছাড়াও সে-দলে ছিলেন জন শোর, ফ্রান্সিস গ্লাডউইন, জন কারনাক, জনাথন ডানকান, উইলিয়াম চেম্বার্স এবং আরও কেউ কেউ। হেস্টিংস এঁদের প্রায় সকলেরই উৎসাহদাতা। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে সার উইলিয়াম

জোন্স-এর নেতৃত্বে এঁদের কেউ কেউ গড়ে তোলে এশিয়াটিক সোসাইটি। হেস্টিংস সেই ঐতিহাসিক বিদ্বৎসভার প্রথম পৃষ্ঠপোষক।

ভারত-বিদ্যার নানা অঙ্গনে এঁদের সন্ধানী অভিযাত্রার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল— ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং রহস্যের উদ্ঘাটন। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিক থেকে ইউরোপ অভিযাত্রীর ভূমিকায়। দিকে দিকে চলেছে ইউরোপের নানাদেশের অভিযান। তারা নতুন নতুন দেশ এবং জাতির সংস্পর্শে আসছে। বাণিজ্যের এলাকা বাড়ছে। সেইসঙ্গে কোথাও কোথাও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে রাজনৈতিক প্রভুত্ব। ফলে অবশিষ্ট দুনিয়া সম্পর্কে ইউরোপিয়ানদের জ্ঞানের পরিধিও সম্প্রসারিত হচ্ছে তখন। অভিজ্ঞতার আলোকে তুলনামূলক বিচারে তাঁদের মনে সেদিন এই ধারণা বদ্ধমূল যে— সভ্যতায় সংস্কৃতিতে তাঁরা তুলনাহীন। কারও তুলনা চলে না ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনৈতিক এবং সামরিক সামর্থ্যের সঙ্গে। দক্ষিণ এবং মধ্য-আমেরিকা কিংবা আফ্রিকা তো বটেই, এমনকী মুসলিম সভ্যতাও, তাঁদের চোখে মনে হয়, ইউরোপের অনেক পেছনে। তা ছাড়া ইসলাম 'সাম্প্রতিক'ও বটে! এই অহমিকাবোধের সামনে পূর্ব দিগন্তে ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে দুটি বৃহৎ প্রশ্ন চিহ্ন—চিন আর ভারত। এদের চট করে বাতিল করে দেওয়া যায় না। আত্মগর্বী ইউরোপকে অতএব থমকে দাঁড়াতে হয়। প্রাচীন এই দুই সভ্যতাকে একবার খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন।

ইউরোপ তখন খ্রিস্টীয় ধর্ম এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির কিছু কিছু সমালোচক আবির্ভূত হয়েছেন। আত্ম-সমালোচনা উপলক্ষে তাঁরা বারবার তুলনা হিসাবে টেনে আনছিলেন প্রাচীন চিনা সভ্যতাকে। কখনও কখনও ভারতের সংস্কৃতিকে। ভারত সম্পর্কে ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকেও কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে ইউরোপের নানা ভাষায়। কিছুই হয়তো পূর্ণাঙ্গ নয়, কিন্তু রহস্যকে ঘনীভূত করার পক্ষে যথেষ্ট। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও প্রত্যক্ষ, আরও নিবিড়। সুতরাং জিজ্ঞাসা আরও প্রবল। অনুসন্ধান ব্যাপকতর। সেটাই স্বাভাবিক। বিশেষত, বণিকের মানদণ্ড যখন দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে রাজদণ্ডে। এসময়ে ভারত-চর্চায় প্লাবন দেখা দেবে বইকী! ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ঐতিহাসিকতা এখানেই যে, সেই ক্রান্তিকালে তিনি ছিলেন এদেশে কোম্পানির সর্বেসর্বা— গভর্নর জেনারেল। দ্বিতীয়ত, হঠকারীর মতো তিনি অনুসন্ধিৎসার স্রোতকে আটকাতে চাননি। বরং যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন তাতে আরও বেগ সঞ্চার করার জন্য। প্রাচ্য-বিদ্যা চর্চায়, সে-কারণেই অনেকের কাছে তিনি উৎস হিসাবে গণ্য।

অবশ্য এটা ঠিক যে, হেস্টিংস-এর পরবর্তী গভর্নর জেনারেলরাও প্রাচ্য তত্ত্ববিদদের উৎসাহিত করেছেন। উইলিয়াম জোন্স টানা আট বছর কাজ করেছেন কর্নওয়ালিশ-এর সঙ্গে। এমনকী, বলা হয়, তাঁর ভারতীয় আইনের সংকলন প্রকাশের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল কর্নওয়ালিশ-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনুকূলে সমর্থন জোগানো। মার্কিস অফ হেস্টিংস থেকে লর্ড হার্ডিনজ সবাই ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। একজন ভারতীয় গবেষকের সিদ্ধান্ত: সপ্তদশ শতকের ব্যাপক বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের পেছনে অন্যতম প্রেরণা ছিল যেমন নৌবিদ্যার উন্নয়ন ঘটিয়ে অভিযানে গতি সঞ্চার, তেমনই প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার এই ধুমের পেছনে সত্যকারের প্রেরণা সেদিন ঔপনিবেশিক শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ। এই সিদ্ধান্তকে বোধহয় নাকচ করে দেওয়া যায় না। হেস্টিংস তখনকার পরিস্থিতিতে যা করণীয় ছিল তা-ই করেছেন। তিনি দূরদর্শী

ঔপনিবেশিক শাসক। হয়তো ভারত-চর্চায় তাঁর উৎসাহ কখনও কখনও শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনের সীমা লঙ্ঘন করেছিল এই যা।

সন্দেহ নেই, হেস্টিংস বাস্তববাদী শাসক। প্রাচ্যবিদ্যায় তাঁর অতি-উৎসাহের পেছনে এক কারণ তীক্ষ্ণ গার্হস্থ্য বুদ্ধি। তিনি দীর্ঘকাল এদেশে ছিলেন। নানা পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে কাজ করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল বিশাল। তিনি ভারতীয় ভাবা জানতেন। এদেশের হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতি সম্পর্কেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি জানতেন ইংল্যান্ড এবং ভারতের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতিনীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তুলনামূলক বিচারে ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ এ-তত্ত্ব তিনি স্বীকার করতেন না। স্বদেশের সমাজের কাছে সতত তাঁর সওয়াল ছিল ভারত বর্বরের দেশ নয়। ভারতীয়দের নিজস্ব সভ্যতা এবং সংস্কৃতি রয়েছে। রয়েছে নানা সামাজিক সংগঠন। সেগুলোকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া কর্তব্য। এ-ব্যাপারে ক্লাইভ আর হেস্টিংস-এর মধ্যে বিশেষ মতভেদ ছিল। একজন ঐতিহাসিকের মন্তব্য—বিচার করলে দেখা যাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত অষ্টাদশ শতকের ইংলন্ডেরই ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন।

প্রশাসক হিসাবে হেস্টিংস ক্লাইভের দ্বৈতশাসন নীতি বা 'ডাবল গভর্নমেন্ট'-এর পথ ত্যাগ করেছিলেন। অথচ একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় মূলত তিনি ক্লাইভকেই অনুসরণ করছিলেন। ক্লাইভ ক্ষমতা ভোগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর কথা ছিল—কোম্পানির সার্বভৌমত্ব মুখোশের আড়ালে থাক। হেস্টিংস মুখোশটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে সরাসরি সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সর্ব বিষয়ে তিনি প্রচলিত ভারতীয় ব্যবস্থাদি নাকচ করে সেখানে ইংলন্ডের নিজস্ব সংগঠন স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন। একের বদলে অন্য নয়, তিনি চেয়েছিলেন দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়। ভারতীয় সমাজ এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নকশাটিকে তছনছ না-করেই তিনি ইংলন্ডকে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সে-কারণেই কিছু উদ্ধত ক্ষমতাগর্বী ইংরেজ আমলের বদলে তিনি নিম্নস্তরে প্রশাসক হিসাবে ভারতীয়দের নিয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। এটাও এক ধরনের দ্বৈত শাসন বইকী।— লিখেছেন একজন। এজন্য তিনি শাসনসংস্কারেও উদ্‌যোগী হয়েছিলেন। জেলা থেকে ইংরেজ প্রশাসকদের কলকাতায় সরিয়ে এনে তাঁদের শূন্য স্থানে বসাতে শুরু করেন ভারতীয়দের। তাঁর ধারণা, কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতা ইংরেজের হাতে থাকলেই যথেষ্ট। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর পক্ষে এ-নীতি কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। এদেশে এবং স্বদেশে নানা স্বার্থচক্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। একজন আধুনিক ইংরেজ লেখকের মন্তব্য: ভাবতে অবাক লাগে ইংলন্ডে ব্যাপক দুর্নীতি ছিল বলেই হেস্টিংস সেদিন তাঁর এই ভ্রান্ত নীতি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রশাসন সংস্কার করে শৃঙ্খলা আনায় দায়িত্ব পড়ে অতঃপর কর্নওয়ালিশ-এর ওপর।

কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ওই নিষ্ঠুর দেশে নিত্য যেখানে মৃত্যুর মহোৎসব, যেখানে ইউরোপিয়ানদের গড় আয়ু মাত্র 'দুই বর্ষা' সেখানে কিছু মানুষ পরিবেশকে অস্বীকার করে কেমন করে মগ্ন হয়েছিলেন এমন গভীর ভারত-তত্ত্বের চিন্তায়।

কিন্তু, আগেই বলা হয়েছে, সেটা কোনও অবাক-কাণ্ড নয়। ওঁরা কালের প্রয়োজনেই অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন মৃত্যুর উদ্যত থাবাকে— করাল কালকে। হেস্টিংস-এর

উদ্‌যোগ-আয়োজনই তার প্রমাণ। তিনি চেয়েছিলেন— বিজিতকে তাদের নীতিতেই শাসন করতে। এজন্যই তাদের রীতিনীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া তাঁর পক্ষে বিশেষ জরুরি ছিল। এজন্যই হালেদকে দিয়ে সরকারি উদ্‌যোগে 'জেন্টু লজ' অনুবাদ করানো, বাংলা ব্যাকরণ লেখানো। এজন্যই কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, এবং মাদ্রাসার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করা। হেস্টিংস জানতেন তিনি কী চাইছেন, এবং কেন। তাঁর এই নীতিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'রোমান পন্থা'।

দূর ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দেই আমরা দেখি জেলা আদালতগুলোতে ইংরেজি আইনের ফারসি অনুবাদ পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে হেস্টিংস বাংলা অনুবাদও পাঠাচ্ছেন। কেননা, তাতে আদালতের কাজকর্ম পরিচালনা সহজতর হবে। যে-সব জটিলতা দেখা যায় সেগুলো দূর হবে। বাঙালিকে তিনি বাংলা ভাষায় শাসন করতে আগ্রহী। সম্ভব হলে বাংলা মতে। যেন তিনি গ্রিসে কোনও রোমান বিজয়ী।

হালেদ 'জেন্টু লজ'-এর ভূমিকায় রোমানদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ইংরেজ পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রোমানরা শুধু বিজিত দেশের প্রজাদের নিজেদের রীতি অনুযায়ী শাসিত হবার অধিকার রক্ষা করেনি, যেখানে সম্ভব তাদের উপকথা ইত্যাদি নিজেদের করে নিয়েছে। 'বেঙ্গল গ্রামার'-এর ভূমিকায়ও দেখি একই যুক্তি। হালেদ লিখছেন—রোমানরা গ্রিস দখল করার পর সে দেশের ভাষা শিখতে আরম্ভ করে। তাদের ভাষায় পুথিপত্র পড়তে শেখার আগেই তারা গ্রিকদের আইনকানুন গ্রহণ করে এবং শত্রুকে অধীন করে নিজেদের সভ্য করে তোলে। হালেদ আসলে হেস্টিংস-এর মতামতের প্রতিধ্বনি করছিলেন মাত্র। লক্ষ্যভেদের জন্য হেস্টিংস-এর হাতে তুলে দিচ্ছিলেন যুক্তির নতুন নতুন শর। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শুধু হিন্দু আইনের সংকলন নয়, হেস্টিংস আরবি থেকে ফারসিতে মুসলিম আইনেরও একটি সংকলন তৈরি করাচ্ছিলেন। ১৭৮৪ সনে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন—'জেন্টু লজ' এবং এই ফারসি সংকলনের জন্য টাকা খরচ করেছেন তিনি নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে। সংকলনটির ইংরেজি অনুবাদ করেন মি. জেমস অ্যানডারসন এবং মি. হ্যামিলটন।

নিজের পকেট থেকে অকাতরে টাকা খরচ করে যে-প্রকাশক এ-সব কাজ করাতে পারেন তাঁকে নিছক 'বাস্তববাদী শাসক' বললে হয়তো তাঁর প্রতি পুরোপুরি সুবিচার করা হয় না। হেস্টিংস-এর গৃহস্থ বুদ্ধি সম্পর্কে কোনও সংশয় না-রেখেই বলা চলে, তাঁর ভঙ্গিতে কিছু ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ছিল। কখনও কখনও তিনি সত্যই রাজ-কর্তব্য সীমার ঊর্ধ্বে। সেখানে তিনি ভারতের সংস্কৃতি অনুরাগী একজন বিশিষ্ট ইংরেজ। ভারতীয় রাজনীতি, এদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ তাঁর তখন আর ব্যবহারিক প্রয়োজনবশত নয়, আন্তরিক আকর্ষণের জন্য। উইলকিনস-এর 'ভগবদ্গীতা'র ভূমিকা হিসাবে মুদ্রিত নাথানিয়েল স্মিথ-এর কাছে লেখা তাঁর দীর্ঘ চিঠিখানি এই দ্বিতীয়-হেস্টিংস-এর অন্যতম পরিচয়পত্র। তিনি জানেন ভারতে ইংরেজ শাসনের সুবিধা অসুবিধার সঙ্গে গীতা-পাঠের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নেই। তবু তিনি এই মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশের প্রস্তাব পেশ করছেন, কারণ, তার ফলে ভারত সম্পর্কে ইংলন্ডে প্রচলিত কুসংস্কার আরও কিছু পরিমাণে দূর হবে। এদেশ সম্পর্কে ইংরেজের অজ্ঞতা কাটবে। তা ছাড়া, এ-ধরনের বিদ্যাচর্চায় অন্য লাভও আছে। যাঁরা এতে মনোনিবেশ করতে পারেন অনিবার্যভাবেই তাঁদের মনের সংকীর্ণতা ঘোচে, চিত্তের প্রসারতা

বেড়ে যায়, চরিত্র উদার হয়ে ওঠে। হেস্টিংস যেন সেই মুহূর্তে জটিল কুটিল কোনও রাজনীতিক নন, ধ্রুপদী সাহিত্যের এক রসিক পাঠক, উদ্বুদ্ধ কোনও শিক্ষক। পরবর্তীকালেও বার বার দেখা মেলে এই হেস্টিংসকে। যখন তিনি অতি বৃদ্ধ, ভারতের রাজনীতির সঙ্গে যখন তাঁর কোনও যোগ নেই তখনও দেখি হেস্টিংস সুযোগ পেলেই ভারতের ভাষা এবং সাহিত্য চর্চার সপক্ষে সওয়াল করছেন। নানা ব্যাপারে তিনি ওয়েলেসলির কঠোর সমালোচক ছিলেন। অথচ তাঁর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবে হেস্টিংস রীতিমতো উৎসাহিত। শুধু ফারসি আর উর্দু নয়, পরবর্তীকালেও হেস্টিংস-এর বক্তব্য ছিল—সংস্কৃত শেখা চাই। এজন্য নয় যে, সংস্কৃত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী, সংস্কৃতচর্চা করতে পারলে লাভ অন্য— সামনে পাওয়া যাবে অফুরন্ত এক জ্ঞানভাণ্ডার!

আবার স্মিথ-এর কাছে লেখা চিঠিখানি হাতে তুলে নেওয়া যাক। হেস্টিংস কথায় কথায় এক জায়গায় পৌঁছে লিখছেন—ভারত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়তে পারে একমাত্র তাদের রচনাবলীর মাধ্যমে। আর, একদিন ভারতে যখন ইংরেজের রাজত্ব থাকবে না, রাজকীয় ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের উৎসগুলি যখন পরিণত হবে নিছক স্মৃতিতে তখনও বেঁচে থাকবে এই সব পুথিপত্র।

পদাধিকার বলে এশিয়াটিক সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন বলতে গেলে ভারতের সব গভর্নর জেনারেলই। তাঁদের কেউ কেউ নিশ্চয় ব্যক্তিগতভাবে কোনও কোনও প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ-ধরনের উক্তি এবং যুক্তি বোধহয় শোনা গেছে একমাত্র ওয়ারেন হেস্টিংস-এর মুখেই।

এবার কিছু জরুরি সংযোজন। হঠাৎ মনে হতে পারে বুঝিবা প্রক্ষিপ্ত কিছু। তবু ক্ষেত্রবিশেষে পুনরুক্তি বলে ঠেকলেও পাঠককে অনুরোধ করব ধৈর্য ধরে বক্তব্যটুকু শুনতে। কারণ, এই তথ্যগুলো পরবর্তী গবেষণার ফল। আগেকার কিছু কিছু সিদ্ধান্ত অতএব সংশোধন না-করলেই নয়।

প্রথমত, হালেদের বাংলা ব্যাকরণ হুগলিতে ছাপা হয়েছিল এই তথ্য বইতে উল্লেখিত। কিন্তু বলা হয়নি, বইটি ছাপা হয়েছিল কোন চাপাখানায়। শ্রীরামপুরে কেরির সহযোগী মার্শম্যান লিখেছেন, গ্রামার ছাপা হয়েছিল বই-বিক্রেতা মি. অ্যানড্রুজ-এর ছাপাখানায়,— "মি. অ্যাজড্রুজ, আ বুক সেলার।" কাছাকাছি সময়ে কলকাতায় মি. অ্যানড্রু নামে একজন বই-বিক্রেতা সত্যই ছিলেন। আমদানি-করা বইয়ের বিরাট দোকান ছিল তাঁর। কিন্তু হুগলির ছাপাখানার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল এমন কথা বলার সপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। গবেষকরা কাছাকাছি সময়ে হুগলিতেও আরও দু'জন মি. অ্যানড্রুজকে খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কেউ ছাপাখানাওয়ালা নন। তবে হুগলির ছাপাখানাটি কার? তার সম্ভাব্য উত্তর একটাই— চার্লস উইনকিনস্-এর। যে-কোনও সূত্রেই হোক, তিনি হুগলিতে একটি ছাপাখানা হাতে পান। কিংবা প্রতিষ্ঠা করেন। আর সেই ছাপাখানাতেই তাঁর তত্ত্বাবধানে হুগলিতে ছাপা হয়েছিল 'আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ।' এর পরোক্ষ প্রমাণ মেলে চার্লস উইলকিনস-এর পরবর্তী কাজকর্মে। 'গ্রামার' ছাপাবার পর সরকারের ইচ্ছানুসারে তিনি একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেখানে সরকারি ছাপার কাজ শুরু করেন। ছাপাখানাটিকে "অনারেবল কোম্পানিজ প্রেস" বলা হলেও সেটি যে আসলে

উইলকিন্‌স-এর নিজের ছাপাখানা ছিল সেটা বোঝা যায় সরকারি ছাপাখানার "আদি" ঠিকানা দেখে। সেটি ছিল কলকাতায় নয়, মালদহে। ফলে "অনারেবল কোম্পানি'জ প্রেস"-এর প্রথম বইটি কলকাতার বদলে ছাপা হয় মালদহে। কারণ, চার্লস উইলকিন্‌স তখন অন্য কর্মসূত্রে— মালদহে। অর্থাৎ, হুগলি উপাখ্যানেরই রকমফের।

দ্বিতীয়ত, কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব কাহার? "মি. অ্যানড্রুজ", বা চার্লস উইলকিন্‌স-এর না অন্য কারও? পরবর্তী গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে, 'আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ', এখানে মুদ্রিত প্রথম বই নয়, এবং "মি. অ্যানড্রুজ" বা উইলকিন্‌স প্রথম মুদ্রাকর নয়। কলকাতায় প্রথম মুদ্রাকর স্বনামধন্য জেম্‌স অগস্টাস হিকি। তিনি কলকাতায় পৌঁছন ১৭৭২ সালের ডিসেম্বরে। শহরে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ে লোকসান দিয়ে ঋণের দায়ে তাঁকে জেলে যেতে হয়। সেখানে বসেই তিনি কিছু ছাপার হরফ ও একটি ছাপাখানা সংগ্রহ করে নতুন ব্যাবসা, ছাপার কাজ শুরু করেন। সেটা ১৭৭৭ সালের কথা। সে বছরই কলকাতায় সুইডিশ মিশনারি রবার্ট কিরনেন্ডার-এর জন্য ১৭৭৮ "ক্যালেন্ডার" বা তথ্যপঞ্জি প্রকাশ করেন। যেহেতু ১৭৭৮ সালের পঞ্জিকা, সুতরাং, ধরে নেওয়া হয় সেটি ছাপার কাজ শেষ হয় ১৭৭৭ সালের মধ্যে। দ্বিতীয় এ-বইয়ের একটি বিশেষ কপির মলাটের ভাঁজের ভেতরে পাওয়া গেছে মুদ্রাকর হিসাবে হিকির নামযুক্ত একটি ব্যবসায়িক নিলামের হ্যান্ডবিল। হালেদের ব্যাকরণ ছাপা হয়েছিল বলা হয় ১৭৭৮ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে। সুতরাং, কলকাতা এলাকায় এটি দ্বিতীয় বই। বইয়ের পাতায় বাংলা হরফের উপস্থিতির কথা ধরলে অবশ্য প্রথম বই। উল্লেখ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সংবাদপত্র 'হিকিজ বেঙ্গল গেজেট: অর দ্য ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালের জানুয়ারি মাসে।

তৃতীয়ত, হালেদের বাংলা ব্যাকরণে ব্যবহৃত বাংলা লিপির ধাতব হরফগুলি তৈরির কৃতিত্ব কাহার? চার্লস উইলকিনস, পঞ্চানন কর্মকার, কিংবা অন্য কারও। ব্যাকরণের ভূমিকায় হালেদ পঞ্চানন কর্মকার কিংবা অন্য কারও নাম উল্লেখ করেননি। তিনি বাংলা হরফ তৈরি থেকে শুরু করে বই ছাপার যাবতীয় কৃতিত্বের জন্য বাহাদুরি দিয়েছেন চার্লস উইলকিন্‌স-কে। সন্দেহ নেই উইলকিন্‌স অষ্টাদশ শতকের একজন প্রধান মুদ্রাকর। হরফ শিল্পেও তাঁর অবদান যথেষ্ট। ফ্রান্সিস বালফোর তাঁর 'ফর্মস অব হারকেরুন'-এর (১৭৮১) ভূমিকায় বলেছেন তাঁর বইয়ে ব্যবহৃত উর্দু হরফ তৈরির কৃতিত্ব চার্লস উইলকিন্‌স-এর। কিন্তু তৎকালেই এ-সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন আর-একজন লেখক। তিনি বর্থউইক গিলক্রিস্ট। তিনি তাঁর 'ডিকশনারি, ইংলিশ অ্যান্ড হিন্দুস্থানি'-র ভূমিকায় জোসেফ শেফার্ড নামে একজন খোদাই শিল্পীর কথা উল্লেখ করেছেন। শেফার্ড তাঁর ওই বইটির জন্য ফারসি হরফ তৈরি করেন। বইটির প্রকাশকাল— ১৭৯৮ সাল। অসুস্থ শেফার্ড মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় গিলক্রিস্টকে অনুরোধ করেন তিনি যেন একটি তথ্য সর্বজনের গোচরে আনেন। তথ্যটি এই যে, বারফোর-এর বইয়ে ব্যবহৃত উর্দু হরফ এবং হালেদের বইয়ে ব্যবহৃত বাংলা হরফ, চার্লস উইলকিন্‌স নন, তাঁর নিজের হাতে খোদাই করা। ওঁরা সত্যকে মিথ্যার আবরণে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, আপনি যেন অনুগ্রহ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সত্যকে উদ্ঘাটন করেন। গিলক্রিস্টের মন্তব্য—উইলকিন্‌স ওঁকে যৎসামান্য কৃতিত্বের শরিক করলে কী ক্ষতি ছিল। আর-একজন গবেষকের কথা—এটুকু উদারতা চার্লস উইলকিন্‌স দেখাতে পারতেন

বইকী! সংক্ষেপে বললে, একালের গবেষকরা জোসেফ শেফার্ডের দাবিকে মেনে নিয়েছেন। কারণ খোঁজখবর করে দেখা গেছে দেশে খোদাইশিল্পে তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন। কলকাতায়ও সমকালে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট খোদাইশিল্পী। লালবাজার এলাকায় দোকান ছিল তাঁর। তাঁর কাজেরও কিছু কিছু নমুনা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। শেফার্ড-এর মৃত্যু ১৭৮৭ সালে, কলকাতায়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৪ বছর।

ব্যাপক অনুসন্ধান এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদি যাচাই করে হালেদ-এর 'আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'-এর মুদ্রণ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তগুলো আজ গ্রহণ করা সম্ভব তা হল: ক) 'গ্রামার'-এ ব্যবহৃত বাংলা হরফের লিপি আসলে হালেদ-এর বাঙালি মুনশির হস্তাক্ষর। ওই লিপিতেই সাহেবের জন্য নানা বাংলা পুথি নকল করেছিলেন তিনি। খ) বাংলা লিপি ধাতব হরফে রূপান্তরিত করার কাজে প্রয়োজনীয় খোদাই ইত্যাদির কাজ করেন জোসেফ শেফার্ড নামে এক নবীন খোদাই শিল্পী।। গ) সে-হরফ ঢালাই করেন বাঙালি লোহার কারিগর পঞ্চানন কর্মকার। লোহা বা অন্য ধাতু ঢালাইয়ে তাঁদের অধিকার বংশগত। ঘ) আর বইটির মুদ্রণ ব্যবস্থা পরিচালনা সহ মুদ্রণের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বহন করেছেন চার্লস উইলকিন্‌স স্বয়ং। ঙ) এবং 'গ্রামার' তাঁর ছাপাখানারই মুদ্রিত।

লক্ষণীয় বিষয় এই, কোম্পানির রাজত্বে ছাপাখানা এল কিন্তু হেস্টিংস-এর আমলে। তাঁরই অপেক্ষায় ছিল যেন এই এলাকায় আধুনিকতার শুভ উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান। প্রশ্ন—এত দেরিতে কেন? সবাই যৎসামান্য নয়, মাপতে গেলে—যোজন যোজন। জানেন অন্যান্য দেশের তুলনায় সময়ের দূরত্ব ইউরোপে আধুনিক ছাপাখানার আবির্ভাব পনেরো শতকে। গুটেনবার্গ মাইনজ-এ তাঁর ৪২-ছত্রের বাইবেল ছাপেন ১৪৫২ থেকে ১৪৫৬ সালের মধ্যে। যাকে বলা হয় ছাপাখানার শৈশব, সেই আদিপর্বের অবসান শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে। তার পর দাবানলের মতো দেখতে দেখতে গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে নবযুগের নতুন ধ্যান। উইলিয়াম ক্যাক্সটন ওয়েস্টমিনিস্টার-এ তাঁর ছাপাখানা বসান ১৪৭৬ সালে। পরের বছর প্রকাশিত হয় তাঁর ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রথম মুদ্রিত বই। ভারতেও আধুনিক ছাপাখানা পুরোপুরি অজানা যন্ত্র নয়। পর্তুগিজরা গোয়ায় প্রথম এই কল আমদানি করেন ১৫৫৬ সালে। প্রথম দিকে ছাপার কাজ চলত আমদানি করা রোমান হরফে। বাইশ বছর পরে পাদ্রিদের চেষ্টায় দেখা গেল একটি বইয়ের পাতায় স্বদেশি হরফের মুখ। বইটির নাম—'ডাউট্রিনা ক্রিস্টা' পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬। হরফ—মালাবার তামিল। তুইলন থেকে সেটি ছাপা হয়ে বের হয় ১৫৭৮ সনে। অর্থাৎ আমরা যখন দু'শো বছর পরে বাংলায় ছাপাখানার আবির্ভাবের দিনগুলোর কথা স্মরণ করছি তামিলভাষীরা তখন উদ্‌যাপন করতে পারেন চারশো বছর পূর্তি উৎসব।

কোম্পানির এলাকায়ও কিন্তু ছাপাখানা অজ্ঞাত ছিল না। সরকারি কাগজপত্রে দেখা যায় সুদূর ১৬৭৪ সালে, অর্থাৎ ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল-এর আসনে বসার একশো বছর আগে কোম্পানির লন্ডনের কর্তারা হেনরি মিলস নামে একজনকে বোম্বাইয়ে পাঠিয়েছিলেন একটি ছাপার কল এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য জিনিসপত্রসহ। ছাপার কল ছিল মাদ্রাজেও। ১৭৭২ সালে সেখানে যে কোম্পানির ছাপাখানা চালু ছিল এমন প্রমাণ রয়েছে।

ছিল না শুধু কলকাতায়। এক কারণ, বলাই বাহুল্য, কোম্পানির আমলে এই এলাকায় গোয়া বা দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলের মতো ব্যাপক মিশনারি কার্যকলাপ ছিল না। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এখানে ধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারিদের অনুপ্রবেশ এবং অভিযান, দুই-ই ছিল নিষিদ্ধ। মনে রাখতে হবে, এমনকী পরবর্তী সময়েও কেরি এবং তাঁর সহযোগীদের আস্তানা গাড়তে হয়েছিল দিনেমারদের আশ্রয়ে— শ্রীরামপুরে। কলকাতায় তাঁদের আশ্রয় বা প্রশ্রয় মেলেনি। এক কথায়, বাংলা মুলুকে যাঁরা অনেক আগেই ছাপাখানার বাহকের কাজ করতে পারতেন তাঁরা তখন, বলতে গেলে অবাঞ্ছিত প্রাণী। নয়তো বাংলা বোধহয় আরও আগেই ছাপাখানার মুখ দেখতে পেত।

সমাজে যে ছাপাখানার জন্য কোনও সুপ্ত চাহিদা ছিল না এমন নয়। পর্তুগিজ পাদ্রিরা লিসবন থেকে বাংলা বই ছাপিয়ে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছেন বাংলায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার চিন্তা অবান্তর চিন্তা নয়। ছাপাখানার প্রতি আন্তরিক আগ্রহের কিছু কিছু পরোক্ষ ইঙ্গিতও রয়েছে। যদিও এই এলাকায় শিক্ষিতের হার তখন খুবই কম, তবু লিপিকরদের সামাজিক সম্মান দেখা ... বোঝা যায় পুথির প্রতি বাঙালির আকর্ষণ কম ছিল না। একমাত্র অতি বিত্তবানই পুথি নকল করাতেন সে-ধারণা ভ্রান্ত। অনেক সময় দেখা গেছে সাধারণ গৃহস্থও দক্ষিণার বিনিময়ে নকল করিয়ে নিচ্ছেন ... অথবা প্রয়োজনীয় পুথি। তা ছাড়া দেশে অনেক টোল ছিল। পড়ুয়ারা পুঁথির বদলে হাতে মুদ্রিত বই পেলে নিশ্চয় খুশিই হতেন। ছাপা-বই সম্পর্কে কুসংস্কার কাটতে যে বেশি দিন লাগেনি প্রথমাবির্ভাবের কয়েক দশকের মধ্যে বাঙালি সমাজে ছাপাখানার ব্যাপক জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। কথায় বলে 'আইডিয়া' বা নতুন ভাবাদর্শের পাখা আছে। দেখা গেল— পাখা আছে ছাপার যন্ত্রেরও। দেখতে দেখতে সে যন্ত্র শহর থেকে গ্রামে। বহড়া অগ্রদ্বীপ পর্যন্ত বাদ নেই।

তবু যে শুভদিনের নির্ঘণ্টে বাংলার পালা এল অনেক পরে তার ব্যাখ্যা একটাই, এই অঞ্চলের অস্থির রাজনৈতিক আবহাওয়া। মিশনারিদের ছাড়পত্র দিতে দ্বিধা, ছাপাখানার প্রতি উদাসীনতা— ইংরেজের আচরণে সব অস্বাভাবিকতার হেতু বোধহয় একটাই, রাজনৈতিক অস্থিরতা। বলা হয়— পলাশির পরে শান্তি নেমে এল। বলা উচিত বোধহয়— শান্তির সম্ভাবনা দেখা গেল বকসারের পরে। বকসারের যুদ্ধ ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। দ্বিতীয় শাহ আলম কোম্পানির হাতে দেওয়ানি তুলে দেন ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে। তথাকথিত শান্তি নেমে আসে তারও অনেক পরে, অনেক আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে, ভীরুর মতো ধীর পায়ে। এমনকী কলকাতার মুখের দিকে তাকালেও বোঝা যায় সেটা। ক্লাইভের নতুন কেল্লা তখনও অসমাপ্ত। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন গভর্নর হয়ে কলকাতায় এসেছেন তখনও দুর্গে কাজ চলছে। নতুন গভর্নমেন্ট হাউস তখনও স্বপ্ন। তাঁকে অফিস করতে হবে পুরনো কাউন্সিল হাউসে। তিনি বাস করবেন আজ যাকে বলে হেস্টিংস-স্ট্রিট সেখানে খালের ধারে একটি বাড়িতে। ছুটির দিনে আলিপুরের বাগানবাড়িতে। সেটি তখনও ভগ্নস্তূপ। বিকল্প ভজনালয় সেন্ট জন-এর পরিকল্পনা তখনও তাঁর অপেক্ষায়। লাল দিঘির ধারে কিয়েরনেন্ডার-এর লাল গির্জা আকাশে মাথা তুলেছে— এই যা। তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে পুরনো প্লে-হাউস, পুরনো কোর্ট হাউস। তবে হ্যাঁ, চারদিকে নতুন কর্মব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে। কলকাতায় জমির দাম বাড়ছে। বাড়ছে সাহেবপাড়ায় বাড়িভাড়া। চৌরঙ্গিপাড়ায় বাহারি ছাতা আর পাল্কিই শুধু একমাত্র দ্রষ্টব্য নয়, পথে এখন রকমারি ঘোড়ার গাড়ির ভিড়। সন্দেহ

নেই, শহরে স্বস্তি ফিরছে। ইংরেজরা ফিরে পাচ্ছে আত্মবিশ্বাস। কর্নেল ওয়াটসন খিদিরপুরে বায়ু-কল বসিয়েছেন। দুর্ধর্ষ গোকুল ঘোষালকে তুচ্ছ করে বানাতে চাইছেন ডক। এ কলকাতায় নির্ভয়ে আত্মকলহে মেতে ওঠা যায়, কথায় কথায় প্রতিপক্ষকে আহ্বান জানানো যায় 'ডুয়েল'-এ। অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকি আর তাঁর বন্ধু লঘু পাখায় যদৃচ্ছ উড়ে বেড়াচ্ছেন তখন শহরে। হারমনিক ট্যাভার্ন, 'ক্যাচ ক্লাব'। শেরি আর শ্যাম্পেন-এর স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছেন তাঁরা ডিনারে 'পেলেটিং', খাবার টেবিলে বসে রুটির গুলিতে চাঁদমারি বাদামি-রঙের সামান্য রমণী নিয়ে প্রকাশ্যে গৃহস্থালি। সে-কলকাতায় শতেক মজা। লক্ষণীয়, ধীরে ধীরে বাড়ছে তখন মুনাফার অঙ্ক। উল্লেখ্য, হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল ছিলেন এগারো বছর। 'বেঙ্গল গ্রামার' যে-বছর প্রকাশিত হয় সে-বছরই কোম্পানির মুনাফা সর্বোচ্চ। খাতায় লেখা পড়ে—নীট লাভ ১২০০৬২৩ পাউন্ড।

শুধু লাভের অঙ্ক নয়, সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির কাজের পরিধিও বাড়ছে তখন। বাড়ছে কর্মীর সংখ্যা। সেনাবাহিনীও আরও বলবান। সর্বত্র কাগজের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। সুতরাং, ভাষা শেখার মতো ক্রমেই অনুভূত হচ্ছে মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা। সেদিক থেকে বিচার করলে 'বেঙ্গল গ্রামার' কালের ফসল। পরবর্তী এক বিশেষ অধ্যায়ে রেলপথ যেমন।

ভারতে রেলপথের সূচনা সম্পর্কে মার্কস-এর প্রসিদ্ধ উক্তিটি মনে পড়ে। উপযুক্ত পরিবেশে একবার তার প্রতিষ্ঠা হলে প্রতিষ্ঠাতাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না-রেখেই এগিয়ে চলে যান্ত্রিক সভ্যতা। রেল ব্যবস্থা অনিবার্যভাবেই আধুনিক শিল্পের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে ভারতকে—বলেছিলেন মার্কস। ঔপনিবেশিকদের সাধ্য নেই সে-পরিণতি ঠেকিয়ে রাখেন, এই ছিল তাঁর যুক্তি। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা সম্পর্কেও বোধহয় এই যুক্তিটি হুবহু খেটে যায়। আমরা দেখি 'বেঙ্গল গ্রামার' ছাপা শেষ হতে-না-হতে ছাপার কল প্রতিষ্ঠার জন্য রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে কলকাতায়। এবং মাত্র দু' বছরের মধ্যে (১৭৮০) এই কলের 'অব্যবহারের' অপরাধে ওয়ারেন হেস্টিংসকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট অব ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার'-এর প্রতিষ্ঠাতা জেমস অগস্টাস হিকির বিরুদ্ধে। মুদ্রাযন্ত্র আসতে-না-আসতে কলমের সঙ্গে তলোয়ারের লড়াই। আপাতত বিজয়ী হলেও তলোয়ারধারী কি সেদিন জানেন, ভবিষ্যতে তাঁর উত্তরাধিকারীদেরও চালিয়ে যেতে হবে এই যুদ্ধ? এবং প্রতিপক্ষ হিসাবে ক্রমে আবির্ভূত হবে এদেশেরই কলমধারীর দল? কিন্তু ততক্ষণে ধার্য হয়ে গেছে শাসককুলের নিয়তি। কেননা, ছাপার প্রথম কলেই ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছে বাংলা হরফকে—যাকে বলে 'জনমত' তার উন্মেষ এবং প্রকাশ অতঃপর কিছু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। কলের যান্ত্রিক আওয়াজ ছাপিয়ে ক্রমে নিশ্চিত স্পষ্ট হয়ে উঠবে জনতার কণ্ঠস্বর। কখনও শোনা যাবে আর্তনাদ, কখনও আবেদন, কখনও বা অগ্নিঅক্ষরে বিদ্রোহের ঘোষণা। 'বেঙ্গল গ্রামার' তারই আগমনী।

নাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ, 'আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ', হুগলি, ১৭৭৮।

অর্ধকথানক
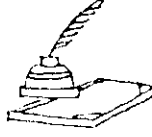
প্রথমে আমার ভাল দিকগুলোর কথা বলি। আমি কবি। ভক্তিমূলক পদ্য রচনায় আমার জুড়ি নেই। আমি কবিতা আবৃত্তি করি কলানৈপুণ্যের সঙ্গে, তার প্রভাবও স্বভাবতই গভীর। আমি সংস্কৃত ও প্রাকৃত জানি। এই দুই ভাষার নির্ভুল উচ্চারণ আমার আয়ত্ত। তা ছাড়া আমি আরও নানা স্থানীয় ভাষা জানি। ভাষা ব্যবহারের সময় শব্দের ব্যঞ্জনা এবং অর্থ সম্পর্কে আমি সজাগ।

: আমি স্বভাবত ক্ষমাশীল। আমি সহজেই তৃপ্ত। সাংসারিক ভাবনা চিন্তা সহসা আমাকে বিচলিত করতে পারে না। আমি ধৈর্যশীল। আমি সহজে লোকের সঙ্গে মিশতে পারি। কারণ আমি সহনশীল এবং কর্কশভাষণে অভ্যস্ত নই। আমি নিষ্কলুষ। ফলে অন্যদের আমি যে-সব উপদেশ দিই সেগুলি সাধারণত তাঁদের পক্ষে সহায়ক হয়। আমার কোনও বদ বা বাজে অভ্যাস নেই। আমি পরস্ত্রীর পেছনে ছুটে বেড়াই না। জৈন ধর্মে আমার সত্যিকারের আস্থা আছে। আমার মন দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন, বিশ্বাসে অটল। অন্তরে আমি খাঁটি। সব সময়ই চেষ্টা করি মনের সমতা রক্ষা করতে। এগুলো হচ্ছে আমার ছোট বড় নানা সৎগুণাবলী। কোনওটাই খুব স্পষ্ট সুউচ্চ নয়, আবার কোনওটাই হয়তো পুরোপুরি নিখুঁত নয়।

: এবার আমার খারাপ দিকগুলো। আগে বলেছি আমার ক্রোধ, অহমিকা বা ধূর্ততা নেই, কিন্তু আমার অর্থলোভ প্রবল। সামান্য অর্থলাভ হলেই আমি খুশিতে আত্মহারা হই, আবার সামান্য লোকসান হলেই বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। আমি স্বভাবত আলস্যপ্রবণ, কাজ করি ধীরেসুস্থে, বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না আমার।

: আমি পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পালন করি না। কখনও পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করি না। কখনও জপতপ করি না। কখনও আত্মসংযম পালন করি না। পূজাআর্চা বা দানধ্যানের অনুষ্ঠানেও উৎসাহ নেই আমার।

: আমি হাস্যরসের অত্যধিক ভক্ত। সব-কিছু নিয়ে রসিকতা করা আমার অভ্যাস। আমি বিদূষকের মতো আচরণ করতে ভালবাসতাম। ভাঁড় সাজতে আমার মহা উৎসাহ। আমি প্রায়শ এমন শব্দ উচ্চারণ করি যা যা মুখে আনতে লজ্জাবোধ করা উচিত। অথচ আমি

পরমানন্দে অশ্রাব্য কাহিনী এবং বাহাদুরের নানা গল্প ফেঁদে বসি। আমি কাল্পনিক কাহিনী বলতে ভালবাসি। কখনও কখনও স্রেফ কেলেঙ্কারির কেচ্ছা। আমি অবশ্য সেগুলোকে সত্য বলেই চালিয়ে দিই। বিশেষত, আসরে যখন অনেক শ্রোতা। আমি যখন মজা করতে চাই, তখন মিথ্যা বা কাল্পনিক গল্প বলতে আমায় আটকায় কে?

: যখন আমি একা, তখন, কখনও কখনও আমি আপন খেয়ালে নাচি।...

এই জবানবন্দি সাধারণ একজন অসাধারণ মানুষের। সাধারণ, কারণ বানারসীদাস সাধারণ একজন জৈন ব্যবসায়ী। অসাধারণ, কারণ, ষোড়শ শতকের ভারতে জন্মগ্রহণ করেও তিনি কাগজ কলম নিয়ে বসেছিলেন তাঁর জীবনকাহিনী শোনাতে। প্রাচীন ভারতীয় রীতির কথা মনে রাখলে বোধহয় এর দ্বিতীয় কোনও নজির নেই। বানারসীদাসের জন্ম খ্রিস্টীয় ১৫৮৬ অব্দে, আকবর বাদশার আমলে। তিনি আকবর এবং জাহাঙ্গীরের আমলের মানুষ। সকলেই জানেন, ঠিক আত্মচরিত না হলেও মুঘলদের মধ্যে স্মৃতিকথা বা জার্নাল ধরনের রচনা লেখার চল ছিল। আরবি-পারসি দুনিয়ায় তার ঐতিহ্য অনেকদিনের। তৈমুর এবং চেঙ্গিস খান পর্যন্ত স্মৃতিচর্চা করেছেন। সেই ধারা মুসলিম ভারতেও বহমান। বাবর স্মৃতিকথা লিখেছেন। লিখেছেন হুমায়ুন-কন্যা গুলবদন। তার পর জাহাঙ্গীর। এবং আরও কেউ কেউ। অনেক মুসলিম ঐতিহাসিকও ইতিহাস লিখতে বসে প্রসঙ্গত নিজের কাহিনীও শুনিয়েছেন। যথা: বার্নি, ইবন বতুতা, বাদাউনি। মধ্যযুগের ভারতে এমনকী সাধারণ মুসলিম ভাগ্যান্বেষীর আত্মকাহিনীর সন্ধান মেলে। প্রসঙ্গত সুলতানি আমলের একজন বান্দার আপন কথার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তামস খান। তাঁর লেখা তামসনামা মধ্যযুগের ইতিহাস-গবেষকের কাছে স্বভাবতই মূল্যবান দলিলের মতো। সুতরাং, বানারসী যদি এই সব দৃষ্টান্ত দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতেন তবে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু মুসলিম ঐতিহ্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে বলে মনে হয় না। কেননা, যদিও মুঘলযুগের মানুষ, এবং তাঁর চার পাশ ঘিরে রয়েছে মুসলমান শাসক এবং শাসিত, আমীর এবং গরিব— তবু আত্মচরিতে তাঁরা বলতে গেলে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে দুটি মুসলিম-প্রধান শহরে। একটি তার আগ্রা, অন্যটি জৌনপুর। এই দুই শহর বলতে গেলে মুসলিম শাসকদেরই হাতে গড়া। অনেক দর্শনীয় প্রাসাদ, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব ছিল এই দুই শহরে। কিন্তু বানারসীর আত্মচরিতে দুটি অদৃশ্য নগরী, কিছুই চোখে পড়ে না তাঁর। তিনি আরবি ফারসি ভাষা জানতেন না। ফলে ওই সূত্রে আরবি-ফারসি ঐতিহ্যে দীক্ষিত হওয়ার সুযোগ ছিল না। তাঁর দুনিয়া একান্তভাবে নানা গোষ্ঠী, জৈন ব্যবসায়ীদের নিয়ে গড়া এক একান্ত আপন পৃথিবী। সে পৃথিবীতে আত্মজীবনীর নজির কোথায়? সপ্তম শতকে লেখা বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'-এ অবশ্য কবি কিছুটা নিজের কথা বলেছেন। একাদশ শতকে একই ভঙ্গিতে বিহ্লন বলেছেন আপন কথা। প্রাচীন ভারতীয় কবিরা কেউ কেউ অনুসরণ করেছেন সে-রীতি। বানারসীদাসও কবি। অনেক-বই লিখেছেন তিনি। ভক্তিগীতি। প্রেমগীতি। জৈন আচার, অনুষ্ঠান ধ্যান এবং দর্শন বিষয়ে বেশ-কিছু পদ্যগ্রন্থ আছে তাঁর। কিন্তু আত্মকথা কোনও গ্রন্থের ভূমিকা বা ভণিতা নয়, স্বতন্ত্র একখানা বই। প্রথম আত্মকথা রচনার গৌরব সে-কারণেই অর্জন করেছেন বানারসীদাস। সব-গবেষকই এ বিষয়ে একমত যে, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে তিনি অনন্য।

বানারসীদাসের আত্মকাহিনীর নাম— অর্থকথানক। নামটি অর্থপূর্ণ। ধর্মপ্রাণ জৈনরা

জন হ্যারিসনের চতুর্থ ঘড়ি। আধুনিক ক্রনোমিটারের আদি।

দরিয়ায় দ্রাঘিমার সন্ধানে
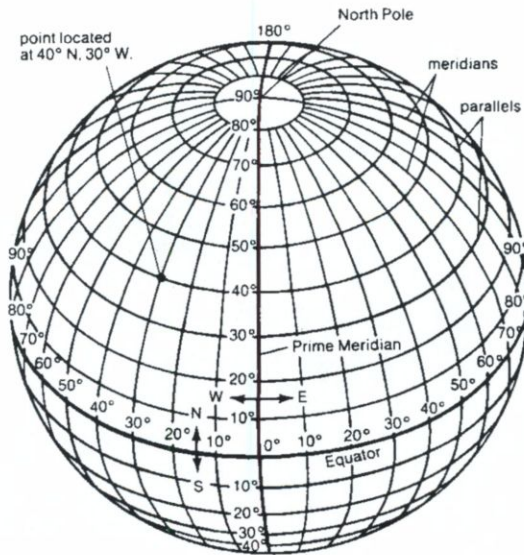
দ্রাঘিমা-রেখা। তা যা মানচিত্রে স্বাভাবিক, একদিন তা-ই নিয়ে কত-না কাণ্ড!

দরিয়ায় দ্রাঘিমার সন্ধানে
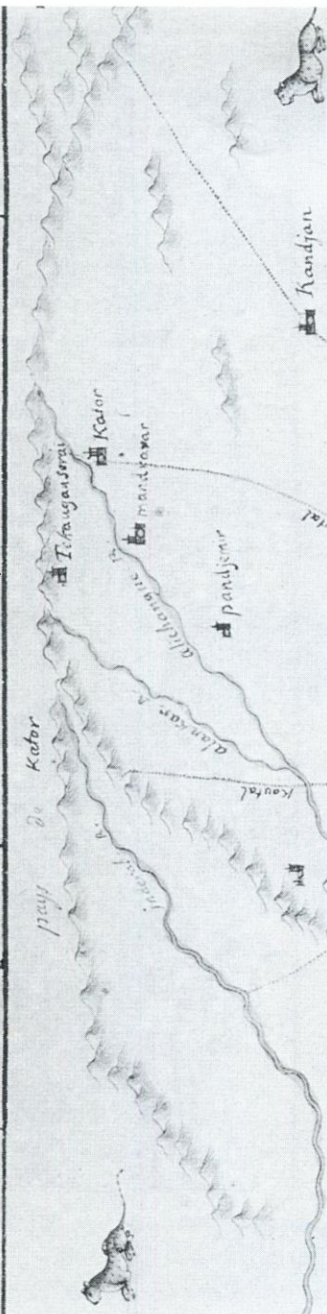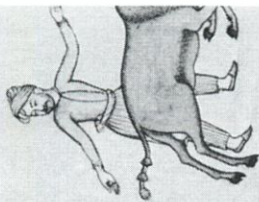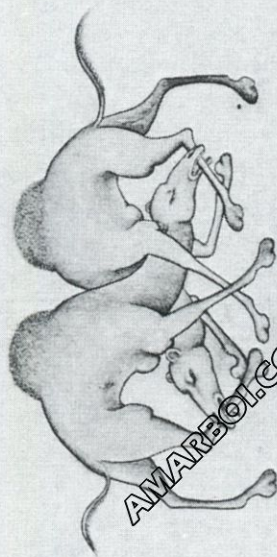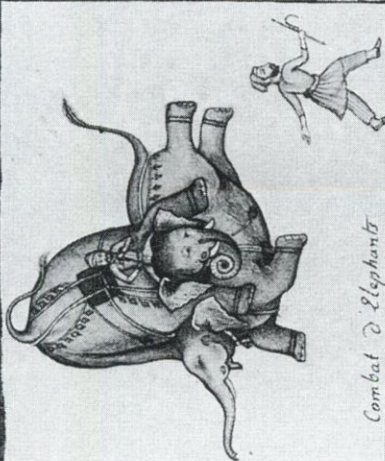
জাঁতিল-এর উদ্যোগে আঁকা ভারতের রঙিন মানচিত্রে 'কাবুল'। ফয়জাবাদের একজন শিল্পীর আঁকা।

ASIA SECVNDA PARS ERRE IN FORMA PEGASIR.

SEPTENTRIO.

OCCIDENS.

স্বর্গীয় অশ্বের অবয়বে এশিয়ার মানচিত্র। ম্যাগডেবুর্গ, ১৫৯৭।

ইউরোপের চোখে চতুর্দশ শতকের ভারত। ক্যাটালান-মানচিত্রের অংশ। পুনর্মুদ্রণ, জুরিখ। ১৯৭৮

চতুর্দশ শতকের ইউরোপের একটি মানচিত্র।
নিজেদের পৃথিবীর খোঁজে মানুষ

মাটির ফলকে মেসোপটেমিয়া-র (ইরাক) প্রাচীন বিশ্বের মানচিত্র।
নিজেদের পৃথিবীর খোঁজে মানুষ
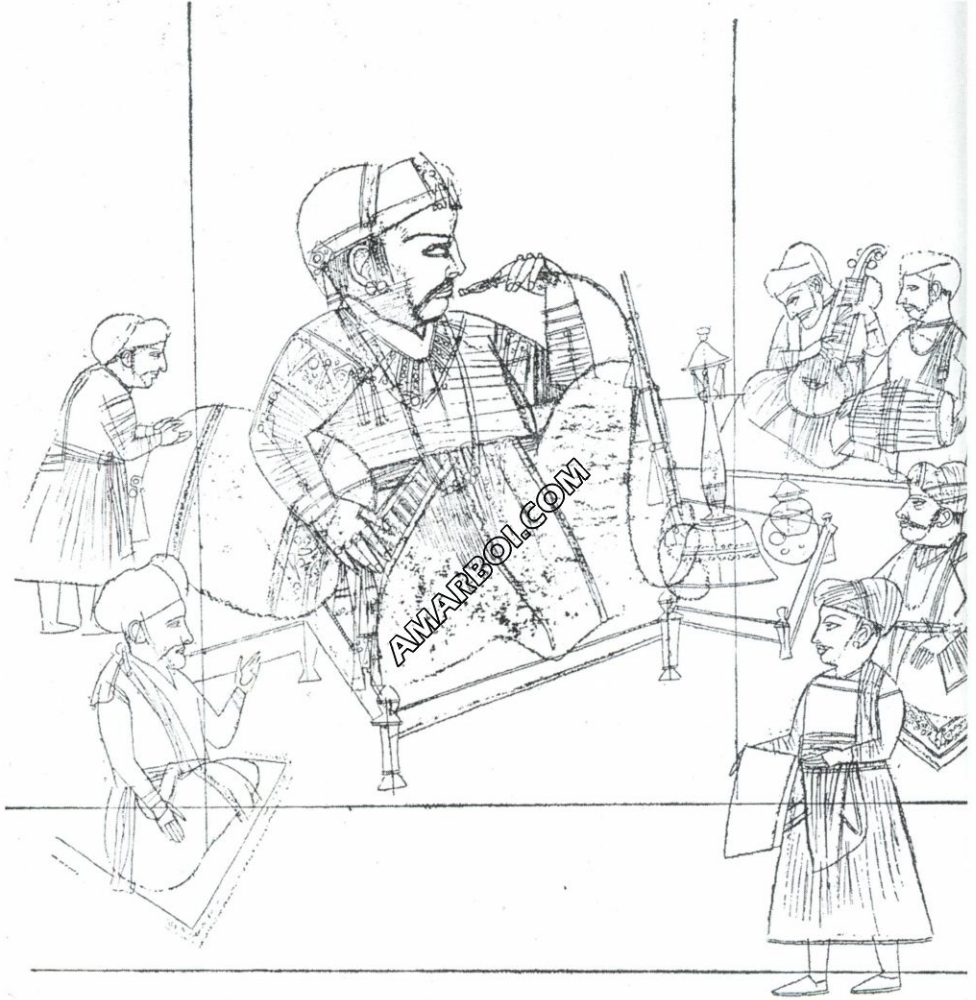
'অর্ধকথানক'-এর আর-একটি অলংকরণ। রেখাচিত্র। শিল্পী গণেশ পাইন।
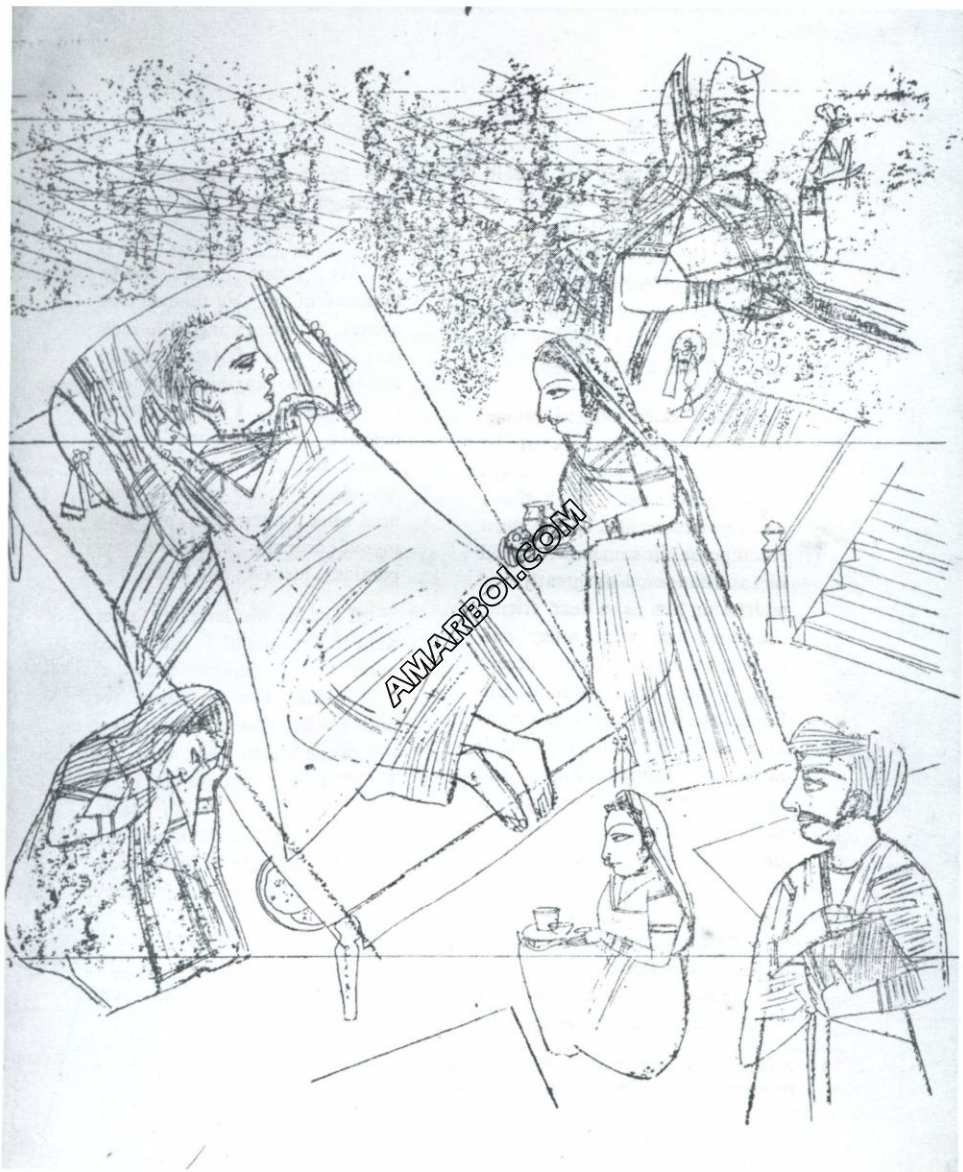
'অর্ধকথানক'-এর একটি অলংকরণ। রেখাচিত্র। শিল্পী গণেশ পাইন।

লন্ডনের পানীয় জলের এক বিন্দু। 'পাঞ্চ'-এর ব্যঙ্গচিত্র। উনিশ শতকের প্রথম দিকে লন্ডনে বিশুদ্ধ পানীয় জল ছিল দুষ্প্রাপ্য।

লুই পাস্তুর নিজেই পশুদের টিকা দিচ্ছেন। ১৮৮১

বিশ্বাস করেন মানুষের পরমায়ু একশো দশ বছর। বানারসী যখন তাঁর জীবনকাহিনী শোনাতে বসেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন। অর্থাৎ পরমায়ুর অর্ধেক মাত্র তিনি তখন যাপন করেছেন। সে-কারণেই অর্ধকথানক— অর্ধেক জীবনের কাহিনী। অর্থকথানক, আগেই বলা হয়েছে, লেখা হয় মুঘল-আমলে, ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে। আত্মজীবনীটি হিন্দিভাষায় লেখা। এবং পদ্যে। দীর্ঘ পদ্য। মোট ৬৭৫টি স্তবক। বেশির ভাগই 'দোহা' এবং 'চৌপাই'। বানারসী লিখেছেন, তিনি মধ্যদেশে প্রচলিত হিন্দিভাষায় তাঁর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মধ্যদেশের ভূগোল সম্পর্কে এক-একজন প্রাচীন লেখক এক-এক মত প্রকাশ করেছেন। মনুস্মৃতির যে মধ্যদেশ তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পুবে প্রয়াগ, পশ্চিমে সারহিন্দ মরুভূমি। বানারসীর মধ্যদেশে রোটকও রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন তাঁর হিন্দি খারিবোলি প্রধান আজকের হিন্দি নয়, কোনও বিশেষ এলাকার কথ্যভাষাও নয়, ব্রজভাষা খারিবোলি এবং ভোজপুরীর এক অনবদ্য মিশ্রণ। বানারসীর কালে নাকি হিন্দিতে ব্রজভাষার অনুপাত বেশি ছিল। মথুরা আগ্রা অঞ্চলে প্রধান ভাষা তখন ব্রজভাষা। আবার বেনারস জৌনপুরের প্রধান ভাষা ভোজপুরি। এই দুই অঞ্চলেই কেটেছে বানারসীর বাল্য এবং যৌবনের অনেকখানি। সুতরাং, ভাষায় তার প্রভাব স্বাভাবিক। তবে বলাই বাহুল্য, ভাষা-মাধুর্যের জন্য নয়, অহিন্দিভাষী মানুষের কাছে অর্ধকথানক-এর গুরুত্ব তার বিষয়বস্তুর জন্য। বানারসী তাঁর আপন বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন প্রথম পুরুষে। তবু, অবলীলায় তিনি আমাদের নিয়ে যান মুঘল আমলে, ধূসর অতীতে। প্রবলপ্রতাপ মুঘল সম্রাটদের ঐশ্বর্য, প্রভুত্ব, অপরিমিত ক্ষমতা আর বিলাসিতার কাহিনী শোনাতে বসেননি তিনি। বানারসী শুনিয়েছেন ওই বিশাল সাম্রাজ্যে একজন সাধারণ জৈন ব্যবসায়ীর জীবন। তাঁর পরিবার-পরিজন, সংসার, ব্যাবসা-বাণিজ্য লাভ-লোকসান, প্রেম-পরিণয়, সুখ-দুঃখ। সেইসঙ্গে কথাচ্ছলে আপন সম্প্রদায়ের কাহিনীও।

অর্ধকথানক কোনও লুপ্ত বা দুষ্প্রাপ্য পুথি নয়। আধুনিক কালেই নাথুরাম প্রেমী এবং মমতাপ্রসাদ গুপ্ত এই পুথির দুটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত গবেষণাপত্র 'ইন্ডিকা'র দুটি সংখ্যায় অর্ধকথানক-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। বছর কয়েক আগে (১৯৮১) প্রকাশিত হয়েছে আরও একটি ইংরেজি অনুবাদ। এবার বই হিসাবে। অনুবাদক এবং সম্পাদক মুকুন্দ লাঠ (Mukund Lath)। চমৎকার অনুবাদ। সেইসঙ্গে দীর্ঘ ভূমিকা, এবং বিস্তারিত টীকাভাষ্য। সব মিলিয়ে অসাধারণ কাজ। বইটিতে কিছু ছবি এঁকেছেন গণেশ পাইন। মুঘল রাজপুত মিনিয়েচার ভেঙে নতুন শৈলীতে জাদুকরের মতো তিনি ফিরিয়ে এনেছেন পুরনো দিনের আমেজ। সব মিলিয়ে মুকুন্দ লাটের অর্ধকথানক ইতিহাসপাঠকের কাছে সম্মোহনীর মতো। সে-কারণেই আজ বানারসীর কাহিনী অন্যদের না শুনিয়ে পারা যায় না। আমি এই আলোচনায় প্রধানত মুকুন্দ লাটের অনুবাদে পরিবেশিত, তথ্যাদিই ব্যবহার করেছি। সে-কারণে গবেষকের কাছে কৃতজ্ঞতা। অবশ্য আমার কাছে কাহিনীর যে অংশটুকু প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে আমি সেটুকুই শুনিয়েছি। ধারাবাহিকতা মানি না। এবং স্বভাবতই কোনও মন্তব্য যদি কোথাও করে থাকি তবে একান্তভাবে তা আমারই।

বানারসী জৈন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় শ্রীমলদের ঘরের সন্তান। ওঁরা রাজপুত। আদি নিবাস ছিল রোটকের কাছে বিহোলি গ্রামে। পরিবারের লোকেরা গলায় মালা ধারণ করতেন

বলেই শ্রীমল। মুঘল আমলে শ্রীমল উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় সব বাণিজ্যকেন্দ্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন। কোনও কোনও শ্রীমল মুসলিম শাসকদের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদও অলংকৃত করেছেন। বানারসীর পিতামহ মূলদাসও মালবের নরওয়ারে একজন মুসলিমের অধীনে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন হুমায়ুনের একজন প্রধান আমীর। মূলদাস হিন্দি ছাড়াও ফারসি জানতেন। তিনি তাঁর মনিবের হয়ে সুদের কারবার করতেন। ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে মূলদাসের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। নাম রাখা হল খড়্গসেন। দু' বছর পরে মূলদাস আবার পুত্রলাভ করেন। এবার ছেলের নাম রাখলেন তিনি ঘনমল। কিন্তু তিন বছর পরে সে ছেলে মারা গেল। ছেলের শোকে মারা গেলেন বাবাও। সেটা ১৬১৩ বিক্রমাব্দের কথা। বানারসী সন তারিখ সম্পর্কে খুবই সজাগ। যে-কোনও ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি সন তারিখ উল্লেখ করেছেন। কোন মাস, কী তিথি—সবই তাঁর কাছে জরুরি। তবে সন বলতে সর্বক্ষেত্রেই নির্দেশ করেছেন বিক্রমাব্দ। (বিক্রমাব্দ থেকে ৫৭ বছর বাদ দিলে পাওয়া যায় খ্রিস্টাব্দ।) যাই হোক, মূলদাস মারা যাওয়ার পর তাঁর মনিব সব বিষয় সম্পত্তি দখল করে নেন। বলেন— সবই তো আমার। সুতরাং, নাবালক পুত্র খড়্গসেনের হাত ধরে মূলদাসের বিধবাকে নামতে হল পথে। নরওয়ার ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে জৌনপুরে।

জৌনপুরে কিশোর খড়্গসেন আর তার মাকে আশ্রয় দিলেন মদনসিং শ্রীমল নামে একজন গহনাব্যবসায়ী। তিনি খড়্গসেনের মায়ের বাবার বড়ভাই। সম্পর্কে মাতামহ। তিনি অনাথ বিধবাকে সান্ত্বনা দিলেন— রোদ আর ছায়ার মতো পর্যায়ক্রমে আসে সুখ আর দুঃখ। অপেক্ষা করো। তোমাদেরও দিন ফিরবে।

ওঁরা জৌনপুরে মদনসিং শ্রীমলের আশ্রয়ে নতুন জীবন শুরু করলেন। সে জীবন বুঝিবা ছায়াময়। জৌনপুর তখন উত্তরভারতের প্রসিদ্ধ শহর। বেনারস থেকে উত্তর-পশ্চিমে ৭০ মাইল দূরে গোমতীতীরে এই শহরের পত্তন করেছিলেন ফিরোজ শা তুঘলক। সেটা ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দের কথা। তাঁর প্রিয় আত্মীয় সুলতান মুহম্মদ ওরফে জুনা শা'র স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যই জৌনপুর। জৌনপুরের গৌরবের কাল ছিল চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগ থেকে পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত মোটামুটি একশো বছর। জৌনপুরের তখতে তখন সারকি সুলতানরা। তাঁদের রাজত্বের পরিধি ছিল বিশাল। এই 'পুবের সুলতান'দের আমলে জৌনপুর দিল্লির সঙ্গে পাল্লা দিত। ১৪৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে বাহলোল লোদি জৌনপুরকে দিল্লি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' কাব্যে আছে দিল্লির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সেই জৌনপুরের বিবরণ।

বানারসীও জৌনপুরের বিবরণ রেখে গেছেন। এই জৌনপুরেই তাঁর বাল্য কেটেছে। প্রথম যৌবন কেটেছে। ঘুরে ঘুরে তিনি ফিরে এসেছেন জৌনপুরে। সুতরাং, তাঁর আত্মকাহিনীতে জৌনপুর-কথা থাকবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু পড়তে পড়তে মনে হয় বিবরণটা কিছুটা অস্বাভাবিক। গোমতীর বর্ণনাটি অবশ্য সুন্দর। বানারসী লিখেছেন— গোমতী বয়ে চলেছে দক্ষিণে, তার পর বাঁক নিয়ে পুবে, তার পর কিছুদূর গিয়ে উত্তরে। যেন শহরকে ঘিরে পরিখা। বানারসী জৌনপুরের ইতিহাস বিবৃত করেছেন। সন-তারিখ এবং ঐতিহাসিক পুরুষদের নাম ইত্যাদিতে গোলমাল থাকলেও তাঁর উদ্‌যোগ নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তার পরই কবিকল্পনা তাঁকে নিয়ে গেছে যেন এক কল্পলোকে। বানারসী বলছেন— জৌনপুর ৫২'র শহর। এখানে সবকিছুই বাহান্নটি করে। যথা: ৫২টি পরগনা,

৫২টি পাইকারি বাজার, ৫২টি খুচরো কেনাবেচার জায়গা, ৫২টি সরাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। শহরের ঘরবাড়ির কথাও বলেছেন তিনি। কিন্তু জৌনপুরের বিখ্যাত মসজিদ-মাদ্রাসার কোনও উল্লেখ নেই। সব মিলিয়ে এক কল্পনগরী রচনা করেছেন বানারসী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ছাড়াও শহরে ছত্রিশ জাতের শূদ্রের তালিকা দিয়েছেন তিনি, কিন্তু নগরীর শাসক মুসলিম সম্প্রদায়ের কথা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তা ছাড়া, জৌনপুর তখন আর অতীতের সেই দ্বিতীয় দিল্লি নয়, তার গৌরবের দিন তখন গত। কোথায় তখন বাহান্ন পরগনা, বাহান্ন বাজার! ইতিহাস বলে হুমায়ুন জৌনপুরকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। আকবরের আমলে, ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জৌনপুর এক বিস্তীর্ণ সুবার প্রধান নগরী ছিল বটে, কিন্তু সে বছর সেই গৌরব দেওয়া হয় এলাহাবাদকে। বানারসী আমলের জৌনপুর কোনও সুবা নয়, 'সরকার'-এর কেন্দ্র মাত্র। সুতরাং, ধরে নেওয়া যায়, জৌনপুর তাঁর ভালবাসার শহর বলেই বানারসীর কাছে তখনও সে-শহর নানা গরিমায় অলংকৃত।

জৌনপুরে কিশোর খড়্গাসেনের নতুন জীবন শুরু হল। আট বছর বয়সে তাকে স্কুলে পাঠানো হল। খড়্গাসেন অচিরেই লিখতে পড়তে শিখে গেল। সেইসঙ্গে শিখল আসল এবং ভেজাল সোনা-রুপা চিনতে। আসল টাকা আর জাল টাকার ফারাকও লহমায় বুঝতে পারে সে। ঠিকঠাক লিখতে পারে সুদের কারবারের খত। চার বছরের মধ্যেই নিজে ব্যাবসা শুরু করল খড়্গাসেন। তার পর গোপনে মায়ের অনুমতি নিয়ে নিঃশব্দে একদিন ভাগ্যের সন্ধানে যাত্রা করল বাংলা মুলুকের দিকে।

বাংলায় তখন পাঠান আমল। সেখানে সুলতানের নিকট-আত্মীয় জনৈক লোদি খানের দেওয়ান ছিলেন একজন শ্রীমল। নাম তাঁর— রাইধন। খড়্গাসেন গিয়ে হাজির হলেন তাঁর কাছে। রাইধন তরুণকে গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁকে চারটি পরগনার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিলেন। খড়্গাসেন দেওয়ানের হয়ে রাজস্ব আদায় করে তাঁর কাছে জমা দেন। এভাবেই চলছিল। এভাবে চললে হয়তো অচিরেই তাঁর দিন ফিরে যেত। কিন্তু তার আগেই বিপত্তি। খড়্গাসেন কাজ পাওয়ার ছয়-সাত মাসের মধ্যেই রাইধন সুলতানের অনুমতি নিয়ে তীর্থযাত্রায় বের হলেন। সঙ্গে তীর্থযাত্রীদের বিরাট দল। সেকালে এটাই ছিল প্রথা। সাধারণত তীর্থযাত্রীরা বের হতেন কার্তিক মাসে। কোনও সম্পন্ন জৈন দূর কোনও তীর্থে যাত্রায় উদ্‌যোগী হলে চার দিকে আপন সম্প্রদায়ের লোকেদের কাছে খবর পাঠাতেন তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে। বিশিষ্টরা ব্যক্তিগত চিঠিও পেতেন। আমন্ত্রণপত্র। তার পর সদলবলে মহা উৎসাহে শুরু হত যাত্রা। রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীনের তীর্থযাত্রার কথা আছে কবিতায়। বানারসীর কাব্যে আছে জৈন ব্যবসায়ীদের দলবদ্ধ হয়ে দূর দূর তীর্থ-পরিক্রমার কথা। অর্থ ও ক্ষমতাবান জৈনদের সঙ্গে সাধারণ দাসদাসী লোকজন ছাড়াও থাকত সশস্ত্র বাহিনী। বানারসীও মনে হয় একা কখনও তীর্থদর্শনে বের হননি। কখনও তিনি বের হয়েছেন বন্ধুদের নিয়ে, কখনও বা কোনও বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠীর সঙ্গী হয়ে। সে-প্রথা অনুসারেই বাংলা থেকে রাইধন যখন তীর্থযাত্রায় বের হন, তখন সঙ্গী ছিলেন খড়্গাসেন।

রাইধন তীর্থ-পরিক্রমা শেষে আবার ফিরে এলেন বাংলায়। বাংলার ঠিক কোথায় তা উল্লেখ করেননি বানারসী। কিন্তু যেদিন তিনি ফিরে আসেন সেদিনই মণ্ডপে জপের মালা হাতে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু। বিপন্ন খড়্গাসেন তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করলেন। রাইধন ছিলেন তাঁর সর্বস্ব। তিনি যখন নেই তখন আর এখানে থাকার অর্থ হয় না। ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে তিনি

ঘুরতে ঘুরতে ফিরে এলেন জৌনপুরে। চার বছর পরে তাঁর বয়স যখন আঠারো তখন আবার ঘর ছাড়লেন তিনি। এবার আগ্রায়। সেখানে পরিচিত বলতে ছিলেন বাবার এক খুড়ো। নাম সুন্দরদাস। আগ্রায় তাঁর সোনা-রুপোর গহনার কারবার। খড়্গাসেনকে তিনি ব্যবসায়ের অংশীদার করে নিলেন। অবশ্য খড়্গাসেন কিছু নগদ অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন। হাতে কিছু পয়সা এল। সুতরাং চার বছর পরে মীরাটে খড়্গাসেনের বিয়ে। সুরদাস ধর নামে একজন শ্রীমলের কন্যাকে বিয়ে করেন তিনি। বিয়ে করে আবার ফিরে আসেন আগ্রায়। দেখতে দেখতে ব্যাবসা জমে উঠল। হাতে কিছু টাকাও জমল খড়্গাসেনের। এদিকে নতুন বউয়ের সঙ্গে সুন্দরদাসের স্ত্রীর বনিবনা হচ্ছে না। সংসারে অশান্তি। খড়্গাসেন আলাদা বাড়ি নিলেন। তার পর স্ত্রীকে নিয়ে উঠে গেলেন সেখানে। এবার অন্য সমস্যা। দু'বছরের মধ্যে সুন্দরদাস ও তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। ওঁদের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। একটি মাত্র কন্যা ছিল সুন্দরদাসের। পঞ্চায়েত ডেকে খড়্গাসেন তাঁকে বাবার ব্যবসায়ের অর্থ দিয়ে দিলেন। তার পর নিজের অংশ বুঝে নিয়ে ফিরে চললেন জৌনপুরে। গোরুর গাড়িতে মালপত্র চাপিয়ে, ঘোড়ার পিঠে। সঙ্গে অনেক পাহারাওয়ালা।

জৌনপুরে ফিরে দশদিনের মধ্যে বাজারে নিজের দোকান খুললেন খড়্গাসেন। তাঁর সঙ্গে অংশীদার হিসাবে যোগ দিলেন রামদাস আগরওয়াল নামে জৌনপুরের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। জহুরির কারবার ওঁদের। বড় ব্যাবসা।

দিন ভালই কাটছিল। ১৬৩৫ বিক্রমাব্দে খড়্গাসেনের একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিল। কিন্তু দশ দিনের মধ্যে শিশুটি মারা গেল। দু' বছর পরে স্ত্রীকে নিয়ে সতীর থানে পুজো দিতে গেলেন খড়্গাসেন। পথে ডাকাতে সর্বস্ব কেড়ে নিল ওঁদের। একবস্ত্রে ওঁরা ঘরে ফিরে এলেন। কিছুদিন পরে আবার একই স্থানে গিয়ে পুজো দিয়ে এলেন ওঁরা। জৌনপুরে ফিরে এসে খড়্গাসেন আবার মন দিলেন ব্যবসায়ে। তাঁদের আশ্রয়দাতা এবং পরমাত্মীয় মদনসিং তখন ব্যাবসা থেকে অবসর নিয়েছেন। বলতে গেলে তিনি সম্পূর্ণ বিবাগী হয়ে গেছেন। দিনরাত কাটে তাঁর ধর্মচিন্তায়। তাঁর অন্তরাত্মা তখন শান্তির জন্য ব্যাকুল। মদনসিংয়ের মৃত্যুর পর তৃতীয়বারের মতো একই সতীর থানে পুজো দিতে যাত্রা করলেন খড়্গাসেন। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে আবার একটি সন্তান এল ওঁদের ঘরে। এবারও পুত্রসন্তান। ছেলের নাম রাখা হল বিক্রমজিৎ। ছয় মাস ধরে বাড়িতে নৃত্য-গীত, আনন্দ-উৎসব। দীয়তাং ভুজ্যতাং।

কিছুদিন পরে বিখ্যাত একটি জৈন তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করলেন ওঁরা। সেখানেই আদেশ পেয়েছিলেন, যে শহরে পার্শ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই শহরের নামে নাম রাখো সন্তানের। সে-কারণেই বানারসী। বানারসীদাস। কেননা, দুই-দুইজন পার্শ্বনাথ আবির্ভূত হয়েছিলেন বারাণসীতে। বারাণসী থেকেই— বানারসী।

সংক্ষেপে পিতৃকাহিনী বিবৃত করে নিজের উপাখ্যান শুরু করেছেন বানারসী। তাঁর বাবা কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেও তিনি মোটামুটি সম্পন্ন ঘরের সন্তান। শৈশবে দু'বার তাঁর প্রাণসংকট দেখা দেয়। একবার পেটের রোগ। আর-একবার বসন্তের আক্রমণ। শেষ পর্যন্ত সেরে ওঠেন বানারসী। আট বছর বয়সে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে তাঁকে পাঠানো হয় লেখাপড়া শিখতে। বানারসী লিখেছেন মাত্র একবছর তাঁর কাছে পড়েছিলেন তিনি। তারই মধ্যে পড়তে এবং লিখতে শিখে ফেলেন। নয় বছর বয়সে এল বিয়ের প্রস্তাব। পাত্রী কল্যাণমল তাম্বী নামে খয়রাবাদের

একজন ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা। একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের হাত দিয়ে তিনি খড়্গসেনের কাছে পত্র পাঠালেন। সঙ্গে এল ওঁদের পরিবারের পরামানিক। কোনও কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, কনে দেখার বালাই নেই। খড়্গসেন প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। বানারসীর কপালে আনুষ্ঠানিকভাবে তিলক দিয়ে দেওয়া হল। বাবা বললেন— বিয়ে হবে দু'বছর পরে। তখনই দিনক্ষণ স্থির করে কল্যাণমলকে পত্রযোগে তা জানিয়ে দেওয়া হল।

বিয়ের তারিখ পাকা হয় ১৬৫২ বিক্রমাব্দে। পরের বছর জৌনপুরে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। জিনিসপত্রের আকাল। যা মেলে অগ্নিমূল্য। বানারসী লিখছেন— লোকের দুর্দশার শেষ নেই। কিন্তু দুর্ভিক্ষের কার্যকারণ বা বিস্তারিত বিবরণ দেননি তিনি। মনে হয় এ-সব বিপদকে মানুষ তখন স্বাভাবিক বিপর্যয় বলে গ্রহণ করতেই অভ্যস্ত। বিশেষত মোটামুটি সুখী এবং সম্পন্নরা। যা হোক, তার পরের বছর, ১৬৫৪ বিক্রমাব্দে বানারসী খয়রাবাদ চললেন বিয়ে করতে। তাঁর বয়স তখন সবে এগারো।

নতুন বউকে নিয়ে যেদিন তিনি জৌনপুরে ফিরে আসেন সেদিনই তাঁর একটি বোন ভূমিষ্ঠ হয়। আর সেদিনই একই বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন খড়্গসেন-মাতামহী, মদনসিংয়ের বৃদ্ধ বিধবা। বানারসী লিখেছেন একমাত্র নির্বোধই এইসব ঘটনায় অবিচলিত থাকতে পারে, জ্ঞানী মানুষ এ-সব থেকেই বুঝতে পারেন মনুষ্যজীবনের দীনতা, অর্থহীনতা!

দু'মাস পরে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এসে কনেকে নিয়ে গেলেন। আর তার পরেই জৌনপুরের জহুরি, স্বর্ণকার এবং রৌপ্যকারদের জীবনে নেমে এল বিপর্যয়। সেখানে এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সহসা স্থানীয় শাসক কিলিজ খানের রোষে পড়লেন। তিনি তাঁদের কয়েদ করলেন। বানারসী লিখেছেন— তাঁদের কাছে এমন কিছু দাবি করা হয়েছিল যা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। দাবিপত্রটি বিশদ করেননি বানারসী। জহুরিরা অসমর্থ হলে কিলিজ খান অপমানিত বোধ করেন। একদিন সকালে তাঁদের ধরে এনে তিনি সার বেঁধে শিকলে বাঁধলেন, তার পর শুরু হল চাবুক মারা। মারতে মারতে ওঁরা যখন মৃতপ্রায়, তখন কিলিজ বললেন— এবার তোমরা যেতে পারো। ছাড়া পেয়ে জহুরি এবং গহনাব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে স্থির করলেন— এ-শহরে আর নয়। তাঁরা জৌনপুর ছেড়ে পালালেন। যিনি যেদিকে পারেন। খড়্গসেন পরিবার নিয়ে পালালেন পশ্চিম দিকে। তিনি সাজাদপুরে পৌঁছোলেন। সেদিন তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। বিপন্ন খড়্গসেন তাঁর পরিবারের লোকজনদের নিয়ে আশ্রয় নিলেন একটি সরাইখানায়। তাঁর দুঃখের বুঝিবা শেষ নেই। সেই দুঃখের রাতে দেবদূতের মতো তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন করমচাঁদ মাহুর নামে একজন বানিয়া। তিনি খড়্গসেন এবং তাঁর পরিবারকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। তাঁর আতিথেয়তায় কোনও ত্রুটি ছিল না, লিখেছেন বানারসী।

তিন মাস পরে খড়্গসেন প্রয়াগ যাত্রা করেন। আকবরের নিজের সন্তান দানিয়েল তখন সেখানে শাসক। খড়্গসেন ভাবলেন হয়তো সেখানে ব্যবসায়ের সুযোগ পাওয়া যাবে। পরিবারের অন্যদের সাজাদপুরে রেখে তিনি প্রয়াগে ব্যাবসা গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করলেন। তরুণ বানারসী নিজেও তখন একজন ছোটখাটো ব্যবসায়ী। তিনি সাজাদপুরের স্থানীয় বাজারে কড়ি কেনাবেচা করেন। দু'-চার পয়সা হয়। লাভের কড়ি তিনি তুলে দেন ঠাকুমার হাতে। বৃদ্ধা তা-ই দিয়ে পারিবারিক দেবী সতী আউত-এর পুজো দেন।

তিন মাস পরে, অর্থাৎ জৌনপুর ছাড়ার তেরো মাস পরে প্রয়াগ থেকে খড়্গসেনের চিঠি

এল সাজাদপুর থেকে বাড়ির লোকজনদের নিয়ে ফতেপুর চলে আসতে। বানারসী যাত্রার উদ্‌যোগ করলেন। দুটি পালকি ভাড়া করা হল। চারজন কাহার। তার পর সবাইকে নিয়ে বাবার নির্দেশমতো চললেন তিনি ফতেপুর। ফতেপুরে পৌঁছে তিনি সেখানকার ওসওয়াল জৈনদের মহল্লার খোঁজ করলেন। মনে হয় উত্তরভারতের নানা কেন্দ্রে ব্যবসায়ী জৈনরা তখন দলবদ্ধভাবে এক-একটি পল্লী বা মহল্লায় বাস করতেন। ফতেপুরে ওঁরা আশ্রয় নিলেন সেখানকার বিখ্যাত জৈন ব্যবসায়ী বাসু শা'র পুত্র ভগবতী শা'র বাড়িতে। নিশ্চয় খড়্গাসেনের তা-ই নির্দেশ ছিল। পরবর্তী নির্দেশে বানারসীকে তিনি প্রয়াগে ডেকে পাঠালেন। পরিবারের লোকেরা ফতেপুরেই রয়ে গেল। বানারসী প্রয়াগ যাত্রা করলেন।

বেশ-কিছুদিন পরে প্রয়াগে পিতাপুত্রের মিলন হল। খড়্গাসেন তখন দামি পাথরের ব্যাবসা গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। সেই সুদের কারবার। অন্যান্য রকমারি পণ্য কেনাবেচার কাজও করেন তিনি। কখনও লাভ হয়। কখনও লোকসান। পিতাপুত্র অতঃপর চললেন প্রয়াগ থেকে ফতেপুর। সম্ভবত পরিবারের অন্যদেরও প্রয়াগে নিয়ে আসার জন্য। হয়তো তাঁদের ইচ্ছা ছিল প্রয়াগেই স্থায়ীভাবে বসবাসের। কিন্তু কখনও মেঘ, কখনও রৌদ্রের মতো এই সব ব্যবসায়ীর ভাগ্য। এবার ভাগ্য আবার প্রসন্ন। দু'মাসের মধ্যেই শোনা গেল জৌনপুরের শাসক অত্যাচারী কিলিজ খানকে আগ্রায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। জৌনপুর স্বাভাবিক, শান্ত। পলাতক ব্যবসায়ীরা সবাই একে একে নিজেদের পুরনো কেন্দ্রে ফিরে আসছেন। খড়্গাসেনও অতএব আর প্রয়াগে ভাগ্য পরীক্ষার চেষ্টা না-করে পরিবার পরিজন নিয়ে ফিরে চললেন জৌনপুর। মধ্যযুগের এই সব ব্যবসায়ীর উদ্‌যোগ, উদ্যম, সহ্যশক্তি এবং চলনশীলতা সত্যই দেখবার মতো। বানারসী থেকে থেকেই লিখেছেন— সবই কর্ম। সব-কিছুই কর্মফল, এ-কথা মেনে নিয়েও কিন্তু কখনও নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করেননি ওঁরা, নতুন উদ্যমে আবার শুরু করেছেন কর্মজীবন। ওঁরা হার মানতে জানেন না।

জৌনপুরে কিছু দিনের মধ্যেই আর-এক বিপদ। ১৬৫৬ বিক্রমাব্দের কথা। সহসা জৌনপুরের উপান্তে সসৈন্যে এসে হাজির হলেন আকবরের পুত্র সেলিম। শোনা গেল কাছাকাছি একটা বনে শিকার করতে এসেছেন তিনি। কিন্তু রটে গেল আসলে তিনি বিদ্রোহী। সেলিম জৌনপুর দখল করতে এসেছেন। আকবর জৌনপুরের শাসককে সতর্ক করে দিয়েছেন। জৌনপুরের শাসক তখন আর-এক কিলিজ খান। নবীন কিলিজ খান। ডাক নাম তাঁর— নুরম সুলতান। তিনি লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলেন। জৌনপুরে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষিত হল। সৈন্যরা শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করল। জৌনপুরে প্রবেশের সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হল। গোমতীর জলে নৌকো চলাচল বন্ধ। শহরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে পদাতিক আর অশ্বারোহীরা। প্রত্যেক মহল্লায় ফৌজ। কেল্লার সামনে কামান সজ্জা। জৌনপুর প্রস্তুত হল দীর্ঘ অবরোধের জন্যও। বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য, পোশাক পরিচ্ছদ এবং জল মজুত করা হল। প্রচুর মদ্যও সংগ্রহ করে সঞ্চয় করা হল। প্রস্তুতি শেষ। নুরম সুলতান এবার যুদ্ধের জন্য তৈরি।

ভয়ার্ত নাগরিকরা এদিক-ওদিক পালাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে শহর শূন্য। যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে তৎকালে শহরগুলোতে কী হত, সাধারণ মানুষ কী করতেন, তার মোটামুটি একটা বিশ্বস্ত বিবরণ দিয়েছেন বানারসী দাস। তিনি লিখেছেন— শেষ পর্যন্ত রয়ে

গেলেন একমাত্র জহুরিরা। সবাই তখন একসঙ্গে। তাঁরাও পরিবার পরিজন নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু ভেবে পাচ্ছেন না, কী করা যায়। নগরে কোনও নিরাপত্তা নেই। এদিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও নিরর্থক। তাতেও বিপদ। তাঁরা দলবেঁধে নুরম সুলতানের কাছে পরামর্শ চাইতে গেলেন। কিন্তু নুরম কী করবেন, তিনিও সমান অসহায় সেদিন। বললেন— আমার কাছে তোমরা মিছেই উপদেশ চাইছ, আমি নিজেই মৃত্যুফাঁদে বসে আছি। তোমরা জৌনপুরে থাকবে কি পালিয়ে যাবে, সেটা নিজেরাই স্থির করো। ওঁরা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে ঠিক করলেন— পালানোই সংগত। জহুরিরা পালালেন। জৌনপুরের প্রত্যেক জহুরি। যিনি যেদিকে পারেন। খড়্গসেন পালালেন লছমনপুরার কাছে একটি গ্রামে। সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন জৌনপুরের আর-এক ব্যবসায়ী দুলা শাহু। গাঁয়ের চৌধুরী ছিলেন লছমন দাস নামে একজন। তিনি খড়্গসেনকে অভয় দিলেন। বললেন— আমি পাশে আছি।

এক সপ্তাহের মধ্যেই খবর এল জৌনপুর স্বাভাবিক। নুরম সুলতান আত্মসমর্পণ করেছেন সেলিমের কাছে। সেলিম গোমতী তীরে পৌঁছে লালাবেগ নামে একজন দূতকে পাঠালেন জৌনপুরের শাসকের কাছে। লালাবেগ বুঝিয়েসুজিয়ে নুরম সুলতানকে নিয়ে চললেন বাদশাজাদার কাছে। শিবিরে পৌঁছে নুরম সেলিমের পায়ে পড়ে গেলেন। সেলিম বললেন— আমি তোমাকে মার্জনা করলাম। তুমি আমার সমর্থন পাবে।

আকবর-পুত্র সেলিম যে একসময় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন ইতিহাস পাঠকরা তা জানেন। কিন্তু তিনি জৌনপুর দখল করতে গিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। হয়তো নুরম সুলতান সেলিমের মতিগতি সম্পর্কে সন্দিহান হয়েই যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েছিলেন। যা হোক, জৌনপুরে শান্তি ফিরে এল। সেইসঙ্গে ফিরে এলেন শহরের নাগরিকরাও। জহুরিরাও ফিরলেন। ফিরলেন বানারসীর পরিবারও।

এ-ধরনের রাষ্ট্রীয় বিপত্তি সেকালে মাঝে মাঝে নেমে আসত জনজীবনে। বানারসীর আত্মকথায় জৌনপুরের জহুরিদের ওপর অত্যাচারের আরও একটি কাহিনী উল্লেখিত। সেটি ঘটেছিল অবশ্য অনেক পরে, আকবর নয়, জাহাঙ্গীরের আমলে।

সেবার অত্যাচারীর ভূমিকায় আগা মীর নামে একজন। ছোট কিলিজ খান তখন মারা গেছেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর আগা মীর নামে একজনকে শিরোপা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন জৌনপুর অঞ্চলে। বারাণসী এবং জৌনপুর এলাকায় তিনি ত্রাস সৃষ্টি করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর অত্যাচারের বিশেষ লক্ষ্য ব্যবসায়ীরা। নিষ্ঠুর আগা মীরের হাতে পড়ে তাঁরা অনেকে সেদিন মৃত অথবা মৃতপ্রায়। অসংখ্য মণিকার, লগ্নির কারবারি কুঠিয়াল এবং হুণ্ডিওয়ালা ও দালালকে তিনি কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। তাঁদের অপরাধ কী তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই আগা মীরের। নির্বিচারে শিকলে বেঁধে চাবুক মারা হতে লাগল তাঁদের। বানারসী তখন জৌনপুরের বাইরে। তিনি পালিয়ে ফিরতে লাগলেন।

আগা মীর হঠাৎ যেমন দুর্দৈবের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন তেমনই হঠাৎ একদিন ফিরে গেলেন আগ্রায়। বন্দি সওদাগরদের অধিকাংশকেই ছেড়ে দেওয়া হল। তবে বেছে বেছে সব চেয়ে বিত্তবানদের কয়েদ করে তিনি নিয়ে চললেন আগ্রায়।

আগা মীর কেন সেদিন অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বানারসী তা জানতেন না। জানলেও তিনি তা বলেননি। গবেষকরা বলছেন একজন জৈন সন্ন্যাসীর ওপর রাজকীয়

রোষের জের এ-সব। গণনা করে ওই সন্ন্যাসী নাকি সেলিমকে বলেছিলেন তাঁর সিংহাসনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কম। সিংহাসনে বসে ওই মিথ্যা ভবিষ্যৎবাণীর জন্য প্রতিশোধ নিয়েছিলেন জাহাঙ্গীর। হঠকারীর মতো তিনি হুকুম দিয়েছিলেন সব জৈনদের কয়েদ করতে। তাঁর সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল এমন প্রমাণ নেই। তবে বানারসীর বিবরণ বলছে বেনারস-জৌনপুর এলাকায় অন্তত জৈন ব্যবসায়ীরা সেদিন লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত।

আরও একটি রাষ্ট্রীয় সংকটের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। সেটা আকবরের মৃত্যু ঘিরে। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের কথা। বারানসী লিখছেন— বর্ষা শেষ। কার্তিক মাস। মহান সম্রাট আকবর আগ্রায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। দীর্ঘ বাহান্ন বছর রাজত্ব করেছেন তিনি। সেই বিপজ্জনক বার্তা ক্রমে এসে পৌঁছল জৌনপুরে। জনসাধারণ যেন হঠাৎ পিতৃহারা। পিতাকে হারিয়ে তাদের মনে নিরাপত্তার অভাব। সর্বত্র আতঙ্ক। ভয়ে সকলের হৃদয় কম্পমান, মুখ বিবর্ণ।

: আমি আমার বাড়ির সিঁড়ির উপর বসেছিলাম। হঠাৎ আঘাতের মতো সেই ভয়াবহ সংবাদ পৌঁছল আমার কাছে। আমি আতঙ্ক-উত্তেজনায় প্রবল বেগে কাঁপতে লাগলাম। আমার মাথা ঘুরে গেল। আমি ভারসাম্য হারিয়ে অচৈতন্য হয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেলাম। পাথরের মেঝেয় লেগে আমার মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। সবাই ছুটে এলেন আমাকে ধরতে। বাবা-মা বিপর্যস্ত মা আমার মাথা কোলে টেনে নিলেন। রক্ত বন্ধ করার জন্য এক টুকরো ন্যাকড়া পুড়িয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। আমাকে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। মা বিছানার পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন।

জৌনপুর শহরের অবস্থা বর্ণনা করেছেন বানারসী:

গোটা শহর যেন সেদিন কাঁপছে। ভয়ে সবাই বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলেন। দোকানিরা বন্ধ করে দিলেন দোকান। ধনীরা তাঁদের টাকাপয়সা এবং দামি পোশাক-পরিচ্ছদ মাটির তলায় পুঁতে ফেললেন। অনেকেই তাঁদের ধন-দৌলত এবং মালপত্র গাড়িতে চাপিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেললেন। প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ নিজ বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করতে লাগলেন। নিজেদের ঐশ্বর্য গোপন করার জন্য ধনীরা গরিবের মতো মোটা রুক্ষ পোশাক পরতে লাগলেন। তাঁরা মোটা কম্বল বা চাদর গায়ে দিয়ে শহরের পথে পথে ঘুরতে লাগলেন। মেয়েরা গয়না খুলে রেখে দিলেন। তাঁদের পরনে বিবর্ণ আটপৌরে পোশাক। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বলার উপায় নেই কে ধনী, কে গরিব। চার দিকে আতঙ্কের চিহ্ন। যদিও স্পষ্টত কোনও কারণ নেই। ধারে কাছে চোর-ডাকাতও নেই। দশদিন পরে এই উদ্‌বেগ উত্তেজনা স্তিমিত হল। আগ্রা থেকে চিঠি এল রাজধানীতে সব-কিছু যথাযথ। আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম সিংহাসনে বসেছেন। তিনি জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করেছেন। মুঘল সাম্রাজ্যে তিনিই সর্বেসর্বা। তাঁর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। শুনে সবাই আশ্বস্ত। বানারসীদের বাড়িতে আনন্দ উৎসব। এক কারণ, নির্ঝঞ্ঝাটে জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণ। দ্বিতীয় কারণ, বানারসীর রোগমুক্তি, ততদিনে তিনিও সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

আকবর রাজত্ব করেন ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ। সুতরাং, বাহান্ন নয়, তিনি রাজত্ব করেছিলেন পঞ্চাশ বছর। এই সামান্য ত্রুটিটুকু বাদ দিলে বানারসীর এই বিবরণ এক মূল্যবান দলিল। আকবরকে দেশের সাধারণ মানুষ কী চোখে দেখতেন, এই বিবরণে যেমন

তার আভাস মেলে, তেমনই সেকালে উত্তরাধিকার প্রশ্নে জনমনে কী ধরনের উৎকণ্ঠা দেখা দিত তারও একটা দৃষ্টান্ত এই বিবরণ। কোথায় আগ্রা, কোথায় জৌনপুর। তবুও জনমন উদ্‌বিগ্ন কে জানে অতঃপর কী!

লক্ষণীয়, জৈন ব্যবসায়ীদের ওপর দুই-দুইবার নিপীড়নের সাক্ষী বানারসী। দুইজন শাসকের জন্য তিনি এবং তাঁর পরিবার বিপন্ন। তবু দেশের মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁর কোনও ক্ষোভ বা বিদ্বেষ নেই। জৈন বলেই তাঁরা অত্যাচারিত হচ্ছেন, এ-ধরনের কোনও নালিশও শোনা যায়নি বানারসীর মুখে। মুসলিমদের ধর্মাচার বা শাসক হিসাবে তাঁদের দোষ-গুণ সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। বরং, জৌনপুরের এক মুসলিম শাসকের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্বের কথা সানন্দে উল্লেখ করেছেন তিনি। কিছুটা গর্বের সঙ্গেও বটে। তিনি লিখেছেন জৌনপুরের শাসক দ্বিতীয় কিলিজ খান তাঁকে ভালবাসতেন। এই কিলিজের বাবাই জহুরিদের ওপর অত্যাচার করেছিলেন। কিন্তু পুত্র পিতার মতো ছিলেন না। তিনি জ্ঞানী, সাহসী, এবং উদার প্রকৃতির মানুষ। বানারসী লিখেছেন— আমাদের বন্ধুত্ব ছিল অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর। কিলিজ হিন্দি কাব্যের অনুরাগী ছিলেন। বানারসীকে তিনি শিরোপা দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে মিলিতভাবে তিনটি হিন্দি গ্রন্থ চর্চা করেছিলেন, 'নামমালা', 'ছন্দকোষ' এবং 'শ্রুতবোধ'। এই বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু জৌনপুরের কোনও-একজন বাসিন্দা এই বন্ধুত্বের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ান। তিনি বানারসীর জীবন অতিষ্ঠ করে তোলেন। তাঁর কারসাজির ফলে বানারসীর প্রতি সুলতানের আগ্রহও এক সময় কমে আসে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত মেঘ কেটে যায়। বানারসী আবার জৌনপুর-শাসকের বন্ধুত্ব ফিরে পান!

বানারসীর কাছে শাসকরা অতএব সব সময় ত্রাস নন, কখনও কখনও রীতিমতো বান্ধব!

রাজনৈতিক কাহিনী ওই পর্যন্ত। এবার বানারসীর নিজের কাহিনীতে ফেরা যাক। পরিবার পরিজনের সঙ্গে এলাহাবাদ ফতেপুর থেকে জৌনপুরে ফিরে আসার পর সেলিমের তথাকথিত অভিযান। সে-হাঙ্গামা চুকে গেল। বানারসীর জীবনে স্থিতি ফিরে এল। তাঁর বয়স তখন চৌদ্দ। মনে তীব্র জ্ঞানপিপাসা। জৌনপুরে দেবদত্ত নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। বানারসী তাঁর কাছে শিক্ষার্থী হলেন। নানা বিষয় পড়লেন। 'নামমালা', 'অভিধান', 'অনেকার্থকোষ'। তা ছাড়া জ্যোতিষ, অলংকার এবং কামশাস্ত্র। কোক পণ্ডিতের লঘু-কোক। তা ছাড়া দীর্ঘ কাব্যচর্চা। পুরো এক বছর গভীর মনোযোগ দিয়ে নানা শাস্ত্র পড়লেন। যা পড়েছেন তা নিয়ে গভীর ভাবনা, আত্মস্থ করার চেষ্টা।

বানারসী লিখেছেন তখন তাঁর মনে জ্ঞান-চর্চার মতো তীব্র হয়ে উঠেছে অন্য তৃষ্ণা কামোন্মদনা। তিনি প্রেমে পড়লেন। তাঁর ভাষায় সুফি ফকিরের মতো কামনা-তাড়িত তিনি। কামনার মানুষটিকে নিয়ে সর্বক্ষণ ধ্যানস্থ। প্রেমিকা সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাঁর দৃষ্টিকে। লোকলজ্জা, সংগত অসংগত বিচার, পরিবারের মান— সব চিন্তা তখন গৌণ। বানারসী বাবার তহবিল থেকে অর্থ এবং গহনাগাটি চুরি করতেও দ্বিধাগ্রস্ত নন তখন। প্রেমিকাকে উপহার দেওয়া চাই, ভাল মিঠাই দেওয়া চাই। প্রেমের প্রচলিত রীতি মেনে বানারসী তখন তাঁর প্রেমিকার 'দাস'। তিনি নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করেন 'দীন একজন' হিসাবে। অর্থাৎ, তিনি প্রেম-ভিখারি।

প্রায় একই সময়ে পাশাপাশি চলে সাধুসঙ্গ। বান চাঁদ এবং রাম চাঁদ নামে দু'জন জৈন

সাধু এসেছিলেন তখন জৌনপুরে। জৈন সাধু-সন্ন্যাসীরা তৎকালে দেশময় ঘুরে বেড়াতেন। বর্ষার সময় হয়তো কোথাও কিছুটা দীর্ঘ সময়ের জন্য আস্তানা গাড়তেন। নয়তো বছরভর তাঁরা যেখানে জৈনদের বাস সেই সব শহরে গঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন। স্থানীয় জৈনরা সাদরে এবং সশ্রদ্ধায় তাঁদের গ্রহণ করতেন, তাঁদের কাছে ধর্মকথা শুনতেন। জৌনপুরে ভক্তদের ভিড়ে বানারসীও অন্যতম শ্রোতা। লিখছেন, আমি তখন ধর্মভাবাপন্ন। যে অষ্টবিধ গুণাবলী থাকলে সৎ জৈন হওয়া যায় তা অর্জনের চেষ্টা করছি। বইপত্রও তখন লিখছেন তিনি। কিন্তু তাঁর দ্বৈতজীবন। একদিকে সাধুসঙ্গ, বিদ্যাচর্চা, অন্যদিকে প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা। বানারসী কবি। প্রেমকে উপজীব্য করে হাজার কবিতা লিখে ফেলেছেন তিনি। নবরসের সব রসই ছিল তাঁর তখনকার কাব্যে। কিন্তু সব ছাপিয়ে প্রেম। বানারসী লিখছেন— আজ বুঝতে পারি মেকি কবি ছিলাম আমি। মিথ্যা কবি। শব্দ আর আবেগের আড়ালে ছিল মিথ্যার বেসাতি!

রোজগার নেই। প্রণয় পর্ব চলছে। চলছে বিদ্যাচর্চাও। বানারসীর তখন এমনকী নাওয়া-খাওয়ার সময় পর্যন্ত নেই। সুতরাং, টাকাকড়ির মতো তুচ্ছ বস্তুর জন্য চিন্তার সময় কোথায়! পরিবার পরিজনের নিষেধকে অগ্রাহ্য করেই পুরো দু'বছর কাটল এভাবে। ক্ষুধা কিছুটা মিটল। জৌনপুর থেকে বানারসী চললেন খয়রাবাদ। শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন, এই বাসনা। সেজেগুজে, রকমারি গহনা পরে পালকি চড়ে তিনি খয়রাবাদের পথ ধরলেন। সঙ্গে ভৃত্যকুল। তাঁর বয়স তখন পনেরো বছর দশ মাস। চোখে স্বপ্ন।

খয়রাবাদে একমাস থাকার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন বানারসী। দেখতে দেখতে তাঁর সারা শরীর ক্ষতে আচ্ছন্ন। কুষ্ঠরোগীর মতো। হাড়ে মজ্জায় অসহ্য ব্যথা। চুল পড়ে যেতে থাকল। হাতে পায়ে ফুটে বের হল ফোঁড়ার মতো কী সব। লোকেরা কেউ তাঁর কাছে আসে না। তাঁর শ্বশুর এবং শ্যালক তাঁর সঙ্গে বসে খান না। বানারসী লিখছেন— আমার পাপ আবার ফল দিতে শুরু করেছে। একমাত্র তাঁর কাছে আসতেন স্ত্রী আর শাশুড়ি। তাঁরাই খাবার দিতেন, জল দিতেন। হাত দিয়ে খাইয়ে দিতেন। মলম মাখিয়ে দিতেন। গা দিয়ে এমন দুর্গন্ধ বের হত যে, শাশুড়ি এবং স্ত্রীকে নাকে কাপড় দিয়ে তাঁর সেবাযত্ন করতে হত। শেষ পর্যন্ত তাঁকে সারিয়ে তোলে বাড়ির পরামানিক। তার ওষুধেই নাকি কাজ হয়। চার মাসের মধ্যে সেরে ওঠার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছয়মাসের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ।

কী অসুখ করেছিল বানারসীর। গবেষকরা এ-সম্পর্কে নানা মত পোষণ করেন। তবে প্রধান অনুমান এই ব্যাধি প্রেম-সূত্রে অর্জিত। বানারসী, বলাবাহুল্য, জৈনপুরে যার প্রেমের জন্য ভিখারি সেজেছিলেন, কবি হয়েছিলেন সে একজন বারবনিতা। সুতরাং, এ-ব্যাধি প্রেমের ফল হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

যা হোক, সেরে উঠে তিনি জৌনপুর ফিরে এলেন। একা। শ্বশুর, মেয়েকে সঙ্গে দিলেন না। বাড়ি ফিরে বানারসী বাবার পায়ে পড়ে গেলেন। তিনি ক্ষমাপ্রার্থী। তাঁর অসুস্থতার সংবাদে বাবা যত না দুঃখিত, তার চেয়ে বেশি লজ্জিত। তিনি ছেলেকে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করতে লাগলেন। ক্রুদ্ধ বাবার সামনে বানারসী বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। নিজের ওপর ঘৃণা হল তাঁর। কিন্তু তখনকার মতো। বানারসী লিখেছেন— কিছুদিনের মধ্যেই পুরনো নেশা ফিরে এল। বিদ্যাচর্চা এবং প্রেমলীলা।

চারমাস পরে বাবা গেলেন পাটনায়। ছেলে শ্বশুরালয়ে, খয়রাবাদে। একমাস সেখানে

ছিলেন। কিন্তু লজ্জায় অপমানে বাড়ি থেকে বের হতেন না। একমাস পরে সস্ত্রীক জৌনপুরে ফিরে এলেন। বউ পালকিতে, বানারসী ঘোড়ার পিঠে। জৌনপুরে ফিরে আসার পর আবার আপন সম্প্রদায়ের প্রবীণদের কাছে তিরস্কার শুনতে হল। তাঁরা নানা উপদেশ দিলেন। বললেন— প্রবীণদের কথা শোনো। প্রেমের পথ ত্যাগ করো। সে-পথ দরবেশের। লেখাপড়ার বাসনাও ত্যাগ করো। বিদ্যা ব্রাহ্মণ আর কবিবর্গের জন্য, তোমার জন্য নয়। ব্যবসায়ীর সন্তানের কর্তব্য একটাই, দোকানপত্র দেখাশুনা করা। মনে রেখো, যারা বেশি লেখাপড়া করে তাদের ভিক্ষাপাত্র হাতে ঘুরতে হয়।

কিন্তু বৃথাই। উপদেশে কোনও কাজ হল না। বানারসী তাঁর নিজস্ব পথ ধরেই চলতে লাগলেন। বিদ্যাচর্চার সমান্তরাল ধারায় চলতে লাগল প্রেমের উপাসনা। ঘরে বউ, কিন্তু বানারসী তবুও উদ্দাম। লিখেছেন— এটা ভ্রান্ত ধারণা যে, অন্যের উপদেশে মানুষের জীবনধারা পালটে যায়। মানুষ আসলে চলে আপন হৃদয়ের নির্দেশে। নিজের 'কর্ম অনুসারে' অতএব তিনি আপন খেয়ালেই চলতে লাগলেন।

এভাবে চলল ১৬৬০ বিক্রমাব্দ অবধি। ইতিমধ্যে বোনের বিয়ে। নিজের কন্যা সন্তানের জন্ম। এবং আরও নানা ঘটনা। ক'দিনের মধ্যেই তাঁর সন্তান মারা গেল। বানারসী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিধান দেওয়া হল— উপবাস। উপবাসের সময় এমন ক্ষুধার্ত হয়ে পড়তেন যে, খাবারের জন্য কাঁদতেন পর্যন্ত। তবু তাঁকে খাবার দেওয়া হত না। একদিন এমন হল যে, ক্ষুধার্ত বানারসী চোখে খেতে চাইলেন। বললেন— খেতে চাই না, আমি শুধু চোখ দিয়ে একবার খাবার দেখতে চাই। দোহাই তোমাদের, আমার চোখের সামনে একখানা রুটি এনে ধরো, আমি দু'চোখ ভরে দেখি। মস্ত দুখানা রুটি দেওয়া হল তাঁকে। তিনি সেগুলোকে খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলেন। তার পর একসময় লুকিয়ে খেয়ে ফেললেন। অবাক কাণ্ড, তাঁর অসুখ সেরে গেল। সবাই বিস্ময়ে হতবাক।

এই পর্বে আরও কিছু কিছু অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেছেন বানারসী। যেমন সাধু-সঙ্গে বোকা বনে যাওয়া। এক সাধুর সঙ্গে দেখা হল। সন্ন্যাসী বললেন— তোমাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দেব। গোপন মন্ত্র। কাউকে বলবে না। রোজ কলঘরে আপন মনে উচ্চারণ করবে। নিষ্ঠাভরে নির্দেশ পালন করা চাই। বছর ঘুরে এলে দেখবে বিস্তর ধনদৌলত হয়েছে তোমার। প্রতিদিন ভোরে নিজের ঘরের দুয়ারে একটি করে মোহর পাবে। বানারসী লোভে পড়লেন। মন্ত্র নিলেন। এক বছর মন্ত্র আওড়ালেন। বছর ঘুরে আসার পর ভোরে উঠে ছুটলেন দুয়ারের দিকে। কিন্তু কোথায় মোহর? তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। তবু বেশ-কিছুদিন ধরে আশায় আশায় রইলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বুঝতে পারলেন, সাধু তাঁকে বোকা বানিয়েছেন।

কিছুদিনের মধ্যেই আর-একজন সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়লেন বানারসী। তিনি এক যোগী। বানারসীকে ছোট্ট একখানা শঙ্খ দিয়ে তিনি বললেন— এই শঙ্খ সাক্ষাৎ শিব। একে নিত্য নিয়মিত পুজো করবে। ফল পাবে। বানারসী তাঁকে বিশ্বাস করে শঙ্খটি গ্রহণ করলেন। প্রতিদিন স্নান করে সনিষ্ঠায় তিনি তার পুজো করেন। একশো আটবার করে শিবের নাম জপ করেন। আর সেই ভক্তি-পর্বেই আকবরের মৃত্যু উপলক্ষে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে শয্যা নেওয়া। অতএব ভাবতে বসলেন বানারসী— আমি শিবের ভক্ত। কিন্তু কই, সিঁড়ি দিয়ে যখন পড়ে গিয়ে আঘাত পেলাম তখন শিব আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন কই!

অবিশ্বাসী বানারসী শঙ্খটিকে নিঃশব্দে সরিয়ে রাখলেন।

সহসা তাঁর মনে অন্যভাব। একদিন বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছেন তিনি। হাতে তাঁর প্রেমের কবিতার পাণ্ডুলিপি। চলতে চলতে আবৃত্তি করছেন। প্রেমের গান গাইছেন। হাঁটতে হাঁটতে গোমতীর ওপর সেতুটিতে পৌঁছলেন ওঁরা। হঠাৎ বানারসীর মনে হল, এই মিথ্যা নিয়ে কী হবে? আমার মুক্তিই বা কেমন করে সম্ভব? কবিতার পাণ্ডুলিপিটি তিনি নিক্ষেপ করলেন গোমতীর জলে। বন্ধুরা হা হা করে উঠলেন। কিন্তু গোমতীর জলে ততক্ষণে তলিয়ে গেছে বানারসীর প্রেমকাব্য!

বানারসীর মনে তখন ধর্মভাব। তিনি ধর্মপ্রাণ জৈন। তিনি সমস্ত আচার অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। তাঁর জীবনের মোড় যেন পালটে গেছে। খড়্গসেন স্থির করলেন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ছেলেকে আবার তিনি আগ্রা পাঠাবেন। তিনি প্রস্তুতি শুরু করলেন। রকমারি পণ্য সংগ্রহ করা হল বানারসীর জন্য। তালিকায় ছিল— মূল্যবান রত্নরাজি। কিছু খুচরোয়, কিছু গহনায়, ৯টি নীলকান্তমণি, ২০টি পান্না, ২৪টি পদ্মরাগ। তা ছাড়া ৩৪টি নানা ধরনের পাথর, ৪ থলি চুনি। সেইসঙ্গে দু'খানা ব্রেসলেট এবং দু'খানা আংটি। অন্য পণ্যও ছিল। ছিল ২০ মণ ঘি, দুটি চামড়ার থলি ভরতি ভেষজ তেল, এবং জৌনপুরের নিজস্ব বিখ্যাত পোশাক-পরিচ্ছদ। সব মিলিয়ে দু'শত টাকার জিনিস। মুকুন্দ লাঠ হিসাব কষে দেখিয়েছেন আজকের দিনে তার দাম তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা!

শুভদিনে শুভক্ষণে আগ্রার পথে যাত্রা করলেন বানারসী। সওদাগর বানারসী। এখনকার মতো তখনও শুভ অশুভ দিন বিচার ছিল। বানারসী যখনই যেদিকে পা বাড়িয়েছেন তার আগে তিথি-নক্ষত্রের অবস্থান দেখে দিন বিচার করে যাত্রারম্ভ করেছেন। যা হোক, যাত্রার আগে বাবা নানা উপদেশ দিয়ে দিলেন। ললাটে মঙ্গল তিলক এঁকে দেওয়া হল। তার পর গোরুর গাড়িতে ভারী মালপত্রগুলো চাপিয়ে বানারসী জৌনপুর ছাড়লেন। মণিমুক্তো সব তাঁর নিজের কাছে, কাপড়ের ভাঁজে।

দলে আরও কিছু ব্যবসায়ী ছিলেন। দীর্ঘপথে সেকালে ব্যবসায়ীরা সাধারণত দলবদ্ধভাবেই যাতায়াত করতেন। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা, নিরপত্তার প্রশ্ন। এটোয়ার কাছে এসে ওঁদের ক্যারাভান থামল। মালপত্র বোঝাই গাড়িগুলো একটা খোলা জায়গায় রেখে ওঁরা আশ্রয়ের সন্ধানে বের হলেন। হঠাৎ মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। শুরু হল প্রবল বৃষ্টি। মোটা কম্বল গায়ে চাপিয়ে ওঁরা সরাইখানায় গিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু সেখানে ঠাঁই নেই। দু'জন আমীর তাঁদের লোকজন নিয়ে গোটা সরাইখানাটি দখল করে নিয়েছেন। বাধ্য হয়েই বাজারের দিকে। সেখানেও প্রতিটি দোকানে লোক। বানারসী বলছেন— একটি মেয়ে দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের বাড়িতে ডেকেছিল। কিন্তু স্বামী তেড়ে এল। সে সওদাগরদের মারতে মারতে বের করে দিল বাড়ি থেকে। আবার পথে। অসহায়ের মতো এবার দেওয়ালের ধারে নগর-রক্ষীদের কুটিরে। আরও দু'জন জৈন ছিলেন বানারসীর সঙ্গে। সান্ত্রীরা বলল— আমরা একটু পরেই চলে যাব। তোমরা এখানে থাকতে পারো। কিন্তু ভোরবেলায় সমস্যা হবে। শহরের সরকারি কর্মচারীরা তোমাদের ধরবে। তখন মোটা বকশিস দিতে হবে। ওঁরা তাতেই রাজি। কিন্তু রাত্রেই একজন ভীষণ দর্শন লোক এসে হাজির হল সেই কুটিরে। বলল— তোমরা কারা? ভাগো এখান থেকে, এটা আমার ঘর, এই খাটিয়ায় আমি ঘুমোই। বানারসী এবং তাঁর সঙ্গীরা বাধ্য হয়েই আবার পথে পা

বাড়ালেন। লোকটির কেমন যেন মায়া হল। বলল— আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমরা থাকতে পারো, তবে ঘুমোতে হবে খাটের নীচে। আমি খাট ছাড়া ঘুমোতে পারি না। এই বলে সে খাটের তলায় একটা চট বিছিয়ে দিল। ক্লান্ত সওদাগররা সেখানেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোলেন। পরদিন সকালে আবার যাত্রা।

বানারসীর আত্মজীবনীতে মুঘল আমলের পথঘাট যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ পথে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা। এটোয়ায় যদি মুঘল যুগের সরাইয়ের জীবনের আভাস, পাটনার পথে তবে অন্য কাহিনী।

সেবার আগ্রা থেকে মালপত্র নিয়ে বানারসী চলেছেন পাটনায়। সঙ্গে দুই সঙ্গী। ওঁরা ঠিক করলেন ফিরোজাবাদে পৌঁছে একটা গাড়ি ভাড়া করবেন। তাই করা হল। সাজাদপুরে পৌঁছে গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া হল। ইচ্ছা, এবার তিন বন্ধু বাকি পথ পায়ে হাঁটবেন। সাজাদপুরে হঠাৎ ওঁদের মনে হল ভোর হয়ে উঠেছে। তিনজন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। মোট বইবার জন্য একজন লোক ঠিক করা ছিল। তাকেও নেওয়া হল। কিছুদূর চলার পর তাঁরা এক বনে ঢুকে পড়লেন। আসলে তখনও রাত পোহাতে অনেক দেরি। আকাশে ফুটফুটে চাঁদের আলো ছিল। তাই বিভ্রম। নিশুতি রাতে পথ ভুল করে ওঁরা বনে ঢুকে পড়েছেন। পথ আর তাই ফুরোতে চাইছে না। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এক ডাকাতদলের আস্তানায় গিয়ে হাজির। ডাকাতের সাড়া পেয়ে মোট বইবার জন্য যে-লোকটি ছিল সে বোঝা ফেলে পালিয়ে গেল। বানারসীর মুখে স্পষ্ট সংস্কৃত মন্ত্র শুনে ডাকাতদের সর্দার তাঁকে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাবল। সে 'ব্রাহ্মণদের' এই দলটিকে রাতের মতো আশ্রয় দিল। সওদাগররা ভয়ে কাঠ। কিন্তু বানারসীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁদের বাঁচিয়ে রাখল। শুধু তাই নয়, পরদিন সকালে ডাকাতদলের সর্দার অনেক দূর ওঁদের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে সঠিক পথের নিশানা পর্যন্ত দিয়ে দিল! বানারসী তাকে আশীর্বাদ করে ফতেপুরের দিকে পা বাড়ালেন। সেখান থেকে এলাহাবাদ হয়ে পাটনা।

আর-একবার বলতে গেলে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন তিনি। সেটা কোনও এক আষাঢ় মাসের কথা। জৌনপুর থেকে আগ্রার দিকে চলেছেন বানারসী। ঘোড়ার পিঠে। সঙ্গে নয়জন পার্শ্বচর। প্রথম দিনে ঘাইসুয়া নামে একটা গ্রামে থামলেন। সেখানে আর-একজন শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে দেখা। তিনিও আগ্রাযাত্রী। তিনি হিন্দু মহেশ্বরী সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী। বানারসী যখনই অন্য কারও কথা বলেন তখন তাঁর ধর্ম, সম্প্রদায়, এমনকী গোত্র পর্যন্ত উল্লেখ করতে ভোলেন না। শুধু জাতি বর্ণভেদ নয়, ভেদাভেদ সেদিন বুঝি-বা এমনকী গোত্রের মধ্যেও। মথুরার দুই ব্রাহ্মণও মহেশ্বরীর সঙ্গ নিয়েছিলেন। পরদিন সকালে সবাই একসঙ্গে হাসতে হাসতে গল্পগুজব করতে করতে রওনা হলেন। ঘাটমপুরের কাছে কারোরা নামে একটা জায়গায় পৌঁছে দলটি একটি সরাইয়ে আশ্রয় নিল। মথুরার ব্রাহ্মণ দু'জন সরাইয়ের কাছেই এক আহীর রমণীর ঘরে গেল আমোদ করতে। তার আগে তাঁদের একজন বাজারে গিয়ে একটা টাকা ভাঙিয়ে খুচরো করে নিয়ে এলেন। সেইসঙ্গে প্রচুর মিঠাই ইত্যাদি। মেয়েটির ঘরে বসতে-না-বসতে তাঁর পিছু পিছু বাজার থেকে এসে হাজির হল এক দোকানি। তাঁর কাছেই ব্রাহ্মণ টাকাটি ভাঙিয়েছিলেন। দোকানি এসে বললেন— ব্রাহ্মণ জাল টাকা দিয়ে এসেছে। লোকটি টাকাখানা বের করে দেখাল, ব্রাহ্মণ বললেন— এ টাকা আমি দেইনি। তিনি রেগে আগুন। দোকানিটি ছিল একজন রৌপ্যকার। ব্রাহ্মণ রেগে গিয়ে তাঁকে দু'-চার

ঘা বসিয়ে দিলেন। তাই ঘিরে গোলমাল। দেখতে দেখতে ভিড়। লোকেরা ব্রাহ্মণকে পরামর্শ দিল মারামারি করে কী লাভ? রৌপ্যকারকে ছেড়ে দিন। কিন্তু কে কার কথা শোনে? ব্রাহ্মণ তখনও অগ্নিশর্মা। এদিকে ঘটনাস্থলে রৌপ্যকারের এক ভাই এসে হাজির। সে বলল— আমি ব্রাহ্মণদের তল্লাশি করব। তালাশ করে ব্রাহ্মণের কাছে কুড়িটি টাকা পাওয়া গেল। দোকানির ভাই সবাইকে সে টাকা দেখিয়ে বলল— এই দেখো জাল টাকা। এরা ঠগ। আমি এক্ষুনি চললাম কতোয়ালের কাছে। আসলে সে হাত সাফাই করে ব্রাহ্মণদের টাকাগুলো বদলে নিয়েছে।

তার পর নানা কাণ্ড। রাতেই কতোয়াল, হাকিম। হাকিম অবশ্য এলেন না। তাঁর তরফে এলেন হাকিমের দেওয়ান। দুই ব্রাহ্মণের সঙ্গে বানারসী সমেত গোটা দলটিকেই পাকড়াও করলেন ওঁরা। বানারসীরা বলছেন— তাঁরা ঠগ নন, ব্যবসায়ী। ওই লোক দুটিও ঠগ নয়, মথুরার দুই ব্রাহ্মণ। কিন্তু কে কার কথা শোনে? দেওয়ান যদিবা ওঁদের সওদাগর-দল বলে মেনে নিতে রাজি, কতোয়াল কিছুতেই তা মানতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত কতোয়াল হাকিমের লোককে বললেন—কোরারা, খাটমপুর এবং বারি, এই তিন শহর আমার চৌহদ্দি। অন্যরা কে কী বলছে তা শুনে আমার লাভ নেই। এই তিন শহর থেকে কেউ ওঁদের শনাক্ত করলে তবেই আমি ছেড়ে দিতে রাজি। নচেৎ নয়। তবে আপাতত রাতটা তো কাটুক। রাতে সরাই ঘিরে পাহারা বসল।

বানারসী এবং তাঁর সঙ্গীরা ভয়ে অস্থির। স্থানীয় কোনও সাক্ষী চাই। এমন সাক্ষী, যিনি বলবেন— এরা ঠগ নয়, সৎ ব্যবসায়ী। মাথা চুলকে অনেক ভেবে অবশেষে মহেশ্বরী বললেন— হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বারিতে আমার ভাইয়ের এক আত্মীয় বাড়ি আছে। আমি তার বিয়ের সময় সেখানে গিয়েছিলাম। শুনে বানারসী কিছুটা আশ্বস্ত।

সকালে একদল সিপাহি এল। সঙ্গে কুলির পিঠে উনিশটি শূল। দলের প্রত্যেকের জন্য একটি করে। অভিযোগ প্রমাণ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি— মৃত্যু। সরাইয়ের সামনেই শূলগুলো নামানো হল। সৈন্যরা হাঁক দিয়ে বলল— উনিশ ঠগের জন্য উনিশ শূল। আধ ঘণ্টা পরে এলেন কতোয়াল আর হাকিমের দেওয়ান। বানারসী সাহস সঞ্চয় করে বললেন— বারিতে এমন একজন আছেন যিনি আমাদের চেনেন। দেওয়ান বললেন— চমৎকার। চলো আমার সঙ্গে বারি। মহেশ্বরী ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। তাঁর পিছু পিছু আর-একটি ঘোড়ায় দেওয়ান। দেওয়ান ফিরে এসে বানারসীদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। বললেন— তোমাদের ঝঞ্ঝাটে ফেলার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী সাহু। ব্রাহ্মণরা এবার মুখ খুললেন। বললেন— আমাদের টাকা?

বানারসী চললেন টাকার খোঁজে মুঘল অফিসারদের কাছে। যাওয়ার সময় প্রায় সাত কেজি দামি ফুলেল তেল সঙ্গে নিলেন। হাকিম, দেওয়ান, কতোয়াল— প্রত্যেককে তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী তৈল দান করলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই মানলেন যে, রৌপ্যকারের ভাই চালাকি করে ব্রাহ্মণদের প্রতারণা করেছে। কিন্তু সে নিখোঁজ। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁরা সান্ত্বনা দিলেন— টাকা গেল বটে, কিন্তু তোমরা যে বেঁচে আছ, সেটাই কি যথেষ্ট নয়। বানারসী বুঝলেন, টাকা ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। লিখছেন—তা আশা করা যেত যদি আমাদের যথেষ্ট প্রভাব এবং প্রতিপত্তি থাকত। এই শহরে আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুতরাং বৃথাই আশা করা। তার চেয়ে টাকার মায়া ত্যাগ করে স্থানত্যাগই বিধেয়।

পরদিন ভোরেই তাঁরা আবার আগ্রার পথ ধরলেন। মথুরার পথের বাঁকে পৌঁছে ব্রাহ্মণরা কেঁদে পড়লেন— আমাদের টাকা! ওই টাকা না পেলে আমরা প্রাণে বাঁচব না। আমরা আত্মহত্যা করব। অগত্যা করুণাপরবশ দুই শ্রেষ্ঠী ওঁদের ক্ষতিপূরণ করে দিলেন। মহেশ্বরী দিলেন ১২ টাকা, বানারসী ১৩ টাকা। যা গেল, তার চেয়ে কিছু বেশিই পেলেন ব্রাহ্মণরা। তাঁরা মথুরার পথ ধরলেন। মহেশ্বরী আর বানারসী আগ্রার দিকে পা বাড়ালেন।

এই সব নিয়েই বানারসীর পর্যটন কাহিনী। মুঘল আমলে প্রধান কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ছিল। পথিকদের জন্য ছিল সরাইখানা। সেখানে মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা তো ছিলই। ব্যবস্থা ছিল গোরু-ঘোড়ার জন্যও। বানারসীর বিবরণ পড়লে মনে হয় সাধারণভাবে পথঘাট মোটামুটি নিরাপদ ছিল। বিস্তর ঘুরেছেন বানারসী। কখনও ব্যাবসা সূত্রে, কখনও তীর্থ দর্শনে। মনেই হয় না পথে তখন পায়ে পায়ে বিপদ। তবে হ্যাঁ, কখনও কখনও ঝঞ্ঝাটেও পড়তে হত বইকী! এইসব কাহিনী তারই স্মারক।

ঘরের বাইরে জীবনের প্রথম ব্যবসায়িক অভিযানে বের হয়ে বানারসী আগ্রায় পৌঁছলেন বটে, কিন্তু সেখানে তিনি বাণিজ্যে মোটে সুবিধা করে উঠতে পারেননি। লোকসানের ওপর লোকসান। বাবা যে-সব মালপত্র দিয়ে পাঠিয়েছিলেন বহু কষ্টে সে-সব বিক্রি হল। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেল সব লোকসান। মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছিল দু'শো টাকা পরিমাণ। অথচ বানারসীর পকেটে পড়ে আছে কয়টি কপর্দক মাত্র!

তবু প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর ঘরে বসে মজলিশ। গান-বাজনা, কাব্যপাঠ। দশজন বন্ধু নিয়মিত হাজির থাকেন আসরে। বানারসী তাঁদের 'মধুমালতী' এবং 'মৃগবতী' গেয়ে শোনান। দুই-ই প্রণয়মূলক গীতিকাব্য। বন্ধুরা সবাই তাঁর গান এবং কথোপকথনের তারিফ করেন। অথচ পকেটে তাঁর পয়সা নেই। নেই খাবারের সংস্থান। তাঁর সান্ধ্য আসরে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন একজন হালুইকর। তিনি বানারসীর অনুরক্ত। বানারসী তাঁর কাছ থেকে ধারে দু'বেলা কচুরি খেতেন। বাইরে বের হওয়া বলতে, কচুরির জন্য ওই হালুইকরের দোকানে যাওয়া। সকাল, দুপুর, রাত্রি— তিন বেলা তখন তিনি কচুরি খেয়ে আছেন। একদিন হালুইকরকে সব খুলে বললেন। বললেন— আমাকে আর ধার দিয়ো না, হয়তো ফেরত পাবে না। হালুইকর বলল— কুড়ি টাকা অবধি আপনি খেয়ে যান। ভাবনা নেই। আমি টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করব না। সুতরাং টানা ছয় মাস এভাবেই চলল। দিনভর একা। সন্ধ্যায় আড্ডা। ফাঁকে ফাঁকে কচুরি।

বানারসীর আত্মজীবনী পড়লে মনে হয় সম্পন্ন ব্যবসায়ীদের মধ্যে তখন গান-বাজনার আসরের নেশা ছিল। আগ্রায় পরবর্তীকালে এক সময়ে বানারসীর ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন শাহু শাবল সিং মোথিয়া নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। সেবার বানারসী স্থির করলেন ওই কারবার গুটিয়ে ফেলবেন। তার জন্য শাবল সিংয়ের সঙ্গে বসে হিসাব নিকাশ করা দরকার। কিন্তু সে সুযোগ আর মেলে না। প্রতি সন্ধ্যায় শাবল সিং বলেন— কাল হবে। শাহু শাবল সিং তখন বিলাসে ভাসমান। সব সময় তাঁকে ঘিরে আছেন গায়ক আর যন্ত্রবাদকরা। বিখ্যাত গায়করা তাঁর সামনে গান করেন। বাদ্যকররা রকমারি বাদ্য বাজান। শাবল সিং যেন কোনও ব্যবসায়ী নন। নবাবজাদা। গায়ক কবিরা তাঁর সুখ্যাতি করছেন, তিনি তাঁদের খাতির বিলোচ্ছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা, বর্ণনার অতীত চোখ-ধাঁধানো দৌলতের ছটা তাঁর আসরে। বানারসী লিখছেন— দেখে মনে হয় না নতুন একটি দিনের সূচনা কিংবা

পুরনো দিনটির চলে যাওয়ার কোনও তাৎপর্য আছে এই মানুষটির কাছে। সুতরাং, বানারসীকে শাবল সিংয়ের কাছে পৌঁছতে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। লিখছেন— প্রতীক্ষার এক-একটি ঘণ্টা যেন এক-একটি দিন, এক-একটি দিন যেন এক-একটি বছর!

বানারসীর সান্ধ্য মজলিশ অতএব অভূতপূর্ব নয়। তবে শাবল সিং ছিলেন ধনবান, সফল ব্যবসায়ী, আর বানারসী কপর্দকহীন, এই যা! শেষ পর্যন্ত এক আত্মীয় এসে মজলিশ থেকে উদ্ধার করলেন বানারসীকে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই ভ্রাতৃত্ববোধ, বিশেষত এক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের মধ্যে, সত্যই বিস্ময়কর। বানারসী বা তাঁর পরিবার পরিজনরা যখনই বিপন্ন, তখনই দেখা গেছে আপন সম্প্রদায়ের কেউ-না-কেউ এগিয়ে এসেছেন সাহায্য করতে। এই নির্ভরতার ভিত্তি শুধু একই ধরনের ব্যাবসা নয়, ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িক একাত্মবোধ। আগ্রায়ও অতএব বানারসীর দিকে সাহায্যের হাত এগিয়ে এল।

আত্মীয়ের আশ্রয়ে থেকে তিনি আবার আগ্রায় ব্যাবসা শুরু করলেন। এবার ধর্মদাস নামে একজন ওসওয়াল জৈনের সঙ্গে। ব্যাবসা মোটামুটি ভাল চললেও দু' বছর পরে দেখা গেল সাকুল্যে লাভ হয়েছে মাত্র দু'শো টাকা। কিন্তু সে টাকা খরচপত্র মেটাতেই চলে গেল। কচুরিওয়ালা অবশ্য তার কচুরির দাম ফেরত পেল। মোট বারো টাকা। বানারসী ঠিক করলেন আর আগ্রা-বাস নয়, এবার খয়রাবাদে শ্বশুরবাড়ি যাবেন। আকস্মিকভাবেই আগ্রার পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন আটটি মুক্তো। একটা তাবিজে তা-ই পুরে আগ্রার মায়া কাটিয়ে তিনি যাত্রা করলেন খয়রাবাদ।

সেখানে পৌঁছে রাত্তিরে স্ত্রীর কাছে মিথ্যে বললেন। কিন্তু স্ত্রী তাঁর মুখ দেখে ধরে ফেললেন। তিনি বুঝতে পারলেন— তাঁর স্বামী ব্যবসায়ে সুবিধা করতে পারছেন না। তিনি সান্ত্বনা দিলেন— তাতে কী হয়েছে, মানুষ বেঁচে থাকলে একদিন-না-একদিন সফল হবেই। গোপনে তিনি বানারসীকে কুড়িটি টাকা দিলেন। বললেন— আমার সঞ্চয়। বানারসীর স্ত্রী তাঁর মাকেও গোপনে সব বললেন। বললেন— আমার এই বিপদে তুমি আমাকে সাহায্য করো। এই মানুষটি খালি হাতে চলে গেলে হয়তো চিরকালের মতো চলে যাবেন, আর ফিরবেন না। শাশুড়ির কাছে দু'শো টাকা ছিল। সব শুনে মেয়েকে তিনি তাই দিয়ে দিলেন। সেদিন রাত্রে স্ত্রী খুব হাসিখুশি। বললেন— ভাবনা নেই, ব্যবস্থা হয়েছে।

নতুন উৎসাহে আবার আগ্রা যাত্রার তোড়জোড় করতে লাগলেন বানারসী। চার মাসের এক কর্মসূচি গ্রহণ করলেন বানারসী। সংকল্প—এই সময়ের মধ্যে তিনি দুটি বই লিখবেন, এবং দেখেশুনে কিছু মালপত্র কিনবেন আগ্রার বাজারের জন্য। খয়রাবাদে বসে দু'শো পদ্যের 'নামমালা' লিখলেন বানারসী। তার পর— 'অজিতনাথ কি চান্দ'। কিছু কাপড় কিনলেন। সেগুলোকে ধোলাই করে বাজারের জন্য তৈরি করলেন। আর কিনলেন একটা মুক্তোর মালা। তার পর অগ্রহায়ণ মাসে আবার আগ্রার দিকে। আগ্রায় এটা তাঁর দ্বিতীয় বাণিজ্যিক অভিযান। প্রথমবার যাত্রা করেছিলেন জৌনপুর থেকে। এবার খয়রাবাদ থেকে। প্রথমবার মূলধন জুগিয়েছিলেন বাবা। এবার স্ত্রী এবং শাশুড়ি।

আগ্রায় ওঁর শ্বশুরের একটা ঘর ছিল। কাটলা পারভেজ এলাকায়। বানারসী রাত্রে সেখানেই ঘুমোন। দিনে বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু কিছুতেই কাপড়ের ভাল খদ্দের পাওয়া যাচ্ছে না। যে-কাপড় তিনি নিয়ে এসেছেন তা কিছুটা নিরেস। আগ্রায় কেউ তা কিনতে চান না। মুক্তোর মালাটা বেচে অবশ্য লাভ হল। চল্লিশ টাকায় কিনে সত্তর টাকায়

বিক্রি। নীট লাভ তিরিশ টাকা। কিন্তু চার মাস ধরে চেষ্টা করেও কাপড়ের খদ্দের জোগাড় করতে পারলেন না। বিপদের দিনের জন্য আরও কিছু খুচরো মুক্তো ছিল সঙ্গে। বাধ্য হয়েই সেগুলোকে বিক্রি করে দিতে হল। এবার পাওয়া গেল বত্রিশ টাকা। কিন্তু একটা বিয়ে পার্টির সঙ্গে শহরের বাইরে বেড়াতে গিয়ে সব খরচ হয়ে গেল। উপায়ান্তরহীন বানারসী এবার নামমাত্র দামেই কাপড়ের স্টক বিক্রি করে দিলেন। যে দামে কিনেছিলেন তার থেকে চার টাকা কম পাওয়া গেল। তার মানে আবার তিনি রিক্ত।

প্রথমদিকে এভাবেই চলছিল তাঁর লক্ষ্মীর সাধনা। জৌনপুর, পাটনা, বেনারস এবং আগ্রা। নানা জায়গায় ব্যাবসা করেছেন বানারসী। কিন্তু জৌনপুরের পরে তাঁর দ্বিতীয় শহর আগ্রা। বার বার ফিরে এসেছেন মুঘল রাজধানীতে। বানারসী জাহাঙ্গীরের আমলে আগ্রার ভয়াবহ প্লেগের সাক্ষী। সেই নাকি প্রথম প্লেগ। বানারসী লিখেছেন 'গামতি কা রোগ।' গ্ল্যান্ড ফুলে ওঠে তা-ই এই নাম। জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথায় উল্লেখ আছে এই মহামারীর। বানারসী লিখেছেন—এ রোগের কোনও চিকিৎসা নেই। ডাক্তাররা পর্যন্ত ইঁদুরের মতো মরতে লাগলেন। কেউ ভয়ে খাবার স্পর্শ করে না। লোকেরা দলে দলে আগ্রা ছেড়ে পালাতে লাগল। বানারসীও পালিয়ে গিয়েছিলেন কাছাকাছি এক গাঁয়ে। নাম— আজিজপুর। বানারসী বলছেন— সুন্দর জায়গা। অধিকাংশ বাসিন্দাই ব্রাহ্মণ। একজন ব্যবসায়ীর বাড়ির কাছেই বাড়ি নিয়েছিলেন তিনি। একা সেখানে থাকতেন। বানারসী লিখেছেন— আজিজপুরে থাকাকালে আমি এক দুষ্কর্মের অপরাধে অপরাধী। আমার অতীত কর্মের বদ ফল সেই ঘটনা। এই ব্যাপারটি সম্পর্কে আমি একটি কথাও বলব না। তা গোপন থাকাই ভাল।

আর-একবার তাঁর ব্যবসায়িক সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: কেমন করে আমি সফল হয়েছিলাম তা আমি বলব না। সেটা গোপন ব্যাপার। তাঁর বক্তব্য ছিল মানুষের জীবনে এমন নয়টি ব্যাপার আছে যা গোপন রাখা শ্রেয়। সেগুলি হল— বয়স, সম্পদ, ঘরের খবর, দানধ্যান, গৌরবের উপলক্ষ, অখ্যাতি, সুস্বাস্থ্য রক্ষা করার কৌশল, যৌনজীবন এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা।

এই নীতি নির্দেশ করলেও বানারসী দাস কিন্তু তাঁর আত্মকথায় অবিশ্বাস্য রকম খোলামেলা। তিনি নিজের সম্পর্কে খুব কম কথাই গোপন করেছেন। তবে এটা ঠিক, তাঁর দাম্পত্যজীবনের ছবিটি খুবই ভাসাভাসা। তিন-তিনবার বিয়ে করেছেন বানারসী। অবশ্য দু'বার স্ত্রীর মৃত্যুর পর। কিন্তু তিন স্ত্রীর মধ্যে একমাত্র প্রথমাকেই পাঠক এক-দু'বার মাত্র দেখতে পান। প্রথমবার যখন তিনি অসুস্থ বানারসীর সেবা-শুশ্রূষা করছেন, দ্বিতীয়বার যখন তিনি তাঁর সঞ্চয় তুলে দিচ্ছেন স্বামীর হাতে। একাধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে এই স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বানারসী তাঁরই এক বোনকে বিয়ে করেন। তিনি মারা যাওয়ার পর খয়রাবাদের আর-একটি মেয়েকে। প্রত্যেকেই তাঁরা সন্তানের জননী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁদের একটি সন্তানও বাঁচেনি। বানারসী সন্তানদের মৃত্যু নিয়ে বিলাপ করেছেন। কিন্তু দুই মৃত স্ত্রী নিয়ে বিশেষ কিছু বলেননি। আত্মকথার শেষে তিনি লিখেছেন— আমার কাহিনী শেষ হল। আমার বয়স পঞ্চান্ন বছর। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে আগ্রায় বাস করি। আমার অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। আমি তিনবার বিয়ে করেছি। আমাদের দুটি মেয়ে এবং সাতটি ছেলে হয়েছিল। কিন্তু কোনও সন্তান বেঁচে নেই। এখন শুধু আমি আর আমার স্ত্রী

আমার স্ত্রী শীতের পত্রহীন বৃক্ষের মতো নগ্ন নিরাভরণ দাঁড়িয়ে আছি।

যদিও পঞ্চান্নয় পৌঁছে বানারসী দাসের মনে হয়েছিল তিনি জীবনের অর্ধেক পথ মাত্র পিছনে ফেলে এসেছেন, তবু আত্মকথা লেখার পর আর বেশিদিন তিনি বাঁচেননি। 'অর্ধকথানক' লেখেন তিনি ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে। ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দেই দেখা যায় জগজীবন নামে তাঁর এক অনুরাগী বানারসী দাসের রচনা সংগ্রহ প্রকাশ করছেন। বানারসী তখন মৃত। জগজীবন-সংকলিত 'বানারসী বিলাস'-এ শেষ কবিতাটির রচনা কাল— ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দ। তার মানে ষাট বছরও পূর্ণ করতে পারেননি এই অসাধারণ মানুষটি।

বানারসী দাস মধ্যযুগের এক অসাধারণ ভারতীয়। অসাধারণ শুধু ভারতীয় রীতিতে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মকথা-লেখক বলে নয়, অন্য কারণেও। তিনি কবি। তিনি প্রেমিক। তিনি ব্যবসায়ী। আবার তিনিই ধর্ম আন্দোলনে এক শ্রদ্ধেয় নেতা। উপসংহারে বানারসীর এই শেষোক্ত পরিচয়টি বিশদ করা দরকার। কারণ, অসংখ্য জৈন ভক্তের কাছে আজও এটাই নাকি তাঁর প্রথম পরিচয়।

বানারসী প্রথম যৌবনে ছিলেন নিষ্ঠাবান জৈন। জৈনদের যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। সাধুসঙ্গ, তীর্থ-পরিক্রমা, তীর্থে গিয়ে প্রিয় খাদ্য ত্যাগ— সব-কিছুতেই তখন তাঁর আন্তরিক আগ্রহ। কিন্তু বয়স যখন তাঁর পঁয়ত্রিশ তখন সব আনুষ্ঠানিক ধর্ম-কর্মে তাঁর আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। ধর্মাচারের বহিরঙ্গ নিয়ে তখন আর তাঁর বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। বরং তিনি ওই সব আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারের সমালোচকের ভূমিকায়। ক্রমে দেখা গেল বানারসী বিদ্রোহী। তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি তৎকালের প্রতিবাদী জৈনগোষ্ঠীর তত্ত্বের দিকে ঝুঁকেছেন। আনুষ্ঠানিক, আচার-বিচার-সর্বস্ব ধর্মবিরোধী ওই গোষ্ঠীকে বলা হত— 'অধ্যাত্ম'। অধ্যাত্মশৈলী। তাঁরা রহস্যবাদীদের মতো মানুষের অন্তরলোকে ঈশ্বর সন্ধানে বিশ্বাসী। দেখতে দেখতে বানারসী ওই বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে। তাঁর প্রখর কলম নবীন বিশ্বাসীদের উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। বানারসীর প্রভাব সেদিন এমনই ব্যাপ্ত যে, গোঁড়া জৈনরা তাঁর মতবাদকে খণ্ডন করে পুথি পর্যন্ত রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তা সত্ত্বে বানারসী এবং তাঁর অনুরাগী নব্যপন্থীদের প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। অধ্যাত্মবাদীরা এখনও নাকি জৈনদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়। তাঁরা দিগম্বর জৈনদের তেরাপন্থ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তেরাপন্থরা আজও নাকি সগর্বে বলেন তাঁরা বানারসী-কথিত অধ্যাত্মপথের পথিক। বানারসী তাঁদের আদিগুরু।

বানারসী অধ্যাত্ম মতবাদে প্রথম আকৃষ্ট হন খয়রাবাদে। তার পর আগ্রায় বিশ্বাস আরও নিবিড় হয়। আত্মকথায় তিনি লিখেছেন ওই সময় সব ধরনের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান তিনি বর্জন করেন। যেমন মন্ত্র উচ্চারণ, ব্রত উদযাপন ইত্যাদি। এক সময় মন্দিরে গিয়ে তিনি যে-সব সবজি খাবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাও অনায়াসে ভঙ্গ করেন। আমি তখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আমার কাছে সবই অবান্তর, লিখছেন বানারসী। আচার-আচরণে আমি তখন রীতিমতো দুষ্ট, নীচের চেয়েও নীচ। প্রতিমার সামনে রাখা ভোগের থালা থেকে খাবার তুলে নিয়ে খেতেও আমার দ্বিধা নেই। স্বভাবতই আমার তখন কয়েকজন অনুরাগী জুটে গেছে।

বানারসী লিখেছেন তাঁদের নিয়ে নানা খেলায় মেতে উঠতেন তিনি। জামা-কাপড় খুলে, পায়ের জুতো হাতে নিয়ে একে অন্যের মাথায় আঘাত করি। তাও এক খেলা। ঘরের দরজা বন্ধ করে উলঙ্গ হয়ে ওঁরা ঘোষণা করতেন জগৎকে ত্যাগ করে ওঁরা মুনি হয়েছেন।

পরস্পরের মাথায় জুতোর ঘা বসিয়ে দিয়ে বলা হত— ওঁদের যাঁরা নিন্দা করেন তাঁদের মাথায় ঘা! প্রচলিত ধর্মীয় সংগীত এবং উক্তিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে ওঁরা নিজেরা গান বাঁধতেন, বাণী রচনা করতেন। অশ্লীল নানা অর্থ আরোপ করা হত তাতে। তারই মধ্যে বানারসী লেখেন অধ্যাত্মপন্থীদের জন্য তাত্ত্বিক রচনা— 'জ্ঞান পঁচিশি', 'ধ্যান বতিশি', 'অধ্যাত্ম কা গীত', এবং 'শিব মন্দির।' পাশাপাশি চলে বিদ্রোহের নামে রকমারি লীলা। বানারসী লিখছেন— তখন কোনও উপদেশই কানে পৌঁছয় না।

যখন তিনি স্থিতধী, নব্য দর্শনে বিশ্বাস যখন তাঁর আরও দৃঢ়মূল, তিনি যখন এক নব্যধর্মীয় আন্দোলনের নায়ক, তখনও বানারসী অবলীলায় বলেন— যখন আমি একা, তখন কখনও কখনও আপন খেয়ালে আমি নাচি। অথচ এই আমিই আবার হঠাৎ হঠাৎ অজানা অযৌক্তিক ভয়ে অভিভূত।

বানারসী দাস এই সততার ব্যক্তিত্ব। এসব জবানবন্দির জন্যই আরও অপ্রতিরোধ্য তাঁর— অর্ধকথানক।

মুকুন্দ লাঠ অনূদিত ও সম্পাদিত 'হাফ আ টেল' ['অর্ধকথানক'], রাজস্থান প্রাকৃত ভারতী সংস্থান, জয়পুর, ১৯৮১

নিজেদের পৃথিবীর খোঁজে মানুষ

উনিশশো একাত্তর সালের কথা। টোকিওর একটি বিভাগীয় বিপণিতে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ নজর পড়ল সেই কোণটিতে, যেখানে সাজানো রয়েছে নানা আকারের মানচিত্র, গ্লোব, এবং ছাত্রদের মানচিত্র আঁকার নানা সরঞ্জাম। সেই সাজানো পশরাতে আমার চোখ আটকে গেল কয়টি রুপালি নাতিবৃহৎ গোলকে। মনে হল সেগুলি ঠিক আমাদের অতিপরিচিত ভূগোলক বা গ্লোব নয়, বোধহয় অন্য কিছু। আমার কৌতূহল দেখে কাউন্টারের ওপারের মেয়েটি একটি গোলক তাক থেকে নামিয়ে আমার সামনে টেবিলে বসিয়ে দিল। এবার আর চিনে নিতে কোনও অসুবিধা নেই। স্পষ্টতই বোঝা যায় এই গোলকটি আসলে আমাদের চিরচেনা চাঁদ। অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি এই ছোট্ট চাঁদে যেন জ্যোৎস্নার প্লাবন। গোলকটি সমতল নয়, উঁচু-নিচু, যাকে বলে রিলিফ। তাতে পাহাড়, আগ্নেয়গিরির মুখ, গহ্বর সবই রয়েছে। রয়েছে নানা বিভাজনরেখা। তা ছাড়া, লিখিত ও গাণিতিক নানা পরিচিতি। চাঁদের গায়ে লেখা সংখ্যাগুলো আন্তর্জাতিক লিপিতে হলেও স্থানবিশেষ কিংবা নানা অঞ্চলগুলি সবই লিখিত জাপানি হরফে। আর্থিক অক্ষমতা আড়াল করার পক্ষে সেটাও ছিল একটা যুক্তি। মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, জাপানে যখন চাঁদ বিক্রি হচ্ছে তখন ইউরোপ আমেরিকায়ও নিশ্চয় চাঁদ ফিরি হচ্ছে। সুবিধামতো সেখান থেকে একটি সংগ্রহ করে নিলেই তো গোল চুকে যায়। তাতে লেখালিখি সব নিশ্চয় ইংরেজিতেই থাকবে।

এক রসিক ইংরেজ-কবি লিখেছিলেন, 'জিওগ্রাফি ইজ অ্যাবাউট ম্যাপস,/বায়োগ্রাফি ইজ অ্যাবাউট চ্যাপস।' মানচিত্রকে পাশ কাটিয়ে ভূগোল-পাঠ কেমন করে সম্ভব! আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যত না ভূগোল পড়ি, তার চেয়ে বেশি পছন্দ করি পুরনো দিনের মানচিত্র দেখতে।— মন-চিত্র না মান-চিত্র? দেখতে দেখতে মনে প্রশ্ন জাগে। বিগতকালের যে-কোনও মানচিত্র-সংগ্রহ, বা অ্যান্টিক-ম্যাপের সংকলনের পাতা ওলটালেই বোঝা যায় মানুষের কল্পনাশক্তি ছিল কত উদ্দাম। কতভাবেই না নানা দেশ, মহাদেশ এবং পৃথিবীকে কল্পনা করেছেন! এমনকী ভারতের মানচিত্রেও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি আকৃতি লাভ করতে

কত যুগযুগান্ত পেরিয়ে গেছে। সে-সব মানচিত্রে ভারতীয় নদী বইছে হয়তো আজকের ব্রহ্মদেশ কিংবা মালয়ে! হিমালয়কেও আঁকিয়েদের খেয়াল-খুশিমতো নড়াচড়া করতে হয়েছে যত্রতত্র। তা ছাড়া, মানচিত্রে কত না বাহারি অলংকার! বায়ুস্রোত, সমুদ্রস্রোত বোঝবার জন্য কত না কৃৎকৌশল।

কবে কোথায়, কীভাবে এই মানচিত্র বা মানচিত্রের নামে মন-চিত্র রচনার শুরু, এবং কেমন করে মানুষ শেষ পর্যন্ত একটি নির্ভরযোগ্য মানচিত্র রচনাকে সম্ভব করেছিল, বিচিত্র এবং বিস্ময়কর সেই কাহিনী শুনিয়েছেন— জন নোবল উইলফোর্ড, আমার সামনে খোলা তাঁর বিশাল বইটিতে। বইটির নাম— 'দ্য ম্যাপমেকারস,/দ্য স্টোরি অব দ্য গ্রেট পাইওনিয়ারস ইন কার্টোগ্রাফি— ফ্রম অ্যান্টিকুইটি টু দ্য স্পেস এজ'। উইলফোর্ড অতিশয় পণ্ডিত ব্যক্তি। যদিও তাঁর মুখ্য পেশা সাংবাদিকতা। তিনি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এ কাজ করেছেন। কাজ করেছেন টাইম ম্যাগাজিনে। ১৯৬৫ সাল থেকে বিজ্ঞান-প্রতিবেদক হিসাবে যুক্ত নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর সঙ্গে। তিনি দু'-দু'বার পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন। বিজ্ঞান-বিষয়ক বেশ কিছু বইয়ের লেখক জন নোবল উইলফোর্ড দু'-দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর এই দ্য ম্যাপমেকারস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। ১৯৯৭ সালে লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের ম্যাপ ডিভিসনে উঁকি দিতে গিয়ে তাঁর মনে হল মানচিত্রের দুনিয়ায় ইতিমধ্যে কত কাণ্ডই না ঘটে গেছে! সুতরাং, বইটির পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন অতিশয় জরুরি। অতঃপর তিনি সে-কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফলে ২০০০ সালে আমেরিকায় প্রকাশিত হয় নতুন সংস্করণ। আমার হাতের বইটি ব্রিটিশ-সংস্করণ। এটির প্রকাশকাল ২০০২ সাল! সুতরাং, বলা যায়— হাতে গরম!

এবার বইটির পাতা ওলটানো যাক।

কেউ জানেন না, কবে প্রথম শুরু হয়েছিল মানুষের মানচিত্র আঁকার চেষ্টা বা কী ছিল তার উদ্দেশ্য।— এখান থেকে ওখানে, একটি বিশেষ জায়গা থেকে আর-একটি বিশেষ জায়গার সম্পর্ক নির্ণয়ই কি ছিল তার আদি! লেখালিখি শুরু হওয়ার হাজার হাজার বছর আগেই নিশ্চয়ই শুরু হয়েছিল মানুষের মানচিত্রচর্চা।— কী আছে সমুদ্রের ওপারে? কিংবা, কী রয়েছে দিগন্তের পরে? পৃথিবীর পরে কী, সে-সব প্রশ্ন তখন অনেক দূরে। অনুমান করা হয় পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা জনগোষ্ঠী নানা সময়ে বা একই সময়ে পৃথিবীর আকার-প্রকার এবং আয়তন নিয়ে ভাবতে শুরু করে। প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় ইউরোপিয়ানরা পৌঁছবার আগেই মার্শাল দ্বীপের মানুষেরা গাছের বাকলের তন্তু দিয়ে কাঠি বেঁধে বায়ুর গতি ও সমুদ্রের ঢেউয়ের একটা ছক তৈরি করে নিয়েছিল। কড়ি, ঝিনুক ও পলা দিয়ে রচিত হত তাদের দ্বীপ। এই নকশাগুলো নিয়ে তারা ডোঙা ভাসিয়ে যাত্রা করত অন্য দ্বীপের উদ্দেশে। একই নকশা বড় আকারে রেখে যেত ডাঙায়, যা থেকে অন্যরা নির্দেশ পেত তারা কোন দিকে গেল। তাহিতি দ্বীপের মানুষেরা আবার ক্যাপ্টেন কুক-কে রেখা এঁকে এলাকার মানচিত্র বোঝাবার চেষ্টা করে তখন ইঙ্গিতে বোঝা যায় নিজেদের এলাকার মানচিত্র সম্পর্কে তাদের একটা ধারণা রয়েছে। প্রাক-কলম্বাস যুগে মেক্সিকোয় পদচিহ্ন দিয়ে পথের রেখা বোঝানো হত। কার্তেজ মধ্য আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন কাপড়ে আঁকা স্থানীয় লোকেদের একটি মানচিত্র হাতে নিয়ে। জানা গেছে শত শত বছর আগে এস্কিমোরা সিল্-এর হাড়ে খোদাই করে উপকূলের সঠিক মানচিত্র আঁকতে সক্ষম ছিল। ইনকা-য় কাদা

মাটি ও পাথরে তৈরি হত রিলিফ-ম্যাপ। ইউরোপের আদি অভিযাত্রীরা তাদের গুহার দেওয়ালে নিজেদের মতো করে রেখায় মানচিত্র এঁকে রেখে এসেছেন। বলা বাহুল্য, সবই নিজ নিজ এলাকার খণ্ডিত মানচিত্র।

আজ মানচিত্র বলতে যা বোঝায় হাজার হাজার বছর প্রথমে তা মাথায় এসেছিল চিনের মানুষের। চিন অনেক বিষয়েই পৃথিবীতে ফার্স্ট—প্রথম। মানচিত্র রচনায়ও। অতি প্রাচীন চিনের মানচিত্রের আজ আর কোনও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু দলিল-দস্তাবেজে তার পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ১০২০ অব্দে তদানীন্তন চিন সম্রাটের কাছে নতুন শহর পত্তনের জন্য একটি আবেদন পেশ করা হয়েছিল। আবেদনের সঙ্গে প্রস্তাবিত শহরের একটি খসড়া মানচিত্রও যুক্ত করা হয়েছিল। সেটি অবশ্য হারিয়ে গেছে। কিন্তু আবেদনে তার উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীকালে জাউ বংশের আমলে শাসকদের আদেশ ছিল প্রত্যেকটি নগরের মানচিত্র তৈরি করতে হবে। সম্রাট রাজ্য পরিদর্শনে গেলে তাঁর সঙ্গে থাকতেন রাজকীয় মানচিত্র আঁকিয়ের দল। মনে হয় না কি, সেই সেকালেই শাসকবর্গ এবং আমলাতন্ত্রের কাছে মানচিত্র ছিল একটি শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক হাতিয়ার! গত শতকের নব্বইয়ের দশকে (১৯৯০) উৎখননের ফলে একটি বড়সড় ব্রোঞ্জের প্লেট পাওয়া যায়। তাতে যা লেখা আছে বাংলায় বললে তা দাঁড়ায়— 'ঝাও য়ু তু' (Jhao Yyu Tu)। তার অর্থ— এই গোরস্থানের মানচিত্র। বিশেষজ্ঞরা এই মানচিত্রটির তারিখ ধার্য করেছেন, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক। এলাকাটা একটা সমাধিস্থল। সেখানে শায়িত সম্রাট ওয়াং ঝাউ, তাঁর রানি এবং রক্ষিতারা। একালের মানচিত্র-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই মানচিত্র জানাচ্ছে চিন তখন রীতিমতো অগ্রসর মানচিত্র রচনায়। বিশেষত এতে অঙ্কের ব্যবহার রয়েছে। অঙ্ক ছাড়াও রয়েছে নানা সাংকেতিক চিহ্ন।

এখানেই শেষ নয়। মানচিত্র রচনায় চিনের বাহাদুরির অন্য প্রমাণও মিলেছে। হুনান প্রদেশে উৎখননকালে একজন প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রের সমাধিতে রেশমি কাপড়ের উপর আঁকা একটি মানচিত্র পাওয়া গেছে। এটা ১৯৭৩-৭৪ সালের ঘটনা। মানচিত্রগুলো নির্ভুল, যথাযথ এবং বিস্তারিত। ৯৬×৯৬ সেন্টিমিটার মাপের একটি মানচিত্রে সঠিক দূরত্ব বোঝাবার জন্য স্কেল (যথা—১ : ১,৭০,০০০) ব্যবহার করা হয়েছে। ওই এলাকার ভূচিত্র থেকে শুরু করে দক্ষিণ সাগর পর্যন্ত সমগ্র এলাকা ধরা হয়েছে মানচিত্রে। শুধু তা-ই নয়, মানচিত্রটি আধুনিক বিচারেও বলতে গেলে নির্ভুল। তা ছাড়া তাতে বিভিন্ন প্রতীক ও চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন প্রদেশের নাম চৌকো রেখার মধ্যে, শহর বৃত্তে। দুটি ঢেউ-খেলানো রেখায় নির্দেশ করা হয়েছে পাহাড়, রাস্তা—সরু রেখা, মোটা রেখা— নদী ইত্যাদি। গতিপথ সহ ত্রিশটিরও বেশি নদী আছে মানচিত্রে। যে সমাধিক্ষেত্রে এ-সব পাওয়া গেছে তার কাল নির্দেশ করা হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক।

তার পর আরও একটি। দ্বিতীয় মানচিত্রটি সামরিক মানচিত্র। যুদ্ধের ঘটনাটি মানচিত্র আঁকার বারো-তেরো বছর আগেকার ঘটনা। সুতরাং বলা যায় এই মানচিত্র একটি যুদ্ধের স্মৃতি। এটি রঙিন। নদীর রং নীল, শহর লাল রেখায় ঘেরা, লাল-কালোর ত্রিভুজ দিয়ে বোঝানো হয়েছে ফৌজি ঘাঁটি। আকার ছোট করে যুধ্যমান বাহিনীর আনুপাতিক শক্তি নির্দেশ করা হয়েছে। ত্রিভুজে রয়েছে সেনাপতির নাম। দেওয়াল-ঘেরা দুর্গ, রসদভাণ্ডার, পর্যবেক্ষণ মিনার ইত্যাদি বোঝাতেও নানা সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে। মানচিত্রটিতে

এমনকী যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিও গোপন নেই। চিনা ভাষায় কোনও কোনও শহরের পাশে যা লেখা রয়েছে তার বক্তব্য— '৩৫টি পরিবার অন্যত্র চলে গেছে'। কোনওটিতে বলা হয়েছে— '১০৮টি পরিবার, কেউ ফেরে নাই'। কিংবা 'এখন কেউ নেই'।

বিশেষ করে চিনের এই দুটি মানচিত্র বলছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির তুলনায় চিন ছিল মানচিত্র তৈরির বিদ্যায় অতি অগ্রসর। তার সঙ্গে তুলনীয় কেউ নেই।

উৎখননের ফলে অন্যত্র কাদামাটির এমন ফলক পাওয়া গিয়েছে যা বয়সের হিসাবে চিনের মানচিত্রের চেয়ে প্রাচীন, কিন্তু গুণগত বিচারে আদৌ তার কাছাকাছি নয়। বরং বলা চলে চিনের তুলনায় আদিম। মাটির ফলকে মানচিত্রের প্রাচীনতম নমুনাটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে ইরাকের নুজি-তে। এটির রচনাকাল ধার্য হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০ অব্দ। মানচিত্রটিতে ইঙ্গিতে জনপদ, নদী ও পাহাড়-পর্বত নির্দেশ করা হয়েছে। তা ছাড়া ফসলের খেতও চিহ্নিত। রয়েছে বায়ুপ্রবাহের গতি। মানচিত্রের মাথা বা উপরের দিকটি পূর্ব, বাঁ দিকে উত্তর, নীচে পশ্চিম— দক্ষিণ শূন্য, তার উল্লেখ মাত্রও নেই। উল্লেখ্য, প্রাচীনকালে সব মানচিত্রেই উপরের দিকটিকে চিহ্নিত করা হত 'পূর্ব' বলে। এমনকী মধ্যযুগে খ্রিস্টানদের মানচিত্রও এ-ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছিল না। তার কারণ একটাই, সূর্য ওঠে পূর্বদিকে! আর, স্বর্গও ওই পুব দিকেই।

মেসোপটেমিয়া বা ইরাকে এবং মিশরে মাটির ফলকে আঁচড় কেটে আঁকা যে-সব মানচিত্র পাওয়া গিয়েছে, সাধারণত সেগুলি ব্যবহার করা হত জমির পরিমাপ দেখিয়ে খাজনা আদায়ের জন্য। মনে হয় মানচিত্রের প্রথম ব্যবহার ছিল এ কাজেই। প্রাচীন ব্যাবিলনেও খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে উৎকীর্ণ ফলকের মানচিত্র পাওয়া গিয়েছে। তাতে নগরের সম্পত্তির নির্দেশ। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দের একটি ফলকের মানচিত্রে জমির সীমারেখার সঙ্গে মালিকের নামও দেওয়া হয়েছে। ওই মানচিত্রটিতে নদী, সেচের খালও দেখানো হয়েছে। রাজকীয় সম্পত্তির চার পাশে ঘিরে দেওয়া হয়েছে একটি বৃত্তে। একই সময়ের মিশরের একটি মানচিত্রে অন্য বিবরণও দেওয়া হয়েছে। প্যাপিরাসে আঁকা ওই গোটানো মানচিত্রটি আসলে নুবিয়া-অঞ্চলের স্বর্ণক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য আঁকা। সেখানে স্বর্ণক্ষেত্রটি লাল রঙে আঁকা। আমন-এর মন্দির, রাস্তাঘাট ছাড়াও কিছু ঘরবাড়ির সংকেত দেওয়া হয়েছে এই মানচিত্রে।

মেসোপটেমিয়া বা প্রাচীন ইরাকে নগরের মানচিত্রও ছিল। ইউফ্রেটিসের তীরে নিপ্পুর নামে একটি শহরে উনিশ শতকের শেষ দিকে পেনসিলভানিয়ার সন্ধানীরা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে এমন একটি মানচিত্রের সন্ধান পান যাতে গোটা শহরটাকেই দেখানো হয়েছে। নদী, শহরের মাঝখান দিয়ে বহমান খাল, উঁচু জমি, নগরপ্রাচীর, কেন্দ্রীয় উদ্যান, অনেক কিছুই রয়েছে তাতে। এই মানচিত্রটিও মাটির ফলকে আঁচড় কেটে আঁকা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ওই এলাকায় প্রাচীন ব্যাবিলনে মাটির ফলকে আঁকা হয়েছে এমনকী পৃথিবীর মানচিত্র। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের এই ফলকটি গোলাকৃতি এক সমতল। তার চার দিকে সমুদ্র। সমুদ্রে কিছু কাল্পনিক দ্বীপ। এই পৃথিবী আয়তনে ব্যাবিলনের চেয়ে কিঞ্চিৎ বড়। ব্যাবিলন একটি দীঘল আয়তক্ষেত্র। তার পূর্বে অ্যাসিরিয়া, পশ্চিমে ক্যালডিয়া। লেখক বলছেন এই মানচিত্রটি গর্বিত ব্যাবিলনিয়ানদের দাম্ভিকতার প্রকাশ। এটি একটি দার্শনিক ও রাজনৈতিক ঘোষণা মাত্র। দেওয়াল-ঘেরা নিজেদের শহর এলাকাটি মোটামুটি যথাযথ কিন্তু

তার বাইরে অজ্ঞানতার অন্ধকার। ওদের পৃথিবী নিছক এক কল্পলোক, এবং সে-কল্পনার দৌড়ও বেশি দূর নয়। উনিশ, এমনকী বিশ শতকের পরেও মোটামুটি এরকমই ছিল পৃথিবীর মানচিত্র। অর্ধেক যদি বাস্তব, অর্ধেক তবে কল্পনা।

ব্যাবিলনিয়ানদের মতোই শুরু হয়েছিল গ্রিকদের মানচিত্র রচনা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হেরোডোটাস একটি মানচিত্র ব্যবহারের কাহিনী শুনিয়েছেন। সেটা খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৯-৪৯৪ অব্দের কথা। সে সময় আইওনিয়ান বিদ্রোহ। বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন অ্যারিস্টাগোরাস। স্পার্টায় গিয়ে তিনি সেখানকার রাজা কিওমিনেসকে একটি ব্রোঞ্জের ফলক দেখিয়ে বললেন এটা পৃথিবীর মানচিত্র। মানচিত্রটি তৈরি করেছেন হেকাটায়ুস নামে একজন। বিদ্রোহী নায়ক রাজাকে ফলকটি দেখিয়ে বললেন— এটি গোটা পৃথিবীর মানচিত্র।— এই দেখো, আইওনিয়ানদের পরে লাইডিয়ান দেশ। মানচিত্রে একটি পরিসীমা ছিল। ছিল নদী এবং সাগরও। লোকটি স্পার্টা-রাজকে বললেন, তার পর কাপ্পাডোডিয়ানসদের রাজ্য। তার পর সিসিলি। এর পর সাইপ্রাস। সর্বত্র ধনদৌলতের ছড়াছড়ি। এক সাইপ্রাস থেকেই পারস্যরাজ বার্ষিক নজরানা পান পাঁচশো ট্যালেন্ট। তার পর দেখো আর্মেনিয়ানদের দেশ। সেখানে প্রচুর গো-মহিষাদি রয়েছে। আরও পুবে সিসিয়া ও সুসা নগরী। সেখানেই পারস্য-রাজের অধিষ্ঠান। সেখানেই তাঁর কুবেরের ভাণ্ডার। একবার যদি তা দখল করতে পার, তবে দৌলতে অনায়াসে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে। স্পার্টার রাজা জিজ্ঞাসা করলেন— সেখানে পৌঁছতে কত দিন লাগবে? বিদ্রোহী নায়ক বললেন— পারসিকদের সড়ক ধরে এগোলে তিন মাস। রাজা বেঁকে বসলেন, না, আমার দরকার নেই। আজই সূর্য ডোবার আগে তুমি শহর থেকে বিদায় হও। আসলে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রিকদের পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। তার চেয়েও বড় কথা— মানচিত্রের সঙ্গে বাস্তবের অনুপাত বা দূরত্ব পরিমাপের জন্য ‘স্কেল’ ব্যবহারও ছিল তাদের অজানা।

তবে হেরোডোটাস-এর নিজের লেখালিখি থেকেও বোঝা যায় মানচিত্র তৈরির বিদ্যা ধীরে ধীরে গ্রিকদের মধ্যে দানা বাঁধছিল। মানচিত্রে বিভাজন, সমান্তরাল রেখার চিন্তা ছাড়া পথের মানচিত্র রচনাই বা কেমন করে সম্ভব? খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অ্যারিস্টোফোনিস-এর একটি কমেডিতে বা প্রহসনে দেখা যায় (কমেডির নাম—দ্য ক্লাউড), একটি যন্ত্র মঞ্চে হাজির করা হয়েছে। একটি চরিত্র জিজ্ঞাসা করে— এটি কি জমি মাপবার যন্ত্র? যাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল তিনি উত্তর দেন— তুমি কি জমি বিতরণের কথা বলছ? তা কিন্তু নয়, এটা গোটা পৃথিবী মাপার যন্ত্র। অন্যজন তখন বলে ওঠে, দেখছ-না গোটা দুনিয়াটাই রয়েছে এর পরিসীমার মধ্যে!— এই তো, এখানে এথেন্স!

ইংরেজিতে ‘ম্যাপ’ শব্দটির রকমারি ব্যবহার রয়েছে। কেউ হয়তো তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ‘ম্যাপ’ তৈরি করেন, কেউ হয়তো তাঁর ধ্যানধারণার ‘ম্যাপ’ বুঝিয়ে দেন অন্যদের। অফিসে অফিসেও কাজকর্ম উপলক্ষে রচিত হয় রকমারি ‘ম্যাপ’। কিন্তু আমাদের আলোচ্য এই ম্যাপ বা মানচিত্র বলতে কী বুঝব আমরা? পণ্ডিতেরা বিষয়টি নিয়ে বিস্তর ভেবেছেন, কাহন কাহন লিখেছেন। সে-সব রীতিমতো জটিল তত্ত্ব। টীকাভাষ্য ছাড়া গভীরে প্রবেশ করা দায়। একটি সংজ্ঞা কিছুটা সহজবোধ্য। তাতে বলা হয়েছে মানচিত্র হচ্ছে পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানকে প্রতীকের সাহায্যে বিধিবদ্ধ করে সেই জ্ঞান অন্যদের ব্যবহার-উপযোগী করে পরিবেশন করার একটা পদ্ধতি। এই পদ্ধতি যখন প্রতিবেশকে

চিত্রায়িত করে চোখের সামনে তুলে ধরে তখনই তা ম্যাপ, বা মানচিত্র। ম্যাপ শব্দটার আদি লাতিন— মাপ্পামুন্ডি। মাপ্পা অর্থ টেবিল-ক্লথ বা ন্যাপকিন। আর মুনডাস— পৃথিবী।

ইচ্ছা করলেই মানচিত্রে গোটা পৃথিবীকে যথাযথভাবে উপস্থিত করা যায় না। বোর্হেস এমন এক মানচিত্রের কল্পনা করেছিলেন— 'যা সাম্রাজ্যের আয়তনের সমান।' অর্থাৎ— স্কেল: ১:১। লুইস ক্যারল-এর কাহিনীতেও এমন স্বপ্নকথা রয়েছে। একটি দেশের এমন মানচিত্র তৈরি করা হল যাতে মানচিত্রের ১ মাইল = দেশের ১ মাইল। কিন্তু তা আর খোলা হল কই? চাষিদের আপত্তি। গোটা দেশ যদি ঢেকে দেওয়া হয় তবে সূর্যের আলো পৌঁছবে কেমন করে? তাই তো! সুতরাং, শেষ পর্যন্ত সব মানচিত্রই সংকুচিত। বাস্তবের সঙ্গে তার আকার-প্রকারের পার্থক্য নিশ্চিত।

পৃথিবীর মানচিত্র আঁকতে হলে প্রথমে জানা চাই পৃথিবীর আকার, তার পরিমাপ। আর তা জানতে হলে প্রথম কাজ উপকথার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসা। দ্বিতীয়, বাস্তব কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন। আজ অবশ্য আমরা চাঁদ কিংবা মহাকাশ থেকে তোলা পৃথিবী নামক গোলকটির ছবি দেখে অভ্যস্ত। একটা সময় ছিল পৃথিবীতে বাস করে পৃথিবী সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা দুঃসাধ্য। তখন প্রায় সবই ছিল কল্পনা-নির্ভর। উপকথার জন্ম এই পটভূমিতেই।

তৎকালে অনেকেরই ধারণা ছিল পৃথিবী সমতল। গত শতকের ষাটের দশকেও শোনা গেছে ব্রিটেনে এই অতি-আধুনিক যুগেও রয়েছে 'ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটি' নামে একটি ছোট্ট বিদ্বৎসভা। তার সদস্যরা তখনও বিশ্বাস করতেন পৃথিবী তাঁদের সামনে যে টেবিলটি রয়েছে তার মতোই সমতল।

হোমারও ভাবতেন পৃথিবী সমতল একটি 'ডিস্ক' বা থালার মতো, তার চার দিকে জল, চিরন্তন সমুদ্র। আর পৃথিবীর কানার উপর বিশাল গম্বুজ। সেটি ধারণ করে রয়েছেন মহাবল অ্যাটলাস। তা ছাড়া ভার বহনের জন্য স্তম্ভও রয়েছে। সব মিলিয়ে একটি উপুড় করা অর্ধগোলকের কল্পনা। প্রতিদিন মহাসমুদ্র থেকে সূর্য উঠছে, প্রতিরাত্রে তার ঢেউয়ের নীচে ডুবে যাচ্ছে। চাঁদ এবং অন্যান্য নক্ষত্ররা প্রতিরাত্রে এক দিক থেকে অন্য দিকে চলে যায়।

বিশ্ব (ইউনিভার্স)-কে গ্রিক ভাষায় বলা হয় 'কস্‌মস্‌', যার অর্থ সুশৃঙ্খল। মেসোপটেমিয়ার লোকেরাও চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত দেখে দেখে বুঝে নিয়েছিলেন তার মধ্যে একটা ছন্দ আছে, শৃঙ্খলা আছে। তা থেকে অন্তর্বর্তী সময়ের একটা ধারণা জন্মায়, ঋতুচক্রও ক্রমে ধরা পড়ে। বলতে গেলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সেটাই সূচনা। এই সুশৃঙ্খল চিন্তার স্বাক্ষর রাখেন প্রথমে সুমেরিয়ানরা, পরে ব্যাবিলনের জিজ্ঞাসুরা। গ্রিকরা আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। পণ্ডিতেরা ভাবেন আমরা এই শৃঙ্খলার মর্ম বুঝতে পারলে পৃথিবীর মর্মও ধরতে পারব। ব্যাবিলনের অবদান যদি পর্যবেক্ষণে, বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যায়, তবে গ্রিকদের গৌরব সে-সব তথ্যের যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দুইয়েরই গুরুত্ব অপরিসীম। এই চর্চা থেকে ক্রমে ফুটে ওঠে এই সত্য যে পৃথিবী গোলাকার। ক্রমে ধরা পড়ে গোলকের পরিমাপও। এই পরিমাপ বিজ্ঞানচর্চায় প্রাচীন গ্রিসের এক স্মরণীয় অবদান। মানচিত্র রচনায় ভূমিকা তার মৌলিক।

গ্রিকদের চিন্তায় এইসব ধারণা সূচিত হয় মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। সে-সময়ে গ্রিসের সব চেয়ে ঐশ্বর্যশালী শহর ছিল— মিলেটাস। এশিয়া মাইনরে একটি অতি ব্যস্ত

বন্দর মিলেটাস। সেখানে পাঁচমিশেলি মানুষের ভিড়। (আজ অবশ্য বন্দরটির অবস্থিতি তুরস্কে, অ্যানাতোলিয়ার উপকূলে) যাই হোক, আইওনিয়ান গ্রিকদেরও আড্ডা ছিল সেখানে। তারাও বন্দরের শিল্প-বাণিজ্যের শরিক। ওঁরা ছিলেন উপকথার দেবলোক থেকে মুক্ত, স্বাধীন, কৌতূহলী সওদাগর। নতুন শিল্প-বাণিজ্যের ভুবন তাঁদের উপকথার মোহ থেকে মুক্ত করে। এই পরিবেশেই আবির্ভাব থ্যালেস নামে একজন গ্রিক শ্রেষ্ঠীর। তাঁর ছিল জলপাই-তেলের কারবার। তাতে তিনি রীতিমতো বিত্তশালী হন। মজা এই, লক্ষ্মীর সঙ্গে তিনি সরস্বতীর আরাধনায়ও ছিলেন সমান মনোযোগী। মিশরের জ্যামিতি, ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করতে করতে তাঁর পাণ্ডিত্য এমন প্রখর হয়ে ওঠে যে, খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে তিনি সূর্যগ্রহণের আগাম তারিখ ঘোষণা করতে সমর্থ হন।

থ্যালেস পৃথিবী নিয়েও ভেবেছিলেন। সে-ভাবনা অবশ্য ছিল ত্রুটিপূর্ণ। উপকথায় আস্থাবান না হলেও তিনি সমান-পৃথিবীর তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলা খুঁজতে গিয়ে তিনি একসময় ঘোষণা করলেন, সব-কিছুরই আদি সমুদ্রজল। বৃষ্টিতে প্রকৃতির ঔজ্জ্বল্য, নীল নদের বন্যা, বন্যায় মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি এ-সব পর্যবেক্ষণ করেই তিনি ওই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।

পৃথিবী গোলাকার, এই তত্ত্ব যিনি ঘোষণা করেন, তিনি সুখ্যাত পাইথাগোরাস। তিনি জন্মেছিলেন মিলেটাস-এর পরে সামস নামক একটি দ্বীপে। যৌবনে তিনি ইতালিতে চলে যান। সেখানে ক্রোটনায় দর্শন-চর্চার জন্য একটি টোল খোলেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক শেষ হওয়ার আগেই তিনি ঘোষণা করেন, পৃথিবী সমতল নয়, সিলিন্ডার বা চোঙের মতো নয়, আয়তক্ষেত্রও নয়, পৃথিবী আসলে 'স্ফেরিক্যাল' বা গোলাকৃতি। তিনি ও তাঁর শিষ্যরা আরও বললেন, চাঁদ, সূর্য গোলাকার। নি[illegible] গোল। পৃথিবীও তা-ই। হয়তো ততদিনে পৃথিবীর আরও কোনও কোনও এলাকায় গোলাকৃতি পৃথিবীর ধারণার জন্ম হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমি দুনিয়ায় এই ধারণাটি করেন প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল।

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, আমাদের অনুভূতিই প্রমাণ করছে পৃথিবী গোলাকার। আকাশ, সমুদ্র, সমুদ্রে জাহাজের আসা বা যাওয়া,— ছোটদের ভূগোল বইয়ে আজ গোলাকার পৃথিবীর সমর্থনে যে-সব প্রমাণগুলো দাখিল করা হয়, বলতে গেলে তিনিও সেদিন তা-ই করেছিলেন। তবে তিনি নাকি এটাও বলেছিলেন যে, এই গোলক অতিবৃহৎ নয়।

গ্রিকরা অ্যারিস্টটল-এর যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। না-হয় বোঝা গেল পৃথিবী 'স্ফিয়ার',— গোলাকার। কিন্তু অতঃপর প্রশ্ন— পৃথিবী নামক গোলকটি কত বড়?— কী তার পরিধি? অ্যারিস্টটল হিসাব নিকাশ করে বললেন পৃথিবীর পরিধি বা ঘের (আজকের মাপে) ৬৪ হাজার কিলোমিটার। আর্কিমিডিস তাঁর হিসাব দেখিয়ে বললেন, আটচল্লিশ হাজার কিলোমিটার। কে জানেন, কার হিসাব ঠিক।

চিনারাও নিশ্চয়ই ভেবেছে বিষয়টি নিয়ে। পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র রচনার গৌরব যাদের, তারা কি এমন একটি জরুরি প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে? তা কেমন করে সম্ভব! চিনারা অবশ্য পৃথিবীকে তখনও সমুদ্রঘেরা এক বর্গক্ষেত্র বলেই বিশ্বাস করত। তবু পৃথিবীর আয়তন মাপতে তারা কসুর করেনি। এ-সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। না, সেটা আমাদের গণেশ ঠাকুরের মতো মাতৃপরিক্রমাতেই পৃথিবী পরিক্রমা বলে ধরে নেওয়ার কাহিনী নয়। দুই ভাই দায়িত্ব নিয়েছিলেন পৃথিবীর পরিমাপ করতে। একজন পূর্ব থেকে যাত্রা করেন

পশ্চিমে, অন্যজন উত্তর থেকে দক্ষিণে। দু'জনেই ঘুরে এসে বললেন পৃথিবীর পরিধি ১ লক্ষ ৩৪ হাজার কিলোমিটার। মাপটা আদৌ সঠিক নয়। তবু মনে রাখতে হবে চার হাজার বছর আগে তাঁরা এরকম একটা প্রশ্ন নিয়ে ভেবেছিলেন। সেটা কম কথা নয়।

পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানসম্মত আয়তন স্থির করেন এরাটসথেনেস নামে একজন গ্রন্থাগারিক। তাঁর সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ২৭৬ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৯৬ অব্দ। নীল নদের বদ্বীপে ভূমধ্যসাগরের তীরে আলেকজান্ডার-প্রতিষ্ঠিত শহর আলেকজান্দ্রিয়া— আলেকজান্ডারের মৃত্যুর (খ্রি.পূ. ৩২৩) পরে গ্রিক-দুনিয়ার উজ্জ্বলতম শহর। সেখানে নানা এলাকার গ্রিকরা তো বটেই সমবেত মিশরীয়, ইহুদি, পারসিক, সিরিয়ান, নিগ্রো এবং নানা জাতের মানুষ। একজন গ্রিক কবি লিখেছেন, আলেকজান্দ্রিয়া অ্যাফ্রদিতির শহর। এখানে ধনদৌলত, ক্রীড়াভূমি, দর্শনীয় নানা বস্তু, বিবিধ মূল্যবান পশরা, রাজকীয় প্রাসাদ, কী নেই! রয়েছে বিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র, উৎকৃষ্ট মদ্য, সুদর্শন তরুণ, শান্ত নীল আকাশ এবং সুন্দরী রমণীরা। তবে দুনিয়ার বিদ্বজ্জনের কাছে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রধান আকর্ষণ ছিল বিস্ময়কর মিউজিয়াম বা জাদুঘর এবং গ্রন্থাগার। আলেকজান্দ্রিয়া তথা মিশরের অধিপতি তখন গ্রিকরা। আলেকজান্ডারের পরে সেখানে যে রাজবংশ নিজেদের শাসন কায়েম করেন তাঁদের বলা হত টলেমি। তাঁরা বিশাল সৈন্যবাহিনী পুষতেন, মোটা হারে কর আদায় করতেন বটে, কিন্তু স্বভাবত ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। তাঁদের সাংস্কৃতিক আভিজাত্য ছিল তুলনাহীন। তাঁরা কলাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জাদুঘর এবং গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন এবং আলেকজান্দ্রিয়াকে পরিণত করেন সে-কালের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যাচর্চা-কেন্দ্রে। পৃথিবীর নানা এলাকার জ্যোতির্বিদ, গাণিতিক, ভিষক, ঐতিহাসিক, লেখক, দার্শনিক তাঁরা জড়ো করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। দিমেট্রিউস, স্ট্রাটো, ইউক্লিড, আর্কেমেডিস, অ্যাপোলোনিয়াস, ক্যালিমাকিউস প্রমুখ দিগ্‌গজ ভাবুকরা তৎকালে সেখানে। সবাই সরকারি ভাতা পেতেন। সকলের জন্যই ছিল খাওয়া-পরার সুবন্দোবস্ত। খ্রিস্টপূর্ব ২৪০ অব্দে তৃতীয় টলেমির আমলে এরাটসথেনেস (Eratosthenes) যোগ দিলেন সেই বিখ্যাতদের দলে। তিনি মিশরের পশ্চিম অঞ্চলের মানুষ। এথেন্স-এ দর্শন, বিজ্ঞান ও গণিতচর্চা করেছেন। কবিতা লিখতেন। অন্যান্য বিষয়েও বই ছিল তাঁর। তবে একসঙ্গে একাধিক বিষয় চর্চার জন্য তাঁকে বলা হত— 'পেনথালস'। ক্রীড়াঙ্গনে পাঁচটি বিভাগে যাঁরা দক্ষতা দেখাতেন গ্রিকরা তাঁদের তা-ই বলতেন। তাঁদের বিচারে মানুষটি 'বিটা'— দ্বিতীয় বলে গণ্য হতে পারেন, কিন্তু 'আলফা'— প্রথম নন। এই 'দ্বিতীয় শ্রেণী'র গ্রন্থাগারিকই হিসাব কষে দেখিয়ে দিলেন পৃথিবীর পরিধি কত। ততদিনে পৃথিবীর ৩৬৫ দিনে সূর্য-পরিক্রমার কথা জেনে গেছেন। আকাশকে অনুসরণ করে মাটিতে মনের মানচিত্রে আঁকা হয়ে গেছে বিষুবরেখা, কর্কট ও মকরক্রান্তি। (পাঁচ হাজার বছর আগে ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিদরা বৃত্তকে ৩৬০ ভাগে ভাগ করেন।) নীল নদের উজানে একটি ওয়েসিস বা বড় কূপ ছিল। সূর্য বিষুবরেখার উপরে আসে ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর। এরাটসথেনেস এ-সব জানতেন। তিনি ২১ জুনের কথা মনে রেখে কূপের দূরত্ব মাপবার জন্য এক উটের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। দূরত্ব মাপা হল। ওই বিশেষ স্থানটি কত ডিগ্রিতে তাও তাঁর জানা। এবার লাইব্রেরির সামনে একটা সূর্যঘড়ি, মানে একটা লম্বা খুঁটিতে একই সময়ে মাপলেন ছায়া। দুই বিন্দুতে একটি ত্রিভুজ করে বৃত্তের পাঁচ ভাগের এক ভাগ তিনি হাতে পেলেন। এর পর

সামান্যই কাজ। হিসাব করে বললেন পৃথিবীর পরিসীমা, ২,৫০,০০০ স্ট্যাডিয়া বা ৪৬,২৫০ কিলোমিটার। সামান্য ভুলচুক হতে পারে ভেবে অঙ্কটা পাকাপাকিভাবে ধার্য করলেন ৪৬ হাজার কিলোমিটার। আসলের চেয়ে শতকরা ১৬ ভাগ বড় হয়ে গেল বটে, কিন্তু সন্দেহ নেই কৃতিত্ব। কারণ, তাঁর হাতে কোনও আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না। হিসাবে যে গরমিল তার কারণ উটের বাহিনী দূরত্ব ঠিকমতো মাপতে পারেনি। ডিগ্রি তথা অক্ষাংশের মাপেও ভুল ছিল। একালে পৃথিবীর আয়তন ধরা হয় ৪০ হাজার কিলোমিটার! সুতরাং, একালের পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থাগারিক 'বিটা' ছিলেন না, 'বিটা' ছিলেন তাঁরাই যাঁরা তাঁর প্রতিভা পরিমাপ করতে পারেননি। তিনি 'আল্‌ফা'।

সেই আলেকজান্দ্রিয়া। সেই বিশ্ববিনন্দিত গ্রন্থাগার। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের কথা। আলেকজান্দ্রিয়ার আগেকার ঐশ্বর্য নেই। তবু জনসংখ্যায় রোমের পরেই তার স্থান। বিদ্যাকেন্দ্র হিসাবে অবশ্য তখনও রোমের চেয়ে অনেক বেশি খ্যাতিমান। গ্রন্থাগারে কাজ করছেন তখন ক্লডিয়াস টলেমি নামে এক পণ্ডিত। (তাঁর কর্মজীবন ১২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫১ খ্রিস্টাব্দ) তিনি টলেমি-রাজদের কেউ নন। তাঁর চর্চার বিষয় ছিল সংগীত, গণিত আর দৃষ্টিবিজ্ঞান বা আলোকবিদ্যা। কিন্তু বিশ্বজোড়া খ্যাতি তাঁর দুটি বইয়ের জন্য। একটির বিষয় ছিল— জ্যোতির্বিদ্যা, অন্যটির— ভূগোল।

টলেমি একটি পৃথিবীর মানচিত্র এঁকেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর ভূগোলে ছিল আরও ২৬টি আঞ্চলিক মানচিত্র। সেগুলি তাঁর নিজের আঁকা কি না নিশ্চিত বলা যায় না। তাঁর বক্তব্য ছিল— মানচিত্রে শুধু শহর জনপদ, পর্বত ও বড় বড় নদী থাকলেই চলবে না, তার অন্তর্গত বিশেষ চরিত্রলক্ষণাদিও অনুধাবন করতে হবে। প্রকারান্তরে তিনি 'থিমেটিক ম্যাপ'-এর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাঁর আর-একটি শর্ত— মানচিত্রে 'স্কেল' বা পৃথিবীর অনুপাতে বিশেষ দেশের পরিমাপ নির্দেশ করতে হবে। তাঁর মানচিত্র জ্ঞাত পৃথিবীর মানচিত্র। ফলে তাতে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যকে বড় করে দেখিয়ে এশিয়া আফ্রিকাকে খুবই সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মানচিত্র অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাহীন নয়। এ-সব কারণেই বিশেষজ্ঞদের মতে বিজ্ঞানসম্মত মানচিত্রের সংজ্ঞা যিনি নির্ধারণ করেন তিনি ক্লডিয়াস টলেমি।

চিনারাও কিন্তু তখন বসে নেই। টলেমির প্রায় সমসাময়িক ভূগোলবিদ চ্যাং হেং। তাঁর সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি একটি মেয়েকে রেশমি কাপড়ে একটি মানচিত্র নকল করতে দিয়েছিলেন। তার ছুঁচ চালনার আড়াআড়ি পদ্ধতি থেকে তাঁর মাথায় আইডিয়া আসে মানচিত্রকে রেখার জালে বন্দি করার। তার পরে এলেন (খ্রিস্টীয় ৩য় শতকে) সেই 'জিউ' (Pei Xiu)। তিনি প্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'সঠিক মানচিত্র রচনার ছয়টি পদ্ধতি' শিরোনামে টলেমির মতো তিনি বিজ্ঞানসম্মত মানচিত্র আঁকার পদ্ধতি শিখিয়ে গেছেন। অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা, স্কেল, পরিসীমা— সবই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি, তবে অস্বীকার করার উপায় নেই তুলনামূলকভাবে এই বিদ্যায় গ্রিকদের অবদান বেশি। গ্রিক বলতে গ্রিক-দুনিয়া। আর, সেই সূত্রেই রেনেসাঁর দিনগুলোতে আধুনিক মানচিত্র রচনার উদ্‌যোগ।

টলেমির একশো বছর পর আলেকজান্দ্রিয়া পরিণত হয় রণক্ষেত্রে— বিদ্রোহ, যুদ্ধ, আগুন। পাঁচশো বছরের পুরনো গ্রন্থাগার বিধ্বস্ত। অবশিষ্ট যা ছিল উন্মত্ত খ্রিস্টান জনতা

সেটি পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয় ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে। তার খোলসে অতঃপর গড়ে তোলা হয় একটি গির্জা। ধর্মীয় অন্ধত্বের কাছে পরাজিত হয় যুক্তি বা জ্ঞানের প্রতীক। হাজার বছর ধরে অতএব ক্লডিয়াস টলেমির মতো আরও অনেক বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন লুপ্তনাম। বিশেষত পশ্চিমি জগতের কাছে। কাকে বলে বিজ্ঞানসম্মত মানচিত্র, কী তার সঠিক রচনা-পদ্ধতি কিছুই তারা জানে না। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে চতুর্দশ শতক ইউরোপে মধ্যযুগ। সে-পৃথিবী তমসাবৃত। সেখানে সঠিক মানচিত্র রচনার প্রশ্নই ওঠে না। যে-সব মানচিত্র আঁকা হচ্ছিল তখন তা চরিত্রে স্বর্গীয়, অর্থাৎ বাস্তবের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তৎকালের ইউরোপিয়ান পণ্ডিত এমনকী নিজেদের শহরের পাশের শহরের অক্ষাংশও জানেন না। ফলে চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে তৈরি একখানা মানচিত্র বাদ দিলে আর যা মানচিত্র সবই উদ্ভট কল্পনার ফসল।

দ্বাদশ শতকে শোনা যায় প্রেসবাইটার জন বা পেস্টার জন নামে এশিয়ার এক মহাপরাক্রমশালী খ্রিস্টান রাজার কথা। তার আগেই কলমে ও মানচিত্রে আবির্ভূত হয়েছে ভয়াবহ দুই দুশমন গগ ও ম্যাগগ। মানচিত্রে যেমন পেস্টার জন-এর রাজ্য জমি দাবি করছে, তেমনই নির্দেশ করতে হচ্ছে গগ ও ম্যাগগ-এর বসত এলাকাও। গগ ও ম্যাগগ-এর কথা ভাবলেও ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে। সুতরাং, মানচিত্র আঁকিয়েরা তাদের দেওয়ালের আড়ালে ঠেলে দিতে পারলেই খুশি। কিন্তু পেস্টার জনকে অবশ্যই চাই খ্রিস্টান দুনিয়ায়। তাঁর দরবারে পৌঁছবার জন্য মধ্যযুগের ইউরোপ যা করছে তা অকল্পনীয়। মানচিত্রে দেখা যায় পেস্টার জন প্রায়শ ঠিকানা বদল করছেন। একসময় ভারতেও তাঁর প্রাসাদ উঁকি দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত অবশ্য চিহ্নিত হয় ইথিওপিয়ায়। ইথিওপিয়া নির্দেশ করেন ফা মাউরো নামে এক মানচিত্র-আঁকিয়ে। এই মানচিত্রটিকে বলা হয় মধ্যযুগের সর্বোত্তম মানচিত্র এবং অনাগত রেনেসাঁর বার্তাবহ।

৩০০ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের ছয়শো বা তার কাছাকাছি সংখ্যক মানচিত্র আঁকা হয়েছে। মধ্যযুগের এই মনের ফসল দিকে দিকে সন্ধানী অভিযাত্রা, প্রাক-বিজ্ঞান যুগের। সুতরাং, তাতে ভৌগোলিক তথ্যাদি নামমাত্র, কখনও ভ্রান্তিপূর্ণ, তবে হ্যাঁ, সালংকৃত ওইসব মানচিত্র নয়ননন্দন। গৌরবময় সেই অতীতের পর হাজার বছর ব্যাপী সময়ের সে কী অপচয়! গ্রিকরা কী করেছিলেন তার একটা সংক্ষিপ্ত নমুনা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। গ্রিকদের সেই সুবর্ণ-যুগের পর রোমানরাও কি নিজেদের সাম্রাজ্যের রাস্তাঘাটের মানচিত্র তৈরি করেননি? অগস্টাস সিজারের নির্দেশে তাঁর জামাতা মার্কাস অ্যাগ্রিপ্পা-র (Agrippa Marcus) নেতৃত্বে চব্বিশ বছরের চেষ্টায় খ্রিস্টপূর্ব ৬৩-১২ অব্দে সম্পূর্ণ হয়েছিল পথের সে-বিশাল মানচিত্র— ব্রিটেন থেকে মধ্যপ্রাচ্য। দীর্ঘ পথের মাকড়সা জালের সর্বত্র মাইল ফলক। সেই পটভূমিতে মধ্যযুগের দীনতা কি সভ্যতায় লজ্জাকর নয়?

তবে আলো ফোটার আভাসও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে চতুর্দশ শতকের আগেই। চুম্বক আবিষ্কৃত হল পাথরে। কে তা আবিষ্কার করেছিলেন, মানচিত্র রচনা কিংবা সমুদ্রযাত্রায় কারা সে বস্তুটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন কেউ তা জানেন না। তবে অনুমান করা হয় এগারো শতকে দিগ্‌দর্শনের জন্য চিনারা তা প্রথম ব্যবহার করে। চিন আবার ফার্স্ট! চুম্বকের পর এল কম্পাস। তার ব্যবহার শুরু হয় ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে বা তারও আগে। যদিও জ্যোতির্বিদরা তৎকালে বৃত্তকে ভাগ করতে জানতেন, তবু প্রথম দিকের কম্পাসে ডিগ্রি নয়,

বায়ু ছিল নির্দেশক। ৩৬০ ডিগ্রির চেয়েও নাবিকের কাজে জরুরি ছিল বারোটি বায়ুর স্রোত। কম্পাসে তারই নিশানা। ক্রমে ক্রমে আরও ভাগ করে নির্দেশিত হয় আটটি প্রধান বায়ুস্রোত, আটটি অর্ধ-বায়ু, ষোলোটি বিষুব-বায়ু— সব মিলিয়ে বত্রিশ পাপড়ির একটি ফুল। ওঁরা বলতেন— 'রোজা ডস ভেনটস'— 'বাতাসি গোলাপ'। আরও কিছু কিছু কাণ্ড ঘটে মানচিত্রের দুনিয়ায়। চতুর্দশ শতকের সূচনায় ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী নানা বন্দরে গড়ে ওঠে সমুদ্রপথের 'চার্ট' বা পথ-রেখা তৈরির কেন্দ্র। পিসা, জেনোয়া, ভেনিস— আরও অনেক বন্দরে এগুলোকে বলা হত 'কাটালান চার্ট' (Catalan Chart)। ওই সব কেন্দ্রে নৈপুণ্যের সঙ্গে তৈরি হয় বেশ-কিছু চার্ট, যা শুধু ভূমধ্যসাগরের তটরেখার যথাযথ বিবরণ নয়, কৃষ্ণসাগর, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্রতট পর্যন্ত নির্ভুলভাবে চিহ্নিত। বোঝা যায় নাবিকদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই রচিত হচ্ছিল এইসব চার্ট। কোনও-কোনওটি আরও উচ্চাভিলাষী। সেখানে কখনও যদি আফ্রিকার উপকূল, কখনও বা ভারতের পশ্চিম তটরেখা। এভাবেই ক্রমে ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট পঞ্চম চার্লস-এর উদ্‌যোগে ছ'টি মানচিত্র নিয়ে তৈরি হয় একটি অ্যাটলাস। তাতে ভারতের মালভূমি মোটামুটি অবয়বলাভ করেছে, চিনের কিছু নদী ও শহর ঠাঁই পেয়েছে। দুই নীল নদের প্রবাহও ধরা পড়েছে। মানচিত্র-আঁকিয়ে কোথাও কোথাও তট ছেড়ে উঁকি দিয়েছেন দেশের ভেতরেও। বলা হয় এই রঙিন মানচিত্রটি থেকে বোঝা যায় হাজার বছর পরে আবার মানুষের হাতে এসেছে মানচিত্র তৈরির বিদ্যা, এবং তাকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার মতো যুক্তিবুদ্ধিও। যবনিকা কম্পমান। ইউরোপে নতুন ভোর বুঝি-বা আসন্ন।

এই নবজাগরণে আরবদের বিশেষ ভূমিকা। লুপ্ত গ্রিক মনস্বীদের জ্ঞানের ভাণ্ডার অতি যত্নসহকারে এতকাল আগলে রেখেছিলেন ওঁরাই। গ্রিক দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং নানা বিষয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আরবি ভাষায় অনুবাদ করে মধ্যযুগের সেই অন্ধকারে তাঁরাই চালিয়ে গেছেন জাগতিক বিদ্যার চর্চা। নিজেদের মতো করে সে-সব তত্ত্ব বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, এবং সম্প্রসারণের চেষ্টাও চালিয়ে গেছেন তাঁরা। ইউরোপ নিজেদের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আবিষ্কার করেছিল আরব মুলুকেই। দৃষ্টান্ত হিসাবে ক্লডিয়াস টলেমির কথাই ধরা যাক। হারিয়ে যাওয়া টলেমির ভূগোল ছিল আরবদের ঘরে। তাঁরা তা চর্চা করে নিজেদের ভূগোলের ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি গুটেনবার্গের আবির্ভাব। সহজে অদল-বদল করা যায় এমন ধাতব হরফ নিয়ে এল মুদ্রাযন্ত্র। টলেমির মানচিত্র ছাপা হল। ইউরোপ উত্তেজিত, উদ্‌বেলিত। উত্তেজনার আগুনে নতুন সমিধ মার্কো পোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত। এককালে পোলো সম্পর্কে বিতর্ক ছিল বটে, কিন্তু পণ্ডিতেরা এখন স্বীকার করেন, ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে মার্কো পোলো সত্যই চব্বিশ বছর চিনে বাস করেছেন। পশ্চিমের ভূগোলের ধারণাকে তাঁর মতো সমৃদ্ধ আর কেউ করেননি। মার্কো পোলোর পথ-রেখা প্রথম ঠাঁই পায় ১৪৫৯ সালের একটি মানচিত্রে। তার পর থেকে প্রতিটি মানচিত্রে তাঁর উপস্থিতি। নবজাগ্রত ইউরোপ এবার তৈরি দিকে দিকে জাহাজ ভাসাতে। শুরু হল 'এজ অব ডিসকভারি' বা আবিষ্কারের যুগ। ইউরোপ দ্রুত এগিয়ে চলেছে ঐতিহাসিক ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের দিকে।

এক দিকে ভাস্কো ডা গামা। অন্য দিকে কলম্বাস। এক দিকে পর্তুগালের প্রিন্স হেনরি, অন্য দিকে স্পেনের রানি ইসাবেলা। জেনোয়ার এক তাঁতির ঘরের সন্তান কলম্বাস একজন

অভিজ্ঞ নাবিক। তিনি বিস্তর দরিয়ার জল ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। ভূমধ্যসাগর, অ্যাটলান্টিক তো বটেই, তিনি এমনকী আইসল্যান্ডেও অভিযান করেছিলেন। উনিশ শতক থেকে সকলেই এই তথ্য মেনে নিয়েছেন যে, ১০০০ অব্দ নাগাদ নরওয়ের নাবিকরা দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন। তবে কি কলম্বাস তাঁদের কাছ থেকেই ওদিকে অভিযানের উৎসাহ পেয়েছিলেন? যা হোক, তাঁর 'এন্টারপ্রাইজ অব দ্য ইন্ডিজ', বা ভারত আবিষ্কারের প্রকল্প তিনি প্রথমে পেশ করেন পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন-এর কাছে। দাবি— সফল হলে তাঁকে এবং তাঁর বংশধরদের আভিজাত্যের মর্যাদা দিতে হবে, আবিষ্কৃত দেশের (ক্যাথে বা চিনের) ধনদৌলতের দশ ভাগের এক ভাগ তাঁর প্রাপ্য হিসাবে গণ্য করতে হবে— ইত্যাদি। জন রাজি হননি। কলম্বাস ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের দরবারেও প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত নন। শেষ পর্যন্ত স্পেনের রানি ইসাবেলা সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। ভাসতে ভাসতে অবশেষে কলম্বাস ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে ১২ অক্টোবর একটি দ্বীপে পৌঁছলেন। ভাবলেন এটিই বুঝি-বা মার্কো পোলো কথিত ইন্ডিজের উপকূল!

যা হোক, কলম্বাসের অভিযানের বিস্তারিত কাহিনী এখানে শোনানোর সুযোগ নেই। বোধহয় প্রয়োজনও নেই। ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন মারা যান কলম্বাস তখন জানেন না তিনি কোথায় পৌঁছেছেন। ভারতের কোনও অংশে, না নতুন এক পৃথিবীতে? ফলে নতুন মহাদেশ চিহ্নিত হয়েছিল আমেরিকো ভেসপুচ্চি নামে ফ্লোরেন্সের এক ধনী নাবিকের নামে। কারণ, ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে আর-একটি স্প্যানিশ অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। অভিযান শেষে দুটি চিঠিতে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। নানা ভাষায় তা প্রকাশিত হয়। তাতে তিনিই প্রথম লেখেন, আমরা যা দেখে এলাম তা এক নতুন পৃথিবী, 'নিউ ওয়ার্ল্ড'। ১৫০৭ সালে একজন জার্মান ভূতত্ত্ববিদ টলেমির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাতেই এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রথম চিহ্নিত হয় 'নিউ ওয়ার্ল্ড' হিসাবে। এই পৃথিবী এশিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এ দেশের নাম দেওয়া হয়—'আমেরিকা'।

ভাস্কো ডা গামার অবশ্যই মানচিত্র ছিল। পর্তুগিজরা এই দরিয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু ভাস্কো ডা গামা? হ্যাঁ, তাঁর হাতেও ছিল নাকি একটি মানচিত্র। কিন্তু সে মানচিত্রে দ্রাঘিমাতে ছিল অন্তত ১০ ডিগ্রির গোলমাল। ফলে অজানা দরিয়ায় দুঃসাহসী অভিযাত্রী উদ্দিষ্টের বদলে পৌঁছে যান অন্য কোথাও। নিজের অজ্ঞাতে অজানা, আনকোরা একটি 'নতুন পৃথিবী' আবিষ্কার, সে তো সামান্য ঘটনা নয়। কলম্বাস অবশ্যই এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক। অধুনা অবশ্য তাঁর কৃতিত্বের অন্য দাবিদারও আবির্ভূত হয়েছে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে বার্সেলোনার একটি পুরনো মানচিত্রের দোকানে এমন একটি মানচিত্র পাওয়া গেছে যাতে গ্রিনল্যান্ডের একটি বড়সড় দ্বীপ রয়েছে— 'ভিনল্যান্ড ইনস্যুলা'। এ তো সেই তথাকথিত নতুন পৃথিবী! দ্বিতীয় দাবিদার জন ডে নামে একজন ইংরেজ ব্যবসায়ীর চিঠি। তিনি স্প্যানিশ কর্তাব্যক্তিকে জানাচ্ছেন, ১৪৯২ সালের আগেই একজন ইংরেজ নাবিক পৌঁছেছিলেন 'বেসিল' (Brasil) বা ব্রাজিলে! এই দুটি প্রশ্ন-চিহ্ন নিয়ে এখনও চর্চা চলছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন জলপথে বিশ্বপরিক্রমাও একালেরই ঘটনা। এই কৃতিত্ব প্রাপ্য ফার্ডিন্যান্ড ম্যাগেলন (Magellan Ferdinand) নামে একজন পর্তুগিজ নাবিকের। বিভিন্ন সামুদ্রিক চার্ট দেখে ভুগোল বিশারদ এক বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে 'বদর

বদর' করে পাঁচটি জাহাজ নিয়ে ভেসে পড়েন। দলে নাবিক ছিলেন দু'শো আশিজন। ওঁরা গিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগরের পথে, ফিরে আসেন ভারত মহাসাগর দিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে। ওঁরা ফিরে আসেন ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ তিন বছর পরে। পাঁচটি জাহাজের মধ্যে ফিরেছিল মাত্র একটি। আর, দু'শো আশিজন নাবিকের মধ্যে বেঁচেছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশজন। কিন্তু হাতেনাতে প্রমাণ হয়ে গেল পৃথিবী গোলাকার, এবং জলপথে তার পরিক্রমা সম্ভব।

রেনেশাঁ যুগের সব চেয়ে খ্যাতিমান মানচিত্র-রচয়িতা গেরারডুস মার্কেটার (Mercator, Gerardus)। জার্মান মা-বাবার ষষ্ঠ সন্তান তিনি। জন্মেছিলেন অ্যান্টুয়ার্প-এর রুপেলমন্ত নামে একটি ছোট্ট শহরে, ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর, মার্টিন লুথার তখন উইটেনবার্গ গির্জার দরজায় তাঁর ঐতিহাসিক ইস্তাহার সেঁটে দেন। প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন সূচিত হয়েছিল সেদিন। ক্রমে রিফর্মেশন এবং কাউন্টার-রিফর্মেশন। মার্কেটার যখন লোভান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যামিতি পড়ছেন তখন ইউরোপের ধর্ম-জগৎ অস্থির, আলোড়িত। সম্ভবত মার্কেটার-এর মনেও সেদিন বিতর্ক, সংশয়। এক বছর তখন নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন। গির্জার প্রভুদের মনে হয়, হয়তো এই তরুণ অবিশ্বাসী, ধর্মদ্রোহী। তাঁরা মার্কেটারকে কয়েদ করেন। ইনকুইজিশান অন্য অনেককেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে। কারও মাথা কাটা হয়, কাউকে জীবন্ত কবর দেওয়া, কাউকে হয়তো আগুনে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। শোনা হয় প্রভাবশালী বন্ধুদের তৎপরতায় মার্কেটার বেঁচে যান। সভ্যতার পথে সেটা অবশ্যই স্বস্তির কথা।

মার্কেটারদের পরিবার ইতিমধ্যে ফ্ল্যান্ডার্স-এ বসত করতে শুরু করেছেন। পড়াশোনা শেষে মার্কেটার (তাঁর পিতৃ-দত্ত নাম ছিল অন্য। সেকালের বিদ্বানদের মতো তিনি নাম পালটে হয়েছিলেন মার্কেটার।) ব্যাবসা শুরু করেন। ব্যাবসা মানে গ্লোব, সূর্যঘড়ি, মানচিত্র এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির ব্যাবসা। চব্বিশ বছর বয়সের মধ্যেই মানচিত্র ও চার্টের খোদাইয়ের কাজে নিজেকে প্রমাণ করেন। তাঁর আঁকা প্রথম মানচিত্রটি ছিল ছ' প্রস্থ কাগজে আঁকা প্যালেস্টাইনের মানচিত্র। ধর্মপ্রাণ ইউরোপে সেটি সংগ্রহ করার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। তিন বছর নিজে জরিপ করে অতঃপর তিনি প্রকাশ করেন ফ্ল্যান্ডার্স-এর মানচিত্র। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পায় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। আরও অনেক কীর্তি তাঁর। পৃথিবীকে তিনি দুটি গোলকে ভাগ করেন, পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধ। তার মাঝামাঝি অংশে দেশ বা স্থান যথাযথ ছিল, স্কেলেও কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু ধারের দিকে তাকালে যেন সংকুচিত— অঞ্চলগুলি বুঝি-বা পড়ে যায়। ফলে এই দুই গোলক কিছুটা বিকৃত বটে, কিন্তু বোঝা যায়— পৃথিবী গোলাকৃতি। আরও অনেক কাণ্ডই করেছেন তিনি।

তবে তাঁর সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মানচিত্রের উপস্থাপনা। সেদিন তিনি যা করেছিলেন বলতে গেলে তা যুগান্তকারী, বৃত্তকে তিনি পরিণত করেছিলেন বর্গক্ষেত্রে। সমগ্র পৃথিবীকে এক সমতলে সাজিয়ে তিনি তাকে সরলরেখায় বন্ধন করলেন। জিজ্ঞাসু, ভ্রমণকারী, কিংবা নাবিক— সবাই অতঃপর সাদা চোখে পৃথিবীর দিকে তাকাতে পারেন। নাবিক এক সরলরেখা থেকে অনায়াসে চলে যেতে পারেন অন্য রেখায়। আশ্চর্য এক ঘটনা। ওই মানচিত্র প্রকাশিত হয় ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দেও তার দাম মাত্র

১ পাউন্ড ৬ শিলিং ৬ পেন্স! একশো বছর লেগেছিল এটি গ্রহণ করতে। এখন বিশ্বময় স্কুল-পড়ুয়াদের মানচিত্র বইতেও থাকে— 'মার্কেটারস প্রজেকশান'। তার পর কত মানচিত্র-বিশারদ কতভাবেই না উপস্থাপনা করেছেন এই বিশ্বকে।

মার্কেটার-এর এই মানচিত্র প্রকাশের এক বছর পরে তাঁর এক প্রতিযোগী প্রকাশ করেন তিরিশটি বিভিন্ন মানচিত্রের একটি সংকলন। তার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে। তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ। ক্রমে চল্লিশ সংস্করণ। বলা হয় পৃথিবীতে এটিই প্রথম যথার্থ মানচিত্র-সংকলন। কিন্তু জন নোবল উইলফোর্ড স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে প্রথম ইউরোপে, বিশ্বে নয়। কারণ তার ১৮০০ বছর আগে 'চিনের টলেমি' পেই জু আঠারোটি মানচিত্রের ঠিক এমনই একটি সংকলন করেছিলেন। সেটি হারিয়ে গেছে। তবে ভূমিকাটি রয়ে গেছে। তিনি আরও জানাচ্ছেন, দশম শতকের পর চিনে এ-ধরনের সংকলন মানচিত্রবিদ্যার বিশেষ কৃত্য হয়ে দাঁড়ায়। মার্কেটারও মানচিত্র সংকলন করেছেন। কাঠখোদাইয়ের বদলে তিনি সব মানচিত্রই ছাপাতেন তামার এনগ্রেভিংয়ে। মার্কেটার-এর সংকলনটি তিন খণ্ডে। প্রথম দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৫৮৫ ও ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে। শেষটি তাঁর মৃত্যুর এক বছর পরে, ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে। উল্লেখ্য: আজও যে আমরা মানচিত্র-সংকলনকে অ্যাটলাস বলি, তা কিন্তু মার্কেটার-এর সুবাদেই। তাঁর প্রতিযোগীর যে-সংকলনটির কথা বলা হয়েছে সেটির নাম ছিল— 'থিয়েট্রাম ওরবিস টেরারাম', বিশ্বের মঞ্চ। মার্কেটার তাঁর সংকলনের নাম দিয়েছিলেন— 'অ্যাটলাস'। গ্রিক পুরাণের সেই বীর, যাঁর কাঁধে পৃথিবীর বোঝা, তিনি পরিণত হলেন পৃথিবীর চিত্রাবলীর ধারকে!

এখানে একটা প্রশ্ন: বিশ্বের মানচিত্রচর্চায় আমরা মাঝে মাঝেই দেখতে পাচ্ছি সেই সুদুর অতীত থেকে বিশ্বসন্ধানীদের দলে যোগ দিচ্ছে চিন। কোথায় গেল আমাদের ভারত? কৌতূহলী পাঠকদের আমি অনুরোধ করব অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে মেঘনাদ সাহার সেই ঘোর বিতর্কটি একবার পড়ে নিতে। আমাদের জ্যোতির্বিদ্যায় সাহার পাণ্ডিত্য প্রশ্নাতীত। তাঁর ওই রচনা যে-কোনও প্রবন্ধ সংকলনে লভ্য। তা থেকে আপাতত সংক্ষেপে সামান্য কিছু তথ্য।

পাটলিপুত্র নিবাসী আর্যভট্টের জন্ম ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি "এপিসাইক্লিক থিয়োরি দিয়া গ্রহগণের গতি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাতে পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র বলিয়া ধরা হইয়াছে।" আর বরাহমিহির? তাঁর সময়ে, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে, "সূর্যসিদ্ধান্তে যে জ্যোতিষিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পশ্চিম দেশবাসী অসুরদিগের অর্জিত জ্ঞান।" আর, "তাঁহাদের ঠিকানা ছিল ব্যাবিলন, নিনেভে, উর, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস নদীর উপরিস্থিত নগরগুলি।" অতএব খেদ করে লাভ নেই।

তবে হ্যাঁ, জন নোবল উইলফোর্ডের বিশাল বইটিতে ভারত সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়। ভারতের মানচিত্র আঁকার কাহিনী এতে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। তবে তার কৃতিত্ব স্বভাবতই মিলেছে পশ্চিমের ঔপনিবেশিক শাসকদের। আমাদের ভূমিকা সেই বৃহৎ-কর্মকাণ্ডে নিতান্তই পার্শ্বচরের। সে-প্রসঙ্গ পরে। আপাতত বলার কথা একটাই, রয়াল সাইজের পাঁচশো পৃষ্ঠারও বেশি জন নোবল উইলফোর্ড-এর 'দ্য ম্যাপমেকার্স' বইটির আমি আদৌ কোনও সুবিচার করতে পারিনি। সচিত্র এই বইটি এক কথায় মানচিত্র সম্পর্কে এক বিশ্বকোষ। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে এই একুশ শতকের সূচনা পর্যন্ত নিজেদের পৃথিবীর

সন্ধানে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে যা করেছে সবই বর্ণিত হয়েছে এখানে। তথ্য আর তত্ত্ব চলেছে হাত ধরাধরি করে। বিদ্বান এবং আমার মতো যারা 'আনপড়' সকলের জন্যই জ্ঞাতব্যের এই বিপুল আয়োজন। বিজ্ঞানী হিসাবে লেখক যেমন তাঁর আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল, আবার সাংবাদিক হিসাবে তাঁর জানা আছে পাঠককে কী করে টেনে এনে ধরে রাখা যায়। একজন বিজ্ঞানী লেখক হলে কী হতে পারেন, এবং একজন লেখক বৈজ্ঞানিক হলে কী হওয়া সম্ভব এ-বই তার একটি প্রমাণ। কী নেই এখানে! পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানচিত্র আঁকার আনুপূর্বিক বিস্তারিত বিবরণ, দুই আমেরিকা তো বটেই, মেরু অঞ্চলের মানচিত্র, ক্যাপ্টেন কুক-এর অভিযান, সমুদ্রতলের মানচিত্র, দ্রাঘিমার সন্ধানে ইংরেজ ঘড়ি কারিগর জন হ্যারিসন-এর কাণ্ডকারখানা থেকে শুরু করে আকাশ থেকে তৈরি মানচিত্র (মহাকাশ থেকে তৈরিও), চাঁদ, মঙ্গলগ্রহ, মহাকাশের মানচিত্র কিছুই বাদ নেই। সব অধ্যায়ই তথ্যবহুল, বিস্তৃত এবং বিশদভাবে আলোচিত।

মানচিত্রের ইতিহাস এমন উপাদেয় হতে পারে, জানা ছিল না। দুর্ভাগ্য এই, আমার ধারণক্ষমতা কম। পরিপাকশক্তিও এই মহাভোজের পক্ষে অতিশয় দুর্বল। সুতরাং, স্বল্পেই তুষ্ট থাকতে হল।

তবু জন নোবল উইলফোর্ড-এর মুখে সংক্ষেপে হলেও ভারতের মানচিত্র-আঁকার কাহিনী বাঙালি পাঠকরা শুনতে চাইতেই পারেন। যদিও গত কয়েক বছরে শুধু ইংরেজ-আমলে ভারতের মানচিত্র আঁকার উদ্যোগ নিয়েই বিদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে বেশ-কয়েকটি বই। আমার তো মনে হয় উইলফোর্ড শোনার যোগ্য।

ঠিক একটি পরিবার নয়, বিশাল এই ভারতের অনুপুঙ্খ মানচিত্র যাঁরা তৈরি করেছিলেন তাঁদের বলা যেতে পারে একটি গোষ্ঠী। উইলফোর্ড ভারতের মানচিত্র-বিষয়ক দীর্ঘ অধ্যায়টির শিরোনাম দিয়েছেন 'সোলজারস্ পন্ডিতস্ অ্যান্ড দি ইন্ডিয়া সার্ভে'। এই সৈনিকেরা বিদেশি। অস্ত্রধারী না হলেও তাঁরা ছিলেন ঔপনিবেশিক ভারতের সৈন্যবাহিনীর তকমাধারী। স্বস্তির কথা, মানচিত্র আঁকার সেই বৃহৎ ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী উদ্যোগ থেকে তিনি ভারতীয়দের পুরোপুরি বাদ দেননি। প্রসঙ্গত দুরূহ ব্রতে কিছু কিছু পণ্ডিতের কাহিনীও শুনিয়েছেন। সূচনাতেই তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর 'কিম'-এর সাহায্যে। উপন্যাসটিতে শুনি কর্নেল ক্রেইগটন কিমকে বলছেন, তোমাকে জানতে হবে কী করে পথঘাট, পাহাড়-পর্বত, নদীর ছবি তৈরি করতে হয়। তার পর সুযোগ-সুবিধামতো কাগজে তার ছবি আঁকতে হবে। ভবিষ্যতে যদি কোনওদিন তুমি সার্ভের চেনম্যান বা শিকল ধরার কাজ পাও তখন হয়তো তুমি আর আমি একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাব, তোমাকে বলব— ওই পাহাড়ের ওপারে যাও। দেখো সেখানে কী আছে। কিম মনে মনে ভাবে চেনম্যান হতে হলে তাকে খুব বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী হতে হবে। ওইসব কথাবার্তা শুনেই অনাথ বালক কিম ক্রমে রোমাঞ্চকর অভিযানের দিকে আকৃষ্ট হয়। শিকল, পরিমাপ দণ্ড, কোণ, কম্পাস ইত্যাদি ব্যবহার অধিগত করে এবং জপমালা হাতে নিয়ে কী করে হাঁটতে হাঁটতে দূরত্ব পরিমাপ করা যায়, তাও শিখে নেয়। তার চার পাশে যাঁরা, তাঁদের মধ্যে আছেন কর্নেল ক্রেইগটন, যিনি রয়াল সোসাইটির সদস্য হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, ঘোড়া ব্যবসায়ী পাঠান মাহবুব আলি, বাঙালি অভিযাত্রী ও গুপ্তচর নাদুসনুদুস

হরিবাবু এবং আরও কেউ কেউ। এই উপন্যাসের রহস্য রোমাঞ্চের মতোই বর্ণাঢ্য সেদিন ঔপনিবেশিক ভারতের জরিপের জগৎ।

প্রথমে সংক্ষেপে সাহেবদের কথাই বলি। সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা জেমস রেনেল (Rennell, James) নামে একজন ইংরেজ নৌ-সৈনিক। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার তদানীন্তন গর্ভনর রবার্ট ক্লাইভ তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন বাংলা মুলুকের একটি মানচিত্র তৈরি করতে। রেনেল জরিপের কাজে অভিজ্ঞ ছিলেন। সাত বছর ধরে নিজে সদলবলে ঘুরে ঘুরে জরিপ করলেন তৎকালের বিশাল বাংলা। পূর্ববঙ্গ ও সুন্দরবন অঞ্চলও বাদ নেই। তিনি নাকি বলতেন— মানচিত্রে শূন্যস্থান চোখে বড়ই পীড়াদায়ক! স্বভাবতই তাঁর সেই বিস্তারিত অনুসন্ধানে ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। কিন্তু ঝুঁকি ছিল প্রচুর। তাঁর দল একবার বাঘের মুখে পড়ে। বাঘ একজন সিপাইকে তুলে নিয়ে যায়। আর-একবার চিতাবাঘের সঙ্গে সরাসরি লড়াই করতে হয় রেনেলকে। তৃতীয় বিপর্যয় ডাকাতদলের সামনে পড়া। তাদের আক্রমণে রেনেল ক্ষত-বিক্ষত। ক্লাইভ দেশে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন—রেনেলের দেহ ক্ষত-বিক্ষত। অন্যত্র পড়েছি, রেনেল তখন পূর্ববঙ্গে। চিকিৎসার জন্য তাঁকে বহন করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তখন ঔপন্যাসিক থ্যাকারের ঠাকুর্দা বিখ্যাত 'সিলেট থ্যাকারে' ছিলেন। তাঁর কন্যা জেনেট সেবাশুশ্রূষা করে রেনেলকে বাঁচিয়ে তোলেন। তখনই দু'জনের মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মায়। কলকাতায় দু'জনের বিয়ে। যা হোক, তেরো বছর এ-দেশে কাজ করার পর ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে রেনেল স্বদেশে ফিরে যান। সেখানেই তিনি প্রকাশ করেন তাঁর সুখ্যাত—'বেঙ্গল অ্যাটলাস'। তাঁকে বলা হয় 'ভারতীয় ভূবিদ্যার জনক'। বলা হয়, ব্রিটেন কেন, সারা ইউরোপেও তাঁর তুল্য কেউ নেই। রেনেল মারা যান ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে, সাতাশি বছর বয়সে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রেনেল-এর স্মৃতিকথা 'মেমোয়ার অব আ ম্যাপ অব হিন্দুস্থান' এখনও (পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ) লভ্য।

রেনেল-এর পর সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় ইংল্যান্ড থেকে অনেকেই এসেছেন। কর্মজীবন শেষে ফিরে গিয়েছেন। সে তালিকায় আছেন বেশ-কিছু সম্ভ্রান্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বিদ্বান, অভিযাত্রী এবং কিছু কিছু আত্মভোলা মানুষ। কিছু কিছু ছিটগ্রস্তকেও অবশ্য দেখা গেছে। সে-দলে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য ফ্রান্সিস উইলফোর্ড-এর নাম। তিনি একজন বেপরোয়া জ্যোতির্বিদ, গাণিতিক, একই সঙ্গে পশুচিকিৎসকও বটে। তিনি ছিলেন অস্থির, অস্থির চরিত্রের। একঘেয়ে লাগছে বলে লন্ডনে কেরানির কাজ ছেড়ে দিয়ে উত্তেজনার খোঁজে চলে এসেছিলেন ভারতে। তিনি বেঙ্গল-ইঞ্জিনিয়ার্স-এ কাজ পান। সেই সূত্রে যুক্ত হন সার্ভের সঙ্গে। ১৭৮৮-১৭৯৪ সালের মধ্যে বেনারসের চার পাশের বিস্তীর্ণ এলাকা জরিপ করে মানচিত্র তৈরি করেন তিনি। বলা বাহুল্য, সেখানে উত্তেজনার উপাদানে ঘাটতি ছিল না।

'ট্রায়েঙ্গুলার সার্ভে বা 'ট্রিগোনমেট্রিক্যাল সার্ভে' বাংলায় যাকে বলা যায়— 'ত্রিকোণভিত্তিক জরিপ'—আঞ্চলিকভাবে তার শুরু ১৮১৪-২৩ সালের মধ্যে। তার শেষ হতে শতাব্দী প্রায় গড়িয়ে যায়। সারা ভারত একসময় আবৃত হয় ত্রিভুজের রেখায়। রেখায় রেখায় গড়ে ওঠে যেন বিশাল এক তোরণ, বিশ্বময় খ্যাতি তার 'দ্য গ্রেট আর্ক', বা 'অতি-বৃহৎ খিলানাকৃতি তোরণ'। উইলফোর্ড সবিস্তারে ইংরেজের সেই ঐতিহাসিক এবং গৌরবময় কীর্তির কথা বলেছেন। সেই প্রসঙ্গে এসেছে উইলিয়াম ল্যাম্বটন, জর্জ

এভারেস্ট এবং অন্যান্য খ্যাতনামা ভূগোল-বিশারদদের কথা। তাঁদের অন্যতম ল্যাম্বটন (Lambton, William)।

ল্যাম্বটন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংল্যান্ডের তরফে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলেন। এদেশে এসে তিনি যোগ দেন আর্থার ওয়েলেসলির (পরবর্তীকালের ডিউক অব ওয়েলিংটন-এর) বাহিনীতে। ভারতের সব মানচিত্র পরখ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে, গাণিতিক এবং জরিপভিত্তিক পদ্ধতি ছাড়া এত বড় দেশের নির্ভুল মানচিত্র রচনা সম্ভব নয়।

তার পরে এলেন জর্জ এভারেস্ট। ছোটখাটো মানুষ। দেখলে মনে হয় ক্লান্ত। চোখ দুটি বসে গেছে। গালে মোটা গালপাট্টা। তিনি খিটখিটে চরিত্রের মানুষ। সহকর্মীরা বলেন, অতিশয় বদমেজাজি। (কিন্তু অন্যত্র পড়েছিলাম রাধানাথ সিকদারকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। তাঁর প্রতিভাকে তারিফ করতেন। বিশেষত, গণিতে দক্ষতার।) কিন্তু এভারেস্টও কর্মযোগী। তিনি বিস্তারিত তথ্যই শুধু চান না, চান নির্ভুল তথ্য। শীত থেকে বাঁচবার জন্য ৩৬০০ মিটার উপরে তাঁবুর ফাঁকফোকর নানাভাবে বন্ধ করে ভেতরে স্টোভ জ্বালিয়ে তিনি কাজ করেন। তাঁর আমলে যান্ত্রিক সহায়তা অবশ্য অনেকটা বেড়েছে। শুধু থিওডোলাইট বা উল্লম্ব এবং আনুভূমিক জরিপের জন্য সর্বত্র ব্যবহৃত যন্ত্রটি নয়, এভারেস্ট কাজে লাগালেন হেলিওট্রোপ বা গোলাকার আয়না যা একটা উঁচু দণ্ডের উপর বসিয়ে দিলে অনেক দূরেও প্রতিফলিত আলোর সংকেত পৌঁছায়। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ১৮৪৩ সালে এভারেস্ট যখন অবসর নিয়ে ফিরে যান তখন ত্রিকোণভিত্তিক সার্ভে হিমালয়ের নিম্নাঞ্চলে। তাঁদের সামনে 'পিক ফিফটিন', ১৫ নম্বর শৃঙ্গ। তিব্বতিদের 'চোমোলুঙ্গমা', বা বিশ্বের মাতা, ভবিষ্যতের—মাউন্ট এভারেস্ট। এভারেস্ট কি অবসর গ্রহণের আগে সে শৃঙ্গ দেখেছিলেন? উইলফোর্ড বলছেন—বৃহৎ প্রশ্ন।

এভারেস্টের উত্তরসূরি ছিলেন—অ্যান্ড্রু ওয়া। তিনি ছয়টি কোণে যন্ত্র বসিয়ে পরিমাপ করলেন শৃঙ্গ১৫-র। কিন্তু কারও সঙ্গে কারও অঙ্ক মেলে না। অঙ্ক নিয়ে বিবাদ। এইসব বির্তকের মধ্যেই একদিন 'ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন এক বাঙালি কেরানি', বললেন—'স্যার, আই হ্যাভ ডিসকভারড দ্য হাইয়েস্ট মাউন্টেন অব দ্য ওয়ার্ল্ড।'—পিক-ফিফ্‌টিন-এর উচ্চতা ২৯ হাজার ফুট। জন নোবল উইলফোর্ড এই বাঙালি যুবকের নাম করেননি। সকলেই জানেন, তিনি আমাদের মুলুকে স্বনামধন্য রাধানাথ সিকদার। তাঁর কাহিনী আজ সকলের জানা। এমনকী দেশের বাইরেও।

সার্ভে অব ইন্ডিয়ার লক্ষ্য হিমালয়ের ওপারে, নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতে। উইলফোর্ড তিব্বতের মানচিত্র আঁকার বিস্তারিত ইতিহাস বিবৃত করেছেন। আর সেই দুরূহ কর্মে কী জটিল, কুটিল, বেপরোয়া পদ্ধতিই না তাঁরা অনুসরণ করেছেন সেদিন। এ-কাজে তাঁদের প্রধান এবং একমাত্র সহায়ক ছিল ভারতীয় 'পণ্ডিতরা'। আমরা শরৎচন্দ্র দাশের রোমাঞ্চকর তিব্বত অভিযানের কিছু কিছু কাহিনী শুনেছি। উইলফোর্ড শুনিয়েছেন অন্যদের কথা। ১৮৬৫ সালে অনেক সম্ভাব্য অভিযাত্রীকে যাচাই করে, দু'বছর ধরে ভাষা ও জরিপের কাজ শিখিয়ে পাঠানো হয়েছিল নইন সিং ও মণি সিং নামে দু'জনকে। ওঁরা পরস্পরের নিকট আত্মীয়। দু'জনই পাহাড়ি এলাকার লোক। নইন সিং ছিলেন শিক্ষক। উইলফোর্ড সে-কারণেই বলছেন—'আ-এক্সপ্লোরার!' তাঁরা ছদ্মবেশে, তীর্থযাত্রী হিসাবে প্রবেশ করেন

তিব্বতে। নেপাল সীমান্তে গিয়ে দু'জন দুই পথ ধরেছিলেন। মণি সিং চলে গিয়েছিলেন পশ্চিম দিকে। সেদিককার মানচিত্রের জন্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করে কিছুকাল পরেই তিনি ফিরে আসেন। কিন্তু পাকা গোয়েন্দার মতো ছদ্মবেশী নইন সিং ঘুরতে ঘুরতে চলে যান খাস লাসায়। বিচিত্র তাঁর কর্মকাণ্ড, বিচিত্রতর তাঁর অভিজ্ঞতা। তিনিই কিন্তু প্রথম স্থির করেন লাসা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৪২০ মিটার উঁচুতে। এখন তার পরিমাপ ৩৫৪০ মিটার।

একুশ মাস পরে তিনি বিপুল তথ্যসহ দেরাদুনে ফিরে আসেন। তিব্বত সম্পর্কে এত তথ্য কোনওদিন কারও গোচরে ছিল না। তাঁকে নানাভাবে পুরস্কৃত করা হয়। লন্ডনের রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির স্বর্ণপদক মিলে যায় তাঁর।

পরবর্তী দুই দশকে এভাবে আরও কিছু ভারতীয়কে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করে, জরিপের কাজ শিখিয়ে, নানা সাজে সাজিয়ে, তিব্বতে পাঠানো হয়। নইন সিং-এর এক ভাইপো কিশেন সিংকেও পাঠানো হয়েছিল। তিনি তিব্বত অতিক্রম করে চিনে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি চিনের তো বটেই ইরাবতী নদী সম্পর্কেও তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সব-চেয়ে মূল্যবান আবিষ্কার, ফিরে এসে তিনি বলেছিলেন তিব্বতের 'সাংপো' নদীই ভারতের ব্রহ্মপুত্র। অসম্ভব! বলে উঠেছিলেন সবাই। আর হাতেনাতে তা প্রমাণের জন্য তাঁরা গোপনে পাঠিয়েছিলেন দার্জিলিঙের এক লামাকে। তাঁর সঙ্গী হন সিকিমের এক সার্ভেয়ার। ওঁদের দায়িত্ব ছিল সাংপো নদীতে ৪ ফুট লম্বা ৫০০টি গাছের গুঁড়ির টুকরো ভাসিয়ে দিতে হবে। প্রতিদিন ভাসাতে হবে ৫০টি করে। লামা পথে পালিয়ে যান। সহকারী সিকিমের ছেলেটি নাম যাঁর কিনথুপ। দুঃসাহসী কিনথুপ শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে-দায়িত্ব পালনও করেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকদিন কেটে যায়। তিনি যখন কাঠের গুঁড়ি ভাসাচ্ছেন তখন ব্রহ্মপুত্রে তা ধরার জন্য আর কেউ নেই। সার্ভে পর্যবেক্ষণকেন্দ্র গুটিয়ে নিয়েছে। কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছিলেন ওঁরা মারা গেছেন। কিনথুপ সার্ভে অফিসে দেরির কারণ জানিয়ে একটি চিঠিও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে চিঠিও সময়ে পৌঁছয়নি। ফলে তাঁর অভিযান কার্যত বিফলে যায়। অন্যদের মতো সম্মানও তাঁর জোটেনি। শেষ যখন তাঁর কথা শুনি, কিনথুপ দার্জিলিঙে দরজির কাজ করছেন।

'কিম'-এর চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর এবং উত্তেজক ভারতের জরিপ-উদ্‌যোগের অন্তিম কাহিনী। ইংরেজ প্রভুদের এই কীর্তি এখন মানচিত্রের ইতিহাস-লেখকদের কাছে এক আশ্চর্য এবং অবিশ্বাস্য বিজয়কাহিনী। সে-কাহিনী অপ্রতিরোধ্য। কোনও ঐতিহাসিকের সাধ্য নেই তা এড়িয়ে যান। প্রমাণ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ম্যাথু এইচ এডনির বিশাল বই 'ম্যাপিং অ্যান এম্পায়ার'।

চাঁদ দিয়ে শুরু করেছিলাম। শেষ করার আগে আর-একবার চাঁদে উঁকি দেওয়া যাক। বলা হয় পৃথিবীর প্রথম গোলক বা গ্লোব তৈরি করেন গ্রিকরা। কিন্তু তা আজ খুঁজে পাওয়ার প্রশ্ন নেই। কিন্তু যে গোলকটি এখনও রয়েছে সেটি তৈরি করেন মার্টিন বেহাইম (Behaim, Martin) নামে একজন জার্মান। তিনি বেশ-কিছুকাল লিসবনে ছিলেন। পর্তুগিজদের নানা সামুদ্রিক অভিযানে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং নুরেমবার্গ-এ বসে একটি গ্লোব তৈরি করেন। সেটি এখনও নাকি রয়েছে। তার পরিধি ৫০ সেন্টিমিটার। কাঠের গোলকের উপর চামড়ার ফালিতে আঁকা মানচিত্র টুকরো টুকরো করে সেঁটে দেওয়া হয়েছিল তাতে। মানচিত্র আঁকেন একজন শিল্পী। তাতে সুমেরু

কুমেরু রয়েছে। রয়েছে ৩৬° বিষুবরেখা। একমাত্র দ্রাঘিমা লিসবনের পশ্চিমে ৮০° ডিগ্রি। ছয় রঙে আঁকা এই গোলকে এক হাজার একশো স্থাননাম, এগারোটি ছবি। বেহাইম নাম দেন তার—'এরাডাফেল', বা 'আর্থ অ্যাপল'।

পৃথিবীতে বসে কে বা কারা প্রথম রচনা করেছিলেন চাঁদের মানচিত্র? কারা চিহ্নিত করেছেন ওই সুন্দর মুখে কলঙ্ক। কারাই বা নামাঙ্কিত করেছেন পাহাড় সমুদ্র? এক-এক প্রশ্নে প্রথম উত্তর দেওয়ার কৃতিত্ব এক-একজনের। তিনিই প্রথম চাঁদের স্থাননাম মানচিত্রে ব্যবহার করেন। স্পেনের এই দরবারি জ্যোতির্বিদের নাম ছিল মাইকেল ফিরান লংগ্রেন। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি চাঁদ পর্যবেক্ষণ শুরু করেন, আর তাঁর মানচিত্র প্রকাশিত হয় ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি চাঁদে তিনশো পঁচিশটি দ্রষ্টব্য নির্দেশ করেন। বিভিন্ন দর্শনীয়ের নামকরণ করেন রাজা, সাধুসন্ত, বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদের নামে। তালিকায় এমনকী তিনি নিজের নামটিও যোগ করেন। তাঁর কাছাকাছি সময়েই রেক্কিয়োলি নামে একজন চাঁদের পিঠে সাধু-সন্ন্যাসী বা বিখ্যাত মানুষের নাম এঁকে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, চাঁদে তিনি নির্দেশ করেছেন নানা সমুদ্র,—সি অব ট্রানকুইলিটি, সি অব ফার্টিলিটি, ওশন অব স্টর্ম ইত্যাদি। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়েই হেভেলিয়াস নামে এক বিজ্ঞানী প্রকাশ করেন একাধিক মানচিত্র নিয়ে চাঁদের প্রথম অ্যাটলাস। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ গবেষক রবার্ট হুক আঁকলেন চাঁদের আগ্নেয়গিরির মুখের স্পষ্ট ছবি। তিনিই প্রথম বললেন, এইসব গহ্বরের উৎস উল্কাপাত। চাঁদ প্রসঙ্গে অগ্ন্যুৎপাতের তত্ত্বও তিনিই প্রথম শোনান।

সপ্তদশ শতকে নানা ইউরোপীয় সন্ধানী নানাভাবে বোঝার এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছেন চাঁদকে। ওই চাঁদমুখ হাতেকলমে প্রথমে ধরলেন কে, সেটাই আমাদের আপাতত জ্ঞাতব্য। এতদিন পর্যন্ত তার দাবিদার ছিলেন বিশ্ববন্দিত গ্যালেলিও। নিজের তৈরি টেলিস্কোপে চোখ রেখে তিনি চাঁদের দিকে তাকান ১৬০৯-১০ খ্রিস্টাব্দে। চাঁদ নিখুঁত গোল কি না সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। চাঁদের মুখের কালো দাগগুলোকে তিনি বলেছেন 'অতি পুরনো এলাকা'। তাঁর সর্বোচ্চ পাহাড়চূড়া পরিমাপেও ভুল ছিল। কিন্তু তিনিই প্রথম টেলিস্কোপে পর্যবেক্ষণ করে ৮ সেন্টিমিটার পরিধির চাঁদের ৪টি মানচিত্র নিয়ে প্রকাশ করেন তাঁর মানচিত্র।

জন নোবল উইলফোর্ড বলেছেন, চাঁদের প্রথম মানচিত্র-চিত্রকার হিসাবে গ্যালেলিওর প্রতিষ্ঠা এখন চ্যালেঞ্জের মুখে। সম্প্রতিকালে সে-কৃতিত্বের দাবিদার হয়ে দাঁড়িয়েছেন দুই ইংরেজ বিজ্ঞানী। তাঁদের একজন উইলিয়াম গিলবার্ট (Gilburt, William), অন্যজন টমাস হ্যারিয়েট (Harriet, Thomas)। গিলবার্ট ছিলেন রানি প্রথম এলিজাবেথের চিকিৎসক। বলা হয় তিনি পৃথিবীর চৌম্বকশক্তি আবিষ্কার করেছিলেন। খালি চোখে দেখে তিনি পূর্ণিমার চাঁদের একটি মানচিত্র তৈরি করেন। সেটি ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দের আগে (সে বছরই গিলবার্টের মৃত্যু) আঁকা হতে পারে, কিন্তু প্রকাশিত হয় অনেক পরে, ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর হ্যারিয়েট ছিলেন একজন গাণিতিক। একসময় স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের শিক্ষক। তিনি টেলিস্কোপে পর্যবেক্ষণ করে ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে চাঁদের একটি মানচিত্র আঁকেন। সুতরাং, তিনি চাঁদ আঁকলেন, হ্যাঁ, টেলিস্কোপে দেখেই, গ্যালেলিওর কয় মাস আগে। তা ছাড়া ১৬১১-১৬১২ খ্রিস্টাব্দে আঁকা হ্যারিয়েট-এর আরও একটি মানচিত্র চাঁদ-চিত্র পাওয়া গেছে। তাতেও তিনিও চাঁদের সর্বাঙ্গে সংখ্যাযুক্ত নামাবলি চাপিয়ে দেন। এত কাজ করার পরও হ্যারিয়েট কিন্তু জীবৎকালে তাঁর এ-সব মানচিত্র প্রকাশে বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিলেন না।

ভাবখানা—কী হবে এ-সব ছাপিয়ে! আশ্চর্য, জ্ঞানের চর্চায় পৃথিবীতে কত কাণ্ডই না ঘটে।

দেখে ভাল লাগল, এই অজ্ঞের মতোই বিজ্ঞ ঐতিহাসিক জন নোবল উইলফোর্ড মনে করেন, মানচিত্র এখনও অনেকাংশে মন-চিত্র। যাঁরা যেমনটি দেখতে চান, পৃথিবীকে তাঁরা সেভাবেই এঁকে চলেছেন এখন। আসল কথা উপস্থাপনা। পৃথিবীতে এখন অনেক মার্কেটার। নব নব উপস্থাপনা। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি মার্কিন সরকারের পৃষ্ঠপোষণায় আঁকা কিছু মানচিত্রের উল্লেখ করেছেন, একটি মানচিত্র দেখা যায় গ্রিনল্যান্ড, আলাস্কা, অন্য দেশের অনুপাতে অনেক বড়। সোভিয়েত রাশিয়া কার্যত মূল পরিমাপের চেয়ে ২২৩ গুণ বড়! এই মানচিত্র ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগের স্মারক। সোভিয়েত রাশিয়া কেন আমেরিকার পক্ষে বিপজ্জনক, তারই চিত্ররূপ তুলে ধরা হয়েছে চোখের সামনে। মার্কিন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই উপস্থাপনাই মেনে নিয়েছিল। ২০০০ অব্দে নতুন মানচিত্রে আবার রাশিয়াকে স্বাভাবিক আকারে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কারণ, সোভিয়েত রাশিয়া এখন শুধুই রাশিয়া। অন্য দেশগুলো, যেগুলিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছিল সেগুলোও এই মানচিত্রে সংকুচিত।

ঔপনিবেশিকতার অবসানের পর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে জার্মান মানচিত্র-আঁকিয়ে ইউরোপ-কেন্দ্রিক উপস্থাপনাকে বাতিল করে এমন এক মানচিত্র উপস্থিত করেন যাতে আমেরিকা এবং খর্বাকৃতি তৃতীয় বিশ্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একজন আমেরিকান মানচিত্র-আঁকিয়ে উত্তরমেরু-কেন্দ্রিক এক উপস্থাপনা প্রকাশ করেন। তাতে দেখা যায় ইউরোপ উত্তর আমেরিকার খুবই কাছাকাছি, আর সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকার ঠিক মাথার উপরে। উইলফোর্ড বলছেন, ঘটনা এই, পৃথিবীর আকার কোনও-না-কোনওভাবে বিকৃত না-করে কোনও সমতল মানচিত্র রচনা সম্ভব নয়। সুতরাং, বলার কিছু নেই। অতএব বেল টেলিফোন কোম্পানির গবেষণাগারে একজন গাণিতিক এমন মানচিত্র পেশ করলেন যার দিকে তাকালে মনে হয়—পৃথিবীর কেন্দ্রে রয়েছে ওয়াল স্ট্রিট। কে জানে, হয়তো এই মানচিত্রটি প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ-এর অতিপ্রিয়। কিংবা পেন্টাগন হয়তো তাঁর জন্য তৈরি করেছে এমন মানচিত্র যেখানে ইরাক, ইরান আর উত্তর কোরিয়া চেহারায় দৈত্যাকৃতি, কিংবা নিছক তিনটি পিঁপড়ে!

জন নোবল উইলফোর্ড, 'দ্য ম্যাপমেকার্স: দ্য স্টোরি অফ দ্য গ্রেট পাইওনিয়ার্স ইন কার্টোগ্রাফি— ফ্রম অ্যান্টিকুইটি টু দ্য স্পেস এজ', পিমলিকো, লন্ডন, ২০০২
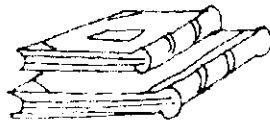
মানচিত্র, না মন-চিত্র
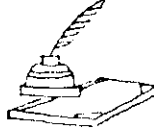
এখন বুঝতে পারি কেন রেগে গিয়েছিলেন আমার গুরুমশাই, আর কেনই-বা এমন বিষণ্ণবোধ করেছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর।

খাতাটা হাতে নিয়ে গর্জন করে উঠেছিলেন ভূগোলের স্যার— এ কি ভারতের মানচিত্র, না তোমার মাথা! আঁকতে বলা হল ভারত, আর তুমি কিনা এঁকে নিয়ে এলে নিজের চেহারাটি!— মাথায় মোটা, গায়ে সরু, এ তো দেখছি তোমারই ছবি!

সেদিন লজ্জায় দুঃখে ক্ষোভে আমার অবস্থা অনেকটা পাতাল-প্রবেশের আগে সীতার মতো। তবে নিতান্তই বেহায়া ছেলে, তাই ক্লাসঘরের মেঝে ফাটাবার কোনও ব্যর্থ চেষ্টা না করে মনে মনে তখন শুধু ঘণ্টাধ্বনি প্রার্থনা করেছি। এটুকু বুঝতে পারছিলাম ভূগোলের স্যারের নির্মম ব্যঙ্গ আর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাত থেকে আমাকে যদি কেউ রক্ষা করতে পারেন তবে তিনি বাংলার স্যার। এর পরই তাঁর ক্লাস। তিনি যত দ্রুত এসে অকুস্থলে পৌঁছন ততই মঙ্গল। স্বচক্ষে দেখছি সমালোচনা পর্ব শেষে ভূগোলের স্যার এবার আমার সাধের ভারত বিভাগে উদ্যত! স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, কাগজটাকে টুকরো টুকরো করে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে না দিয়ে ক্ষান্ত হবেন না তিনি।

এখন বুঝতে পারি এই ক্রোধ অকারণ ছিল না। স্কুলের ক্লাসঘর না হয়ে ওটা যদি কোনও আন্তর্জাতিক সভাকক্ষ হত, এবং সেখানে পরিবেশিত হত আমার ওই মানচিত্র, তা হলে কী ঘটত তা-ই ভাবি। দু'-তিনটি দেশের প্রতিনিধি নির্ঘাত ওয়াক-আউট করতেন নিজ নিজ দেশের মান বাঁচাতে। কাগজে কাগজে রব উঠত— কার্টোগ্রাফিক অ্যাগ্রেশান!— নির্লজ্জ কার্টোগ্রাফিক অ্যাগেশান! বিদেশ মন্ত্রকে রাশি রাশি প্রতিবাদপত্র এসে পৌঁছত। লড়াই বেধে না গেলেও কোর্ট কাছারি হত নিশ্চয়।

কেননা আমার সেই মানচিত্র আত্মপ্রতিকৃতি হিসাবে যত উঁচুদরেরই হোক-না-কেন, দ্বিতীয়বার তাকিয়ে আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম, মানচিত্র হিসাবে সেটি যার-পর-নাই ভয়াবহ। কোথায় ম্যাকমোহন-লাইন, কোথায় ডুরান্ড-লাইন, আমার অভিযাত্রী পেনসিল তিব্বত তো বটেই, পাকিস্তান আফগানিস্তান সব গ্রাস করে ফেলেছে। মনে হয়, ইরানের কিছু

এলাকাও এসে গেছে ভারতে। এক কথায় সে এক অভূতপূর্ব ভারত, চন্দ্রগুপ্ত অশোক কিংবা আকবর কারও সাধ্য ছিল না সেই বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন! এদিকে দক্ষিণ ভারতের যা চেহারা দাঁড়িয়েছে দেখলে কার না করুণা হয়। শ্রীকরুণানিধি সে-দৃশ্য দেখলে নিশ্চয় চটে যেতেন, ওই সংকীর্ণ মাটিতে তামিলনাড়ু গড়ে তোলা সত্যিই শক্ত কাজ। অবান্তর হলেও নীচে, তলার দিকে যথারীতি সিন্ধুর-টিপ সিংহল দ্বীপ ছিল অবশ্য, কিন্তু কার সাধ্য বলেন ওই ভূমিখণ্ড শ্রীলঙ্কা না মাদাগাস্কার, অথবা— অন্য কিছু! ভূগোলের স্যারের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেবার মতো উপাদান অতএব আমার মানচিত্রে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল।

জাহাঙ্গীরের ক্রোধের উপলক্ষ, বলা নিষ্প্রয়োজন, আমার বা কোনও স্কুল-বালকের কোনও অপসৃষ্টি নয়; দিল্লীশ্বরের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছিলেন নাকি একজন পাকা মানচিত্র-আঁকিয়ে।

সপ্তদশ শতকের প্রথম-দিককার কথা। ইংরাজ দূত টমাস রো তখন মুঘল-রাজধানীতে। সম্রাটের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়ে গেছে। দরবারে তাঁর নিয়মিত আসা-যাওয়া। একদিন নিজের ঘরে বসে কাজ করছেন রো, এমন সময় বাইরে হঠাৎ কোলাহল।— কী ব্যাপার? রো শুনলেন তাঁর দুয়ারের সামনে দিয়ে চলেছে রাজকীয় মিছিল, নগর পরিদর্শনে বেরিয়েছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। সাহেবের অনুচর জানাল— হিন্দুস্থানে দেশাচার, দুয়ারে রাজার পায়ের ধুলো পড়লে গৃহীকে দুয়ার খুলে বেরিয়ে আসতে হয়। যা-হোক-কিছু নজরানা দিয়ে অভিবাদন করতে হয় তাঁকে। রাজা নন, স্বয়ং মুঘল-সম্রাট তাঁর অঙ্গনে। সুতরাং ত্রস্ত হয়ে উঠে পড়লেন রো। কিন্তু সম্রাটকে দেওয়া যায় কী! তহবিলে দেওয়ার মতো কিছুই নেই। যা ছিল নজরানা দিতে দিতে সবই ফুরিয়ে গেছে। বস্তুত দেশ থেকে কবে আরও উপঢৌকন এসে পৌঁছবে রো তারই অপেক্ষায় বসে আছেন। এই মুহূর্তে কী করা যায় ভাবনা সেটাই। হাতের কাছে ছিল মার্কেটারের মানচিত্রের একটা সংকলন, রো তা-ই তুলে দিলেন সম্রাটের হাতে। মনে মনে ভাবলেন,— ভালই হল। গোটা বিশ্বই তুলে দিলাম ওঁর হাতে। সম্রাট নিশ্চয় খুশি হবেন। তা ছাড়া এই বিশ্বের একটা বিস্তীর্ণ এবং ঐশ্বর্যময় অংশের প্রভু তো এই মানুষটিই। জাহাঙ্গীর সানন্দে গ্রহণ করলেন বিদেশির দেওয়া অভিনব সেই উপহার। আবার এগিয়ে চলল রাজকীয় মিছিল।

ক'দিন পরের কথা। সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে রো গিয়েছেন দরবারে। নানা বিষয়ে কথাবার্তা হল। ফেরার সময় জাহাঙ্গীর হঠাৎ বললেন— একটু দাঁড়াও। সম্রাটের ইঙ্গিতে একজন অনুচর নিয়ে এল সেই বই যাতে নানা দেশের মানচিত্র। গম্ভীরভাবে জাহাঙ্গীর বললেন— ওটা আমার চাই না। তোমার বই তুমিই নাও। রো স্তম্ভিত। কিন্তু কিছুই করবার নেই তাঁর। বোঝা যাচ্ছে যে-কোনও কারণেই হোক সম্রাট এই মানচিত্রের বইটি পছন্দ করেননি। এবং সে-অপছন্দের কথা জানিয়ে দেওয়ার জন্যই এভাবে ফিরিয়ে দিলেন বইটি। রো ভেবে পাচ্ছেন না— মানচিত্রে সম্রাটের এই অরুচির হেতু কী!

টমাস রো অনেক ভেবেছেন এই নিয়ে। হয়তো অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন তিনি। কিন্তু রহস্যভেদ করতে পারেননি। তাঁর রোজনামচায় ঘটনাটিরই উল্লেখ আছে; উত্তর নেই। আজকের যে-কোনও বুদ্ধিমান দর্শক কিন্তু সেই মানচিত্রটির দিকে এক নজর তাকালেই ধরে ফেলতে পারবেন গোলমাল কোথায়। জাহাঙ্গীর কেন সেদিন যুগপৎ বিষণ্ণ এবং ক্ষুব্ধ।

মার্কেটার বিশ্বের মানচিত্রকরদের মধ্যে সুখ্যাত একটি নাম। জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক তিনি। ষোড়শ শতকের নেদারল্যান্ডের এই মানুষটি এক আশ্চর্য প্রতিভা। তিনি গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ, যন্ত্রকুশলী; তিনি ভূগোল-বিশারদ, তিনি মানচিত্র-আঁকিয়ে। বড় বড় গ্লোব গড়তেন মার্কেটার। মানচিত্র এঁকে নিজেই তা ছাপতেন। মানচিত্রকে 'অ্যাটলাস' বলি আমরা তাঁর জন্যই। নিজের আঁকা মানচিত্রগুলো একসঙ্গে করে মলাটে গ্রিক পুরাণের অ্যাটলাস টাইটানের প্রতিকৃতি দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন তিনি। অ্যাটলাসের কাঁধে ভূমণ্ডল। সেই থেকে যে-কোনও মানচিত্র 'অ্যাটলাস।' শুধু তাই নয়, এক সমতলে সমগ্র বিশ্বকে সুকৌশলে বিশেষভাবে উপস্থাপন তাঁর আর-এক কীর্তি। কে না শুনেছেন—'মার্কেটার্স প্রোজেকশান'-এর কথা!

কিন্তু তাঁর আঁকা ভারত, সে কেমন ভারত? কোথায় সেই সীমাহীন বিস্তৃতি যেখানে অতুল বৈভব, যেখানে গ্রেট মুঘলদের সাম্রাজ্য। শীর্ণ, চাপা—এ-হিন্দুস্থান দেখে জাহাঙ্গীর খুশি হবেন কেন? তাঁর পক্ষে বরং আমার ভূগোলের মাস্টারমশাইয়ের মতো খেপে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। নেহাত দূত অবধ্য, রো তাই বেঁচে গিয়েছিলেন সেদিন। তবে যাকে বলে রাজকীয় ক্রোধ; জাহাঙ্গীর তৎক্ষণাৎ সব ভুলে গিয়েছিলেন এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তিনি অন্যভাবে। সে-কথা পরে।

মার্কেটারের কাহিনী শুনে নিজের লজ্জা কিছুটা ঘুচেছে। বিশ্ব-বন্দিত ম্যাপ-আঁকিয়ে যদি ভারতের বেলায় ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে আর নবীন পড়ুয়ার অপরাধ কী, বিশেষত মানচিত্র বাবদে নম্বরের বরাদ্দ যখন খুব বেশি নয়। কিন্তু মার্কেটারও যখন পারলেন না, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে— মানচিত্র কি সত্যিই কেউ আঁকতে পারেন? আঁকতে পেরেছেন কেউ?

যুগ যুগ ধরে আঁকা হচ্ছে অজস্র মানচিত্র। বলা হয় আদিম মানুষ খুশি ছিল মানসিক মানচিত্র তথা মনশ্চিত্র নিয়েই। সভ্যতার শুরু থেকেই মন-চিত্রের ঠাঁই নিয়েছে মানচিত্র। প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, চিন— সকলের ভাণ্ডারেই ছিল মানচিত্র। ছিল গ্রিক এবং রোমানদেরও। অগস্টাস কুড়ি বছর খাটিয়ে বিরাট এক মার্বেল পাথরে খোদাই করিয়েছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের মানচিত্র। রোমান ফোরামের দেওয়ালে সেটি খচিত ছিল। এ ধরনের আরও নানা দর্শনীয় মানচিত্রের কথা আছে ইতিহাসে। কিন্তু সেগুলোও কি এক ধরনের মন-চিত্র নয়?

টলেমির মানচিত্রের কথাই ধরা যাক। তিনি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মানুষ। নিবাস ছিল আলেকজান্দ্রিয়ায়। সেকালের পণ্ডিতদের মতোই তিনিও সর্ববিদ্যাবিশারদ। টলেমি গাণিতিক, সংগীতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, ভূগোলবিদ। জ্ঞানের জগতে, বিশেষত ভূগোল আর জ্যোতির্বিদ্যায় তেরোশো বছর ধরে তাঁর আধিপত্য। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের আগে কমপক্ষে একত্রিশটি শুধু লাতিন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ভূগোলের! সুতরাং, তাঁর পাণ্ডিত্য এবং যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। হেরোডোটাস মনে করতেন পৃথিবী বৃত্তাকার, এবং ইউরোপ ও এশিয়া আয়তনে সমান সমান। টলেমির দৃঢ় অভিমত ছিল বিশ্ব গোলক। তিনি তার পরিধির একটা মাপও দিয়েছিলেন। তাঁর মানচিত্রে অক্ষ দ্রাঘিমা সবই ছিল। অবশ্য সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। তবু দ্বিতীয় শতকের একজন ভূগোলবিদের পক্ষে টলেমির ভূগোল নিঃসন্দেহে প্রতিভার এক বিস্ময়কর প্রমাণপত্র। কিন্তু হায়, তাঁর ভূগোল মাফিক ছক মেনে আঁকা যে

মানচিত্র তুলে দেওয়া হয়েছে আমাদের হাতে তা কি সত্যি মানচিত্র?

আকার এবং আয়তনের কথা বাদই দিচ্ছি। স্ট্রাবোর ধারণা ছিল সিন্ধু নদীই ভারতের পশ্চিম সীমানা। টলেমির ভূগোল অনুযায়ী মানচিত্রে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে হিন্দুকুশ। আজকের আফগানিস্তান, বালুচিস্তান, কান্দাহার,— সবই ভারত! বোঝা যায়, তাঁর মানচিত্রে 'গালফ কান্থি' আসলে কচ্ছ উপসাগর, 'গোয়ারিস'— গোদাবরী, 'খেবেরস'— কাবেরী, 'সোসারণ' কালিদাসের সেই দর্শনা নদী, আজকের— দশন। বিন্ধ্য, নর্মদা, এবং ইন্দ্রপ্রস্থকেও চেষ্টা করলে নাকি চেনা যায়। কিন্তু ইয়ুল সাহেব থেকে শুরু করে অনেকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখেছেন সেই মানচিত্রে এখনও অনেক অচেনা নাম, অজ্ঞাত এলাকা।

সেই সেকালে এটাই স্বাভাবিক। মানুষ তখন পাখির মতো উড়তে পারে না, বাতাসের মতো ছুটতে পারে না। তার হাতে তখন না আছে কম্পাস, না ক্রনোমিটার, না আধুনিক নানা সাজসরঞ্জাম। ক্রনোমিটার বানিয়েছিলেন নাকি ১৭১৪ সালে জন হ্যারিসন নামে ইয়র্কশয়ারের এক কাঠের মিস্ত্রি। বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রবিদদের হারিয়ে দিয়ে লক্ষ ডলারের পুরস্কার পকেটস্থ করেছিলেন তিনি। কিন্তু কম্পাস নাকি অতি পুরনো যন্ত্র। পূর্ব ইউরোপের উরাল পর্বতে নাকি পাওয়া গেছে তার কঙ্কাল। তবু অনুমান করা যায় অনিবার্যভাবেই প্রাচীন মানচিত্র-আঁকিয়ের অন্যতম ভরসা ছিল— কল্পনা। জোনাথন সুইফ্ট তাই পুরনো দিনের মানচিত্র দেখে লিখেছিলেন:

> So geographers in Africa maps,
> With savage pictures fill their gaps,
> And, o'er inhabitable downs
> Place elephants for want of towns.

টলেমিকে অতএব দোষ দেওয়া যায় না। দুই শতক আগেও মানচিত্র যত না কাজের জিনিস তার চেয়ে বেশি যেন দেখবার জিনিস। যথাযথভাবে মাপার এবং আঁকার সমস্যা তো ছিলই, ছিল ছাপাবার সমস্যাও। প্রাচীনতম মুদ্রিত মানচিত্রের তারিখ বোধহয় পনেরো শতকের মাঝামাঝি, তার আগে নয়। তা ছাড়া, প্রতীক নিয়েও তখন কতই না ভাবনা। পাহাড়, নদী, মরুভূমি, শহর, গ্রাম— সংক্ষেপে অথচ সহজে বোঝানো চাই। পুরনো অনেক মানচিত্রে দেখা যায়, পাহাড়ের ছায়া পড়েছে ডান দিকে। কেননা, এনগ্রেভার বা খোদাই-শিল্পী তখন কাজ করতেন বাঁ দিকে আলো রেখে। আফ্রিকার প্রতীক যদি হাতি, টার্টারির প্রতীক তবে উট, নরওয়ের— ছাগল। মানচিত্র জুড়ে তাদের দৌরাত্ম্য। অনেকে শূন্যস্থান পূরণ করতেন আবার ছবিতে মার্কো পোলোর ভ্রমণ কাহিনী কিংবা বাইবেলের গল্প ব'লে। ষোড়শ শতকের এক চিত্রকর মানচিত্র বোঝাই করেছিলেন নরনারীর নানা লীলা দিয়ে। এক উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য দর্শকের মনোরঞ্জন। তবে আরও একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল নাকি এই অলংকরণের পেছনে। তুর্কিরা মানুষের প্রতিকৃতির দিকে তাকায় না, বারণ আছে; সুতরাং এ-মানচিত্র তারা ছোঁবে না! মানচিত্র শুধু চিত্রকরের নয়, দেশের শাসকের মন-চিত্রও বটে। ইউরোপের দরবারে দরবারে সেকালে ছিলেন এক ধরনের বিশেষ রাজকর্মচারী। তিনি 'জিওগ্রাফার টু দি কিং'। রাজাকে স্বদেশ-বিদেশের মানচিত্র সরবরাহ করা ছাড়াও

তাঁদের আর-এক লক্ষ্য ছিল সিংহাসনে উপবিষ্ট মানুষটির মহিমা-কীর্তন। অনেক মানচিত্রে তাই ন্যায়দণ্ড হাতে মুকুট মাথায় আবির্ভূত হতেন দেশের রাজা। কখনও বা রূপ পেত জাতীয় অহমিকা। ১৬১৭ সালে আঁকা একটি মানচিত্রে নেদারল্যান্ডকে চিত্রিত করা হয়েছে সিংহ হিসাবে। লেজ, থাবা, কিছুই বাদ নেই। ফাঁকে ফাঁকে দেশের ভৌগোলিক বিবরণ! এ-ধরনের কিছু মানচিত্র তথা 'মন-চিত্রে'র নমুনা রেখে গেছেন জাহাঙ্গীরের চিত্রকর আবুল হাসান।

মার্কেটারের আঁকা হিন্দুস্থান দেখে ক্ষুব্ধ জাহাঙ্গীর কী করেছিলেন সে-কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তিনি আবুল হাসানকে পছন্দসই মানচিত্র আঁকতে বসিয়ে দিয়ে। একটি চিত্রে দেখা যাচ্ছে, সিংহরূপী মুঘলসম্রাট ভারত এবং পারস্য তুরস্ক জুড়ে গা এলিয়ে বসে আছেন, তাঁর থাবার সামনে মেষরূপী পারস্য-রাজ, জাহাঙ্গীরকে দেখে সভয়ে তিনি ভূমধ্য সাগরের দিকে পালাচ্ছেন! আর-একটি মানচিত্রে মনে হয় জাহাঙ্গীর তাঁর নামের অর্থ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। মাছের পিঠে ষণ্ড, তার পিঠে ভূমণ্ডল, আর তার উপর দাঁড়িয়ে ধনুর্বাণ হাতে সম্রাট জাহাঙ্গীর, তিনি আবিসিনিয়ার দাস মালিক অম্বরকে শাস্তি দিচ্ছেন। মার্কেটারকে সামনে পেলে হয়তো অম্বরের জায়গায় দাঁড় করানো হত সেই বিদেশি মানচিত্র-আঁকিয়েকেই। সম্রাটের তৃতীয় আর-একটি মন-চিত্রে দেখি ভূমণ্ডলের পিঠে দাঁড়িয়ে মুঘলসম্রাট পারস্য-রাজ শাহ আব্বাসকে ঠেলে দিচ্ছেন ভূমধ্য সাগরের জলে। একটি ছবি হাজার কথা বলে; এ-সব ছবি বোধহয় বলে একটি কথাই— মানচিত্র মন-চিত্র মাত্র।

কারও মানচিত্র মনগড়া অক্ষমতাবশত, কারও কল্পনা আবার অন্যের মন জোগাতেই বল্‌গাহীন। আমি অজ্ঞাতসারে প্রথম দলকেই অনুসরণ করছিলাম মাত্র। অনেক ছেলেমেয়েই তা করে। সম্ভবত অনেক গুরুমশাইও। স্কুলপাঠ্য ভূগোল-ইতিহাসে মানচিত্রের নামে মন-চিত্র সুদুর্লভ নয়। বরং হামেশাই তা দেখা যায়। সেটা অনভিপ্রেত হয়তো, কিন্তু ঐতিহ্যহীন নয় নিশ্চয়ই।

গত কয় শতকে আর সব বিষয়ের মতো মানুষের ভূগোল-জ্ঞানও অবশ্যই বেড়েছে। বেড়েছে মানচিত্রের ব্যবহারও। এক সময় ভূগোল ছিল ভূপৃষ্ঠের বিবরণ; নদী পাহাড় মরুভূমি আর সমতলের সহজ সরল বর্ণনা, সেইসঙ্গে এক ঠিকানা থেকে আর-এক ঠিকানা কোন দিকে বা কতদূরে তার নিশানা। বিশ্ব তখন ভূগোলবিশারদের জ্ঞানের পরিধি অনুপাতে নানা মাপের। ক' বছর আগে উত্তর গ্রিনল্যান্ডে এমন এক এস্কিমো-গোষ্ঠীর সন্ধান মিলেছিল যাদের ধারণা, পৃথিবীর জনসংখ্যা তিনশো। অর্থাৎ তারা আর-কোনও দেশ কিংবা মানুষের খবর রাখে না। অজ্ঞতায়, বলা নিষ্প্রয়োজন, তারা প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নয়। শোনা যায়, ভারতে পৌঁছে আলেকজান্ডার শিশুর মতো কান্না জুড়েছিলেন এই ভেবে যে, এর পর আর জয় করার মতো কোনও দেশ পৃথিবীতে রইল না! সে অন্ধকার কেটে গেছে অনেকদিন। ধীরে ধীরে ভূগোল বিশারদের কাজের তালিকায় উঠেছে বাতাস আর মেঘের চালচলন সম্পর্কেও খোঁজখবর সংগ্রহ। কেননা, অভিজ্ঞতায় বোঝা গেছে সে-সব তথ্যও খুবই দরকারি। আরবরা মৌসুমী বায়ুর মেজাজ-মর্জির খবর নাকি গোপন রেখেছিল অনেক দিন। ইউরোপের অভিযাত্রী রাজারাজড়া যেভাবে মানচিত্র লুকিয়ে রাখতেন, ঠিক সেইভাবেই বাতাসের খবর গোপন রাখত আরব নাবিক। কেনই বা রাখবে না? কোথায় যেন পড়েছিলাম উত্তমাশা

অন্তরীপ থেকে একটা সওদাগরি নৌকোকে পশ্চিমা বায়ু তিন সপ্তাহে পৌঁছে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে। বাতাসের রহস্য অতএব প্রতিযোগীদের স্বেচ্ছায় কে জানাতে চায়! উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে অস্ট্রেলিয়া, এই দুই বিন্দুর দূরত্ব পাকা ছ' হাজার মাইল।

সমুদ্রস্রোত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির রহস্যভেদের চেষ্টা করেই ক্ষান্ত হননি একালের ভূগোল-সাধক। ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাস এবং রাজনীতির সম্পর্কও তাঁর চোখে অন্যতম বিশ্লেষণের বিষয়। উনিশ শতকে বার্কলে যদি প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন ভূগোলের সঙ্গে সভ্যতার যোগ অতিশয় নিবিড়, বিশ শতকে তবে এল হালফোর্ড ম্যাকিনডার-এর জিওপলিটিকস তত্ত্ব, তথা ভূগোল আর রাজনীতির গূঢ় সম্পর্কের কথা। সেই সূত্র ধরেই কয় দশকের মধ্যে জার্মানির বিকৃত রাষ্ট্রীয় সাধনা, হিটলারি উন্মাদনা। জিও-পলিটিকসেই উদ্যম ফুরিয়ে গেল না। ক্রমে নানা মহলে শোনা গেল, জিও-সায়েন্স, জিও-মেডিসিন, জিও-নমিকস ইত্যাদি বিচিত্র সব শাস্ত্রের কথা। শাখা-প্রশাখা ফুলে-পল্লবে ভূগোল আজ এক প্রকাণ্ড জ্ঞানবৃক্ষ। তার ফুল-ফলের দিকে প্রসারিত সকলের হাত।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই সব তত্ত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানচিত্রও হয়েছে দিনে দিনে বৈচিত্র্যময়। অভাবিত সে চিত্রশালা। কেননা, প্রত্যেকের আজ মানচিত্র চাই। খ্যাতিমান রাষ্ট্রীয় পুরুষদের বৈঠকখানায় শোভা পায় বিশালাকার গ্লোব, যেন প্রত্যেকেই তাঁরা টাইটান অ্যাটলাস, বিশ্বের বোঝা অষ্টপ্রহর তাঁদেরই ঘাড়ে, এইমাত্র নামিয়ে রাখলেন একটু বিশ্রামের আশায়। নিহত বাঘের পিঠে পা রেখে বিজয়ীর ভঙ্গিতে ছবি তোলা যেমন শিকারির এক প্রবণতা, ঠিক তেমনই জেনারেলদের প্রথাসিদ্ধ ছবিতেও বোধহয় মানচিত্র অবশ্য চাই। কখনও তা ড্রপ-সিনের মতো দেওয়ালে ঝোলে, কখনও বা দেখা যায় সেটি টেবিল-ঢাকনার কাজ করছে, জেনারেল তন্ময় হয়ে তা পর্যালোচনা করছেন। সাধারণ সৈনিকেরও আজ মানচিত্রজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এমনকী সাধারণ মোটর ড্রাইভারেরও। আর সবাই জানেন, পরদেশি গুপ্তচরের ঝুলিতে ক্যামেরা কিংবা বেতার যন্ত্রের মতো মানচিত্র না থাকলেই নয়। না-থাকলেও গল্পে অন্তত রাখতেই হবে, মানচিত্রহীন গুপ্তচরকে গুপ্তচর বলে মেনে নেওয়া শক্ত! গত মহাযুদ্ধে একা আমেরিকাই নাকি তৈরি করেছিল নানা ধরনের পঞ্চাশ হাজার মানচিত্র। আর সেগুলোর কপি ছাপানো হয়েছিল পঁয়ষট্টি কোটি! অন্যরাও নিশ্চয় তখন চুপচাপ বসে ছিলেন না। গুপ্তচর খালি হাতে পথে বের হলে সেটা বোধহয় তারই ত্রুটি।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সব মানচিত্রই রাজনৈতিক বা প্রাকৃতিক নয়। সেকালের হাটে বিশেষ চাহিদা ছিল নাকি যে-সব মানচিত্র গোপন রত্নভাণ্ডারের সন্ধান দিতে পারে সেগুলোর। কি ওয়েস্ট, ক্যাটালিনা, গার্ডিনার, ওক আয়ল্যান্ড, কোকোস আয়ল্যান্ড— আমেরিকার উপকূলে তখন কতই না রত্নদ্বীপ! কোকোস-দ্বীপে ছিল নাকি ইংরেজ জলদস্যু এডগার ডেভিস আর মেক্সিকোর লুঠেরা বেনিটোর গোপন ঐশ্বর্যভাণ্ডার। সে-ভাণ্ডার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য এমনকী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট স্বয়ং রুজভেল্টও নাকি একবার পদধূলি দিয়েছিলেন ওই দ্বীপে। কিন্তু কোকোস দ্বীপে একটি রুপোর ক্রুশ আর অসংখ্য ছাগল ছাড়া এ-পর্যন্ত আর কোনও ঐশ্বর্যের সন্ধান মিলেছে বলে শোনা যায় না। অথচ শুধু স্টিভেনসনের 'ট্রেজার আয়ল্যান্ড'-এ নয়, এখানে-সেখানে কত মানচিত্রই না দেখা গেছে এই কোকস দ্বীপের। এ-ধরনের মানচিত্র কি আজও তৈরি হচ্ছে না? কোথায় তেল থাকতে পারে, কোথায় থাকতে পারে ইউরেনিয়াম— এ-সব খবর জানার জন্যও আগ্রহী নিশ্চয়

অনেকে। আর, তাদের কৌতূহল মেটানোর জন্য সেকালের মতো একালেও যে বিস্তর কাল্পনিক মানচিত্র রচিত হচ্ছে না তাই বা কে জোর দিয়ে বলতে পারে? উত্তর আটলান্টিকে আইল অব স্যাটান, আইল অব গোটস, কিংবা গ্রিনল্যান্ডের দক্ষিণে 'বাস্' দ্বীপের মতোই আজকের কিছু কিছু তেলের-সাগর আর খনিজের-পাহাড় হয়তো আগামীকাল প্রমাণিত হবে কাল্পনিক। তবু উদ্যমের অভাব নেই। জল-স্থল-আকাশ তছনছ করে তৈরি হচ্ছে হরেক রকমের মানচিত্র। বিজ্ঞানের দৌলতে কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে বলেই হয়তো নজর পড়ছে পৃথিবীর বাইরে, চাঁদ কিংবা মঙ্গল গ্রহের ওপর। পশ্চিমের মনোহারী দোকানে এখন চাঁদও কিনতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, চাঁদের বিস্তারিত মানচিত্র।

এ-সব অবান্তর ছেলেমানুষি, কিংবা হাতে আর কাজ নেই বলেই আজকের মানুষের এই খই-ভাজা, এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবে না। ভূগোল এবং মানচিত্র-চর্চা নিশ্চয়ই খুব জরুরি। বিশেষ করে আমাদের পক্ষে তো বটেই। কেননা, আরও কিছু কিছু বিষয়ের মতো আমরা ভূগোল বিষয়েও এক প্রাচীন উদাসী, বহুকাল বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল অতি অল্প। অন্তত ঐতিহাসিকদের তা-ই অভিমত। বলা যেতে পারে আমাদের কালিদাস ছিলেন; মেঘদূত এবং রঘুবংশে তাঁর যে ভূগোল-জ্ঞানের পরিচয় রয়েছে তা নিশ্চয়ই তুচ্ছ করার মতো নয়। অনেকে রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণগুলোর দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর— এই সপ্তদ্বীপ তাঁদের কাছে অতি সহজ ভূগোল। কনক পর্বত মেরু, ইলাবৃত বর্ষ, বা স্বর্গ, কিছুই তাঁদের কাছে রহস্য নয়। কেউ বলেন, ইলাবৃত বর্ষ আধুনিক পামির কিংবা পূর্ব তুর্কিস্তান, উত্তর কুরু সাইবেরিয়ার কোনও স্থান, ব্রহ্মলোকের পথে আর হ্রদ— আরল; পাতাল— হয় আমেরিকা, না-হয় দক্ষিণ ভারত। ইত্যাদি। আশার কথা আধুনিক গবেষকরাও চেষ্টা করছেন পুরাণের ভূগোল পুনঃনির্মাণ করতে, ধাঁধার পর ধাঁধার রহস্যভেদ করতে। ঐতিহাসিকের কাছে তবু মেঘদূত ভূগোলের বই নয়, কাব্য; আর পুরাণগুলোও আগে পুরাণ, তার পর ভূগোল। কবিতার বই আর ভূ-বিজ্ঞান নিশ্চয়ই এক বস্তু নয়। তাঁদের মতে ভূগোল বিষয়ে আমাদের উদাসীনতার পরোক্ষ প্রমাণও বিস্তর। এশিয়া নামক মহাদেশটিতে আমরা সঠিক কোথায় আছি, অন্যত্রই বা কারা কেমন আছে সে-সম্পর্কে যদি আমাদের সুস্পষ্ট চেতনা থাকত তা হলে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক যুদ্ধগুলো অনুষ্ঠিত হত দিল্লির অদূরে নয়, সীমান্তের ওপারে অন্য কোথাও। পশ্চিমের ইতিহাসে তাই দেখা গেছে ওরা লড়াই করে ওয়াটারলুতে, আমাদের মতো পাণিপথে নয়। যুগের পর যুগ হিমালয় আমাদের স্বপ্নের ম্যাজিনো লাইন, হিন্দুকুশ পার হয়ে শত্রু পাতাল সীমান্তে নেমে না আসা অবধি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাই আমরা। দ্বিতীয়ত, নিকট-দূর প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগ কিংবা আগ্রহ ছিল যৎসামান্য, ফলে যাকে বলে বৈদেশিক নীতি আমাদের রাষ্ট্রচিন্তায় দীর্ঘকাল তা ছিল অচিন্তনীয়। সর্দার কে. এম. পানিকর এ-বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তাঁর সওয়াল ছিল—চাই ভূগোল চর্চা। নিজের দেশের ভূগোলের নিবিড় এবং গভীর অধ্যয়ন তো জরুরি বটেই, অন্য দেশের ভূগোলকেও যুগের আলোয় খুলে পড়তে হবে। তা না করতে পারলে, পুরনো অভ্যাসবশত ভূগোলকে এখনও অবহেলা করলে ভারতের পক্ষে তার ফল হতে পারে মারাত্মক। কেননা, বার বার প্রমাণ মিলেছে ভূগোল আর ভাগ্য একসঙ্গে বাঁধা। সেদিক থেকে পাহাড়-প্রমাণ পুথি, রাশি রাশি মানচিত্র

সবই, বলা নিষ্প্রয়োজন, প্রাসঙ্গিক। পরীক্ষার খাতায় নিজের দেশের একটা চলনসই মানচিত্র না আঁকতে পারলে কিছু নম্বর কাটা যাওয়াই বোধহয় ঠিক।

কিন্তু কোন ভূগোল পড়ব আমরা? কোন মানচিত্র দেওয়ালে ঝোলাব? এখনও কি মানচিত্রের নামে অন্যদের মন-চিত্র নিয়েই তৃপ্ত থাকব আমরা?

প্রথমত, মনে রাখা চাই সাধারণত আমরা এদেশ এবং বিদেশের যে-সব মানচিত্র দেখে অভ্যস্ত সে-সব নাবিকের মানচিত্র; অর্থাৎ জল কেটে চলতে চলতে দেখা স্থলের ছবি। অথচ তথাকথিত 'নতুন-পৃথিবী' আর অস্ট্রেলিয়াকে বাদ দিলে নতুন কোনও এলাকারই সন্ধান দেয়নি ওঁরা। পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে তাঁদের দাপাদাপি শুরু হওয়ার অনেক আগেই কিন্তু শুরু হয়েছিল দেশ থেকে দেশান্তরে ডাঙার মানুষের আনাগোনা। ভাস্কো ডা গামা তো সেদিনের কাহিনী, তার শত শত বছর আগে ভারত তো বটেই এমনকী দূর চিনের পণ্যসম্ভার ইউরোপের নানা হাটে। রোমান সুন্দরীর অঙ্গে সেদিন ভারতীয় রেশমের পোশাক, প্রাচ্যের গন্ধসার। ক্ষুরধারসম সে রেশমি-পথ ছিল কিন্তু স্থলেই। সাইরাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পরবর্তী কালের বোগদাস রেলওয়ে। আসরে অনেক পরের আগন্তুক নাবিক সে-সব এলাকার খবর পাবেন কোথায়? তাঁর জানার কথা নয়, বহুকাল পর্যন্ত ইতিহাসের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিল জলচর নয়, ডাঙার মানুষ। এই সভ্যতা— আজকের ভৌগোলিক আর ঐতিহাসিকের মতো— স্থায়ী বাসিন্দাদের এলাকায় যাযাবরদের ক্রমাগত চাপের ফল। বিশ্বের মানচিত্রের দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে তাকালে দেখা যাবে বিস্তীর্ণ এলাকা যেমন জলের অধিকারে, ঠিক তেমনই স্থল বলে চিহ্নিত এলাকার অনেকখানি জুড়েই বালির সমুদ্র। নাবিকদের মতোই মরুভূমি আর তুন্দ্রা পার হয়ে যাযাবর বর্বর বেশে হানা দিয়েছে উর্বর অঞ্চলগুলোতে, তাদের চোখে সেগুলো মরুদ্যান। যে-সব দেশ তাদের অভিযানের মুখে পড়েছে তাদের ভাগ্য স্বভাবতই, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকার দেশগুলোর থেকে একটু অন্যরকম। তবে কমবেশি এই চাপ ভোগ করতে হয়েছে সব 'গৃহস্থ দেশকেই'। হয়তো ভবিষ্যতেও মুখোমুখি হতে হবে মূলত একই ধরনের সমস্যার। এত কাণ্ড ইতিহাসে, অথচ সেদিনের নাবিকের মানচিত্র কী আশ্চর্য সরল! আমরা কিন্তু এখনও মোটামুটি সেই নকশা নিয়েই খুশি। তা না হলে কেন এখনও গ্রিনিচ থেকে তাকাতে চাইব নিজের দেশের দিকে? কেন গ্রিনিচ আমাদের চোখেও শূন্য দ্রাঘিমা? জলচরকুলে ইংরেজরা প্রধান হয়ে উঠেছিল বলেই না আমরা গ্রিনিচকে মেনে নিয়েছিলাম, ওদের অনুকরণে পশ্চিম এশিয়া বোঝাতে বলতাম— 'মধ্যপ্রাচ্য', পূর্ব এশিয়া আমাদের কাছেও তখন 'দূরপ্রাচ্য" 'নতুন-পৃথিবী', 'পুরনো-পৃথিবী' এ-সবও, বলা অনাবশ্যক, ওঁদেরই মনগড়া কথা। ইউরোপের পদসঞ্চারের আগে যারা আমেরিকায় সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তাদের কাছে পৃথিবীর ওই অঞ্চলটি নিশ্চয়ই 'নতুন' ছিল না।

ইংরেজ আপন সাম্রাজ্যকে মানচিত্রেও লাল রঙে সাজিয়েছিল। অন্যরাও রাঙিয়েছিল মনের রঙে। মানচিত্রের পুথি বোঝাই রকমারি 'প্রোজেকশন' বা ভূমণ্ডলকে নব নব পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপনের উদ্‌যোগগুলোর কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। ভূপৃষ্ঠ যেভাবেই দ্বিমাত্রায় সমতলে দেখানোর চেষ্টা করা যাক-না-কেন, কিছু-না-কিছু বিকৃতি ঘটবেই। হয় আয়তনে, নাহয় আকারে, নয়তো দূরত্বের পরিমাপে। মার্কেটারের বিন্যাসে আকার মোটামুটি ঠিক আছে, কিন্তু মেরুর দিকে গিয়ে বেড়ে গেছে আয়তন, দেখলে মনে হয়

গ্রিনল্যান্ড আর দক্ষিণ আমেরিকা আয়তনে সমান, অথচ ভূগোলের ছাত্র জানেন এক দেশ আর-একটির দশ ভাগের একভাগ মাত্র। মলোউসাইড আয়তনের অনুপাত ঠিক রেখেছেন, কিন্তু গোলমাল ঘটে গেছে চেহারায়। বার্থলোমিউ-এর আঞ্চলিক উপস্থাপন, অর্থাৎ কমলালেবুর খোসা ছাড়াবার মতো করে দক্ষিণ মেরু থেকে ভূ-গোলকের খোসা-ছাড়াবার চেষ্টার ফল— সমুদ্র ছত্রখান! জল থেকে দেখা হোক, স্থল থেকে দেখা হোক, আর আকাশ থেকেই দেখাবার চেষ্টা চলুক, মানচিত্রে রফা কিছু করতেই হয়। বিচার্য আমরা ভুল কিছু দেখছি কি না তা-ই। অনেক পশ্চিমি ভূগোল-বিশারদ মনে করেন এশিয়া এবং আফ্রিকার পক্ষে পশ্চিমের অনেক মানচিত্রই সুবিচার করেনি, সেগুলো পক্ষপাতদুষ্ট মন-চিত্র মাত্র, অর্থাৎ— ইউরোপকেন্দ্রিক। দৃষ্টিভঙ্গিতে কখনও বা নির্লজ্জভাবে— কলোনিয়াল, ঔপনিবেশিক!

সম্প্রতি আর্নো পিটার নামে একজন জার্মান ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক নাকি মানচিত্রের সে-সব ত্রুটি সংশোধন করেছেন। তাঁর মানচিত্রে ইউরোপ নাকি আর দক্ষিণ আমেরিকার চেয়ে বড় নয়। আসলে আয়তনে যা ইউরোপের দ্বিগুণ, তাকে তিনি সেভাবেই চিত্রিত করেছেন। ভারত আর স্ক্যান্ডেনেভিয়া চিরকালের মতো সমান নয়, পিটার ভারতকেও তার ন্যায্য প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ঘোষণা— এতদিনে মানচিত্রে শ্বেত-প্রভুত্বের অবসান ঘটল। ('হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড', [illegible] মে, ১৯৭৩)

সে-চেষ্টা চালাচ্ছেন অন্যরাও। আমরা যেমন রুশ বিশ্বকোষে ভারতের মানচিত্র শুধরাবার জন্য চেষ্টা করি, চিনারা তেমনই নাকি চেষ্টা করছে রাশিয়া সমেত সকলের ত্রুটি সংশোধনের। সম্প্রতি তাদের বিশ্ব মানচিত্রের বইয়ে আফ্রিকাকে দেওয়া হয়েছে ২৪ পৃষ্ঠা, লাতিন আমেরিকাকে ১৪ পৃষ্ঠা, চিন ছাড়া এশিয়াকে ১৮ পৃষ্ঠা, আর আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া— প্রত্যেককে দুই পৃষ্ঠা করে। সে পুথিতে দেশের নাম ও পরিচয় সবই চিনের, মনোমতো! ('হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড', ১৯ নভেম্বর, ১৯৭২)

গত শতক নয়, এ-সব হালফিল খবর। সুতরাং, বোঝা যায় মানচিত্রের খাতায় এখনও করণীয় অনেক। এখনও এশিয়া-আফ্রিকার মানুষের সামনে রয়েছে মন-চিত্র রচনার অফুরন্ত সুযোগ। বিশ্ব যখন গোলক— সত্যিই যখন মহাকাশ থেকে টেনিস বলের মতো দেখায় তাকে— তখন যে-কোনও বিন্দুকেই নিশ্চয় ধরে নেওয়া যায় কেন্দ্র হিসাবে। আর তা যদি বে-আইনি, মানে, বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ না হয়, তবে ভারতের ভৌগোলিকই বা কেন স্বদেশকে গ্রহণ করবেন না কেন্দ্রবিন্দু বলে? রাজনীতিকরা কিন্তু কেউ কেউ এ-ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। আঞ্চলিকতার মতোই বসুধার সঙ্গে কুটুম্বিতার জন্য ব্যাকুলতা— আমাদের রাজনৈতিক চরিতে বিশিষ্ট লক্ষণ। ভৌগোলিক সক্রিয় না হলে দু'ক্ষেত্রেই বিভ্রাট এড়ানো শক্ত।

স্বদেশি-ভূগোলের নামে ভৌগোলিক উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার করুন সেটা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। আমরা ভারতীয় মন-চিত্র চাই, তার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে পুরনো দিনের চিনের মতো চাই নিটোল সমতল ভূগোল! চিনারা নাকি বিশ্বাস করত বিশ্ব গোলাকার নয়, চৌকো এবং সমতল। সে-ধরনের বিশ্বাস এখনও নাকি ব্রিটেনে কারও কারও আছে। তাদের ক্লাবের নাম—'ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটি'। বিপরীত সব সাক্ষ্য প্রমাণ অগ্রাহ্য করে তাঁদের বক্তব্য— পৃথিবী গম ক্ষেত কিংবা ফুটবলের মাঠের মতোই সমতল, চৌকোণবিশিষ্ট; নয়তো প্রতি

বছরই কিছু মানুষ যে হারিয়ে যায় তারা কোথায় যায়? নিশ্চয় কিনারায় গিয়ে পা পিছলে পড়ে যায় নীচে! চিনারা তদুপরি বিশ্বাস করত এই চৌকোণ পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে যে দেশটি রয়েছে সেটাই চিন— তাদের স্বদেশ। আমরা মন-চিত্র চাই বটে, কিন্তু এমন শর্ত আরোপ করি না যে, ভারতকে বিশ্বের ঠিক মাঝখানেই বসাতে হবে। আমরা মার্কেটারের মতো নিজের ঘরের জানালা দিয়ে দেখা পৃথিবীর ছবি চাই না, চাই না আবুল হাসানের মতো দরবারি ম্যাপ-আঁকিয়েও। আমার মতো অক্ষম চিত্রকরের উদ্দাম কল্পনার ফসলও অবশ্যই অনভিপ্রেত। আমরা মানচিত্র চাই, আজকের ভারতের শরীর মনের সত্যিকারের চিত্র। ফাদার রিক্কি (Father Matteo Ricci) এ-চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবিলা করেছিলেন ইতিহাস-পাঠক তা জানেন। চিনারা পৃথিবীর এক কোণে পড়ে থাকতে রাজি নয় দেখে তিনি মানচিত্র কেটে আঠা দিয়ে সেঁটে 'স্বর্গীয় দেশ' চিনকে বিশ্বের মাঝামাঝি স্থাপন করে তা-ই তুলে দিয়েছিলেন ওদের হাতে। এ-সব ১৬০১ সালের কথা। ওরা মনের-মতো বিশ্বরূপ দর্শন করে যার-পর-নাই খুশি। মান্য মান্দারিনরা পরস্পরের মধ্যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন— হ্যাঁ, পরদেশি বর্বরদের মধ্যে দু'-একটি ভদ্রলোকও আছে বটে। রিক্কি আশ্রয় পেয়েছিলেন নিষিদ্ধ শহর পিকিংয়ে।

আমরা সত্যিকারের ভূগোল চাই, বলে ভৌগোলিক যদি সুখী সালংকারা গোলগাল এক কল্পিত ভারত-মাতার কোলে বসিয়ে দেন আমাদের তা হলে রিক্কির মতোই প্রতারণা করবেন তিনি। দেশের মানচিত্র মন-চিত্র হতে দোষ নেই, হয়তো সেটা অনিবার্য; কিন্তু পাঁচজনের মনের মতো ছবি আঁকা অন্য কথা। সে-কাজ আবুল হাসানের, কিংবা রিক্কির!

সুজান গোলে, 'ইন্ডিয়া উইদিন দ্য গ্যাঞ্জেস', জয়াপ্রিন্টস্, নিউদিল্লি, ১৯৮৩

মানচিত্রে কাশ্মীরি শাল
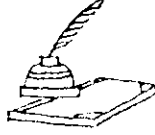
'What is the use of a book', thought Alice, 'without pictures or conversations?'

Lewis Carroll, Alice in Wonderland.

ছবি, পাতার পর পাতা জুড়ে ছবি। ছবির পর ছবি। অধিকাংশই সাদা-কালো। তবে, বেশ-কিছু রঙিনও রয়েছে। সব মিলিয়ে সংখ্যা একশো বাইশ। কিছু বেশি হওয়াও সম্ভব। কেননা, কোনও-কোনও ছবি ভেঙে আলাদা আলাদাভাবে ছাপা। কোনও ছবি চৌকো, কোনও ছবি আয়তক্ষেত্র। কোনওটি দেখতে পানের মতো, কোনওটি শাঁখের মতো, কোনওটি পদ্মের মতো। কোনও কোনও ছবির দিকে তাকালে মনে হয় নানা রঙের ফুলে সাজানো বাগান যেন। কোনও কোনও ছবি আবার মনে করিয়ে দেয় জলরঙে আঁকা ভারতীয় মিনিয়েচার ছবিকে। হ্যাঁ, গোলাকার ছবিও আছে বইকী! পৃথিবীতে বসে নিকট-দূরের পৃথিবীর ছবি যখন, তখন বিশ্বের গোলককে বাদ দিয়ে কেমন করে তা সম্ভব। এই ছবির বইয়ে এমনকী ঠাঁই পেয়েছে ব্রহ্মাণ্ডও।

এ-সব ছবি আসলে মানচিত্র। ভারতীয়দের আঁকা ভারতের এবং বিশ্বের মানচিত্র। মানচিত্র না বলে মন-চিত্র বলাই বোধ হয় শ্রেয়। তা গত শতকে সার্ভে অব ইন্ডিয়া কাজ শুরু করার আগে বিদেশিদের আঁকা ভারতের সব মানচিত্রই কি কমবেশি মন-চিত্র নয়? টলেমির কথাই ধরা যাক। আলেকজান্দ্রিয়ায় বসে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে তিনি যে বিশ্বের মানচিত্র এঁকেছিলেন তার দশম চিত্রটি ছিল এশিয়ার। তার দিকে তাকালে ভারতকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। অথচ সেকালের দুনিয়ায় টলেমি সর্ববিদ্যাবিশারদ এক বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত। তিনি গাণিতিক, সংগীতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ এবং ভূগোলবিদ। ভূগোল আর জ্যোতির্বিদ্যায় তেরোশো বছর ধরে তাঁর একটানা আধিপত্য। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের আগে তাঁর বিশ্ব মানচিত্রের সংকলনটির শুধু লাতিন সংস্করণ হয়েছে কমপক্ষে একত্রিশটি। কালের তুলনায় বিশ্ব সম্পর্কে টলেমির ধারণা অনেক অগ্রসর ছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর দশম

মানচিত্রে দেখি ভারতীয় সমুদ্র-উপকূল যেন এক সরলরেখা। তার এক প্রান্তে সিন্ধু নদী, অন্য প্রান্তে গঙ্গা। আমাদের চেনাজানা মানচিত্রে যে ভারতীয় ব-দ্বীপ, তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পরবর্তীকালে ভারত সম্পর্কে নাবিক এবং পদাতিক-পর্যটকদের জ্ঞান যখন যথেষ্ট বেশি তখনও কিন্তু ইউরোপের মানচিত্র প্রায়শ মন-চিত্র। অনেকেই টলেমির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ফলে ষোড়শ শতকেও বিস্তর নতুন বিশ্ব মানচিত্রে দেখা যায় ভারতের সঙ্গে সহাবস্থান করছে দ্বিতীয় আর-এক ভারত। ১৫১৮ সালে একটি গ্লোবে এই কাণ্ড ঘটেছে। ১৫২৮ থেকে ১৫৩৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত আরও বেশ-কিছু ইউরোপীয় মানচিত্রে এভাবে যুগল ভারত ঠাঁই পেয়েছে। একটি নিজেদের কল্পনার ভারত অন্যটি টলেমির ভারত। ষোড়শ শতকের ইউরোপীয়দের মানচিত্রে আরও অনেক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটেছে। পর্তুগিজরা যখন মালাবার উপকূলে নোঙর করে তখন দক্ষিণ ভারতে খুবই শক্তিশালী রাজ্য ছিল বিজয়নগর। সেখানকার শাসক তখন নরসিংহ রাও। পর্তুগিজরা তার রাজধানীকে নরসিংহ বলে উল্লেখ করেছিলেন একবার। ফলে দু'শো বছর ধরে ইউরোপের মানচিত্রে নরসিংহ কোনও ব্যক্তি নয়, একটি স্থান-নাম। কখনও তার অবস্থান কুমারীন এলাকায়, কখনো বা ওড়িশায়। এরকম আরও নানা অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটিয়েছেন ইউরোপের ম্যাপ বা মানচিত্র-আঁকিয়েরা। ১৬১৯ সালে উইলিয়ম বাফিন লন্ডনে মুঘল সাম্রাজ্যের যে মানচিত্র প্রকাশ করেন তাতে ওড়িশা রয়েছে দু'বার। একবার ওড়িশা সত্য সত্যই যেখানে, সেখানে; আর-একবার বাংলা ও ব্রহ্মদেশের মাঝামাঝি। এ ছাড়া হিমালয়হীন ভারত যেমন বিস্তর ছিল তৎকালে তেমনি ছিল যত্রতত্র পাহাড় দিয়ে শূন্যস্থান পূরণের নমুনাও। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে সালংকৃত মানচিত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখান ডাচরা। ভারতের ঠিক সে-ধরনের কোনও মানচিত্র আঁকা হয়নি বটে, ১৫৯৭ সালে আঁকা একটি মানচিত্রে এশিয়াকে দেখানো হয়েছে পেগাসোস, অর্থাৎ গ্রিক পুরাণের সেই পক্ষধর অশ্বরূপে। ভারত ঘোড়ার কোমরে পেছনে পায়ে এবং লেজে। অর্থাৎ কোমর থেকে ঘোড়ার পুরো নিম্নাঙ্গ ভারতের। ভারত এবং ভারত, গঙ্গার এপারে ভারত, ওপারে ভারত, দূরের ভারত। এশিয়ার পুব দিকে আর কোনও দেশ নেই।

সাতসমুদ্র তেরো নদী তোলপাড় করে বেড়াবার পরও যদি ইউরোপীয় মানচিত্র আঁকিয়েদের হাতে ভারতের এই পরিণতি হয়, তবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারি চিত্রকর আবুল হাসানের আর দোষ কী!

কে জানে, এ-সব দেখেশুনেই অনেকেরই ধারণা, ভারতীয়রা অতীতে কোনও দিনই মানচিত্র সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা বাস্তব পৃথিবীর চেয়ে বেশি অনুসন্ধিৎসু ছিলেন আধ্যাত্মিক জগৎ সম্পর্কে। এই অনুমান সত্য বলে ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। ভারতে অতীতকালে গণিতচর্চার মান খুবই উন্নত ছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কেও প্রাচীন ভারতীয়দের জ্ঞান ছিল রীতিমতো অগ্রসর। পৃথিবী যে গোলাকৃতি তা নিয়ে প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যেও কোনও বিরোধ-বিতর্ক ছিল না। ষোড়শ শতকে আর্যভট্ট পৃথিবীর যে আকার ধার্য করেছিলেন নানা সময়ে তা নিয়ে তর্ক উঠলেও শেষ পর্যন্ত সবাই মেনে নেন পৃথিবীর আয়তন সম্পর্কে আর্যভট্টের সিদ্ধান্ত মোটামুটি সঠিক। বলা হয় অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা সম্পর্কেও প্রাচীনদের বোধ ছিল, তাঁরা গোলকের উত্তরও নির্দিষ্ট করতে পেরেছিলেন। জরিপ এবং আয়তন পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সন্ধানও নাকি

প্যাওয়া গেছে লোথাল-এ, উৎখননের সময়ে টুকিটাকি যন্ত্র পাওয়া গেছে যা নকশা রচনার পক্ষে সহায়। মার্শাল মহেঞ্জোদড়োতে এ-ধরনের জিনিসপত্র যা পেয়েছিলেন সেগুলোকে তিনি ব্যক্তিগত গহনা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সেখানে কিন্তু এক ধরনের পরিমাপদণ্ড বা স্কেলও পাওয়া গিয়েছিল। গায়ে তার দাগ কাটা। সংস্কৃত সাহিত্যেও এমন অনেক বাক্য এবং বিবরণ রয়েছে যাতে স্বদেশ এবং বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে ধারণার স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। রামায়ণে দেওয়ালচিত্র এবং স্থান-নামের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তা রচনা সম্ভব নয়। অষ্টম শতকে ভবভূতির উত্তর-রামচরিতের আলেখ্যদর্শন পর্বে যা বলা হয়েছে তা একই সঙ্গে চিত্র এবং এক অর্থে মানচিত্রও বটে। কালিদাসের মেঘদূত তো মনে হয় সামনে বিস্তীর্ণ এলাকার নদী পাহাড় উপত্যকা নগর-পল্লীর বাস্তব মানচিত্র রেখে লেখা। পনেরো শতকে গঙ্গাধরের লেখা 'গঙ্গাদাস প্রতাপ বিলাস' নাটকের উপজীব্য আমেদাবাদের দ্বিতীয় সুলতান মুহাম্মদের সঙ্গে গুজরাতের চম্পারণ দুর্গের অধীশ্বর রাজা গঙ্গাদাসের মধ্যে বিরোধ। সেখানে পুথির একটি পৃষ্ঠায় দুর্গের ভেতরের চেহারা আঁকা রয়েছে (এই বই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Oriental Institute-এ Vol XVIII, 1968, pp. 45-53, প্রকাশিত হয়েছিল)। অন্যভাবে ভাবলে সে-ছবিও তো এক ধরনের মানচিত্রই। গবেষকরা বলেন, লিঙ্গপুরাণে চৌকো সোনার প্লেটে বিশ্ব মানচিত্রের একটি বিবরণ আছে। এক 'কিউবিট' দীর্ঘ সেই মানচিত্রে সপ্তদ্বীপ, সমুদ্র এবং পর্বত খোদাই করা। কেন্দ্রে অবশ্য মেরুপর্বত।

এ-সব লিখিত এবং কিছু পরিমাণে অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াও দৃষ্টি এবং স্পর্শগ্রাহ্য কিছু কিছু এমন প্রমাণ এখনও রয়েছে যা থেকে অনায়াসেই বোঝা যায় ভারতের মানুষ প্রাচীন কাল থেকেই আপন পরিবেশ এবং চারপাশের ভৌগোলিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রীতিমতো ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং অনুমানকে প্রয়োজনমতো চিত্র অথবা নকশায় রূপ দিতেও জানতেন। মধ্যপ্রদেশের জায়োরা গুহাচিত্রে এমন একটি চিত্র রয়েছে যা মহাবিশ্ব-ধারণার চিত্ররূপ বলে গণ্য হতে পারে। এই চিত্রে জল, জলজ প্রাণী, গাছ, আকাশ, বায়ুমণ্ডল এবং বিশ্ব কিছুই বাদ নেই। সবই অবশ্য প্রতীকী। অন্ধ্রপ্রদেশের শালিহুনদাহ-এ একটি পাথরের গায়ে খোদাই করা রয়েছে কিছু জ্যামিতিক নকশা। সেইসঙ্গে স্বস্তিকা চিহ্ন। রামায়ণ অনুসারে স্বস্তিকা লঙ্কায় বাড়ির ভিতের নকশা। এমনকী মহেঞ্জোদড়োতেও এই নকশার সন্ধান পাওয়া সম্ভব। অন্ধ্রের এই প্রস্তরখণ্ডটি অনুমান করা হয় কোনও বৌদ্ধ মঠের ভিতের নকশা। একই ধরনের কিছু নকশা পাওয়া গেছে নাসিকে। ভোপালের থেকে আটাশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ভোজপুরের শিবমন্দিরের কাছাকাছি এমন অনেক পাথর পাওয়া গেছে, যার গায়ে আঁকা নকশাগুলো স্থপতির নকশার মতো। এই মন্দির একাদশ শতকে তৈরি করেন রাজা ভোজ। গোয়ালিয়রের পুরাতত্ত্ব বিভাগের জাদুঘরে একাদশ শতকের একটি পাথরের ওপর খোদাই করা দৃশ্যচিত্র রয়েছে যা মানচিত্রের ধারণা ছাড়া রচনা সম্ভব নয়। ভাস্কর্যের বিষয় বারাণসী শহর। মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা নদী। দুই ধারে দেবমন্দির এবং দেবলোক। এ-ধরনের পাথুরে মানচিত্র বা আরাধ্য তীর্থস্থান নাকি প্রয়াগ এবং গয়ারও ছিল। যাঁরা দূরবর্তী তীর্থ দর্শনে অসমর্থ ছিলেন, তাঁরা এই প্রস্তরীভূত তীর্থই দর্শন করে পুণ্যলাভ করতেন। বিজাপুরের শাসক ইব্রাহিম

আদিল শাহের সমাধির দরজায় এমন কিছু নকশা খোদাই করা আছে, বলা হয় তার মধ্যে রয়েছে শহরের জলধারার আঁকাবাঁকা পথ। সমাধিমন্দিরটি তৈরি হয় সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে।

হয়তো আধুনিক অর্থে এ-সব সঠিক মানচিত্র নয়। কিন্তু মানচিত্রের ধারণা যে ভারতীয়দের ছিল নিঃসন্দেহে তার নির্দেশক বলা হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে মানচিত্র বলে কোনও শব্দ নেই। চিত্র আছে, আলেখ্য আছে, কিন্তু মানচিত্র নেই। ম্যাপ-এর প্রতিশব্দ হিসাবে মানচিত্র শব্দটি নাকি পূর্ব ভারতের অবদান। আর, নকশা শব্দটি মূলত আরবি। তা ছাড়া অনেক দানপত্র বা তার খোদাই করা লিপি পাওয়া গেলেও নকশার চিত্রিত রূপ নেই। একাদশ শতকের একটি দানপত্রে জমির আয়তন ও অবস্থান বোঝাবার জন্য পঁচাত্তরটি চিহ্ন বা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবু অঙ্কিত কোনও নকশা দেওয়া হয়নি। পশ্চিমিরা তাই ধরে নিয়েছিলেন এদেশে মানচিত্র আঁকার কোনও রেওয়াজ ছিল না। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ফ্রান্সিস উইলফোর্ড নামে একজন গবেষক ভারতীয় মানচিত্রের সন্ধান করেছিলেন। কলকাতা এবং বারাণসীতে পুরাণের ভূগোল নিয়ে কিছু চর্চা করার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, হিন্দুদের মানচিত্র হয় পুরাণ অনুসারী। না-হয়, জ্যোতির্বিদদের গণনা অনুসরণে আঁকা। হিন্দু মানচিত্রের কেন্দ্রে মেরুপর্বত। তা থেকে বেরিয়ে আসে চারটি নদী। তার মধ্যে দুটি অবশ্যই গঙ্গা ও সিন্ধু। ব্রহ্মাণ্ডের মানচিত্রও বাস্তবের চেয়ে বেশি যেন আধ্যাত্মিক মানচিত্র। উইলফোর্ড যে-সব মানচিত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, সেগুলি সম্পর্কে আজ আর কিছু জানা যায় না, তার কিছু পরে মাদ্রাজে কলিন ম্যাকেঞ্জি নামে গবেষক আলোচনা করেন জৈনদের ভূগোলের ধারণা সম্পর্কে। হিন্দুর বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ড ও জৈনদের ব্রহ্মাণ্ডের ধারণার মধ্যে পার্থক্য ছিল হয়তো, তবে ভারতীয়দের সে-সব ধারণার সঙ্গে পশ্চিমি মানচিত্রের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া সত্যিই খুব শক্ত। উইলফোর্ড নাকি ওয়ারেন হেস্টিংসকে নেপালের এমন একটি মানচিত্র উপহার দিয়েছিলেন, যা ত্রিমাত্রিক। সেটিও মন-চিত্র হওয়াই সম্ভব। আধুনিক মানচিত্র বলতে প্রথম সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেনেলের মানচিত্র। ১৭৬৭ সালে মাসিক তিনশো টাকা বেতনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাঁকে সার্ভেয়ার জেনারেল অব বে অফ বেঙ্গল নিযুক্ত করে। বাস্তব জরিপের ভিত্তিতে আঁকা তাঁর বিখ্যাত বেঙ্গল অ্যাটলাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ সালে। তাতে মানচিত্র ছিল তেরোখানা। তার সঙ্গে আরও কিছু জুড়ে ১৭৮১ সালে প্রকাশিত হয় নতুন সংস্করণ। গোটা ভারতের মানচিত্র প্রকাশিত হয় আরও পরে, ১৭৮২ সালে। তার পর আরও সংস্করণ। তাঁর স্মৃতিকথা 'মেমোয়ার অব এ ম্যাপ অব হিন্দুস্থান অর দি মুঘলস এম্পায়ার' (*Memoir of a Map of Hindoostan or the Mogul's Empire*, London, 1785)। রেনেল চারটি ভারতীয় মানচিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম ম্যাপটি পঞ্জাবের। দু'শো পঞ্চাশ মাইল এলাকার মানচিত্র। স্থান-নাম ইত্যাদি আরবি হরফে ফারসিতে লেখা। রেনেল বলেছেন, এই মানচিত্র খুবই প্রয়োজনে লেগেছে। দ্বিতীয় মানচিত্রটি একজন গুজরাতের স্থানীয় লোকের আঁকা। রেনেল বলছেন, এই মানচিত্রে ইওরোপীয় ম্যাপের তুলনায় গুজরাতের আকার অনেক সঠিক। তৃতীয় মানচিত্রটি হিন্দুদের আঁকা বুন্দেলখণ্ডের মানচিত্র। চতুর্থ মানচিত্রটি কর্নাটকের কোনও স্থানীয় লোকের আঁকা মালাবারের মানচিত্র। এই মানচিত্রগুলো অনুমান করা হয়েছে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে আঁকা। তার আরও

কিছু আগে হলেও বিস্ময়ের কোনও কারণ নেই। গুজরাতের মানচিত্রটি 'ব্রাহ্মণ শিল্পী সুধানন্দের' আঁকা। সেটি এমনই নিখুঁত যে, রেনেল যাঁর কাছে নিজের ছাড়া আর সকলের মানচিত্র অসাড়, তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এ-মানচিত্রটি শুধু আকারে নয়, প্রকারেও অসাধারণ।

এখানেই কি নিঃশেষিত হয়ে গেল ভারতের নিজস্ব মানচিত্রের মহাফেজখানা? অবশ্যই নয়। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর একটি মানচিত্র-সংকলনে সুজান গোলে অন্তত তাই বলতে চেয়েছেন। তাঁর বইখানা সামনে রেখেই আমার এই শৌখিন মানচিত্রচর্চা। বইখানার নাম 'ইন্ডিয়ান ম্যাপস অ্যান্ড প্ল্যানস/ ফ্রম আর্লিয়েস্ট টাইমস টু দ্য অ্যাডভেন্ট অব ইওরোপিয়ান সার্ভেস'। (*Indian Maps and Plans from earliest times to the advent of European surveys* by Susan Gole, Manohar, New Delhi) বইয়ের প্রচ্ছদে পুরীর জগন্নাথমন্দির সহ অনবদ্য একটি রঙিন মানচিত্র। পেছনের মলাটে পানহালা দুর্গ অবরোধের অসাধারণ আর-একটি চিত্র। অথবা মানচিত্র। আর ভেতরে? আগেই বলেছি বড় মাপের দু'শোর-ও বেশি পৃষ্ঠা জুড়ে ছবির পর ছবি। সবই মানচিত্র। সবই ভারতীয়দের আঁকা। ভারতের প্রাচীন মানচিত্র এবং ভূগোল সম্পর্কে ভারতীয়দের ধারণা সম্পর্কে অষ্টাদশ শতক থেকে শুরু করে একেবারে হাল আমল পর্যন্ত অনেক দেশি-বিদেশি পণ্ডিতই আলোচনা করেছেন, কিন্তু সুজান গোলে যা করলেন এককথায় তা অনন্য। কেননা শুধুই গবেষণা আর আলোচনা নয়, চোখের সামনে তুলে ধরলেন এমন অনেক মানচিত্র আর নকশা যা ছিল সর্বসাধারণের চোখের আড়ালে পৃথিবীর নানা সংগ্রহশালা কিংবা ব্যক্তিগত সংগ্রহে। পশ্চিমি বিচারে না-ই বা হল যথাযথ মানচিত্র, কিন্তু অতিশয় খুঁত ধরা বুড়োকেও স্বীকার করতে হবে, প্রতিটি চিত্রই দর্শনীয়।

সুজান গোলের জন্ম ইংল্যান্ডে। বিবাহসূত্রে তিনি ভারতে। ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি লাতিন ও গ্রিক পড়েছেন। মানচিত্রে তাঁর অনুরাগের সূচনা নিতান্তই নিজের অজান্তে একদিন হঠাৎ। হঠাৎ এক বর্ষার দিনে সময় কাটাবার জন্য তিনি ঢুকেছিলেন লাইব্রেরির ম্যাপ-ঘরে। সেই যে ঢোকা, আর বের হতে পারলেন না। পুরনো দিনের মানচিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক দিনে দিনে নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েই চলেছে। বেশ কয়েক বছর আগে হাতে পড়েছিল তাঁর লেখা অসাধারণ একটি বই— 'ইন্ডিয়া উইদিন দ্য গ্যাঞ্জেস'। ১৪৭৭ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে ইওরোপিয়ানদের মুদ্রিত মানচিত্রে ভারত-চিত্র। ভারতের অনেক প্রাচীন মানচিত্রের প্রতিলিপি ছিল বইটিতে। সেইসঙ্গে বিদেশে প্রকাশিত ভারতের মানচিত্রের সম্পূর্ণ তালিকা। সুজান গোলে তাঁর সেই বইখানার সহযোগী হিসাবে তখন প্রকাশ করেন ১৫১১ থেকে ১৮৪৬ সালের মধ্যে ইউরোপের নানা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত একানব্বইটি মানচিত্রের হুবহু প্রতিলিপি, ইংরেজিতে যাকে বলে ফ্যাকসিমিলি। অধিকাংশই আদি আকারে। আলাদা আলাদা কাগজে সুন্দর ছাপা সেই পোর্টফোলিও যে-কোনও সংগ্রাহকের পক্ষে অপ্রতিরোধ্য। তার পর নতুন উপহার এই অচিন্তনীয় সংগ্রহ— ভারতীয়দের আঁকা ভারতেরই তীর্থ, নগর, বন্দর, দুর্গ, নদী, নালা, পর্বত, ভূপ্রকৃতি— রণক্ষেত্র। কতখানি আন্তরিক প্রেরণা এবং তাড়না থাকলে কোনও গবেষক এমন উদ্‌যোগ গ্রহণ করতে পারেন, এবং কী পরিমাণ শ্রম, যত্ন এবং অধ্যবসায় এই অসম্ভবপ্রায় প্রকল্পকে সম্ভব করতে প্রয়োজন, নিজেদের চোখে এই বই না দেখলে তা অনুমান করা শক্ত। না-ই বা হল অক্ষাংশ-দ্রাঘিমা

মেনে, স্কেল ধরে আঁকা জরিপ-ভিত্তিক মানচিত্র, এ চিত্রশালা অবাক চোখে দেখার মতো। ফ্রান্সিস বেকন বলতেন, কিছু বই আছে যা জিভে ঠেকালেই যথেষ্ট, কিছু গিলে খেতে হয়, আর সামান্য কিছু বই আছে যা চিবিয়ে খেয়ে হজম করা সংগত। হয়তো ঠিক কথা। কিন্তু এ-ধরনের বই দেখলে স্বয়ং বেকনও হয়তো মানতেন, হ্যাঁ, এমন বইও কিছু কিছু থাকে, থাকতে পারে— যা দেখবার মতো!

সুজান গোলে এই সংগ্রহের মানচিত্রগুলো ভাগ করছেন আট ভাগে। ১) ভাস্কর্য, পাথরে খোদাই নকশা ইত্যাদি। ২) ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আঁকা মানচিত্র। ৩) গোলক বা গ্লোব। অর্থাৎ বিশ্ব মানচিত্র। ৪) প্রাকৃতিক বিবরণমূলক বা টোপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র। ৫) সামরিক মানচিত্র। ৬) নাবিকের প্রয়োজনে আঁকা সমুদ্রপথের মানচিত্র। ৭) নগরচিত্র বা বিভিন্ন শহরের নকশা। ৮) শহর তৈরি বা নবীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নকশা।

এইসব ভারতীয় মানচিত্রের কিছু কিছু মুঘল যুগে আঁকা। তবে বেশির ভাগই ইওরোপিয়ানদের পদসঞ্চারের পরে অষ্টাদশ শতকে আঁকা। কিছু আবার ঊনবিংশ শতকে আঁকা। বলতে গেলে কোনও মানচিত্রেই স্কেল নেই। সব মানচিত্রে উত্তর দিক ওপরে নয়। কোনওটিতে উপরের দিকে পূর্ব, কোনওটিতে উপরে রয়েছে দক্ষিণ। আবার এমনও আছে যেখানে উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম ইত্যাদিরও নিশানা মেলে। মাপজোকেও বিভ্রান্তি ঘটা সম্ভব। 'ক্রোশ' সব এলাকায় সমান দূরত্ব বোঝায় না। জার্মানিতেও একসময়ে মাইল বলতে এক-এক এলাকায় এক-একরকম দূরত্ব বোঝাত। ফ্রান্সে একসময়ে লিগ-ও ছিল বিভিন্ন দূরত্বজ্ঞাপক। 'বিঘা'রও একই হাল। জয়পুর এলাকায় একসময়ে নাকি চল্লিশ মাপের বিঘা ছিল! তবে ভারতে পূর্ব-মাহাত্ম্যের পিছনে একটা সংগত কারণ ছিল বটে। হিন্দুদের কাছে পূর্ব সর্বাগ্রে, কারণ সূর্য ওঠে পুবের আকাশে। পূর্ব অতএব জীবনের প্রতীক। পশ্চিমে সূর্য অস্ত যায়, সুতরাং পশ্চিম রাত্রি তথা মৃত্যুর প্রতীক। সূর্যর দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডান হাত দক্ষিণে, বাঁ হাত উত্তরে। ফলে দুনিয়াময় মানচিত্রে পরবর্তীকালে উত্তর উপরের দিকে হলেও ভারতীয় মানচিত্রে অনেক দিন পর্যন্ত উপরের দিক ছিল পুব। তবে আধুনিক বিচারে এ-সব মানচিত্রে যত ঘাটতিই থাক, যাঁরা এগুলো এঁকেছেন কিংবা ব্যবহার করেছেন তাঁরা দিগ্‌ভ্রান্ত ছিলেন কিংবা দূরত্ব বা আয়তন সম্পর্কে তাঁদের কোনও ধারণা ছিল না এমন কথা বলা চলে না। তাঁদের বিশেষ চাহিদা কী তা তাঁরা নিশ্চয় জানতেন। তার চেয়েও বড় কথা, এ-সব মানচিত্র যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আঁকা তা স্পষ্ট। কোনও কোনও মানচিত্র মনে হয় বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে আঁকা।

সুজান গোলের শ্রেণী-বিভাগ মেনে নিয়ে সব মানচিত্রের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করার সুযোগ এখানে নেই। প্রয়োজনও নেই। আমরা প্রতি বিভাগের কিছু কিছু মানচিত্র নিয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই আশ্চর্য সুন্দর বইটি বন্ধ করে আগ্রহীদের জন্য আবার তাকে তুলে রাখব। প্রথম শ্রেণীর নকশা বা পাথরে কিংবা স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে ইঙ্গিতবহ রেখাচিত্রাদির কথা আগেই বলা হয়েছে। সেই বন্ধনীতে ফেলা যায় সপ্তদশ শতকের একটি সংস্কৃত পুথিকে। 'শ্রৌত সূত্র' নামক সেই পুথিতে যজ্ঞবেদী নির্মাণের জন্য কিছু রঙিন নকশা রয়েছে। সেগুলো শুধু জ্যামিতিক নয়; এক দিকে যেমন সুশৃঙ্খল, তেমনই বেশ জটিল নকশা। অনুমান করা হয়েছে পুথিটি সপ্তদশ শতকের নয়, আরও অনেক প্রাচীন। এ চিত্র যাঁরা রচনা করতে পেরেছেন তাঁদের পক্ষে কোনও দেশের বা অঞ্চলের সীমারেখা আঁকা অসম্ভব হবে

কেন? গবেষকদের অনুমান, ভারত থেকে এ-বিদ্যা লুপ্ত হয়ে যায় একসময়ে। আর চর্চা চালিয়ে যান এক দিকে আরবরা, অন্য দিকে চিনারা।

সুজান গোলে দ্বিতীয় বন্ধনীতে বিন্যাস করেছেন ধর্মীয় মানচিত্রগুলিকে। এই পর্যায়ে কিছু জৈন মানচিত্র দেখলে মনে হয় যেন রাজস্থানের মিনিয়েচার-ছবি। রাস্তার দু'পাশে ঘরবাড়ি দোকানপাট। পথে মানুষজন। অলিন্দে দাঁড়িয়ে সুবেশা নারীরা। মনে হয় তাঁরা যেন কাউকে অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। পথের শেষে একটি মন্দির। এগুলোকে বলা হত নাকি বিজ্ঞপ্তি-পত্র। মন্দিরের তরফে তা পাঠানো হত বিশেষ কোনও জৈন সন্ন্যাসীকে। তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হত বর্ষার দিনগুলো এই মন্দিরে কাটিয়ে যাওয়ার জন্য। আমন্ত্রণপত্রের ছবি আসলে পথনির্দেশিকা। এ-ধরনের পথচিত্রের চল ছিল বিশেষ করে গুজরাত এবং রাজস্থানে। চল ছিল এমনকী গত শতকেও। বিশেষ কোনও মন্দির এবং সেখানে পৌঁছবার পথ নির্দেশ করতে গিয়ে এ-ধরনের কোনও কোনও ছবিতে রচিত হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকার সুদৃশ্য মানচিত্র। শুধু জৈন নয়, হিন্দুদের তীর্থ-কেন্দ্রিক মানচিত্রও রয়েছে বইটিতে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান ব্রজ বা মথুরার একটি মানচিত্র স্পষ্টতই তীর্থযাত্রীর পরিক্রমার পথ নির্দেশ করে। যাত্রা শুরু হবে খাস মথুরায়। ছত্রিশটি উপবন পেছনে ফেলে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে যাত্রা শেষ হবে বৃন্দাবনে। এ-চিত্রে গিরিগোবর্ধন যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে ভরতপুরের বিখ্যাত ঝিল, যেখানে এখনও পাখির কলরব। ব্রজের আর-একটি চিত্র বারো-পাপড়ির এক পদ্মফুল। আর-একটি পদ্মে যমুনার প্রতিটি ঘাট চিহ্নিত। এই বিশেষ মানচিত্রটির স্থান-নাম আবার বাংলা অক্ষরে। ওড়িশার নিজস্ব চিত্রশৈলীতে আঁকা পুরীর ছবিটির কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কাপড়ের ওপর পটচিত্রের রীতিতে আঁকা বিশাল সেই মন্দিরচিত্র রয়েছে প্যারিসের 'বিবলিওথেক ন্যাশন্যালে'। পুরীতে মন্দির আছে নাকি একশো কুড়িটি। সম্ভবত সব কয়টিই ঠাঁই পেয়েছে এই ছবিতে। বারাণসীরও এ-ধরনের কিছু মানচিত্র রয়েছে যা তীর্থযাত্রীদের পক্ষে সহায়ক, এবং একই সঙ্গে অন্য দর্শকের পক্ষেও উপভোগ্য। গোলাকৃতি মানচিত্র। বিশ্বনাথের কাশীই যেন বিশ্ব। নদীর উপরের দিকে শহর। মন্দির। নদীতে মাছ, কচ্ছপ। শহরে দশটি প্রধান শিবমন্দির চিত্রিত। নদীর ওপারে বারাণসীর প্রতীকবিশেষ দুটি ধর্মের ষাঁড়। গোলকের চার পাশ ঘিরে বনের আভাস। দেখবার মতো আরও দুটি মানচিত্রের একটি মানস সরোবরের পথচিত্র। হরিদ্বার-হৃষীকেশ থেকে দীর্ঘপথ এক আশ্চর্য সুন্দর বৃক্ষপত্রের মতো। পাতার শিরা-উপশিরার মতো নদীনালা, অন্যান্য সরু পথ। এমনকী সেতুগুলো পর্যন্ত চিহ্নিত। মনে হয়, নির্ভুল পথনির্দেশিকা শুধু নয়, এই স্টাইলাইজড চিত্র-সৃষ্টিও ছিল শিল্পীর লক্ষ্য। দ্বিতীয় দর্শনীয় মানচিত্রটি দ্বারকার। শঙ্খের মতো আকৃতি। নাম তার শঙ্খোদ্ধার বেট। অষ্টাদশ শতকের এই মানচিত্র দ্বারকার। মানচিত্রে প্রধান অপ্রধান প্রায় সব মন্দিরই রয়েছে। রয়েছেন তীর্থযাত্রীরাও। গোমতী নদী, সমুদ্র কিছুই বাদ নেই। দ্বারকার আর-একটি মানচিত্রে সমুদ্রে গোমতীর মুখে জলের ঘূর্ণি পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে এমনকী জলের তলায় হারিয়ে যাওয়া দ্বারকা পর্যন্ত। তার ওপর নীল জলে ভাসছে বাণিজ্যতরী।

এবার গোলক। গ্লোব। অষ্টাদশ শতকে জয়পুরের সোয়াই জয়সিংহ তৈরি করিয়েছিলেন এই গোলাকার পৃথিবী। মানসিংহ বিশ্ব এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিশেষ সন্ধানী ছিলেন। তাঁর নেশা ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান। দেশের নানা স্থানে বেশ-কয়েকটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

যোধপুর। ভারতীয়দের আঁকা মানচিত্র। অ-মুদ্রিত। রাজস্থান। সপ্তদশ শতক।
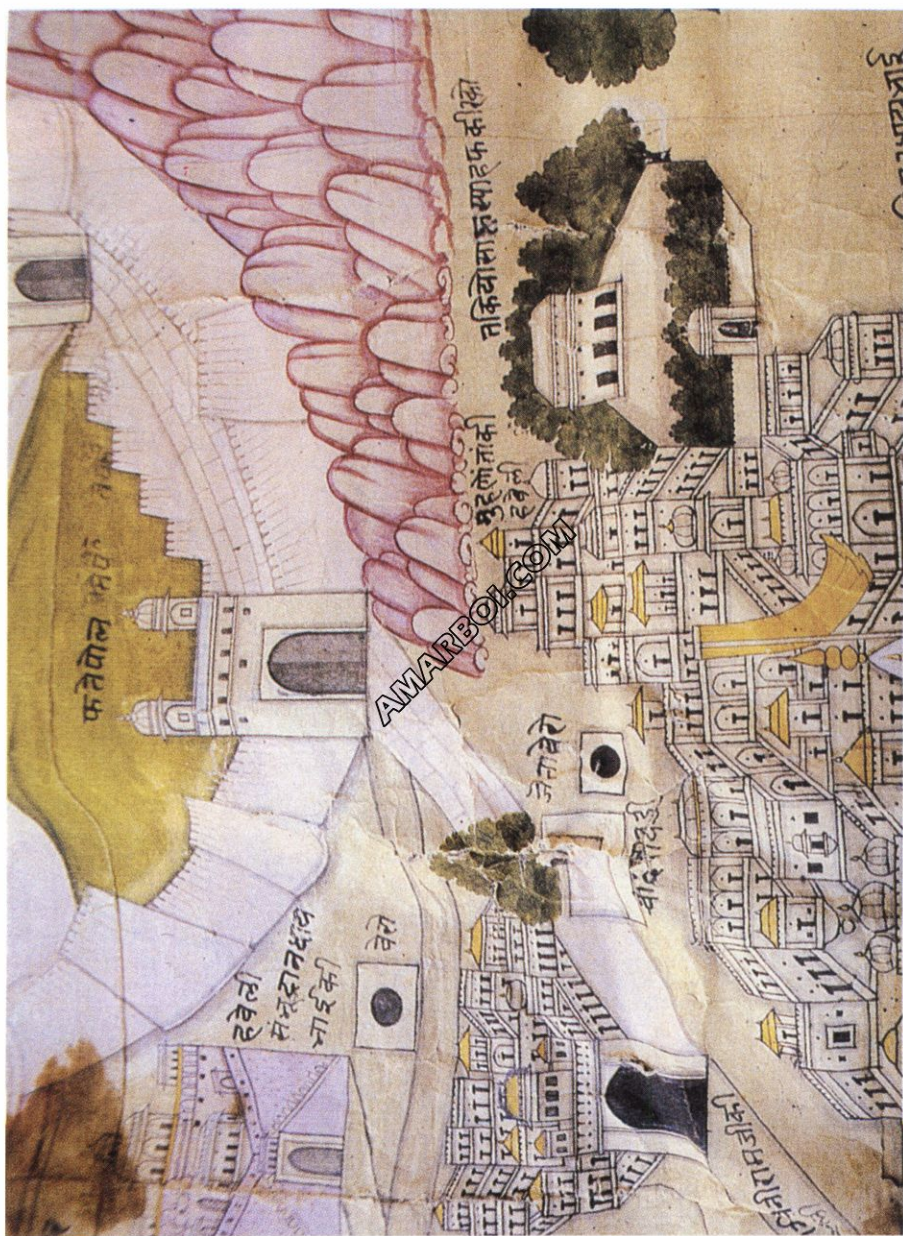
পেতলের তৈরি ভূগোলক। সপ্তদশ শতকে ভারতে ভূ-বিদ্যাবিশারদদের অবদান।

তিনি। কাগজের মণ্ডে তৈরি তাঁর এই ফাঁপা গোলকে স্কন্দপুরাণের বিশ্ব যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে সমকালের মাটির পৃথিবী। গোলকের মাথায় পুরাণবর্ণিত মেরুপর্বত। উপরের দিকে অর্ধেক জুড়ে মানুষের পৃথিবী। নীচের অর্ধেক পাঁচটি সমান বৃত্তে বিভক্ত। পাঁচ বৃত্ত পাঁচ মহাদেশ। তাদের মধ্যে দূরত্ব রচনা করছে পাঁচ জলধি। কিন্তু স্থলভাগের অধিকাংশই ভারতের দখলে। মানস সরোবরের জলে পুষ্ট গঙ্গা। যমুনা আর গঙ্গা কাশ্মীরকে পেছনে ফেলে পাশাপাশি চলেছে। দুটি জলধারার মিলনবিন্দুতে জগন্নাথমন্দির। তার উত্তরে কলকাতা, গঙ্গাসাগর এবং আসাম। এই পৃথিবীতে দিল্লি, আগ্রা, অম্বর আছে। আছে পুনে এবং সাতারাও। কিন্তু ভারতের বিশেষ আর কোনও স্থান-নাম নেই। বাইরের দুনিয়ার মধ্যে আছে কান্দাহার, খুরসান, মক্কা, মদিনা, তুরখান এবং রোমক নামে একটি স্থান। এই আশ্চর্য ভারতীয় গোলকটি এখন রয়েছে বারাণসীর ভারত কলা ভবনে। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট সংগ্রহশালায় রয়েছে আর-একটি ভারতীয় গ্লোব বা বিশ্ব-গোলক। নিরেট কাঠের বলের উপর অলংকৃত রঙিন বিশ্ব। তাতে ভৌগোলিক সংবাদ অবশ্য খুবই কম, তবু উপভোগ্য। এই গোলকে বিশ্ব যেন একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। উজ্জ্বল তার পাপড়ি। কেন্দ্রে মেরু-পর্বত। সমুদ্রে রকমারি ঘরবাড়ি, নৌকো এবং নানা জলের প্রাণী। জলের ঘরবাড়িগুলোকে, কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ মনে করেন, কল্পনার লঙ্কা। সুজান গোলের দৌলতে আরও একটি ভারতীয় গোলক আমাদের সামনে। এটি পিতলের। তৈরি হয়েছিল ১৫৭১ সালে। তৈরি করেছিলেন ক্ষেমকন্যা নামে একজন পণ্ডিত। সংস্কৃত লিপিতে জম্বু দ্বীপের নানা অঞ্চলের নাম খোদাই করা। অলংকৃত প্যানেলে কিছু নর্তকী, এবং উপবিষ্ট মানুষও রয়েছে। দৃশ্যত খুবই মনোরম পৃথিবী, সুখের পৃথিবীও বটে।

বাদবাকি যত গোলাকৃতি বিশ্ব, সবই কাগজের ওপর আঁকা। একটিতে লাতিন হরফে স্থান-নাম। আদিতে নাকি ছিল ফারসি। একজন সাহেব সেটি হাতে পেয়ে নামগুলো লাতিনে লিখে নকল করিয়েছিলেন। মূল মানচিত্র হারিয়ে গেছে। দ্বিতীয় মানচিত্র আর-একজন বিদেশি গবেষক পেয়েছিলেন একটি পারসিয়ান বইয়ে। তাঁর ধারণা ছিল এটিও আঁকা হয়েছিল ভারতে। কারণ, ভারতের কিছু কিছু স্থান-নাম থাকলেও মানচিত্রে পারস্য বা ইরান নেই। দরিয়ায় রয়েছে পর্তুগিজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজদের জাহাজ। আর-একটি মানচিত্র পাওয়া গেছে ইস্কান্দরনামা বা আলেকজান্ডারের অভিযান সম্পর্কিত একটি বইয়ের পাতায়। ইস্কান্দরনামা পহলভি ভাষায় রচিত। এই মানচিত্রটির সঙ্গে দ্বিতীয় শতকে আঁকা টলেমির মানচিত্রের কিছুটা মিল আছে। মানচিত্রে ব্যবহৃত ভাষা— আরবি, ফারসি এবং দেবনাগরী হরফে সংস্কৃত। এই মানচিত্রে উপরের দিক দক্ষিণ। অনুমান করা হয়েছে এটি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজস্থানে আঁকা। মানচিত্রের মাঝখানে ভারত মহাসাগর। সেখানে নোঙর করে রয়েছে পর্তুগিজ জাহাজ। আশ্চর্য, এই বিশ্ব মানচিত্রে আর কিছু থাক বা না থাক, রয়েছে কলকাতা। মানচিত্রটি অবশ্য কলকাতায় নেই, রয়েছে বার্লিনে! আর-একটি বিশ্ব মানচিত্র পাওয়া গেছে দিল্লির বাজারে বাজে কাগজের স্তূপে। অনুমান করা হচ্ছে, এটি বয়সে অর্বাচীন। তবে 'প্রাচীন' বা পুরনো মানচিত্রের অনুসারী। দেশ এবং স্থান-নাম আরবি হরফে। এই মানচিত্রেও উপরের দিক দক্ষিণ। এতে ইউরোপের দেশগুলো মোটামুটি ঠিক জায়গাতেই রয়েছে, তবে বেঠিক জিনিসও প্রচুর। তবে বাঙালি দর্শকের পক্ষে সান্ত্বনার কথা, এতে হুগলি আছে, কলকাতাও রয়েছে। ভারতে আঁকা আর-একটি বিশ্ব মানচিত্র

রয়েছে শাদিক ইস্পাহানির 'শাহির-ই-শাদিক'-এ। শাদিক ১৬৪৭ সালে জুনাপুরে বসে এই কিতাব রচনা করেন। তাতে দুনিয়ার একটি মানচিত্র ছাড়াও রয়েছে বিশ্বের নানা অঞ্চলের তেত্রিশটি মানচিত্র। শাদিকের মানচিত্রগুলোতেও দক্ষিণ মাথার দিকে। তবু এই পুথি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটিই নাকি ভারতে আঁকা প্রথম আটলাস। খেদের কথা এই, ভারতের এই অমূল্য সম্পদও ভারতে নেই। তার হাল সাকিন লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরি।

প্রসঙ্গত বিশ্ব মানচিত্রে কলকাতার উপস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। বুঝতে অসুবিধা নেই, এইসব গোলক বা গোলাকৃতি বিশ্ব যখন তৈরি হচ্ছে কিংবা আঁকা হচ্ছে, কলকাতার তখন বেশ নামডাক। কলকাতা কিন্তু জোব চার্নক পাকাপাকিভাবে নোঙর করার আগেও ঠাঁই করে নিয়েছিল কোনও কোনও বিদেশি মানচিত্রে। আমরা ১৬৬০ সালে আঁকা ওলন্দাজ বণিক ফানড্রেন ব্রকের মানচিত্রটির কথাই জানতাম। সুজান গোলে জানিয়েছেন ১৫৬৫ সালে আঁকা জ্যাকোবো গাস্তালদির মানচিত্রেও রয়েছে কলকাতা। এবং যথাস্থানে!

এবার সামরিক মানচিত্র। বিদেশিদের আঁকা বিস্তর সামরিক মানচিত্র দেখেছি আমরা। পলাশি, শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত। কিন্তু ভারতীয় নবাব-বাদশা এবং রাজারাজড়াও যে সামরিক-মানচিত্র আঁকাতেন, ব্যাপকভাবে তার ব্যবহারের চল ছিল এদেশে, সুজান গোলের এই সংগ্রহ দেখার আগে সে-সম্পর্কে বিশেষ ধারণা ছিল না। মারাঠা যুদ্ধ উপলক্ষে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত বেশ-কিছু মানচিত্র আঁকিয়েছেন মারাঠারা। অনেক মানচিত্র আঁকানো হয়েছে রাজস্থানেও। দুর্গের বাইরের-ভেতরের ছবি, রণক্ষেত্রে দুই পক্ষের সেনাপতি-শিবির এবং সৈন্যবাহিনীর অবস্থান, রণক্ষেত্র, সবই রয়েছে সে-সব মানচিত্রে। তা ছাড়া মুঘল আমলে ব্যবহৃত কিছু কিছু মানচিত্রও রয়েছে। আওরঙ্গজেব যে মানচিত্রের গুরুত্ব বুঝতেন, এবং তা হামেশা ব্যবহার করতেন, সম্রাটের চিঠিপত্রে তার অনেক উল্লেখ রয়েছে। আওরঙ্গজেব যখন আফগানিস্তানে, তখনকার একটি মানচিত্রে ফারসিতে লেখা অনেক খবরই রয়েছে। সিন্ধু নদীর ওপারে একটি বিন্দুতে যা লেখা হয়েছে তার মর্ম—এখানকার শাসক আমাদের শত্রু। সে খুবই দুষ্ট লোক। আর-একটি সমকালের সামরিক মানচিত্র আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের স্মারক। তাতে কোথায় সম্রাটের তাঁবু, কোথায় শাহজাদার তাঁবু, কোথায় তাঁবু ফেলেছেন সেনাপতিরা, কোথায়ই বা রোহিলাদের শিবির, সবই দেখানো হয়েছে। সামরিক মানচিত্র হলেও ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা মানচিত্র, সুতরাং প্রতিটি মানচিত্র যেন এক-একটি নয়নমোহন ছবি!

সুজান গোলে কিছু নাবিকদের চার্টও উদ্ধার করেছেন। সমুদ্র যখন নিষিদ্ধ কালাপানি হয়নি তখন ভারতীয় নাবিক মধুকর বোঝাই করে পুবে-পশ্চিমে দরিয়া তোলপাড় করেছেন। নাবিকের মানচিত্র ছাড়া নিশ্চয় তা সম্ভব হয়নি। ভাস্কো ডা গামা ভারতের পথে সমুদ্রপথের হদিশ পেয়েছিলেন আরব নাবিকদের চার্ট থেকে। এই বইতে একটি নকশায় দেখা যায় লোহিত সাগর আরব সাগরের পথের নিশানা। এই নকশায় গুজরাতি লিপিতে কচ্ছি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এটিও চিত্রিত, দরিয়ায় ভাসছে জাহাজ। বইটিতে বেশ-কিছু সুন্দর সুন্দর শহরের মানচিত্র রয়েছে। শহরের মধ্যে আছে শাজাহানবাদ, আগ্রা, নাসিক, অম্বর, আজমির, যোধপুর, শ্রীনগর, সুরাট ইত্যাদি। মহম্মদ আদিল শাহর আমলের বিজাপুরের একটি চমকপ্রদ মানচিত্রে দেখা যায় শহরের সব কয়টি দরওয়াজা, বিখ্যাত গোল গম্বুজ, সাধু-সন্তদের সমাধি। কোণে লেখা— এই শহর সাতবার তৈরি হয়েছে, সাতবার ধ্বংস

হয়েছে! এই মানচিত্রটিও আওরঙ্গজেবের আমলের। তাঁর কালেই ১৬৬৭ সালে সফি বিন ভালি-আল কাজরিনি সুরাট থেকে মক্কা যাত্রা করেন। এই জ্ঞানী ধর্মপ্রাণ মানুষটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাদশাজাদি জেবুন্নিসা। সুরাট থেকে মক্কা পর্যন্ত যাত্রাপথের সুন্দর বিবরণ রয়েছে তাঁর আঁকা মানচিত্রে। অন্যতম দর্শনীয়— খাস মক্কা।

সুজান গোলে বলছেন, ভারতীয়দের আঁকা সব চেয়ে বেশি মানচিত্র পাওয়া যায় কাশ্মীরের। 'তারিখ-ই-কালা-কাশ্মীর' নামে একটি পুথিতে রয়েছে তেত্রিশটি মানচিত্র। তীর্থস্থানগুলোরও আলাদা মানচিত্র আছে কিছু কিছু। কোনও কোনও মানচিত্রে একই স্থান-নাম দেওয়া হয়েছে নেপালি, ফারসি, সংস্কৃতে। কিছু কিছু মানচিত্রে বাংলা লিপিরও দেখা মেলে। কাশ্মীরের সঙ্গে সেই কলহনের সময় থেকে বাংলার ধারাবাহিক সম্পর্কেরই জের হয়তো! কাশ্মীরে গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের কথা ক্ষেমেন্দ্রও উল্লেখ করেছেন। এ-সব মানচিত্র অবশ্য পরবর্তীকালের। কাশ্মীর প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ সংবাদ— কাশ্মীরের শালেও নাকি সূচিশিল্পীরা মানচিত্র আঁকতেন একসময়ে। তার চেয়েও চমকপ্রদ সংবাদ— একটি শালে অন্তত বোনা হয়েছিল কাশ্মীরের মানচিত্র। রণজিৎ সিংহের জন্য বোনা হচ্ছিল সেটি। শেষ করতে সময় লেগেছিল সাঁইত্রিশ বছর। সুজান গোলে বলেননি শালটি এখন কোথায়। হদিশ পেলে বেনজির ভুট্টো সেটি অন্তত সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারতেন, তা-ই না!

অন্য চেহারার কাশ্মীরও ছিল। সম্পূর্ণ অন্য চরিত্রের কাশ্মীর। কোনও শালের ওপর সূচের মানচিত্র নয়, সরাসরি কাগজের ওপরে আঁকা। সুজান গোলের সৌজন্যে সে কাশ্মীরও আমাদের নাগালে। এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে। অষ্টাদশ শতকের এই মানচিত্র কলোনেল জ্যঁ বাপ্তিস জোসেফ জাঁতিল-এর (১৭২৯-৯৯) আঁকা।

এই মানচিত্রটির কথা প্রথমে আমার গোচরে আসে বেশ কয়েক বছর আগে, সত্তরের দশকের শেষ দিকে। বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসচর্চা করতে গিয়ে। চার্লস উইলকিন্সের জীবনী সম্পর্কে বিদেশি এক বন্ধু একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি অ্যান্ড রেকর্ডসের ১৯৭৮ সালের রিপোর্টে। তারই পাতায় চার্লস উইলকিন্সের সঙ্গে উপরি হিসাবে পাই মিলড্রেড আর্চারের চার পাতার একটি সচিত্র রচনা। শিরোনাম: কর্নেল জাঁতিলস্ অ্যাটলাস, অ্যান্ড আর্লি সিরিজ অব কোম্পানি ড্রয়িংস। দুটি মানচিত্র— ছোট ছোট প্রতিলিপিও ছিল রচনাটিতে। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি আদি চেহারায় সচিত্র সেই মানচিত্রগুলো কখনও দেখতে পাব। সুজান গোলের উদ্যোগের ফলে অবশেষে সে-সুযোগও আমরা পেলাম। কর্নেল জাঁতিল-এর মানচিত্রটি আদি চেহারায় হুবহু ছাপিয়ে তিনি তুলে দিয়েছেন একালের দর্শকদের হাতে। (*Maps of Mughal India, Drawn by Colonel Jea-Baptiste-Joseph Gentil, agent for the French Government to the court of Shuja-ud-daula at Faizabad, in 1770*, Susan Gole, Manohar, New Delhi.) সেইসঙ্গে কর্নেল জাঁতিল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং প্রতিটি মানচিত্র নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা। বই যে একই সঙ্গে পড়বার মতো এবং দেখবার মতো হতে পারে, এই মানচিত্র-সংগ্রহটি তার আর-একটি নমুনা।

জাঁতিল-এর জন্ম ফরাসি দেশে। বাগনোলস (Bagnols)-এ, ১৭২৬ সালে। তিনি এক

সম্ভ্রান্ত সামরিক পরিবারের সন্তান। তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট জাঁতিল ফরাসি পদাতিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে ভারতে আসেন ১৭৫২ সালে। এ দেশে তিনি দুপ্লে, লালি এবং ল'-র অধীনে বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ভারতে ফরাসি শক্তির ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার পর, বিশেষত ১৭৬১ সালে পণ্ডিচেরি পতনের পর জাঁতিল ফরাসি বাহিনী ত্যাগ করে স্বাধীন অভিযাত্রী হিসাবে ভাড়াটে সৈনিকে পরিণত হন। তিনি কিছুকাল বাংলার বিদ্রোহী নবাব মিরকাশিমের অধীনে কাজ করেন। তার পর আরও কিছু কিছু ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীর মতো ১৭৬৩ সালে চলে যান অযোধ্যায়। নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজধানী তখন ফৈজাবাদে। জাঁতিল তাঁর দরবারে এসে হাজির হন। নবাব খুশি হয়ে এই অভিজ্ঞ বিদেশি সৈনিককে গ্রহণ করেন। জাঁতিল ছ'শো ভবঘুরে বেকার ফরাসি সৈন্য নিয়ে নবাবের জন্য এক বাহিনী গড়ে তোলেন। তাঁর তৎপরতা এবং দক্ষতা দেখে নবাব যার-পর-নাই প্রীত। দেখতে দেখতে কর্নেল জাঁতিল নবাব সুজাউদ্দৌল্লার এক বিশ্বস্ত পরামর্শদাতায় পরিণত। দরবারে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে নবাব সুজাউদ্দৌল্লা ও তাঁর মিত্রবর্গ পরাজিত হলেন। অভিযাত্রী জাঁতিল-এর ভাগ্যেও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন সূচিত হল। নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধিচুক্তির সময়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করলেও ফরাসি জাঁতিলের ভাগ্য-সূর্যও যে অতঃপর অস্তগামী হবে সেটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। চুক্তির পর দীর্ঘ বারো বছর তিনি ফৈজাবাদে কাটালেও ১৭৮৫ সালে সুজাউদ্দৌল্লার মৃত্যুর পরে তাঁকে ফৈজাবাদ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। ইংরেজরা নবাবের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন যেন তাঁদের বিনা অনুমতিতে কোনও বিদেশিকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। সুজাউদ্দৌল্লা তা সত্ত্বেও বন্ধু জাঁতিলকে তাড়িয়ে দিতে সম্মত হননি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আসফদ্দৌল্লা বাধ্য হলেন এক মাসের মধ্যে কর্নেল জাঁতিলকে বরখাস্ত করতে। তাঁর প্রিয় শহর ফৈজাবাদ ছেড়ে জাঁতিল সপরিবারে প্রথমে আসেন চন্দননগরে, সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে ১৭৭৭ সালে ফিরে যান স্বদেশে। তার পর আবার ভাগ্যবিপর্যয়, ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্তন সৈনিক হিসাবে জাঁতিল যে পেনশন পেতেন তা বন্ধ হয়ে যায়। কোনওমতে দুঃখে-কষ্টে এককালে প্রাচ্যদেশীয় নবাবসুলভ বিলাসে অভ্যস্ত মানুষটির দিন কাটে। দারিদ্র্যের মধ্যেই ১৭৯৯ সালে ৭৩ বছর বয়সে অভিযাত্রী জ্যঁ বাপ্তিস্ত জোসেফ জাঁতিল মারা যান।

জাঁতিল যখন ফৈজাবাদে, ফৈজাবাদ তখন এক জমজমাট শহর। সমগ্র উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এই শহর। অশান্ত দিল্লি থেকে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক তখন আসর জমিয়েছেন ফৈজাবাদে। উর্দু কাব্যের সমৃদ্ধির যুগ সেটা। কবি মিরজা মহম্মদ রফি সৌদা, মিয়া হজরত, আসরফ আলি খান তাঁদের কাব্য রচনা করছেন সেই ফৈজাবাদে। দেশি-বিদেশি চিত্রশিল্পীরাও ব্যস্ত তখন সেখানে। অনেক প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছে সেই পর্বে। বিশেষ আঞ্চলিক ঘরানা গড়ে উঠেছে ভারতীয় শিল্পীদের কাজে। সমসাময়িক একজন লিখেছেন, এমন জাঁকজমকের শহর আর হয় না। প্রতিটি বাজারে প্রতিটি রাস্তায় দৌলত যেন উছলে পড়ছে। লাহোর, পেশোয়ার, কাবুল, কাশ্মীর, মুলতান, শাজাহানাবাদ, হায়দ্রাবাদ, গুজরাত, বাংলা, ঢাকা থেকে কারিগর আর বিদ্বানরা এসে ভিড় করেছেন এই ফৈজাবাদে। নবাবের আনুকূল্যে জাঁতিল অচিরেই সেখানে জাঁকিয়ে বসে গেলেন। তাঁর মনের মতো পরিবেশ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। অর্থোপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চা, শিল্পচর্চার

এমন সুযোগ বুঝি আর হয় না। সেকালে আরও কিছু কিছু বিদেশির মতো জাঁতিল ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির অনুরাগী। এ দেশকে জানার, এ দেশের মানুষকে বোঝার আন্তরিক আগ্রহ ছিল তাঁর। ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য যেমন তাঁকে আকর্ষণ করে তেমনই এদেশের শিল্প-সংস্কৃতি-কারুকর্মও তাঁকে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত করে তোলে। ফৈজাবাদ থেকে তিনি একবার কাশ্মীরের বারোটি ভেড়া পাঠিয়েছিলেন দেশে। বাসনা ছিল ফ্রান্সে যদি এই ভেড়া পোষা হয়, তবে হয়তো একদিন কাশ্মীরি উলের মতো উন্নতমানের উল পাওয়া যাবে ফ্রান্সে। একই বাসনায় আর-একবার পাঠিয়েছিলেন গুজরাতের ষাঁড় ও গোরু। আর-একবার বিখ্যাত কস্তুরি মৃগ। ভেড়াগুলো জীবিত অবস্থায় ভার্সাই পৌঁছতে পারেনি। হরিণটি অবশ্য ঠাঁই পেয়েছিল চিড়িয়াখানায়। তা ছাড়া ফৈজাবাদে বসেই তিনি ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিলেন ভারতের অস্ত্রশস্ত্র, মুদ্রা, অলংকার এবং নানা কারুশিল্পের নমুনা। সেইসঙ্গে বেশ-কিছু ভারতীয় পুথি এবং মিনিয়েচার ছবি। সমসাময়িকেরা বলেন, বিদেশি হলেও আরও কোনও কোনও বিদেশির মতো জাঁতিল পোশাকে-আশাকে চালে-চলনে অনেকটা ভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ফারসি জানতেন। মনে হয় আরও কোনও কোনও ভারতীয় ভাষায় তাঁর অধিকার জন্মেছিল। এই ফৈজাবাদেই ১৭৭২ সালে তিনি বিয়ে করেন। স্ত্রী থেরেসে ভেলহো (Therese Velho)। তিনি ছিলেন সেবাস্তিয়ান ভেলহো (Sebastion Velho) এবং লুসিয়া মেন্ডেস-এর (Lucia Mendece) কন্যা। লুসিয়া এককালে মুঘল দরবারে প্রভাবশালী সেই পর্তুগিজ সুন্দরী জুলিয়ানার নিকটআত্মীয়া। জাঁতিল মুঘলদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তৎকালের বিখ্যাত ক'জন ভারতীয় মহিলা সম্পর্কে লিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজিয়া, নুরজাহান, জাহানারা, বেগম সমরু এবং এই জুলিয়ানা। দেশে ফিরে যাওয়ার পর তিন মাসের মধ্যে স্ত্রী থেরেসে মারা যান। ওঁদের সঙ্গে তাঁর মা-ও ফ্রান্সে পৌঁছেছিলেন। তিনি অবশ্য বেঁচে ছিলেন ১৮০৬ সাল পর্যন্ত।

জাঁতিল অষ্টাদশ শতকের ভারতের এক অসাধারণ অভিযাত্রী। এ দেশের অনেক দরবারি খেতাব লাভ করেছিলেন তিনি— রফিউদ্দৌল্লা, নাজির জং, তাজভিন-উল মূলক। তৎকালে দরবারি খেতাব হয়তো কিছুটা সস্তা ছিল কিন্তু এত সস্তা নয় যে, যে-কোনও বিদেশি ইচ্ছা করলেই রাশি রাশি কুড়িয়ে নিতে পারেন। প্রকৃত অনুরাগ এবং আগ্রহ না থাকলে তাঁর মতো ভারতীয় কারুকর্মের বিপুল সংগ্রহ গড়ে তোলা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। সম্ভব নয় বেশ-কিছু ফারসি পুথি নকল করানো বা অনুবাদ করা। জাঁতিলের লেখা বেশ-কিছু ভারত-বিষয়ক পুথি রয়েছে। আর, তাঁর পুথি-সংগ্রহ তো বলতে গেলে তুলনাহীন। জাঁতিলের আগে ফ্রান্সের রাজকীয় গ্রন্থশালায় ভারতীয় পাণ্ডুলিপি বা পুথি ছিল একশো চব্বিশটি। জাঁতিল একসঙ্গে দান করেন একশো তেত্রিশটি পুথি! সে-সব পুথির মধ্যে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, তামিল, বাংলা—অনেক ভাষার পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তাঁর মিনিয়েচার সংগ্রহ নাকি রীতিমতো দর্শনীয়। ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে একজন ইংরেজ রাজপুরুষ এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন এই সংগ্রহটির বিনিময়ে। গর্বিত জাঁতিলের কাছ থেকে এই প্রস্তাবের বিনিময়ে তিনি পেয়েছিলেন বিদ্রূপ। জাঁতিল তাঁর অধিকাংশ ভারতীয় স্মারকই তুলে দিয়েছিলেন ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের হাতে। এমনকী টিলি কিটলের আঁকা নবাব সুজাউদ্দৌল্লার তৈলচিত্রটি পর্যন্ত। ফৈজাবাদে টিলি কিটল নবাবের এই প্রতিকৃতিটি আঁকেন ১৭৭২ সালে। জাঁতিল একজন ভারতীয় শিল্পীকে

দিয়ে এই প্রতিকৃতির একটি অণুচিত্র আঁকিয়ে নেন। সুজাউদ্দৌল্লা তখন অসুস্থ। নিপুণ শিল্পীর কাজ। জাঁতিল ছবিটি কিনে নবাবকে দেখাতে নিয়ে যান। ছবিটি নবাবেরও চোখে লেগে যায়। তিনি সেটি রেখে দেন। নাছোড়বান্দা জাঁতিল তার বদলি হিসাবে চেয়ে নেন টিলি কিটলের আঁকা তৈলচিত্রটি। সুজাউদ্দৌল্লা মিনিয়েচারটি উপহার দেন ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে। জাঁতিল তাঁর ছবিটি নিবেদন করেন ফরাসি সম্রাটকে। সেটি এখন রয়েছে ভার্সাই প্রাসাদে। টিলি কিটলের আঁকা তাঁর দশ পুত্র সহ আর-একটি প্রতিকৃতিও ভারতীয় শিল্পীকে দিয়ে নকল করিয়েছিলেন জাঁতিল। শিল্পীর নাম নেভাসিলাল। সেটিও উপহার হিসাবে পান ফরাসি সম্রাট। এই প্রতিকৃতিটিও এখন ফ্রান্সের একটি সংগ্রহশালায়।

ফৈজাবাদে থাকাকালীন ভারতীয় শিল্পীদের সঙ্গে দিব্যি যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল কলোনেল জ্যঁ বাপ্তিস্ত জোসেফ জাঁতিল-এর। ১৭১০ থেকে ১৭৭৪ সালের মধ্যে ভারতীয় শিল্পীদের দিয়ে জলরঙে প্রচুর ছবি আঁকিয়েছেন জাঁতিল। ইচ্ছা ছিল নিজের লেখা বইগুলো প্রকাশের সময় অলংকরণ হিসাবে সেগুলো ব্যবহার করবেন। অধিকাংশ ছবিই ভারতের দেব-দেবীর, রাজা-প্রজা, পোশাক-আশাক, উৎসব-অনুষ্ঠান, মুদ্রা, নানা পেশাদার কারিগর, শিল্প ও শিল্পীদের জীবনাচারের ছবি। সমকালের ভারতীয় প্রকৃতি ও মানুষজনকে রঙে-রেখায় তাঁর পাঠকদের সামনে পেশ করবেন এই ছিল জাঁতিলের মনোবাসনা। তাঁর লেখা পাণ্ডুলিপির মধ্যে ছিল ভারতের প্রাচীন শাসকবর্গের ইতিহাস, মুঘল সম্রাটদের ইতিহাস, ভারতের দেব-দেবী, ভারতের মুদ্রা, নিজের একটি স্মৃতিকথা ছাড়াও নিজের আঁকা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি মানচিত্র সংগ্রহ। সুজান গোলের উদ্যম এবং আগ্রহবশত সেই সংগ্রহটি অল্পায়াসে আপাতত আমার সামনে ছড়ানো। তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পরে ১৮২২ সালে জাঁতিলের পুত্র পিতার স্মৃতিকথাটি প্রকাশ করেছিলেন। আর প্রায় সোয়া দু'শো বছর পরে সুজান গোলে প্রকাশ করলেন তাঁর আঁকা মানচিত্রগুলো। পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ভারতীয় হলে হয়তো বলা যেত জন্ম-জন্মান্তরের পর এই ইংরেজ দুহিতা হয়তো জাঁতিলের কোনও আপনজন। সে-ধরনের আত্মীয়তা খোঁজার নামে কোনও স্বপ্নবিলাসিতার প্রয়োজন নেই। প্রকৃত সন্ধানীর কর্তব্যই পালন করেছেন সুজান গোলে। এই মানচিত্র-সংগ্রহ শুধুই জাঁতিল নামে কোনও ফরাসি অভিযাত্রীর চরিত্রকে তুলে ধরে না, আমাদের দেশের চিত্রচর্চার ইতিহাসের পক্ষেও এই সংগ্রহ এক মূল্যবান স্মারক।

বইটিতে মোট পাতা ছিল তেতাল্লিশটি। তার মধ্যে একুশটি জুড়ে মুঘল সাম্রাজ্যের একুশটি সুবার মানচিত্র। এই মানচিত্র আঁকা হয়েছে আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি অনুসারে। বাকি পৃষ্ঠাগুলোতে ছিল সরকার ও পরগনার তালিকা। মানচিত্রের সীমারেখা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংশ এঁকেছেন জাঁতিল নিজে। স্থান-নাম, নদী-পাহাড়ের নাম সবই তাঁর নিজের হাতে লেখা ফরাসি ভাষায়। আর, জাঁতিল যখন আইন-ই-আকবরি এভাবে কাজে লাগান তখনও আবুল ফজলের বইটির কোনও ইংরেজি বা ফরাসি অনুবাদ হয়নি। তাঁর এই মানচিত্র আঁকার আগে ১৭৫২ সালে দঁভিল নামে এক ফরাসি (J.B.B. d' Anville) ভারতের চারটি বড় বড় মানচিত্র প্রকাশ করেছিলেন। অনুমান করা হয় মুঘল সাম্রাজ্যের সুবাগুলির সীমারেখা আঁকতে জাঁতিল সেই মানচিত্রগুলো ব্যবহার করেছেন। তবে তাঁর মানচিত্রগুলি পূর্বসূরির মানচিত্রের চেয়ে নানা লক্ষণে উন্নত। তিনি অবশ্য কোনও স্কেল ব্যবহার করেননি। জাঁতিলের মানচিত্র জরিপভিত্তিক নয়। তবে আগের মানচিত্রটির চেয়ে তাতে স্থান-নাম

অনেক বেশি। অষ্টাদশ শতকের অনেক মানচিত্রেই ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা শূন্যস্থান বলে মনে হয়। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। জাঁতিলের মানচিত্র কিন্তু অসংখ্য স্থান-নামে বোঝাই। কারণ, আইন-ই-আকবরিতে উল্লিখিত সব স্থান-নাম তিনি মানচিত্রে যথাযথ স্থানে স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কোনও কোনও মানচিত্রে আইন-ই-আকবরির চেয়ে বেশি স্থান-নাম রয়েছে। আইন-ই-আকবরি অনুসারে মানচিত্রকে সম্প্রতিকালে বিশ্লিষ্ট করেছেন ইরফান হাবিব তাঁর এক অসাধারণ গবেষণায়। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'অ্যান অ্যাটলাস অব দি মুঘল এম্পায়ার'। মুঘল সাম্রাজ্যে ভূগোল শুধু নয়, যাবতীয় তথ্যের খনি সেই বই। তিনি অন্যান্য সূত্র থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি জানেন উনিশ শতকে ইলিয়ট এবং জন বিমস আইন-ই-আকবরি অবলম্বনে উত্তর ভারতের মানচিত্র তৈরির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্রিটেনের সংগ্রহশালাগুলোতে এই গবেষণার কিছু অংশ করা হলেও অধ্যাপক হাবিব জাঁতিলের এই আইন-ই-আকবরির চর্চার সন্ধান পাননি। মিলড্রেড আর্চারের রচনাটি কিন্তু ১৯৭৮ সালে ছাপা হয়ে গেছে। জাঁতিলের মানচিত্রের পাণ্ডুলিপি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির হাতে পৌঁছে গেছে তার কিছু আগে। রেনেল-এর স্মৃতিকথা 'মেমোয়ার অব এ ম্যাপ অব হিন্দুস্থান'-এ (১৭৮৩)। জাঁতিলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র একবার। পন্ডিচেরির অক্ষাংশ উপলক্ষে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এই সেদিন অবধি জাঁতিলের এইসব মানচিত্র ছিল লোকচক্ষুর আড়ালে। ফরাসি সম্রাটের ব্যক্তিগত পুথি-সংগ্রহে কিংবা তাঁর নিজের বাড়িতে। অথচ সন্দেহ নেই, তৎকালের মান অনুসারে এই একুশটি মানচিত্র এক দিক থেকে অতুলনীয়।

মানচিত্রের আকার ৫৫ সি এম × ৪৬ সি এম। প্রতিটি মানচিত্রে রয়েছে ভারতীয় শিল্পীদের তুলিতে জলরঙে আঁকা বেশ-কিছু ছোট ছোট ছবি। তুলির চিকন রেখায় লাল ফিকে হলুদ সবুজ ধূসর প্রভৃতি রঙে ধরা হয়েছে ভারতের মানুষজন। পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, ঠাকুর-দেবতা। এক কথায়, বিশাল বিচিত্র বর্ণাঢ্য ভারত বিদেশি দর্শকদের জন্য পেশ করতে উদ্যত হয়েছিলেন অভিযাত্রী জাঁতিল। ছবিগুলো সম্পর্কে মূল্যবান একটি তথ্য উন্মোচন করেছেন মিলড্রেড আর্চার। তিনি বলছেন, পরবর্তী কালে ইওরোপীয়দের রুচি এবং চাহিদামাফিক ভারতের শিল্পীরা যে বিশেষ চিত্রশৈলী গড়ে তোলেন, যাকে বলা হয় 'কোম্পানি ড্রইং', তার সূত্রপাত মনে হয় ফৈজাবাদে। তার দশ বছর পরে এই ঘরানার চর্চা দেখা যায় লখনউ শহরে। সুজাউদ্দৌল্লা ১৭৬৫-৬৭ সাল নাগাদ লর্ড ক্লাইভকে ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা ১১৫টি ছবির একটি অ্যালবাম উপহার দিয়েছিলেন। সে-সব মিনিয়েচারে পশ্চিমের কোনও প্রভাব নেই। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে একটি ভারতীয় ছবির অ্যালবাম আছে— ১৭৮০-৮২ সালে রিচার্ড জনসন নামে রেসিডেন্সির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে আঁকিয়েছিলেন। মিলড্রেড আর্চার বলছেন, সেই অ্যালবামের ছবির সঙ্গে এক যুগ আগে ফৈজাবাদে আঁকা জাঁতিলের মানচিত্রের এই ছবিগুলোর মিল রয়েছে। লখনউর অ্যালবামটির একজন শিল্পী ছিলেন শীতল দাশ। মানচিত্রের অলংকরণ হিসাবে ব্যবহৃত ছবিগুলোর মধ্যে একটি ছবির সঙ্গে সেই বিষয়েরই তাঁর আঁকা আর-একটি ছবির নাকি আশ্চর্য মিল। মিসেস আর্চার মানচিত্রের কোনও কোনও ছবিতে সমকালের লখনউ শিল্পী গোবিন্দ সিং এবং গুলাম রেজার কাজের মিল খুঁজে পেয়েছেন। প্রসঙ্গত, আরও দু'জন ভারতীয় শিল্পীর নাম উঠেছে। তাঁদের একজন

নেভাসিলাল, অন্যজন মোহন সিং। জাঁতিল ইঙ্গিত করেছেন তিনি তাঁর ছবিগুলো আঁকার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন তিনজন ভারতীয় শিল্পীকে। কোনটি কার আঁকা, কে জানে!

প্রসঙ্গত দু'-একটি মানচিত্রের ছবির বিষয়গুলো উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে অলংকরণের উদ্দেশ্য কী ছিল। শাজাহানাবাদ (দিল্লি) সুবার মানচিত্রের অলংকরণের মধ্যে রয়েছে মুঘল সম্রাটদের রাজকীয় প্রতীক, সিংহাসন, হাতির হাওদা, নিশান, গহনা ইত্যাদি। আজমিরের মানচিত্রে অলংকরণ করেছেন উট, তরমুজ, বক ইত্যাদি। মালবে বর্মে সজ্জিত হাতি, ঘোড়া, সৈন্যবাহিনী। বাংলা সুবার মানচিত্রে দেখি নারী ও পুরুষ দুই বৈষ্ণব ভক্ত, বরাহ অবতার, জগন্নাথমন্দির, কোনও পীরের সমাধি ইত্যাদি। তা ছাড়া বাঘ, হাতি, গণ্ডার, মোষ, গোরু, ছাগল ইত্যাদি। অন্যত্র নাচ, গান, ধর্মীয় উৎসব, সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির, জীবজন্তু এবং মানুষের লড়াই। হিন্দু দেবদেবীর মন্দির, মুসলমানদের ধর্মস্থান, কিছুই বাদ নেই। বলতে গেলে মিনিয়েচারে রঙিন ভারত।

শেষ করার আগে একবার উঁকি দেওয়া যাক কাশ্মীরের মানচিত্রে। মানচিত্রের উপরের দিকে পশ্চিম। তাতে কিছু আসে যায় না। অপূর্ব জাঁতিলের এই কাশ্মীর। পাহাড়, নদী, হ্রদ। সমতল থেকে উপত্যকায় পৌঁছবার পায়ে হাঁটা দীর্ঘ পথ কিছুই বাদ নেই। পাহাড়গুলো অনেকটা রিলিফ ম্যাপের পাহাড়ের মতো। আর ছবি? রণজিৎ সিংয়ের জন্য সাঁইত্রিশ বৎসর ধরে বোনা শালের সেই মানচিত্রটিতে কী ছিল জানি না। আমি কিন্তু এই মানচিত্রখানা দেখেই খুশি। ছবিতে আছে কাশ্মীরের বিখ্যাত রোমশ ছাগল, হরিণ, বাঘ, সিংহ, সাদা এবং কালো ভালুক এবং ভুবনবিখ্যাত সেই কস্তুরীমৃগ। মানচিত্রে দু'জন অভিযাত্রীকে দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা দু'দিক থেকে হাঁটা পথের কাশ্মীর-যাত্রী। আর ছবি বলতে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মহিষমর্দিনী। তিনি সিংহের পিঠে নয়, মহিষের পিঠে বসেই তাকে বধ করতে উদ্যত। আর আছে প্রবাদের দুই কাশ্মীর সুন্দরী। তাঁরা বাইজি। তাঁরা দু'জন নাচছেন। সঙ্গে সংগত করছেন সুন্দর পোশাক-পরা তিন বাদ্যকর। ফৈজাবাদেও কিন্তু বসত এই আসর। কখনও কখনও সায়েবকুঠিতেও।

সুজান গোলে, 'ইন্ডিয়ান ম্যাপস অ্যান্ড প্ল্যানস ফ্রম আর্লিয়েস্ট টাইমস টু দ্য অ্যাডভেন্ট অব ইউরোপিয়ান সার্ভেস', মনোহর, ১৯৮৯

সুজান গোলে, 'ম্যাপস্ অব মুঘল ইন্ডিয়া, ড্রন বাই কর্নেল জ্যাঁ-বাপ্তিস-জোসেফ জাঁতিল, এজেন্ট ফর দ্য ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্ট টু দ্য কোর্ট অব সুজাউদ্দৌল্লা অ্যাট ফৈজাবাদ ইন ১৭৭০', মনোহর, নিউ দিল্লি, ১৯৮৮।
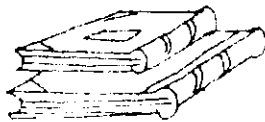
দরিয়ায় দ্রাঘিমার সন্ধানে

দ্রাঘিমা এখন আর নাবিকের কাছে কোনও সমস্যা নয়। তার সামনে রয়েছে বিস্তৃত বিজ্ঞানসম্মত চার্ট। আকাশ এবং সমুদ্রের। পকেটে রয়েছে 'ক্রনোমিটার'। তাতে ০° দ্রাঘিমার সময় ধরা। অন্য ঘড়িতে স্থানীয় সময়। তা ছাড়া রয়েছে একাধিক উপগ্রহ। মহাকাশ থেকে মুহুর্মুহু জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা, জাহাজের অবস্থান। বেতারে পাওয়া যায় সঠিক দিঙ্‌নির্দেশ। কিন্তু একদিন এই কাল্পনিক রেখা দ্রাঘিমাকে খুঁজে পেতে বিশ্বময় সে কী কাণ্ড! জলস্থল মন্থন করে খোঁজা হয়েছে দ্রাঘিমা।

মানচিত্রে দুই ধরনের কাল্পনিক লাইন টেনেছিল মানুষ একদিন পৃথিবীকে পরিমাপ করতে। খ্রিস্টজন্মের তিনশো বছর আগে থেকে চলেছে এই লাইন টানাটানি। খ্রিস্টীয় ১৫০ অব্দে জ্যোতির্বিদ এবং মানচিত্র-আঁকিয়ে টলেমি ২৭টি মানচিত্র নিয়ে প্রকাশ করেন তাঁর বিশ্বমানচিত্র। ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে পাওয়া দেশ-পরিচয় ছাড়াও সেইসব মানচিত্রে ছিল অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমারেখা। ক্লাসঘরের বিশ্বগোলকের দিকে তাকালে দুই ধরনের রেখা চোখে পড়ে। পৃথিবীর মাঝ বরাবর গোলাকার বিষুবরেখা। বিষুবরেখার দু' পাশে, এর সমান্তরাল আরও অনেক কাল্পনিক রেখা পৃথিবী বেষ্টন করে রয়েছে; বিষুবরেখা থেকে যত দূরে গেছে তত ছোট হয়েছে সেই সব বৃত্তের পরিধি, শেষে দু' পাশের দুই মেরুতে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। এগুলো হল অক্ষরেখা। মাঝখানে আরও দুটি উজ্জ্বল রেখা— কর্কটক্রান্তি এবং মকরক্রান্তি। টলেমি বিষুবরেখাকে সমান্তরাল রেখার মধ্যে মধ্যবর্তী রেখা বলে গণ্য করেছিলেন। বিষুবরেখা এবং কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখার ধারণা পেয়েছিলেন তিনি এবং তৎকালীন মানচিত্র-আঁকিয়েরা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষ জেনেছিল চন্দ্র-সূর্য গ্রহনক্ষত্র বলতে গেলে এক রেখায়। কর্কটক্রান্তি এবং মকরক্রান্তিও চিহ্নিত হয়েছিল সূর্যের সাহায্যে। কিন্তু যে রেখাগুলো চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে তার কোনও সঠিক ঠিকানা জানা ছিল না কারও। টলেমিরও না। তিনি তাঁর ০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা বসিয়েছিলেন ফরচুনেট আয়ল্যান্ড বা ক্যানারি এবং মেদিয়ার ওপর দিয়ে। পূর্ববর্তী মানচিত্র-আঁকিয়েরা ০° দ্রাঘিমা বা পুব-পশ্চিম দ্রাঘিমা টানা হবে যে বিন্দু

থেকে সেগুলি সরিয়ে নিয়ে গেছেন, যাঁর যেখানে খুশি সেখানে। বলতে গেলে যে-যাঁর নিজের দেশে। ফলে পুরনো পৃথিবীর মানচিত্রে ০° দ্রাঘিমা যেমন টানা হয়েছে আজোরেস এবং কেপ ভার্দেতে তেমনই, রোম, কোপেনহেগেন, জেরুজালেম, সেন্ট পিটার্সবুর্গ, ফিলাডেলফিয়া, প্যারিস— কোথায় না! শেষ পর্যন্ত এই রেখার স্থিতি, আজ সবাই জানেন লন্ডনের কাছে গ্রিনিচ-এ। সেটা বলতে গেলে একালের ঘটনা।

লন্ডনের কেন্দ্র থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে গ্রিনিচ। সেখানে রয়েছে পুরনো রাজকীয় মানমন্দির। দ্রাঘিমা ধরে পুব আর পশ্চিমে এগোলে শেষ পর্যন্ত মিলতে হয় এই গ্রিনিচ-এ। এখানকার সময়ই পৃথিবীর সময়। স্থানীয় সময় বা দেশীয় সময়ের কথা অবশ্য আলাদা। গ্রিনিচের এই মর্যাদা অবশ্য রাতারাতি অর্জিত হয়নি। এই গৌরবের কৃতিত্ব বলতে গেলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের। ব্রিটানিয়া সেদিন তরঙ্গকে শাসন করছিল বলে গ্রিনিচ মানমন্দিরের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ১৮৮৪ সালে ওয়াশিংটনে ২৬টি দেশের যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসে ০° দ্রাঘিমা নির্ণয়ের জন্য, সেখানে স্থির হয়, পৃথিবীর দ্রাঘিমার হিসাব শুরু করতে হবে গ্রিনিচ থেকে। ফরাসিরা অবশ্য তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্ত মেনে নেননি। তাঁদের ০° দ্রাঘিমা ছিল পরবর্তী ২৭ বছর ধরে, প্যারিস অবজার্ভেটরি বরাবর। শেষ পর্যন্ত গ্রিনিচের নিঃশর্ত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মেলে ১৯১১ সালে। তার আগে অবশ্য দ্রাঘিমার সন্ধানে নানা কাণ্ড ঘটে গেছে পৃথিবীতে।

অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমার মধ্যে প্রধান পার্থক্য প্রথমটি বলতে গেলে প্রাকৃতিক আইন অনুসারে, স্থির করা। অন্যটি ছিল দীর্ঘকাল সতত পরিবর্তনশীল। ফলে যুগের পর যুগ মানুষ সমুদ্রে হাতড়ে ফিরেছে এই কাল্পনিক রেখা। অক্ষাংশ নিয়ে সমস্যা নেই। বিষুবরেখার ওপরে নীচে সমান্তরাল রেখা চলে গেছে মেরুর দিকে। বিষুবরেখা থেকে ১৫° মানে হাজার মাইল। উত্তরে এবং দক্ষিণে দূরত্ব ক্রমে কমে যায়। অন্য দিকে দ্রাঘিমা নিয়ে অন্য সমস্যা। পৃথিবী একবার নিজের অক্ষে ঘুরতে সময় নেয় ২৪ ঘণ্টা। দ্রাঘিমার রেখা পুব-পশ্চিম মিলিয়ে ৩৬০টি। এক ঘণ্টা মানে অতএব আহ্নিকগতির ২৪ ভাগের এক ভাগ বা এক ঘণ্টা। ডিগ্রির মাপে ১৫ ডিগ্রি। কিন্তু ১ ডিগ্রি দ্রাঘিমা সময়ের মাপে ৪ মিনিট। কিন্তু দূরত্বের মাপে তা নয়। বিষুবরেখার কাছে এক ডিগ্রি যদি ৬৮ মাইল, তবে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তিতে কম। মেরুতে বস্তুত কোনও দূরত্বই নেই। সুতরাং নাবিক যদি হিসাবে দু'-এক ডিগ্রিও গোলমাল করে ফেলেন তা হলে তিনি সমস্যায় পড়তে বাধ্য। স্বভাবতই চারশো বছর ধরে দরিয়ায় সঠিক দ্রাঘিমা খুঁজেছে মানুষ। দরিয়ায় নাবিকেরা, ডাঙায় বিজ্ঞানীরা। রাজারাজড়া পর্যন্ত উদ্‌যোগী হয়েছেন সেই কাজে। ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ, ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই রীতিমতো তৎপর দ্রাঘিমার সন্ধানে। বাউন্টি জাহাজের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম ব্লিগ, ক্যাপ্টেন জেমস কুক প্রমুখ অভিযাত্রীরাও দ্রাঘিমা খুঁজছেন। তৎকালের সেরা মগজ গ্যালিলেও, ক্যাসিনি, আইজ্যাক নিউটন, এডমন্ড হ্যালি, অনেকেই মাথা খাটিয়েছেন এ-কাজে। ইংল্যান্ড, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, ইতালির নানা নগররাষ্ট্র কেউ বাদ নেই দ্রাঘিমা নিয়ে গবেষণায়। সবাই কাল্পনিক রেখা, দ্রাঘিমাকে দরিয়ায় ধরতে চান। দ্রাঘিমা নির্ণয়ের কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য পুরস্কারও ঘোষিত হয়েছে। ১৭১৪ সালে ব্রিটেনের বিখ্যাত 'লংগিচ্যুড অ্যাক্ট' (Longitude Act)। ওঁরাও চান কার্যকর এমন কোনও উপায় যা দরিয়ার নাবিককে দ্রাঘিমা নির্ণয়ে নির্ভুলভাবে সাহায্য করবে। 'দ্রাঘিমা আবিষ্কার' করতে গিয়ে

অনেক বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে পৃথিবীতে। পৃথিবীর সঠিক ওজন, গ্রহনক্ষত্রের দূরত্ব, আলোর গতি আরও কিছু কিছু জ্ঞাতব্য ধরা পড়েছে। কিন্তু মরীচিকার মতো নাবিকের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে দ্রাঘিমা। অথচ দ্রাঘিমা জানা না থাকলে নতুন নতুন দেশ জয়, বাণিজ্য, জলযুদ্ধ কিছুই সম্ভব নয়। পৃথিবীর ধনসম্পদ তখন ভাসমান সাতসমুদ্রে। কিন্তু কোন জাহাজ বন্দরে নিশ্চিত পৌঁছবে, কোন জাহাজ দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে কোন ফাঁদে পা দেবে, কিংবা চিরকালের মতো জাহাজের শব হয়ে অকূল দরিয়ায় ভেসে বেড়াবে কেউ তা জানে না। ভাস্কো ডা গামা বা সার ফ্রান্সিস ড্রেক সে যুগের চার্ট কম্পাস ইত্যাদির সাহায্যে কোনওমতে ডাঙা খুঁজে পেয়েছিলেন। বলা হয়, সেটা নিতান্তই তাঁদের সৌভাগ্য, কিংবা ঈশ্বরের অভিপ্রায়। তা না হলে অন্য রকম ঘটতে পারত। ঘটেছেও নানা ভয়াবহ ঘটনা।

১৭০৭ সালের অক্টোবরের কথা। অ্যাডমিরাল সার ক্লাউডিসলি সোভেল জিব্রাল্টার থেকে যুদ্ধ জয় করে দেশে ফিরছেন। লড়াই ছিল তাঁর ভূমধ্যসাগরে ফরাসি নৌবাহিনীর সঙ্গে। ইংল্যান্ডের দিকে চলেছেন তাঁরা। কিন্তু চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। পথ-চলা দায়। অন্য নাবিকদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন তিনি। জানতে চাইলেন ব্রিটিশ নৌবহর কোথায় রয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। ওঁরা অনেক মাথা খাটিয়ে কম্পাস, চার্টের সাহায্যে বললেন জাহাজ ব্রিটানি সাগরদ্বীপের কাছে একটি দ্বীপের মুখোমুখি রয়েছে। নাবিকেরা উত্তর দিকে এগোতে গিয়ে সভয়ে আবিষ্কার করলেন দ্রাঘিমার হিসাব ভুল করেছেন তাঁরা। নিজেদের অজান্তে সেসিলি দ্বীপপুঞ্জের দিকে এগিয়ে পৌঁছেছেন তাঁরা। সেই সেসিলি পরিণত হয় বিজয়-বাহিনীর কবরখানায়। প্রথমে প্রধান জাহাজটি, তার পর আরও দুটি জাহাজ পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তলিয়ে যায়। নৌবহরের পাঁচটি জাহাজের মধ্যে চারটিই ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ হয়ে যায় একইভাবে। বিজয়ী বাহিনী তলিয়ে যায় জলের তলায়। জীবিত অবস্থায় ডাঙায় পৌঁছেছিলেন মাত্র দুইজন। মৃতের সংখ্যা দুই হাজার। সার ক্লাউডিসলি সোভেলও দু'জন জীবিতের একজন। কাছাকাছি গ্রামের একটি মেয়ে সমুদ্রকূলে তাঁর অচৈতন্য দেহ খুঁজে পায়। হাতে দামি আংটি দেখে সে অ্যাডমিরালকে খুন করে আংটিটা খুলে নেয়। অনেক বছর পরে বিবেকের তাড়নায় মেয়েটি স্থানীয় যাজকের কাছে স্বীকার করে তার অপরাধ।

এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটত। দ্রাঘিমা হারিয়ে জাহাজ এগিয়ে যেত মৃত্যুর দিকে। কখনও পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা, কখনও সীমাহীন সমুদ্রে পথ হারিয়ে ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ, কখনও-বা স্কার্ভিতে আক্রান্ত হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মরা। এ-ধরনের শত শত ঘটনা ঘটেছে মহাসমুদ্রে। ধ্বংস আর মৃত্যু চলেছে শতকের পর শতক জুড়ে।

পনেরো, ষোলো, এমনকী সতেরো শতকেও সমুদ্রযাত্রা ছিল বলতে গেলে পুরোপুরি ভাগ্য-নির্ভর। নাবিকেরা বলতেন 'ডেড-রেকনিং'। যে বন্দর ছেড়ে আসা হল তা থেকে পুবে অথবা পশ্চিমে দূরত্ব মাপা হত একটুকরো কাঠ জলে ভাসিয়ে। কাঠের গতি আর জাহাজের বালিঘড়ি মিলিয়ে মাপা হত গতিবেগ। দিঙ্‌নির্ণয়ের জন্য অবশ্য কম্পাস দ্বাদশ শতক থেকেই। আকাশ অবশ্য চিরকালই ছিল। কিন্তু তখনও পুরোপুরি পাঠোদ্ধার হয়নি তার। এই কাঠ ভাসানো পদ্ধতি গ্রহণ করতে গিয়ে অনেক সময় ক্যাপ্টেন সভয়ে আবিষ্কার করতেন, দিক ভুল হয়ে গেছে, সামনে কোনও দেশ নেই, এমনকী মহাদেশও উধাও।

আর-এক পদ্ধতি ছিল যাকে বলা যায়— পাগলা কুকুর। ১৬৮৭ সালে সার কেনেলম ডিগবি নামে এক ইংরেজ আশ্চর্য এক পাউডার আবিষ্কার করেন দক্ষিণ ফ্রান্সে। মন্ত্রপূত

পাউডার। কারও ক্ষত দূরে বসেও এই পাউডারের সাহায্যে নিরাময় করা যায়। প্রয়োজন শুধু অসুস্থ মানুষ বা প্রাণীর ব্যবহৃত কোনও বস্তু। ধরা যাক ক্ষতস্থানের একটি ব্যান্ডেজ। দূরে বসে সেই অলৌকিক পাউডার ব্যান্ডেজে লাগালে ক্ষত নিরাময় হয়ে যাবে। তবে তার জন্য রোগীকে বেশ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। সুতরাং ডিগবি বললেন, যদি কোনও কুকুরকে আহত করে জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে ঠিক দুপুরে লন্ডনে ওই কুকুরের ব্যান্ডেজে ওষুধ লাগালে ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করবে সে। কাপ্তেন তখন জানবে লন্ডনে তখন ঠিক দুপুর। সেইমতো স্থানীয় সময়ের সঙ্গে লন্ডনের সময়ের পার্থক্য হিসেব করে দ্রাঘিমা নির্ণয় করতে পারবেন। এমনই আরও অনেক উদ্ভট চিন্তার কথা শোনা গেছে দ্রাঘিমা নির্ণয় উপলক্ষে। কিন্তু দ্রাঘিমা তবু শতকের পর শতক ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছিল নাবিকদের।

১৭৪০ সালের সেপ্টেম্বর। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের লক্ষ্যে 'সেঞ্চুরিয়ান' জাহাজ নিয়ে ব্রিটেন থেকে যাত্রা করেছেন কমোডোর জর্জ অ্যানসন। পরের বছর মার্চে দেখা গেল তাঁর জাহাজে স্কার্ভি দেখা গেছে। 'সেঞ্চুরিয়ান' স্ট্রেটস লে মারি প্রণালী দিয়ে অতলান্তিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ে। কেপ হর্ন চক্কর দেওয়ার সময় পশ্চিম থেকে ঝড় ওঠে। এই ঝড়ে পাল ছিঁড়ে যায়। কিছু নাবিকও মারা যায়। ৫৮ দিন ধরে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে 'সেঞ্চুরিয়ান'। বৃষ্টি, বরফঝড়। তার ওপর স্কার্ভি। দৈনিক গড়ে নয় থেকে দশ জন নাবিক ঝড়ে প্রাণ দিচ্ছেন। অ্যানসন তবু পশ্চিম দিকে এগোবার চেষ্টা করেন। দেখা গেল দ্রাঘিমার হিসাব গোলমাল হয়ে গেছে। তিনি ৬০° দক্ষিণ অক্ষাংশ আঁকড়ে থাকেন। এক সময় হিসাব করে দেখেন পশ্চিম দিকে তিনি দু'শো মাইল চলে গেছেন। দলের আর পাঁচটা জাহাজ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তার মধ্যে কয়টি হারিয়ে যায় চিরকালের মতো। দুই মাস পরে প্রথম আকাশে চাঁদের আলো দেখতে পান তিনি। সমুদ্র শান্ত। উত্তরে জাহাজ চালিয়ে তিনি জুয়ান ফার্নান্দেজ নামে একটি দ্বীপের দিকে চললেন। ভাবলেন সেখান থেকে জীবিত নাবিকদের জন্য জল নেওয়া যাবে, মৃতপ্রায় নাবিকদের বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা যাবে। বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে কয় দিন ভাসার পর অ্যানসন ডাঙা দেখতে পেলেন। দেখা গেল জুয়ান ফার্নান্দেজ নয়, এটি হচ্ছে কেপ নয়ার। এ কেমন করে সম্ভব! আসলে অ্যানসন যখন ভাবছেন তিনি পশ্চিম দিকে যাচ্ছেন, তখন তিনি প্রবল স্রোতে ভাসছেন মাত্র। সুতরাং আবার তিনি পশ্চিমের দিকে যাত্রা করলেন।

তার পর উত্তরে। শেষ পর্যন্ত অনেক কাণ্ড করে 'সেঞ্চুরিয়ান' পৌঁছেছিল ১৭৪১ সালের মে মাসে জুয়ান ফার্নান্দেজ দ্বীপে। অ্যানসন প্রথমে বুঝে পান না দ্বীপটি পুবে না পশ্চিমে। তিনি অনুমান করলেন পশ্চিমে। কিন্তু তাঁর আত্মবিশ্বাস কমে গেছে। আবার তিনি জাহাজ ঘোরালেন। ৪৮ ঘণ্টা পুবদিকে চলার পর আবার ডাঙা দেখা গেল। সে-ডাঙা স্প্যানিশ-অধিকৃত চিলির উপকূলের পাহাড়ের প্রাচীর। তার অর্থ এবার ১৮০° ঘুরতে হবে জাহাজকে। 'সেঞ্চুরিয়ান' আবার পথ হারায়। অনেক হাতড়ে জুয়ান ফার্নান্দেজ দ্বীপে শেষ পর্যন্ত জাহাজটি নোঙর করেন জুন মাসে। তার আগে এই দ্বীপটি খুঁজতে গিয়ে দুই সপ্তাহে আরও ৮০টি বাড়তি নাবিককে হারাতে হয়েছে অ্যানসনকে। ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা করার সময় তাঁর সঙ্গে নাবিক ছিলেন ৫০০ জন। অ্যানসন যখন নিরাপদ বন্দরে পৌঁছেছেন তখন বেঁচে আছেন মাত্র ২৫০ জন নাবিক। সঠিক দ্রাঘিমা খুঁজে পেলে এই বিপর্যয় এড়াতে পারতেন কাপ্তেন। বাধ্য হয়েই তাঁকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করতে হয় সমান্তরাল রেখা অক্ষাংশ।

সমান্তরাল রেখা অক্ষাংশ ধরে চলার অন্য বিপদও ছিল। যেহেতু দ্রাঘিমা নির্ণয় সব দেশের সব নাবিকের কাছেই সমস্যা, সুতরাং অনেক জাহাজই সমুদ্রে চলাফেরা করত প্রকৃতি-নির্দেশিত পথ অক্ষাংশ ধরে। মহাসমুদ্রে সে-পথ যেন এক বড় সড়ক। সে-পথে ভিড় লেগেই থাকত। অনেক সময় জলদস্যুরাও ওত পেতে থাকত সে-সব পথের ধারে। ১৫৯২ সালে আজোরেস-এর কাছে ছয়টি ব্রিটিশ রণতরী দস্যুভাবেই ফাঁদ পেতে বসে ছিল ক্যারিবিয়ান থেকে ঘরমুখো স্প্যানিশ জাহাজ দখল করে নেবে বলে। ফাঁদে পড়ল ভারত থেকে স্বদেশে ফেরার পথে ধনদৌলত বোঝাই একটি পর্তুগিজ জাহাজ। যদিও জাহাজটিতে বত্রিশটি কামান ছিল তবু ইংরেজের নৌবহরের কাছে হার মানতে হয় তাকে। সিন্দুক ভর্তি সোনা রুপো হিরে মুক্তো ছাড়াও জাহাজে ছিল টন টন ভারতীয় মশলা। টাকার অঙ্কে তৎকালে প্রায় পাঁচ লক্ষ পাউন্ডের সম্পত্তি। বলতে গেলে ইংরেজের কোষাগারের অর্ধেক ধন। এ বিপত্তি কিন্তু বাঁধা জলপথে চলতে গিয়েই। দ্রাঘিমা জানা থাকলে পর্তুগিজরা অনায়াসে শত্রুকে ফাঁকি দিয়ে অন্য পথে দেশে পৌঁছতে পারত।

এ-ঘটনা ষোড়শ শতকের। সপ্তদশ শতকের শেষে দেখা যায় জামাইকায় বাণিজ্যের দৌলতে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে যাতায়াত করছে ৩০০ বাণিজ্যতরী। পথে একটি জাহাজ হারিয়ে যাওয়া মানে বিপুল লোকসান। তা ছাড়া দিগ্‌ভ্রান্ত হওয়ার অর্থ চরম বিপর্যয়। বিপর্যয় জলদস্যুদের হাতে পড়লেও। ব্যবসায়ীরা স্বভাবতই উদ্‌বিগ্ন। তাঁরা জাহাজের নিরাপত্তা চান। চান জলপথে অলিগলির সন্ধান। সে নিরাপত্তা এবং নতুন নতুন পথে অভিযাত্রার নিশ্চিত নির্দেশ মিলতে পারে নির্ভুলভাবে দ্রাঘিমা নির্দেশ করতে পারলে তবেই। ১৭০৭ সালে ব্রিটিশ নৌবহরের সেই ভরাডুবির পর দ্রাঘিমা নির্ণয়ের দাবি আরও উচ্চগ্রামে পৌঁছয়। ব্রিটেনে দ্রাঘিমা নির্ণয় পরিণত হয় জাতীয় সমস্যায়। সংবাদপত্রে, কাব্যে, কথা-কাহিনীতে সর্বত্র কথায়-কথায় দ্রাঘিমা প্রসঙ্গ। দ্রাঘিমা অনুষঙ্গ যেমন রয়েছে সুইফট-এর রচনায়, তেমনই আরও কারও কারও রচনায়। এমনকী উমবার্তো ইকোর সম্প্রতি প্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাসের পাতায়ও ('দ্য আয়ল্যান্ড অব দ্য ডে বিফোর') দেখি দ্রাঘিমা। একজন সমালোচক তো সরাসরি বইটিকে আখ্যা দিয়েছেন—'লংগিচ্যুড নভেল' বলে। যা হোক, ব্যবসায়ী, নৌ-সৈনিক, রাজনৈতিক দল এবং আমজনতার দাবি মেনে ১৭১৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয় দ্রাঘিমা বিষয়ক আইন, বিখ্যাত 'লংগিচ্যুড অ্যাক্ট অব ১৭১৪'। তার কথা পরে। আপাতত দ্রাঘিমার সন্ধানে শতকের পর শতক মানুষ কীভাবে হাতড়ে ফিরেছে অন্ধকারে তার কাহিনী।

প্রাচীন পৃথিবীর মানুষ আকাশ থেকে অক্ষাংশ নির্ণয়ের সংকেত পেয়েছিলেন, দ্রাঘিমার সন্ধানে। তাঁরা তাকিয়ে ছিলেন আকাশের মুখের দিকেই। সেখানে নিয়ম মেনে চলেছে প্রকৃতির আপন ঘড়ি। সূর্য দিবারাত্রের হিসাব দেয়। চাঁদ দেয় মাসের হিসাব। রাত্রির আকাশে ধ্রুবতারা জানিয়ে দেয় দিকের নির্দেশ। দ্বাদশ শতকে কম্পাস আবিষ্কারের পর দিক নির্ণয়ে নাবিকেরা যান্ত্রিক সাহায্য পেয়ে যান। কিন্তু মহাসমুদ্রে দ্রাঘিমা তবু অধরাই থেকে যায়। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তবে সূর্যঘড়ির সাহায্যে নাবিক ঘণ্টার পরিমাপ করতে পারেন বটে, কিন্তু শুধু স্থানীয় সময় থেকে দ্রাঘিমা নির্ণয় সম্ভব নয়। প্রয়োজন অন্য কোনও জ্ঞাত বন্দর বা শহরের সঙ্গে স্থানীয় সময়ের তুলনা। সেটা একমাত্র বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক ঘটনা উপলক্ষেই সম্ভব। যথা: চন্দ্রগ্রহণ। ধরা যাক, মাদ্রিদের আকাশে মধ্যরাত্রে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ

হচ্ছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের পথে জাহাজের কাপ্তেন সে-গ্রহণ প্রত্যক্ষ করলেন রাত এগারোটায়। বোঝা গেল মাদ্রিদের সঙ্গে তাঁর জাহাজের সময়ের দূরত্ব এক ঘণ্টা। এগিয়ে এক ঘণ্টা। সুতরাং, স্থানটি মাদ্রিদ থেকে ১৫ ডিগ্রি পশ্চিমে। নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত। কিন্তু গ্রহণ তো নিত্য ঘটে না! নাবিকের জানা চাই নক্ষত্রলোকের এমন ঘটনা যা নিত্য ঘটে। তা খুঁজতে গিয়ে যুগের পর যুগ মানুষ তাকিয়ে থেকেছে আকাশের দিকে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নাবিক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী অন্ধ হয়ে গেছেন এমন ঘটনাও রয়েছে ইতিহাসে। রাত্রির আকাশও নিশ্চয় আশা-নিরাশার দোলায় দুলিয়েছে অসংখ্য পর্যবেক্ষককে। ১৫১৪ সালে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহানেস ওয়ারনার জানান চাঁদ স্থির তারকাখচিত পথেই নিয়মিত চলে। প্রতি ঘণ্টায় চাঁদ অতিক্রম করে তার প্রস্থের (width) সমপরিমাণ পথ। আরও কিছু কিছু তথ্য পেশ করেন তিনি। বলেন, আকাশের মানচিত্র তৈরি করা দরকার। তাতে জানা যাবে চাঁদ কোন তারার কাছে কখন পৌঁছবে। সূর্যের সঙ্গে তার অবস্থানও ধরা যাবে। বার্লিন বা নুরেমবার্গের দ্রাঘিমাকে ০° ধরে সেখানকার সময় দিয়ে তখন ওইসব মানচিত্রের সাহায্যে দ্রাঘিমা স্থির করা যাবে। কিন্তু তারকার অবস্থান তখনও সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। চাঁদের গতিবিধিও তখন পর্যন্ত অস্পষ্ট। চাঁদের সঙ্গে তারকার দূরত্ব পরিমাপের জন্য তখনও নাবিকের হাতে কোনও যন্ত্র নেই। এই জার্মান জ্যোতির্বিদ অতএব সঠিক পথে পা বাড়ালেও তাঁর ধারণা ছিল সমকাল থেকে অনেক এগিয়ে।

তার একশো বছর পরে গালিলেও গালিলি তাঁর পদুয়ার বাড়ির অলিন্দে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবিন লাগিয়ে আকাশে প্রত্যক্ষ করেন স্বর্গীয় ঘড়ির সঞ্চারণ। তিনি খুঁজে পেলেন চাঁদে পাহাড়, সূর্যে ছায়া, শুক্রের নানা অবস্থা, বৃহস্পতির উপগ্রহ, শনির চারপাশে বৃত্ত ইত্যাদি। গালিলেও নাবিক ছিলেন না। কিন্তু দ্রাঘিমা নির্ণয়ের সমস্যা তাঁর অজানা ছিল না। বলতে গেলে ইউরোপের সব দেশের দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক অবহিত ছিলেন দ্রাঘিমা-সংকট বিষয়ে। গালিলেও জানালেন, বৃহস্পতির উপগ্রহ তথা চাঁদসমূহে বছরে হাজার বার গ্রহণ হয়। তার সাহায্যে ঘড়ির সময় স্থির করা সম্ভব। তিনি কয়েক মাসের জন্য চার্টও তৈরি করেন। তাঁর আশা ছিল এ-পথেই নাবিকের পক্ষে সঠিক দ্রাঘিমা নির্ণয় সম্ভব হবে। তিনি ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় ফিলিপকে তাঁর আবিষ্কারের কথা জানান। ফিলিপ ঘোষণা করেছিলেন যিনি দ্রাঘিমা নির্ণয়ের সঠিক পন্থা উদ্ভাবন করতে পারবেন তাঁর আজীবন ভরণপোষণের দায়িত্ব ফরাসি-রাজের। গালিলেও নাবিকদের আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ এক শিরস্ত্রাণও তৈরি করেছিলেন। তাতে দূরবিন বসানো ছিল। ওলন্দাজরা তাঁর এই উদ্যোগের জন্য তাঁকে একটা সোনার হার উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু গালিলেও-নির্দেশিত পদ্ধতিটি নাবিকদের পক্ষে অনুসরণ করা সহজ ছিল না। বাস্তবে সম্ভবও ছিল না। পরে কিন্তু তাঁর পরামর্শ মেনে ডাঙায় দ্রাঘিমা স্থির করা হয়েছে মানচিত্র তৈরি করার কাজে। বস্তুত নতুন মানচিত্র দেখে ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই নাকি মন্তব্য করেছিলেন—শত্রুদের কাছে আমি আমার সাম্রাজ্যের যতটুকু জমি হারিয়েছি তার চেয়ে বেশি হারালাম আমার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে!

চতুর্দশ লুই বিজ্ঞানে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আমলেই ১৮৬৬ সালে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজকীয় বিজ্ঞান আকাদমি। প্যারিসে তিনি মানমন্দির তৈরি করেন। তাঁর সামনে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন— দ্রাঘিমা। লুই বেশ কয়েকজন বিদেশি জ্যোতির্বিদকেই ডেকে আনেন প্যারিসে। তিনি দ্রাঘিমা প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা চান।

ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস ছিলেন সেদিনের পশ্চিমি দুনিয়ায় সব চেয়ে বেশি সংখ্যক বাণিজ্যতরীর অধিকারী। তাঁর ইচ্ছা দ্রাঘিমার সমস্যা ব্রিটেনের মাটিতেই মেটানো হোক। কিন্তু কীভাবে, চার্লসের তা জানা নেই। তাঁর একজন ফরাসি রক্ষিতা ছিলেন। তিনি একদিন রাজার কানে কানে বললেন, ফ্রান্স থেকে একজন জ্যোতির্বিদ ইংল্যান্ডে এসেছেন। তিনি সমুদ্রে দ্রাঘিমা খুঁজে বের করতে জানেন। ভদ্রলোক সম্মতি পেলে রাজার সঙ্গে দেখা করতে চান। ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাজাকে বললেন, প্যারিসে সবাই বৃহস্পতির চাঁদ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু তিনি মনে করেন পৃথিবীর চাঁদ এবং কিছু তারকাই এ-ব্যাপারে যথেষ্ট। ১৬০ বছর আগে সেই জার্মান বিজ্ঞানী কিন্তু একই কথা বলেছিলেন। হয়তো ফরাসি পদ্ধতিটি ছিল আরও একটু সংস্কৃত এবং উন্নত। চার্লস তাঁর পরামর্শকে যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। তিনি রয়াল কমিশনের সদস্যদের তলব করলেন। তাঁদের একজন ছিলেন বিখ্যাত স্থপতি ক্রিস্টোফার রেন। কমিশনাররা জানালেন জন ফ্ল্যামস্টিড নামে একজন নবীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী রয়েছেন। তাঁর বয়স মাত্র সাতাশ বছর। এ ব্যাপারে তাঁরও পরামর্শ নেওয়া দরকার। ফ্ল্যামস্টিড বললেন, ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানী-বর্ণিত পদ্ধতিটি ভাল। কিন্তু আকাশের নক্ষত্রলোকের এখনও কোনও সঠিক মানচিত্র নেই। চাঁদের গতিপথও এখনও বলতে গেলে অজানা। তিনি রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে বললেন, আকাশ পর্যবেক্ষণ করে গ্রহনক্ষত্র-তারকার ওপর নজর রাখা হোক। সেইসঙ্গে তৈরি হোক নাবিকদের জন্য প্রয়োজনীয় চার্ট ও মানচিত্র। গ্রিনিচের মানমন্দির তারই ফল। ক্রিস্টোফার রেনের নকশা অনুসারে এটি তৈরি হয়, ১৬৭৫ সালে। ফ্ল্যামস্টিড দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে কাজ করেছেন সেখানে। চমৎকার সব তারকা-তালিকা তৈরি করেছেন। সেগুলি ছাপা হয় অবশ্য ১৭২৫ সালে, তাঁর মৃত্যুর পরে।

সার আইজ্যাক নিউটনও ধরে নিয়েছিলেন তারকাই ভরসা। ফ্ল্যামস্টিড চার দশক ধরে যে তারার চার্ট তৈরি করেন তা তিনি প্রকাশ করেননি। তিনি সেগুলো জমিয়ে রেখেছিলেন গ্রিনিচের নিজের গবেষণাগারে। আর-এক বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি-র সঙ্গে পরামর্শ করে নিউটন সেগুলো থেকে একটি ছিনতাই করা সংস্করণ প্রকাশ করেন। ৪০০ কপি ছাপা হয়েছিল সংকলনটির। ফ্ল্যামস্টিডের বিনা অনুমতিতে ছাপা। স্বভাবতই তিনি রীতিমতো ক্ষুব্ধ। তিনি মুদ্রিত সংকলনের ৩০০ কপি সংগ্রহ করে জ্বালিয়ে দেন। আগেই বলা হয়েছে, তাঁর সম্পূর্ণ গবেষণার ফল প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পর। আইজ্যাক নিউটন নিজেও দ্রাঘিমা সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন। এই লক্ষ্যে নিজেও তিনি কিছু কিছু কাজ করেছিলেন। বৃহস্পতির উপগ্রহগুলোর গ্রহণ থেকে ডাঙায় দ্রাঘিমা নির্ণয়ের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন কিন্তু সমুদ্রের নাবিকের পক্ষে তার ব্যবহার যে সম্ভব নয়, তা তিনি জানতেন। তিনি সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। জ্ঞাত কিছু তারকা কখন কীভাবে চাঁদের আড়ালে হারিয়ে যায়, তাও লক্ষ করার কথা বলেছেন। দ্রাঘিমা নির্ণয়ে দিনের বেলা সূর্য থেকে চাঁদের দূরত্ব এবং রাত্রে চাঁদ এবং তারকাদের মধ্যে দূরত্ব পরিমাপের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। নিউটন দ্রাঘিমা 'আবিষ্কার'-এর যান্ত্রিক সাহায্যের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি। তিনি আকাশের ঘড়িকে কাজে লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের তৈরি ঘড়িকে কাজে লাগানোর কথাও উল্লেখ করেছিলেন। তিনি অস্বীকার করেননি, জ্যোতির্বিদদের তৈরি চার্ট থাকলেও কারিগরের হাতে তৈরি ঘড়ি দ্রাঘিমা নির্ণয়ে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু সমুদ্রে দ্রাঘিমা একবার হারিয়ে গেলে চলতি ঘড়ির সাহায্যে তা খুঁজে

পাওয়া যাবে না। অবশ্য আরও উন্নত ধরনের ঘড়ি তৈরি হলে অন্য কথা। নিউটন মারা যান ১৭২৭ সালে। তিনি দেখে যেতে পারেননি তাঁর সেই স্বপ্নের ঘড়ি নিয়েই বিভোর এক ইংরেজ কারিগর।

১৭১৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যখন দ্রাঘিমা সংক্রান্ত আইন রচনা করে তখন রানি অ্যানের রাজত্ব। পার্লামেন্ট ঘোষণা করে সমুদ্রে দ্রাঘিমা নির্ণয়ের কার্যকর পদ্ধতি যিনি বা যে গোষ্ঠী স্থির করতে পারবেন, তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে। সফল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ব্রিটিশ নাগরিক হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। বিদেশিরাও যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে পুরস্কার পাওয়ার অধিকারী। দ্রাঘিমা নির্ণয়কে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে। ওঁরা তিনটি পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন আইন মোতাবেক। প্রথম পুরস্কার ২০,০০০ পাউন্ড। আজকের হিসাবে ১০ লক্ষ ডলার। টাকার অঙ্কে বিপুল অর্থ। প্রথম পুরস্কার দেওয়া হবে তাঁকে, যাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করলে ম্যাপে আধ ডিগ্রির বেশি ভুল হবে না। দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫,০০০ পাউন্ড। তাঁর ক্ষেত্রে ভুলের পরিমাণ তিন ভাগের দুই ভাগ ডিগ্রির বেশি হলে চলবে না। তৃতীয় পুরস্কার ১০,০০০ পাউন্ড। এই প্রতিযোগীর ক্ষেত্রে ভুল ১ ডিগ্রি পর্যন্ত স্বীকার্য। এক ডিগ্রি দ্রাঘিমা মানে সমুদ্রে ৬০ মাইল, ডাঙায় ৬৮ মাইল। সুতরাং, সামান্য ভুলেই দূরত্বে এদিক-ওদিক হয়ে যেতে পারে। আইনে বলে দেওয়া হয় যিনি কার্যকর সম্ভাব্য যে কৌশলই পেশ করুন-না-কেন, তাঁকে কার্যকারিতা প্রকাশ করতে হবে দরিয়ার ব্রিটিশ জাহাজে। সে-জাহাজ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যাবে।

আইন অনুসারে ব্রিটিশ সরকার একটি লংগিচুড বোর্ডও গঠন করেন। এই দ্রাঘিমা বোর্ডে ছিলেন বিজ্ঞানী, নাবিক এবং সরকারি প্রতিনিধিরা। রাজকীয় জ্যোতির্বিদ, রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, নৌবাহিনীর প্রধান, হাউস অব কমনস-এর স্পিকার, নৌবাহিনীর কমিশনার, অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের গণিতের দুই অধ্যাপক। ওঁরাই পুরস্কারের দাবিদারদের প্রস্তাব বিচার করবেন। রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট তখন সার আইজ্যাক নিউটন। বোর্ড তাঁর বক্তব্য শুনতে চায়। আগেই বলা হয়েছে, নিউটন জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্যা মীমাংসার আশা প্রকাশ করেছিলেন। তবে উপযুক্ত ঘড়ি তৈরি হলে তার ভূমিকাও তিনি উড়িয়ে দেননি।

ঘড়ির সাহায্যে দ্রাঘিমা নির্ণয়ের চেষ্টা যে আগে কখনও হয়নি, এমন নয়। অন্যভাবেও মীমাংসা খোঁজা হয়েছে। আর্ত কুকুরের ডাকের মতোই উদ্ভট উদ্ভট কৌশল বের হয়েছে কারও কারও মাথা থেকে। চার্লস নিউটনেরই শিষ্য গাণিতিক উইলিয়াম হুইসটন লুকা আর তাঁর এক গাণিতিক বন্ধু হামফ্রে ডাটন পরামর্শ দেন শব্দের সাহায্য নিতে। তাঁরা বললেন, শব্দ সমুদ্রে অনেক দূর থেকে শোনা যায়। সুতরাং মহাসমুদ্রে সমদূরত্বে কিছু জলযান স্থির রেখে যদি তোপ দাগিয়ে সময়-সংকেত জানিয়ে দেওয়া হয় তার নাবিকেরা ঠিক জেনে যাবেন তাঁরা কত দূরে, কোন দ্রাঘিমায় জাহাজ নিয়ে পৌঁছেছেন। শব্দের সঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তা হিসাবে আলোও যুক্ত হয়। ছ'শো মাইল দূরে জাহাজ রেখে শক্তিশালী কামান দেগে ঘোষণা করা হয় সময়। বাস্তবে দেখা গেল এ-পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকর নয়। মহাসমুদ্রে এভাবে নিঃসঙ্গ গোলন্দাজ কতদিন রাখা সম্ভব? লোক পাওয়া ভার। তা ছাড়া সর্বত্র সমুদ্রের গভীরতাও জানা নেই। সুতরাং জাহাজ নোঙরই বা করবে কেমন করে। সুতরাং যদিও কাগজে ছাপিয়ে, পুস্তিকা প্রচার করে ওই দুই গাণিতিক বেশ হইচই বাধিয়ে দেন, কিন্তু

কাজের কাজ কিছু হল না। মহাসমুদ্রে দ্রাঘিমা যেমন অধরা ছিল, তেমনই রয়ে গেল।

এবার ঘড়ির দিকে তাকানো যাক। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ঘড়ি নিয়ে রকমারি সমস্যা। বিশেষত সমুদ্রে। তখন পেন্ডুলাম ঘড়ির যুগ। তরঙ্গায়িত সমুদ্রে যে ঘড়ির চাল যেমন দ্রুত হয়ে উঠতে পারে, তেমনই শ্লথ। এমনকী বন্ধও হয়ে যেতে পারে। সমুদ্রে যদি ঝড় ওঠে তবে ঘড়ির দশা কী হবে কেউ বলতে পারেন না। তার পর এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় তাপের তারতম্য থাকে। ঘড়ির বিভিন্ন অংশ তাপে সম্প্রসারিত হতে পারে, শৈত্যে সংকুচিত। তেল জমে যেতে পারে। তার উপর আছে চাপের হেরফের, ব্যারোমিটারের ওঠানামা। এক দ্রাঘিমা থেকে অন্য দ্রাঘিমায় মাধ্যাকর্ষণের পার্থক্যও ঘড়িকে প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং দূর মহাসমুদ্রে এমন ঘড়ির পক্ষে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ছেড়ে আসা বন্দরের সঠিক সময় নির্দেশ করা সম্ভব কেমন করে!

উন্নত ঘড়িও তৈরি হয়েছিল বইকী! ১৭১৪ সালে, যে বছর দ্রাঘিমা নির্ণয়ে সাফল্যের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয় সে বছরই ইংল্যান্ডের বেভার্লির এক কারিগর জেরেমি থ্যাকার তৈরি করেন সমুদ্রের পক্ষে উপযোগী এক ঘড়ি। উন্নত, কারণ ঘড়িটি রেখেছিলেন তিনি একটি ভ্যাকুয়াম চেম্বারে। অর্থাৎ বায়ুচাপ এবং জলকণা থেকে মুক্ত পরিবেশে। দ্বিতীয়ত, তাঁর ঘড়িতে দম দেওয়ার কৌশল ছিল অভিনব। অন্য ঘড়িতে তৎকালে দম দেওয়ার সময় ঘড়ি বন্ধ হয়ে যেত কিংবা সময় গোলমাল করত। থ্যাকারের ঘড়ি ছিল সেই ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত। আরও কিছু কারিগরি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এই ঘড়িকে কিছুতেই সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন করতে পারেননি তিনি। প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় পরিবর্তিত তাপমাত্রায় ঘড়ির আচরণ। ঘড়ি ব্যবহার করতে হলে তাপের হেরফেরের সঙ্গে ঘড়ির চালচলনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার। তা ছাড়া থ্যাকার নিজেই কবুল করেন তাঁর ঘড়ি দিনে গড়ে ৬ সেকেন্ড সময় গোলমাল করে। অন্য ঘড়ি করত দিনে গড়ে ১৫ মিনিট। তার তুলনায় উন্নত সন্দেহ নেই, কিন্তু বিচারকরা তবুও সে-ঘড়ি হাতে নিতে রাজি হলেন না। কেননা, দিনে ৬ সেকেন্ডও কম নয়। পুরস্কার পেতে হলে সময়ের হেরফেরকে ৩ সেকেন্ডের মধ্যে বন্দি করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং থ্যাকার আইনমাফিক পরীক্ষিত হলেন না। তবু দ্রাঘিমা নির্ণয়ে চিরস্থায়ী হয়ে আছে তাঁর নাম। তিনিই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন 'ক্রনোমিটার' শব্দটি। কথাচ্ছলে বলেছিলেন— ফনোমিটার, পাইরোমিটার, সেলেনোমিটার, হেলিওমিটার, আর যত যত মিটারের কথাই তোমরা চিন্তা করো-না-কেন, সবার সেরা আমার এই 'ক্রনোমিটার'!

দেশে দেশে নাবিকের পকেটে 'ক্রনোমিটার' ঠাঁই পায় অনেক পরে। তার আগে আসরে হাজির হন সেই আশ্চর্য ঘড়িওয়ালা— নাম যাঁর জন হ্যারিসন। বস্তুত দাবা সোবেল-এর যে বইটি সামনে রেখে 'দ্রাঘিমা আবিষ্কার'-এর এই কৌতূহলোদ্দীপক ইতিকথা বলার চেষ্টা করছি সেটি আসলে বিস্ময়প্রতিভা ঘড়ি-কারিগর জন হ্যারিসনেরই জীবন এবং সংগ্রামের উপাখ্যান। বইটির নাম রেখেছেন লেখক— 'লংগিচ্যুড/দ্য ট্রু স্টোরি অব আ লোন জিনিয়াস হু সলভড দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক প্রবলেম অব হিজ টাইম।' (*Longitude / The True Story of A Lone Genius who / Solved the greatest Scientific Problem of His Time*).

জন হ্যারিসন সাধারণ ঘরের ছেলে। মা-বাবার পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। জন্ম ১৬৯৩ সালে। ইয়র্কশায়ার অঞ্চলে। প্রথমে পরিবারের ভদ্রাসন ছিল নসট্যাল

প্রিয়রিতে এক ভূস্বামীর খামারে। বাবা সেখানে কাঠ-মিস্ত্রির কাজ করতেন। সেইসঙ্গে খামার দেখাশোনার কাজ। হ্যারিসন যখন নিতান্ত বালক তখন ওই পরিবার ঠিকানা বদল করেন। ওঁরা চলে যান লিঙ্কনশায়ারের একটি বরো-তে। হাম্বার নদীর ধারে সেই গ্রাম। বালক হ্যারিসন সেখানেই বাবার কাছে কাঠের কাজ শিখেছিলেন। তিনি ভাল গান গাইতেন। সুর তাল সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কিছু ধারণাও ছিল। তাঁর আর-এক কাজ ছিল চার্চের ঘণ্টা বাজানো। শেষ পর্যন্ত গ্রামের চার্চের কয়ার মাস্টারও হয়েছিলেন। তরুণ হ্যারিসন বই পড়তে ভালবাসতেন। তাঁর জ্ঞানের ক্ষুধা ছিল অপরিসীম। একজন যাজক তাঁকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক নিকোলাস স্যান্ডার্সনের বক্তৃতা-সংগ্রহের একটি পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলেন। বিষয় ছিল 'ন্যাচারাল ফিলজফি'। সেই পাণ্ডুলিপিটি দেখলে বোঝা যায় হ্যারিসন কত মনোযোগী পাঠক ছিলেন। পুথির পাতায় পাতায় তাঁর নিজস্ব টীকা এবং ভাষ্য। একালের গবেষক তাই দেখে স্বীকার করেন তাঁর চিন্তা ছিল সুশৃঙ্খল। নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া'রও একটি কপি ছিল হ্যারিসনের। এই দুটি বই সম্বল করেই স্বশিক্ষিত তরুণের বিদ্যাচর্চা। কাঠের কাজ করতে করতে হ্যারিসন একসময় ঘড়ির কাজে হাত লাগান। সেটা ১৭১৩ সালের কথা। তাঁর বয়স তখন কুড়ির নীচে। কোনও ঘড়ি-কারিগরের কাছে কখনও তিনি শিক্ষানবিশ ছিলেন না। বস্তুত ওই তল্লাটে কোনও ঘড়ি-কারিগরই ছিলেন না। তবু তৈরি হল আশ্চর্য এক ঘড়ি। বলতে গেলে পুরো ঘড়িটাই কাঠের তৈরি। দাঁত পর্যন্ত কাঠের। কাঠের আঁশ এবং দানা বিচার করে তিনি ঘড়ির নানা অংশ তৈরি করেছেন। এখনও লন্ডনের গিল্ড হলে ঘড়ি-কারিগরদের জাদুঘরে রয়েছে সেই ঘড়ি। তার পর আরও দুটি ঘড়ি তৈরি করেন হ্যারিসন দু'বছরের ব্যবধানে। তার পেন্ডুলাম এবং বাক্সগুলো হারিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও রয়েছে হৃৎপিণ্ড। অর্থাৎ পুরো যন্ত্রাংশ। গিল্ড হলে সঞ্চিত সেগুলো। ১৭২২ নাগাদ হ্যারিসন আরও একটি অবাক-করা ঘড়ি তৈরি করেন। তার আগে ১৭১৮ সালে বিয়ে করে তিনি সংসারী হয়েছেন। পরের বছর একটি পুত্রসন্তানও ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্তু সে নয় বছরে পৌঁছবার আগেই স্ত্রী এলিজাবেথ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর ছ' মাসের মধ্যে তাঁর চেয়ে দশ বছরের ছোট আর-এক এলিজাবেথকে বিয়ে করেন হ্যারিসন। পঞ্চাশ বছর দীর্ঘ ওদের বিবাহিত জীবন। দুই সন্তান— পুত্র উইলিয়াম, কন্যা এলিজাবেথ। ইতিমধ্যে আপন এলাকায় ঘড়ির কারিগর হিসাবে হ্যারিসনের কিছু খ্যাতি হয়েছিল নিশ্চয়। তা না হলে সার চার্লস পেলহাম তাঁর নতুন ঘোড়াশালের টাওয়ারে হ্যারিসনকে ক্লক তৈরি করতে বলতেন না। ব্রোকলেসলি পার্কে এখনও রয়েছে সেই টাওয়ার ক্লক। গত শতকের শেষ দিকে একবার সেটি সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু ২৭০ বছর পরেও, সে-ঘড়ি নাকি এখনও চলছে। এই ঘড়িটিও বলতে গেলে কাঠের তৈরি। নিতান্ত প্রয়োজনে হ্যারিসন কিছু পেতল ব্যবহার করেছেন। এই ঘড়িটির আর-এক বৈশিষ্ট্য তাতে তেল দিতে হয় না। এমন কাঠ তিনি ব্যবহার করেছেন, যা থেকে তেল বের হয়।

এই ঘড়ির পর হ্যারিসন তাঁর ভাই জেমস-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আরও কয়েকটি ঘড়ি তৈরি করেন। কিন্তু এই পর্বের কোনও ঘড়িতে তাঁর স্বাক্ষর নেই। সবই ছোট ভাই জেমস-এর নামে। বোঝা যায়, ভাইকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য হ্যারিসন নিজের বাহাদুরি দেখাতে চাননি। এই পর্বের ঘড়িগুলোরও একটি রয়েছে গিল্ড হলের জাদুঘরে। তাতে তিনি নতুন ধরনের পেন্ডুলাম ব্যবহার করেছেন। পেতলের সঙ্গে মিলিয়েছেন ইস্পাত। পেন্ডুলাম

কখনও অতি দ্রুত বা মন্থর হয় না। অভূতপূর্ব কারিগরি দক্ষতা। তৎকালের পৃথিবীতে অন্যান্য ঘড়ি যখন প্রতিদিন গড়ে এক মিনিট পিছিয়ে পড়ে, তখন লন্ডন থেকে দূরে গাঁয়ের কারিগরদের গড়া ঘড়িটি পুরো এক মাসে এক সেকেন্ড মাত্র পিছোয়।

ওঁদের গ্রামের কাছে পাঁচ মাইল দূরে দেশের তৃতীয় বৃহৎ বন্দর হাল। বন্দরে নাবিকদের মুখে হয়তো হ্যারিসন শুনেছিলেন দ্রাঘিমা নির্ণয়ের জন্য পুরস্কার ঘোষণার কথা। সজাগ সতর্ক বুদ্ধিমান কারিগর নিশ্চয় অবহিত ছিলেন দরিয়ায় দ্রাঘিমা নির্ণয়ের সমস্যা সম্পর্কেও। ফলে ১৭২৭ সালে দেখা যায়, হ্যারিসন সমুদ্রের উপযোগী ঘড়ি তৈরির দিকে ঝুঁকেছেন। ইতিমধ্যে ঘড়িতে হাত পেকেছে তাঁর। নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় রেখেছেন প্রতিটি ঘড়িতে। তেলের সমস্যা নেই, পেন্ডুলামের সমস্যা নেই, যান্ত্রিক সমস্যাও অধিকাংশই মীমাংসিত। সমুদ্রের লবণাক্ত হাওয়ায় বা ঝড়ের সমুদ্রের মুখোমুখি হতেও হ্যারিসন প্রস্তুত। আরও কিছু সমস্যা ছিল বটে। চার বছরের চেষ্টায় নিজের মতো করে সেগুলো মিটিয়ে তাঁর ঘড়ি নিয়ে জন হ্যারিসন চললেন দু'শো মাইল দূরে লন্ডনে, বোর্ড অব লংগিচ্যুড-এর দরবারে। সেটা ১৭৩০ সালের কথা।

কিন্তু কোথায় সেই বোর্ড! ইতিমধ্যে তার পনেরো বছর বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু বোর্ডের তখনও কোনও অফিস নেই। কোনও সভাও হয়নি। পুরস্কার ঘোষণার পরে, তার লোভে দেশ-বিদেশ থেকে অনেকেই অবশ্য রকমারি মীমাংসার দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু সেগুলো বলতে গেলে সবই আবোল-তাবোল। ব্যক্তিগতভাবে কমিশনাররাই চিঠি লিখে বাতিল করে দিয়েছেন, পাঁচজন কমিশনারের কখনও একসঙ্গে বসার প্রয়োজন হয়নি। হ্যারিসন একজন কমিশনারের কথাই জানতেন। তিনি স্যার এডমন্ড হ্যালি। ধূমকেতু-খ্যাত সেই হ্যালি। তিনি তখন গ্রিনিচের মানমন্দিরে অ্যাস্ট্রোনমার রয়াল বা রাজকীয় জ্যোতির্বিদ। ওই পদে প্রথম ছিলেন জন ফ্ল্যামস্টিড। তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় রাজকীয় জ্যোতির্বিদ হিসাবে গ্রিনিচে হ্যালি যোগ দেন ১৭২০ সালে, ফ্ল্যামস্টিড হ্যালিকে পছন্দ করতেন না। হ্যালি মদ্যপান করেন। জাহাজের কাপ্তানদের মতো বাজে ভাষায় কথা বলেন। তা ছাড়া তিনি কেমন করে ভুলবেন, নিউটন আর হ্যালি মিলে তাঁর তারকার তালিকা বিনা অনুমতিতে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন এক দিন। সুতরাং হ্যালিকে নিশ্চয় তাঁর পদে আসীন দেখলে খুশি হতেন না ফ্ল্যামস্টিড। তবু আপন যোগ্যতাবলে হ্যালি তখন মানমন্দিরে প্রধান জ্যোতির্বিদ। হ্যালি হ্যারিসনকে সৌজন্যের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। সমুদ্র-ঘড়ি সম্পর্কে তাঁর সব বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন। ঘড়ির ড্রয়িং দেখলেন। কিন্তু তিনি জানতেন বোর্ড অব লংগিচ্যুড সমস্যার যান্ত্রিক মীমাংসার চেয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের মীমাংসার দিকেই ঝুঁকবেন। কারণ বোর্ডে জ্যোতির্বিদরা ছাড়াও রয়েছেন গাণিতিক এবং নাবিক। হ্যালি নিজেও নক্ষত্র-বিজ্ঞানী। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন তিনি। তবু সূর্য-তারার সাহায্যে সমুদ্রে দ্রাঘিমা নির্ণয় তাঁরও স্বপ্ন। তবু তিনি গ্রামের ঘড়ি-কারিগর হ্যারিসনকে উৎসাহ দিলেন। বললেন, তুমি জর্জ গ্রাহামের কাছে যাও। তিনি এর মূল্যায়ন করতে পারবেন। জর্জ গ্রাহাম তৎকালের বিখ্যাত ঘড়ি-নির্মাতা। তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরিতে তাঁর জুড়ি নেই। হ্যারিসন তাঁর কাছে যেতে প্রথমে ইতস্তত করেছিলেন। কে জানে গ্রাহাম যদি এই ঘড়ির কারিকুরি সব জেনে নেন! হ্যালি তাঁকে অভয় দিলেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিধা ও সংকোচ কাটিয়ে হ্যারিসন হাজির হলেন গ্রাহামের ঠিকানায়। প্রথমে কথাবার্তা নাকি

কিছুটা রুক্ষভাবে শুরু হয়েছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জনের খাতির হয়ে যায়। গ্রামের কারিগর ও শহরের কারিগর বলতে গেলে একটি দিন একসঙ্গে কাটিয়ে দিলেন। সকাল দশটা থেকে রাত আটটা দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা চলে। গ্রাহাম সে রাত্রে হ্যারিসনকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁর মতে ঘড়িটিকে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন করতে হলে আরও কিছু কাজ করা দরকার। গ্রাহাম বললেন, তুমি গ্রামে ফিরে যাও। বাকি কাজটুকু করো। আমি তোমাকে টাকা ধার দিচ্ছি। সুদ দিতে হবে না। ফেরত দেওয়ারও তাড়া নেই। হ্যারিসন তাঁর পরামর্শ মেনে নিয়ে ফিরে গেলেন গ্রামে। পরবর্তী পাঁচটি বছর কারিগর মগ্ন থাকলেন এই ঘড়িকে খুঁতহীন করার জন্য। শেষ পর্যন্ত তৈরি হল হ্যারিসনের সমুদ্র-ঘড়ি, 'এইচ-ওয়ান'। ৪ ফুট × ৪ ফুট × ৪ ফুট একটি বাক্স। তার মধ্যে ঘড়ি। ওজন ৭৫ পাউন্ড। তিনটে কাঁটা। ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড। সেইসঙ্গে তারিখ নির্দেশকও। এমন ঘড়ি, কেউ কখনও আগেও দেখেনি, পরেও না। প্রতিদিন অবশ্য দম দিতে হয়, কিন্তু 'এইচ-ওয়ান' এখনও চালু। গ্রিনিচের ন্যাশনাল মেরিটাইম মিউজিয়ামে কাচের বাক্সে এখনও সে-ঘড়ি সযত্নে রক্ষিত। লেখক বলছেন, ঘড়ির অলংকৃত মুখের আড়ালে দেখা যায় তার যন্ত্রপাতি। যেন কোনও সুবেশা রমণী দাঁড়িয়ে আছেন কল্পিত কোনও পর্দার পেছনে। আর দেখা যাচ্ছে শরীর নয়, তাঁর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।

যথাসময়ে হ্যারিসন তাঁর ঘড়ি নিয়ে আবার ফিরে এলেন লন্ডনে। ১৭৩৫-এ আবার তিনি জর্জ গ্রাহামের সামনে। গ্রাহাম বললেন, লংগিচ্যুড বোর্ডের কাছে নয়, ঘড়িটি পেশ করো রয়াল সোসাইটিতে। হ্যারিসন তা-ই করলেন। সেখানে সকলে বীরের অভিনন্দন জানালেন গ্রামের এই কারিগরকে। হ্যালি তো বটেই, আরও দু'জন ফেলো ভূয়সী প্রশংসা করলেন তাঁর। তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে হ্যারিসনের ঘড়িটি পরখ করে দেখার জন্য সুপারিশ করলেন। কিন্তু রাজকীয় নৌবহর টালবাহানা করে একটি বছর কাটিয়ে দিলেন।

এক বছর পরে দ্রাঘিমা আইনের নির্দেশমতো জাহাজে ঘড়িটিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজে না পাঠিয়ে 'সেঞ্চুরিয়ান' নামে লিসবনগামী একটি জাহাজে তুলে দিলেন। ১৭৩৬ সালে মে মাসে ঘড়ি নিয়ে জন হ্যারিসন জাহাজে চড়লেন। জাহাজে হ্যারিসন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। দুর্ভাগ্য তাঁর, যে সহৃদয় কাপ্তেন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং ঘড়িটি যাঁর প্রশংসা কুড়াচ্ছিল, সেই কাপ্তেন সহসা মারা গেলেন। নির্দেশ গেল 'অক্সফোর্ড' নামে আর-একটি জাহাজে ঘরে ফেরার। সেই জাহাজের কাপ্তেন রজার উইলস নিজের মতো করে দ্রাঘিমার হিসাব করছিলেন। হ্যারিসন ঘড়ি দেখিয়ে তাঁর ভুল ধরলেন। দেখা গেল সঠিক দ্রাঘিমা নির্ণয় করেছে হ্যারিসনের ঘড়ি। কাপ্তেন-নির্দেশিত পথে গেলে জাহাজ বিপথে চলতে শুরু করত। কাপ্তেন লিখিতভাবে জানালেন এই তথ্য। হ্যারিসনের ঘড়িকে তিনি নিঃসংকোচে লিখে দিলেন প্রশংসাপত্র।

সে বছরই জুন মাসে তেইশ বছর পর প্রথম সভা ডাকা হল লংগিচ্যুড বোর্ডের। আটজন কমিশনার হাজির। হ্যারিসন তাঁদের সামনে পেশ করলেন তাঁর ঘড়ি, 'এইচ-ওয়ান'। ওঁরা ঘড়িটি অনুমোদন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বললেন কুড়ি হাজার পাউন্ড পুরস্কার পেতে হলে জাহাজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঘুরে আসতে হবে। হ্যারিসন নিজেও যেতে পারেন ঘড়ির সঙ্গে, কিংবা তাঁর কোনও প্রতিনিধি। কিন্তু হ্যারিসন নিজেই হঠাৎ বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন, আমি ঘড়িটিকে আরও উন্নত করতে চাই। লিসবন যাতায়াতের সময় যদিও এ-ঘড়ি

সময়ের হেরফের করেছে ২৪ ঘণ্টায় মাত্র এক সেকেন্ড, তবু এ-ঘড়িতে ত্রুটি রয়েছে। ত্রুটি কোথায় একমাত্র তিনিই তা জানেন। কিছু আগাম অর্থ পেলে দু' বছরের মধ্যে তৈরি করে দেবেন নতুন ঘড়ি। আরও উন্নত, আরও ছোট। বোর্ড অমত করলেন না। কমিশনাররা বললেন, ওঁরা, এই ঘড়ির খাতে তাঁকে ৫০০ পাউন্ড মঞ্জুর করে দিচ্ছেন। ২৫০ পাউন্ড দেওয়া হবে আগে, বাকি ২৫০ পাউন্ড পাওয়া যাবে ঘড়ি তৈরি হবার পর। সরকারি অর্থের সাহায্যে গড়া ঘড়ি তুলে দিতে হবে রয়াল নেভির হাতে। পরীক্ষা শেষে জনসাধারণের স্বার্থে ঘড়ি হবে সরকারি সম্পত্তি। 'এইচ-ওয়ান'-কেও দিয়ে দিতে হবে তাঁকে। হ্যারিসন প্রশ্ন তুলতে পারতেন— কেন? তার জন্য তো তিনি সরকারের অর্থ নেননি। কিন্তু হ্যারিসন সেই তর্কে গেলেন না। বোর্ডের পৃষ্ঠপোষণা পেয়ে তিনি যারপরনাই খুশি। দ্বিতীয় ঘড়িটি তৈরি হলে তার ভেতরে একটি রুপোর পাতে খোদাই করে দিয়েছিলেন তাঁর খুশির খবর—'মেড ফর হিজ ম্যাজেস্টি জর্জ দ্য সেকেন্ড, বাই অর্ডার অব এ কমিটি হেল্ড অন থার্টিন্থ জুন, সেভেনটিন থার্টি সেভেন।'

১৭৪১ সালের জানুয়ারিতে বোর্ড অব লংগিচ্যুডের সামনে যখন ঘড়ি হাজির করার সময় হল তখন হ্যারিসন আবার খুঁতখুঁতে। কমিশনারদের সামনে ঘড়ি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে হ্যারিসন বললেন, আরও একটু সংস্কার করা প্রয়োজন। আমাকে আবার একটু কাজ করতে দিন। ফলে 'এইচ-টু' বা দ্বিতীয় ঘড়ির সমুদ্রযাত্রা হল না। এটিও নাকি আশ্চর্য এক ঘড়ি। প্রধানত পেতল ব্যবহার করা হয়েছে এতে। ওজন ৮৪ পাউন্ড। ১৭৪১-৪২ সালের মধ্যে রয়াল সোসাইটি অনেকভাবে পরীক্ষা করেছে, তাপে রেখে, ঠান্ডায় রেখে, যেন প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ে পড়ে এমনভাবে আন্দোলিত করে। ঘড়ি সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, বাকি শুধু সমুদ্রযাত্রা। রয়াল সোসাইটির তরফে বলা হল এ-ঘড়ি দ্রাঘিমা নির্ণয়ে সহায়ক হতে পারে। হ্যারিসন তবু খুশি নন, তিনি তখন লন্ডনের বাসিন্দা। বয়স ৪৮ পার হয়ে গেছে। তখনও তিনি সমুদ্র-ঘড়ি নিয়েই মত্ত। কী করছেন তিনিই জানেন। মাঝে মাঝে বোর্ড থেকে ৫০০ পাউন্ড বৃত্তি নিয়ে আসেন, আর বলেন, সবুর। 'এইচ-ওয়ান' পড়ে আছে গ্রাহামের ঘরে। দেশ-বিদেশের লোকেরা আসেন, দেখেন, তারিফ করেন। শিল্পী হোগার্থ সৌন্দর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'এইচ-ওয়ান'-এর কথা পাড়েন। লেখেন— 'ওয়ান অব দ্য মোস্ট এক্সকুইসাইট মুভমেন্ট এভার মেড।' দ্বিতীয় ঘড়ি 'এইচ-টু' যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে। হ্যারিসনের মন তখন তৃতীয় ঘড়িতে। এক-দুই বছর নয়, প্রায় দুই দশক পরে তৈরি হল সেই তৃতীয় ঘড়ি। টাওয়ার ক্লক তৈরি করতে লেগেছিল তাঁর দু' বছর। 'এইচ-ওয়ান' এবং 'এইচ-টু', বিপ্লবাত্মক দুটি ঘড়ি তৈরি করতে হ্যারিসন সময় নিয়েছিলেন নয় বছর। কিন্তু তৃতীয় ঘড়ি 'এইচ-থ্রি' তৈরি করতে সময় লেগে গেল তাঁর, সঠিকভাবে হিসাব করলে উনিশ বছর। ফাঁকে ফাঁকে সংসারের দায় মেটানোর জন্য তিনি কিছু কিছু অন্য ঘড়িও তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরিশ্রম, মনোযোগ, ভাবনা, দুর্ভাবনা ছিল তাঁর তৃতীয় ঘড়ি নিয়ে। বোর্ড পাঁচশো পাউন্ড করে পাঁচ কিস্তি অর্থ দিয়েছিলেন ওঁকে। তবে তার চেয়েও বেশি পৃষ্ঠপোষণা পেয়েছেন হ্যারিসন রয়াল সোসাইটির কাছ থেকে। ১৭৪৯ সালে ওঁরা হ্যারিসনকে কোপলে গোল্ড মেডেল দিয়ে সম্মান জানান। সেকালে এই সম্মান পেয়েছেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জেমস কুক প্রমুখ কেউ কেউ। আধুনিককালে যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন রাদারফোর্ড আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী। রয়াল সোসাইটি ওঁকে ফেলোও করতে

চেয়েছিলেন। কিন্তু হ্যারিসন সম্মত হননি। তিনি বলেছিলেন, এই সম্মান দিতে হয়, আমার ছেলে উইলিয়ামকে দাও কিন্তু তা কেমন করে হয়। রয়াল সোসাইটির ফেলোশিপ তো আর উত্তরাধিকার হিসাবে পাওয়া যায় না! উইলিয়াম অবশ্য যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। তাঁর নবীন জীবনের অনেকটাই কেটে গেছে, 'এইচ-থ্রি' বা বাবার তৈরি তৃতীয় ঘড়িটির সাহচর্যে। পরবর্তীকালে আপন যোগ্যতাবলেই অবশ্য রয়াল সোসাইটির ফেলো হয়েছিলেন উইলিয়াম হ্যারিসন। কিন্তু পিতার মতো পুত্রের স্বপ্নও তখন তৃতীয় ঘড়ি 'এইচ-থ্রি'কে ঘিরে। এটিও আশ্চর্য ঘড়ি। যন্ত্রাংশের সংখ্যা ৭৫৩। ওজন ৬০ পাউন্ড। 'এইচ-ওয়ান'-এর তুলনায় ১৫ পাউন্ড কম, 'এইচ-টু'-র তুলনায় ২৬ পাউন্ড। অনেক নতুন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন হ্যারিসন এই ঘড়িতে।

কিন্তু জন হ্যারিসন 'এইচ-থ্রি'-কে বোর্ডের দরবারে পরখ করতে দিলেন না। বললেন, আমি একটি ছোট টাইমকিপার তৈরি করে তাই দেব পরখ করার জন্য। ১৭৫৩ সালে জন জেফ্রি নামে এক কারিগরকে দিয়ে নিজের জন্য একটি টাইমকিপার তৈরি করিয়েছেন। ডিজাইন হ্যারিসনের নিজের। জেফ্রি কারিগর মাত্র। হ্যারিসন তাই দেখে ভাবলেন, তবে ছোট আকারে সমুদ্র-ঘড়িই বা তৈরি করা যাবে না কেন? ক' বছরের চেষ্টায় ১৭৫৯ সালে তৈরি হল টাইমকিপার, 'এইচ-ফোর'। চার ইঞ্চি ব্যাস, ওজন মাত্র তিন পাউন্ড। নিজের তৈরি ঘড়ি দেখে হ্যারিসন নিজেই অভিভূত। লিখেছেন— যান্ত্রিক বা গাণিতিক এমন কোনও বস্তু নেই এই পৃথিবীতে যা এই টাইমকিপারের সঙ্গে তুলনীয়। ঈশ্বরকে আন্তরিক ধন্যবাদ আমি এতদিন বেঁচে আছি, এবং এমন একটি কাজ শেষ করতে পেরেছি— সে ঘড়িটি এখন আর চলে না। কিন্তু পবিত্র স্মারক হিসাবে রক্ষিত আছে সংগ্রহশালায়। সেখানে নরম সাটিনের শয্যায় শায়িত হ্যারিসনের অমর সৃষ্টি, যা অষ্টাদশ শতকের পৃথিবীতে বহন করে এনেছিল যুগান্তরের বার্তা। ১৭৬১ সালে এই ঘড়িরই জয় করে নেওয়ার কথা ছিল দ্রাঘিমা-নির্ণয়ে সাফল্যের জন্য পুরস্কার।

কিন্তু ততদিনে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন অন্য প্রতিযোগী তথা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও। তাঁরা প্রথম থেকেই দ্রাঘিমা-সমস্যার যান্ত্রিক মীমাংসার বিরোধী ছিলেন। মানুষের তৈরি ঘড়ি নয়, তাঁরা ঈশ্বর-সৃষ্ট ঘড়ি আকাশের উপর আস্থাবান ছিলেন। সীমাহীন আকাশ সে ঘড়ির ডায়াল,— মুখমণ্ডল। চাঁদ আর তারা ঘড়ির কাঁটা। সূর্য, এবং নক্ষত্রাদি লিখিত সংখ্যা যেন। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় নাবিক এ-ঘড়ি দেখেন, চার্ট মেলান, তার পর জাহাজ নিয়ে এগিয়ে যান। আকাশের এই ঘড়ির সঙ্গেই হ্যারিসনের প্রতিযোগিতা। ১৭৩০ থেকে ১৭৬০ সালের মধ্যে দুই তরফই যেন তৈরি চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্য। বিজ্ঞানীরা এমন দুটি যন্ত্র তুলে দিয়েছেন নাবিকদের হাতে যা দিয়ে দিনে সূর্য থেকে চাঁদের দূরত্ব এবং রাত্রে চাঁদ থেকে তারার দূরত্ব পরিমাপ করা সম্ভব। পরে অবশ্য জানা যায়, এক সময় নিউটনও এ-ধরনের যন্ত্রের কথা ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন এডমন্ড হ্যালিও। সেইসঙ্গে আকাশের মানচিত্র শুধু ব্যাপকতর হয়নি, নিবিড় হয়েছে। তৈরি হয়েছে রাশি রাশি চার্ট। একা জন ফ্ল্যামস্টিড চল্লিশ বছর টেলিস্কোপে ৩০ হাজার পর্যবেক্ষণ চালান আকাশে, এবং তারকা তালিকা তৈরি করেন। এডমন্ড হ্যালি, তৃতীয় রাজকীয় জ্যোতির্বিদ ব্রাডলিও অনেক নতুন আকাশ-বিবরণ তৈরি করেন পর্যবেক্ষণের পর। ওদিকে ডেনমার্ক, ফ্রান্সেও কাজ হয়েছে বিস্তর। দ্রাঘিমা নিয়ে ব্যস্ত সবাই। জার্মানির জ্যোতির্বিজ্ঞানী

টোবিয়াস মেয়ারও গাণিতিক ইউলারের সহযোগিতায় আকাশ পর্যবেক্ষণকে আরও প্রসারিত করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেদিন তিনটি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছন। প্রথমত, তাঁরা তারার অবস্থান এবং চাঁদের গতি সম্পর্কে ধারণাকে স্পষ্টতর করেন; দ্বিতীয়ত, নাবিকদের হাতে চাঁদ থেকে সূর্যের এবং তারকাদের দূরত্ব পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার তুলে দেন; তৃতীয়ত, রাশি রাশি চার্ট তৈরি করে দরিয়ায় দ্রাঘিমা নির্ণয়ের কাজকে অনেক সহজ করে তোলেন। জার্মান জ্যোতির্বিদ মেয়ার তো নুরেমবার্গ থেকে তাঁর আকাশ-পাঠের ছবি, যন্ত্রপাতি, এবং দ্রাঘিমা নির্ণয়ের পদ্ধতি বিস্তারিত জানিয়ে ব্রিটিশ পুরস্কার দাবি করে বসেন। কর্তারা তাঁকে পুরস্কার দেননি বটে, কিন্তু পদ্ধতিটি পরখ করে স্বীকার করেছিলেন— সম্ভাবনাময়। হঠাৎ মেয়ার মারা যান। ব্রিটিশ বোর্ড প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে তাঁর বিধবাকে ৩০০০ পাউন্ড দেন। আর ৩০০০ পাউন্ড দেওয়া হয় গাণিতিক ইউলারকে। পরিস্থিতি বিচারে স্বীকার না করে উপায় নেই অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি অকূল দরিয়ায় দ্রাঘিমা খোঁজার কাজে জ্যোতির্বিদরা এগিয়ে গেছেন অনেক দূর। বিশ্বজোড়া তাঁদের উদ্‌যোগের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন একমাত্র নিঃসঙ্গ কারিগর হ্যারিসন। তিনি দেখাতে চান সমস্যার সহজ মীমাংসা রয়েছে তাঁর জাদু-বাক্সে।

হ্যারিসন তাঁর চতুর্থ ঘড়ি 'এইচ-ফোর' তৈরি শেষ করেন ১৭৫৯ সালে। 'এইচ-থ্রি'-র পরীক্ষা তিনি আটকে রেখেছিলেন। এবার বোর্ডকে অনুরোধ জানালেন 'এইচ-থ্রি' এবং 'এইচ-ফোর' দুটি ঘড়িকেই একসঙ্গে সমুদ্রযাত্রায় পাঠাতে। স্থির হল তাঁর ছেলে উইলিয়াম হ্যারিসন যাবেন ঘড়ির সঙ্গে। উইলিয়াম 'এইচ-থ্রি' নিয়ে জাহাজ ধরতে পোর্টসমাউথ চলে গেলেন। কথা ছিল জন হ্যারিসন 'এইচ-ফোর' পৌঁছে দেবেন তাঁর কাছে। কিন্তু কোথায় জাহাজ? পাঁচ মাস জাহাজের জন্য নিষ্ফল অপেক্ষার পর উইলিয়াম লন্ডনে ফিরে এলেন। এ-সব ১৭৬১ সালের কথা। এক মাস পর বোর্ড শেষ পর্যন্ত 'এইচ এম এস ডেস্টফোর্ড' নামে একটি জাহাজে তুলে দেন হ্যারিসন-তনয়কে। তাঁর সঙ্গে গেল দুটি নয়, একটি ঘড়ি—সেই টাইমকিপার 'এইচ-ফোর'। 'এইচ-থ্রি' জন হ্যারিসনের কাছে রয়ে গেল। পথে ঘড়ি জটিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তিন মাস লেগেছিল অতলান্তিক পার হতে। জাহাজের কাপ্তেন ডিগস ঘড়ির বাহাদুরি দেখে চমৎকৃত। চমৎকৃত জাহাজে মোতায়েন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং বোর্ডের প্রতিনিধিরাও। উত্তেজিত কাপ্তেন বললেন— এ-ঘড়ি যখন তোমরা বাজারে ছাড়বে তখন প্রথম ঘড়িটি কিন্তু আমাকে দিতে হবে। একাশি দিন চলার পর হিসাব করে দেখা গেছে ঘড়ি সময় হারিয়েছে মাত্র ৫ সেকেন্ড। কাপ্তেন বিদেশ থেকেই অভিনন্দন জানালেন জন হ্যারিসনকে।

ফেরার পথে ঝড় সমুদ্রে। জল থেকে ঘড়ি বাঁচাতে উইলিয়াম প্রথমে কম্বলে জড়িয়ে রাখেন সেটিকে। কম্বল ভিজে যাওয়ার পর নিজেই ভিজা কম্বল জড়িয়ে তা শুকাবার চেষ্টা করেন। তবু ঘড়ি ঠিকঠাক চলে। বোর্ডের সব শর্ত পূরণ করেছে হ্যারিসনের টাইমকিপার—'এইচ ফোর'। সুতরাং, ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে সাফল্যের সঙ্গে ফিরে আসার পর এই ঘড়ির প্রস্তুতকারক হিসাবে দ্রাঘিমা-নির্ণয়ের জন্য পুরস্কার তখনই মিটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল হ্যারিসনকে। তবু জন হ্যারিসন পুরস্কার পেলেন না। বরং বিনিময়ে পেলেন অপমান এবং লাঞ্ছনা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে ঘড়ি ফিরে আসার পর বোর্ড সব সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষা করে এই

সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, সাফল্য তর্কাতীত নয়। সমুদ্রে দ্রাঘিমা নির্ণয়ে এ-ঘড়ি যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন 'এইচ-ফোর'-কে আবার একবার পরীক্ষা করে দেখা। সুতরাং, হ্যারিসন পুরস্কার পেলেন না। তবে বোর্ড তাঁকে ১৫০০ পাউন্ড দিলেন। কেননা, তাঁরা মনে করেন এই আবিষ্কার একদিন সাধারণের উপকারে লাগবে। ওঁরা কথা দিলেন দ্বিতীয় পরীক্ষার পর তাঁকে আরও ১০০০ পাউন্ড দেওয়া হবে।

ঘড়ির সাফল্য সত্ত্বেও জন হ্যারিসন কেন বঞ্চিত হলেন পুরস্কার থেকে সে এক প্রশ্ন বটে। এই জটিল প্রশ্নের সহজ উত্তর— তাঁর তুলনায় প্রতিপক্ষ ছিলেন অনেক বেশি শক্তিমান। পরোক্ষে তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং গাণিতিকদের। তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবেই যেন মূর্তিমান প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়ান একজন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী, তিনি রেভারেন্ড নেভিল ম্যাস্কেলাইন। জন হ্যারিসনের চেয়ে চল্লিশ বছরের ছোট ম্যাস্কেলাইন ছিলেন এক তুখোড় জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি কেমব্রিজের ছাত্র। যাজকের পাঠও নিয়েছিলেন। কেমব্রিজ সূত্রেই তৃতীয় রাজকীয় জ্যোতির্বিদ জেমস ব্রাডলির সংস্পর্শে আসেন নবীন বিজ্ঞানী। ১৭৫৫ থেকে ১৭৬০ ওঁরা দু'জনে মিলেই দ্রাঘিমা প্রশ্নের মীমাংসায় ব্রতী হন। দু'জনেরই আস্থা আকাশে, চান্দ্র পদ্ধতিতে। গ্রিনিচ ছাড়াও ম্যাস্কেলাইন সেন্ট হেলেনায় গিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি সেন্ট হেলেনার দ্রাঘিমাও নির্ধারণ করেন। ১৭৬১ সালে উইলিয়াম হ্যারিসন যখন বাবার ঘড়ি নিয়ে পাড়ি জমিয়েছেন জামাইকায়, ম্যাস্কেলাইন তখন তাঁর বিদ্যাকে আরও ধারালো করে তোলেন। তিনি মেয়ার-এর চার্টের সঙ্গে ব্রাডলির এবং নিজের চার্ট তুলনা করেন এবং যান্ত্রিক সাহায্যে নিজেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। ম্যাস্কেলাইনের আর-এক স্মরণীয় কীর্তি ১৭৬৬ সালে 'ন্যাশনাল অ্যালমেনাক অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এফেমেরিজ' প্রকাশ। ১৮১১ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে এই নাবিক-সহচর। ব্রাডলি মারা যাবার পর নতুন তথা চতুর্থ রাজকীয় জ্যোতির্বিদের পদে বসেন নাথানিয়েল ব্লিস। তিনিও চান্দ্র গণনার পক্ষে। ঘড়ির ওপর তাঁর কোনও আস্থা নেই। নৌবাহিনীর কর্তাদেরও বলতে গেলে তাই। তাঁরাও জানেন না ঘড়িটি কীভাবে সঠিক সময় দিচ্ছে। সবাই মিলে হ্যারিসনকে নিয়ে পড়লেন। ঘড়ির কারিকুরি জানা চাই। হ্যারিসন বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ যদি তিনি মারা যান তা হলে কী হবে? পুত্র উইলিয়াম যদি পরীক্ষা দিতে গিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে যান! তা হলে কি চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে না ঘড়ির করণ-কৌশল? এঁদের চাপে পড়ে বোর্ড হ্যারিসনকে অনুরোধ করলেন পুরো তথ্য পেশ করতে। হ্যারিসন বললেন, আমার আবিষ্কার চুরি হয়ে যাবে না তো? তিনি তাঁর ঘড়ি তৈরির কৌশল প্রকাশের বিনিময় হিসাবে ৫০০০ পাউন্ড চাইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অর্থ মঞ্জুর হল না। ১৭৬৪ সালে 'এইচ এম এস টার্টার' চড়ে হ্যারিসনের ঘড়ি চলল বারবাদোস। সেখানে গিয়ে দেখা গেল নাথানিয়েল ব্লিস এবং ম্যাস্কেলাইন অপেক্ষা করছেন হ্যারিসনের ঘড়ির জন্য। ম্যাস্কেলাইনের ধারণা আকাশের সাহায্যে দ্রাঘিমা নির্ণয়ের পদ্ধতিটি পাকা হয়ে গেছে, অতএব পুরস্কার তিনিই পাবেন। একদিন তিনি নাকি বলেছিলেন— এই পুরস্কার আমি আর মেয়ার কবে পেয়ে যেতাম, বাদ সাধছে এই ঘড়িওয়ালা। স্বভাবতই ওঁদের তরফে বলা হল এ-ঘড়ির যোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়।

মাস কেটে যায়, কিন্তু বোর্ডের কোনও উচ্চবাচ্য নেই। শেষ পর্যন্ত ১৭৬৪ সালে ওঁরা

রায় দিলেন টাইমকিপারটি ঠিকঠিক সময় জানিয়েছে। দশ মাইলের মধ্যে দ্রাঘিমা ধরে দিয়েছে এই ঘড়ি। কিন্তু হ্যারিসনকে সব-কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে। তাঁরা অবশ্য পুরস্কারের অর্ধেক অর্থ দিতে সম্মত। তবে সব ক'টি ঘড়ি দিয়ে দিতে হবে। তার চেয়েও জরুরি, ওঁরা বললেন, 'এইচ-ফোর'-এর আদলে আরও দুটো ঘড়ি তৈরি করতে হবে। প্রমাণ করতে হবে এগুলো ইচ্ছেমতো তৈরি করা সম্ভব। বোর্ড যখন হ্যারিসনের অর্থ নিয়ে এই আলোচনা জানাচ্ছেন, তখন সেখানে এসে হাজির হলেন ম্যাস্কেলাইন। মাত্র দু' বছর অ্যাস্ট্রোনমার রয়াল বা রাজকীয় জ্যোর্তিবিদের পদে থাকার পর ব্লিস মারা যান। ১৭৬৫-তে অতএব বোর্ডে যোগ দেন নতুন রাজকীয় জ্যোতির্বিদ নেভিল ম্যাস্কেলাইন। তাঁর বয়স তখন মাত্র ৩২ বছর। তিনি বললেন, টাকা যদি কাউকে দিতে হয়, তবে কিছু অন্তত দেওয়া উচিত সেই জার্মান জ্যোতির্বিদের বিধবা স্ত্রীকে এবং তাঁর সহযোগী গাণিতিককে। বোর্ড অবশ্য তা দিয়েছিলেন। ম্যাস্কেলাইন জ্যোতির্বিদদের আবিষ্কৃত পদ্ধতি নিয়ে রীতিমতো বক্তৃতা জুড়লেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চারজন কাপ্তেনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁরা সাক্ষী দিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নির্দেশ মেনে তাঁরা মহাসমুদ্রে দ্রাঘিমা ধার্য করার ব্যাপারে বিলক্ষণ সাহায্য পাচ্ছেন। তাঁরা বললেন, চার্ট ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হোক চারদিকে, তাতেই কাজ হবে। হাওয়া স্পষ্টতই হ্যারিসনের অনুকূলে নয়।

সে বছরই (১৭৬৫) দ্রাঘিমা সংক্রান্ত আইন সংশোধন করে আরও কিছু শর্ত আরোপ করা হয়। যেন হ্যারিসনকে প্রতিহত করাই আইনের লক্ষ্য। ক্ষুব্ধ হ্যারিসন সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে আসছিলেন। তাঁকে কোনওভাবে নিরস্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি ঘড়ি সম্পর্কে লিখিত বিবরণ দিতে রাজি হলেন। এই প্রতিশ্রুতিও দেন যে বিশেষজ্ঞদের সামনে তিনি তাঁর ঘড়ি খুলে দেখাবেন। সে বছরই লন্ডনের রেড লায়ন স্কোয়ারে তাঁর বাড়িতে বিশেষজ্ঞ সমাবেশ। সে-দলে ম্যাস্কেলাইনও ছিলেন। ছ'দিন ধরে ঘড়ি খোলা হল। হ্যারিসন প্রতিটি যন্ত্রাংশ ব্যাখ্যা করলেন, প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ওঁরা বললেন, এবার ঘড়িটি তুলে দাও আমাদের হাতে। নৌবাহিনীর সদর দপ্তরে সিন্দুকে বন্দি করে রাখা হবে এই ঘড়িকে। তোমাকে কোনও সাহায্য ছাড়াই আরও দুটি ঘড়ি তৈরি করে দিতে হবে। হ্যারিসন ঘড়ির বিবরণ জানিয়ে ডায়াগ্রাম ইত্যাদি যা বোর্ডের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, ম্যাস্কেলাইন সর্বসাধারণের জন্য সেগুলো ছাপিয়ে দেন। তবু বলা হল নকল ঘড়ি করতে কোনও ডায়াগ্রাম বা লিখিত বিবরণ দেওয়া হবে না তাঁকে। বোর্ড অবশ্য এ-সবের বিনিময়ে হ্যারিসনকে ১০,০০০ পাউন্ড মঞ্জুর করেছিলেন। তবে আরও লাঞ্ছনা বাকি ছিল হ্যারিসনের। পরের বছর, ১৭৬৬ সালে এপ্রিলে বোর্ড জানাল নৌবাহিনীর কাছ থেকে ঘড়ি নিয়ে যাওয়া হবে দশ মাসের জন্য গ্রিনিচে। নেভিল ম্যাস্কেলাইন প্রতিদিন সেটিকে পরীক্ষা করে দেখবেন। বড় ঘড়িগুলোকেও তাঁকে গ্রিনিচের মানমন্দিরে জমা দিয়ে দিতে হবে। সেখানকার ঘড়ির সঙ্গে এগুলিকে মিলিয়ে দেখা হবে। ক'দিনের মধ্যেই নেভিল ম্যাস্কেলাইন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে হাজির হলেন জন হ্যারিসনের বাড়িতে। অসহায় হ্যারিসন দেখলেন তাঁর হাতে গড়া ঘড়ি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তিরিশ বছর ধরে এগুলো ছিল তাঁর সঙ্গী। তবু ছেড়ে দিতে হল। একটা সাধারণ গাড়িতে ঘড়ি বোঝাই করে ম্যাস্কেলাইন বিজয়ীর মতো ফিরে গেলেন গ্রিনিচ।

ছ' বছর পরে ১৭৭২ সালে স্থির হল হ্যারিসনের ঘড়ি আবার পরখ করা হবে। রেজলিউশন জাহাজ নিয়ে দ্বিতীয় অভিযানে যাচ্ছেন কাপ্তেন কুক। তাঁর সঙ্গে যাবে 'এইচ-ফোর'। কিন্তু বোর্ড বেঁকে বসলেন। তাঁরা বললেন যে-পর্যন্ত-না পুরস্কারের প্রশ্নটি চূড়ান্ত হয়, ততদিন পর্যন্ত এ-ঘড়ি দেশেই রাখতে হবে। দু'-দুটি অভিযানে গিয়েছিল 'এইচ-ফোর'। তিন-তিনজন কাপ্তেন অনুমোদন করেছেন, বোর্ডের তরফেও প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গ্রিনিচের মানমন্দিরে পরীক্ষা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হল ঘড়ি। হ্যারিসন এই ব্যর্থতার দায় চাপালেন ম্যাস্কেলাইনের ওপর। ছয় পেনি দামের একটি পুস্তিকা ছাপিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, এই ঘড়ি ঠিকমতো চালানো হয়নি। তবে কাপ্তেন কুকের সঙ্গে যাবে কোন ঘড়ি? হ্যারিসনের আরও দুটি ঘড়ি তৈরি করার কথা। কথা ছিল, তৈরি করতে হবে স্মৃতি থেকে। দয়াপরবশ হয়ে বোর্ড অবশ্য তাঁকে একটি বই দিয়েছিলেন। সেটি তাঁরই লেখা বিবরণ এবং ড্রয়িং-এর সংকলন, যেটি ম্যাস্কেলাইন সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করেছিলেন। অন্যরাও তৈরি করতে পারেন কি না দেখবার জন্য বোর্ড কেন্ডাল নামে একজন কারিগরকে নিয়োগ করেছিলেন। আড়াই বছরের চেষ্টায় ১৭৭০ সালে কেন্ডাল তৈরি করেন 'এইচ ফোর'-এর নকল 'কে-ওয়ান'। এদিকে বৃদ্ধ ক্ষীণদৃষ্টি অসুস্থ হ্যারিসনও কোনওমতে তৈরি করলেন আরও একটি নকল ঘড়ি 'এইচ-ফাইভ'। গিল্ড হলের জাদুঘরে আদি কাঠের বাক্সে এখনও রয়েছে সেটি। এ-ঘড়ির কাজ যখন শেষ হয় হ্যারিসনের বয়স তখন ৭৯। দ্বিতীয় ঘড়ি কেমন করে তৈরি করবেন তিনি? আর করলেই বা বোর্ড তার পরীক্ষা কবে করবে তাই-বা কে জানে! নৈরাশ্য ঘিরে ধরল বৃদ্ধ হ্যারিসনকে। যে করেই হোক এর একটা প্রতিবিধান করত হবে তাঁকে। এভাবে হার মানতে রাজি নন তিনি।

শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করলেন স্বয়ং দেশের রাজাকেই সব-কিছু জানাবেন খোলাখুলি। বিচার চাইবেন। ইংল্যান্ডের সিংহাসনে তখন রাজা তৃতীয় জর্জ। তাঁর বিজ্ঞানে আগ্রহ ছিল। হ্যারিসনের 'এইচ ফোর' সম্পর্কেও তিনি খোঁজখবর রাখতেন। রাজা তৃতীয় জর্জ নিজস্ব একটি মানমন্দির গড়ে তুলেছিলেন ১৭৬৯ সালে শুক্রগ্রহ পর্যবেক্ষণ করবেন বলে। তাঁর মানমন্দির ছিল রিচমন্ডে। যা হোক, ১৭৭২ সালে উইলিয়াম হ্যারিসন বাবার তরফে সব বৃত্তান্ত জানিয়ে রাজা তৃতীয় জর্জের কাছে আবেদন জানান। বোর্ড এবং গ্রিনিচের মানমন্দিরে কেমন হেনস্থা হয়েছেন, সে-সবও বললেন তিনি। উইলিয়াম জানতে চাইলেন তাঁর বাবার শেষ ঘড়িটি কি রাজার নতুন মানমন্দিরে রেখে পরীক্ষা করা যেতে পারে? উইলিয়ামকে তৃতীয় জর্জ প্রাসাদে ডেকে পাঠালেন। তিনি নাকি সব শুনে বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'দিজ পিপল হ্যাভ বিন ক্রুয়েলি ট্রিটেড।' উইলিয়ামকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি দেখব, যাতে তোমরা ন্যায়বিচার পাও। 'এইচ-ফাইভ' রাজার নিজস্ব মানমন্দিরে ঠাঁই পেল। প্রথমে গোলমাল করলেও পরে দেখা গেল ঘড়ি ঠিক আছে। রাজা প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে বললেন, হ্যারিসনের প্রতি যা করণীয় সেই সুবিচার করা হোক। আবার বোর্ড বসল। পার্লামেন্টের দু'জন প্রতিনিধি হাজির থাকলেন সেখানে। তার পর খাস পার্লামেন্টে বিতর্ক চলল তিন দিন ধরে। হ্যারিসন পার্লামেন্টের কাছে আবেদন জানালেন, যদিও ঘড়ি আমার সফল তবু আধখানা মাত্র পুরস্কার পেলাম। সেইসঙ্গে সম্ভব অসম্ভব রকমারি দাবি পূরণ করতে হল আমাকে। পার্লামেন্ট ক'সপ্তাহ পরে ওঁর নামে

মঞ্জুর করে ৮,৭৫০ পাউন্ড। হরে দরে সব মিলিয়ে হয়তো পুরস্কারের পুরো টাকাটাই পেয়েছিলেন জন হ্যারিসন। কিন্তু পুরস্কার তিনি পাননি। কেউই পাননি। ১৭৭৩ সালে আরও কড়াকড়ি করা হয় আইন। আগের আইনগুলো বাতিল করে নতুন নতুন শর্ত। ঘড়ি হলে একসঙ্গে জমা দিতে হবে দুটি! একশো বছরের বেশি দিন ধরে বহাল ছিল দ্রাঘিমা বিষয়ক ব্রিটিশ আইন। সেটি রদ হয় ১৮২৮ সালে। দরিয়ায় দ্রাঘিমার সন্ধানে সাকুল্যে ১ লক্ষ পাউন্ড খরচ করেছিলেন ওঁরা। কিন্তু জন হ্যারিসন ছাড়া এক অর্থে পুরস্কারের দাবিদারও ছিলেন না কেউ।

উল্লেখ্য, হ্যারিসনের ঘড়ি অন্যভাবে পুরস্কৃত হয়েছিল কিন্তু আরও একবার। ১৭৭৫ সালে তাঁর দ্বিতীয় অভিযান সেরে কাপ্তেন কুক স্বীকার করেন তাঁর সঙ্গে যে-ঘড়িটি সমুদ্রযাত্রায় গিয়েছিল সেটি ছিল অতিশয় সহায়ক। ওই টাইমপিস রীতিমতো মূল্যবান নাবিকের কাছে। কুক অবশ্য হ্যারিসনের ঘড়ি নিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর সঙ্গে ছিল কেন্ডালের গড়া 'এইচ ফোর'-এর নকল 'কে-ওয়ান'। কেন্ডালের ঘড়ির প্রশংসা করতে গিয়ে কাপ্তেন কুক কিন্তু হ্যারিসনের কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি।

জন হ্যারিসন মারা যান ১৭৭৬ সালে, তিরাশি বছর বয়সে। জীবৎকালে এই গ্রামের কারিগর কিংবদন্তি। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর খ্যাতি। লোকমুখে তাঁর নাম হয়ে যায়—'জন লংগিচ্যুড হ্যারিসন'। সমকালের বিখ্যাত সব জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গাণিতিক এবং যন্ত্রবিদদের সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাঁর নাম। তাঁর ঘড়ি সাহিত্যে, কাব্যে ঠাঁই করে নেয়। দর্শনীয় যন্ত্র হিসাবে দেশ-দেশান্তরের মানুষকে লন্ডনে টেনে আনে। শিল্পী ঘড়ি সমেত তাঁর তৈলচিত্র আঁকেন। নাবিকেরাও তাঁর নাম শুনে প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে ওঠেন। মৃত্যুর পরও কিন্তু রীতিমতো খ্যাতিমান মানুষ তিনি। এখনও। লন্ডনে ঘড়ি-কারিগরদের নিজেদের জাদুঘরে এবং গ্রিনিচের ঐতিহাসিক মানমন্দিরে এখনও সসম্ভ্রমে এবং সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তাঁর তৈরি ঘড়িগুলো। গ্রিনিচে সে-সব ঘড়ির টানে এমন স্বেচ্ছাসেবী ছুটে এসেছেন যিনি বছরের পর বছর ধরে বিনা পারিশ্রমিকে জন হ্যারিসনের ঘড়িগুলোর সেবাযত্ন করে সেগুলো বাঁচিয়ে রাখার কাজে সাহায্য করেছেন। এখনও প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ গ্রিনিচের মানমন্দির ও সংগ্রহশালা দেখতে এসে অপলক চোখে তাকিয়ে দেখেন অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের এক গ্রামের 'অশিক্ষিত' কারিগরের বিস্ময়কর সৃষ্টি। লেখক দাবা সোবেল বলেন, আগের কোনও শতকে হলে হয়তো হ্যারিসনকে পুড়িয়ে মারা হত শয়তানের অনুচর বলে। হ্যারিসনের ঘড়ি ঘড়ি তো নয়, যেন স্বয়ং হ্যারিসন। গ্রিনিচে ওঁরা ঘড়িগুলোকে বলেন—'দ্য হ্যারিসনস'। দাবা সোবেল দ্রাঘিমা এবং জন হ্যারিসনের কাহিনী লিখতে গিয়ে নিজেও হানা দিয়েছিলেন গ্রিনিচে। প্রতিটি ঘড়ির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা লিখেছেন যেমন সুশিক্ষিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাত্রের মতো, ঘড়ি সম্পর্কে লিখতে বসেও তেমনই তিনি যেন এক কুশলী ঘড়ি-কারিগর। এই মার্কিন ভদ্রমহিলা মূলত সাংবাদিক হলেও তাঁর সাংবাদিকতা বিজ্ঞান নিয়ে। এক সময় ছিলেন 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর বিজ্ঞান প্রতিবেদক। এখন নানা কাগজে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ-লেখক। এই পাঠকের জ্যোতির্বিদ্যা বা ঘড়ির অন্তর্লোক কোনও বিষয়েই অধিকার নেই। ফলে লেখকের হাত ধরে আকাশ

এবং সেদিনের পৃথিবী পরিক্রমা করলেও জন হ্যারিসনের জীবনকাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা মাত্র পেশ করতে পেরেছি আমি। দাবা সোবেল কিন্তু একটি মাত্র বাক্যে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন হ্যারিসনের বিস্ময়কর কৃতিত্বের কথা।— হ্যারিসনের বাহাদুরি এই, নক্ষত্রলোক থেকে তিনি ছিনিয়ে এনেছেন পৃথিবীর ঠিকানা, এবং গোপন রহস্যকে বন্দি করেছেন পকেট ঘড়ির মধ্যে।

সমুদ্রে সঠিক দ্রাঘিমা নির্ণয়ে সমর্থ হলেও দুর্ভাগ্যবশত হ্যারিসনের ঘড়ি প্রাপ্য পুরস্কার পায়নি। তবু হ্যারিসন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরস্কৃত। তাঁর মৃত্যুর ক' বছরের মধ্যেই দেখা গেল নাবিকদের পকেটে পকেটে সমুদ্র-ঘড়ি,—'ক্রনোমিটার'। বলা হয় দুনিয়া জোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলার কাজে বিশেষ ভূমিকা এই 'ক্রনোমিটার'-এর। 'ক্রনোমিটার'-এর বলেই তরঙ্গকে শাসন করতে সমর্থ হয়েছিলেন ব্রিটানিয়া।

জন হ্যারিসন 'ক্রনোমিটার' তৈরি করেননি। যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা ঠিক তাঁর নকশাও অনুসরণ করেননি। তাঁর ভূমিকা পথপ্রদর্শকের। আকাশ থেকে নাবিকদের চোখ তিনি যন্ত্রে টেনে আনতে চেয়েছিলেন। ক্রমে অবশ্য জ্যোতির্বিদরা আরও উন্নত চার্ট ইত্যাদি তৈরি করেছিলেন নাবিকদের জন্য। কিছু যন্ত্রপাতিও হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁদের। তবু ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং জটিল হিসাবনিকাশের প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া জরুরি ছিল আকাশের অবস্থা। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ঠিক আছে, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা পথ দেখাবে, দ্রাঘিমা ধরা দেবে। কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে? হ্যারিসনের উত্তরসূরিদের বাহাদুরি এখানেই। তাঁরা নাবিকদের জন্য তৈরি করলেন বিশ্বস্ত সঙ্গী। আকাশপন্থী এবং ঘড়িপন্থীদের বিতর্ক দেখতে দেখতে মিটে গেল। হ্যারিসনের বিজয়পতাকা হাতে নিয়ে আসরে আবির্ভূত হলেন ক্রনোমিটার-নির্মাতারা। তাঁরাও ঘড়িওয়ালা। তাঁদের যন্ত্রের কাছেই শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে ধরা দিল ফেরারি দ্রাঘিমা।

'ক্রনোমিটার' শব্দটি নেহাত কথাচ্ছলে ব্যবহার করেছিলেন জেরেমি থ্যাকার ১৭১৪ সালে। কিন্তু শব্দটি চালু হয় অনেক পরে। ১৭৭৯ সালে। চালু করেছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কর্মচারী। জন হ্যারিসনের পর 'ক্রনোমিটার' তৈরিতে হাত লাগিয়েছিলেন একাধিক ইংরেজ ঘড়ি-কারিগর। হ্যারিসনের উদ্‌যোগ উৎসাহিত করেছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশের, বিশেষত ফ্রান্সের ঘড়ি-নির্মাতাদের। যা হোক, ইংল্যান্ডে প্রথম পকেট ক্রনোমিটার ওরফে নাবিকের ঘড়ি তৈরি করেন জন আর্নল্ড নামে এক কারবারি ১৭৭৯ সালে। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ান টমাস আর্নশ নামে আর-এক কারিগর। দু'জনের ঘড়িই পরীক্ষা করা হয়েছে গ্রিনিচের মানমন্দিরে। দু'জনকেই ৩০০০ পাউন্ড করে দিয়েছেন লংগিচ্যুড বোর্ড। আর্নল্ড-এর বাক্সে রাখা 'ক্রনোমিটার'-এর দাম ছিল ৮০ পাউন্ড, আর্নশ-এর— ৬৫ পাউন্ড। পকেট 'ক্রনোমিটার' অবশ্য আরও কমে হত। শতকের শেষ দশকে দেখা গেল চড়া দাম সত্ত্বেও বেড়ে চলেছে 'ক্রনোমিটার'-এর চাহিদা। কাপ্তেনরা নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করেই কিনছেন সামুদ্রিক-ঘড়ি।

ক্রমে দেখা গেল ব্রিটিশ নৌবিভাগ নিজেরাই সংগ্রহ করছেন 'ক্রনোমিটার'। কাপ্তেনরা যাতে হাতের কাছে পান তার জন্য পোর্টসমাউথ, এবং নৌবাহিনীর সদরদপ্তরে সেগুলো

গুছিয়ে রাখা হচ্ছে। হ্যারিসনের ধ্যান রীতিমতো সংক্রামিত। কোনও কাপ্তেনই যেন আর 'ক্রনোমিটার' ছাড়া সমুদ্রে জাহাজ ভাসাতে রাজি নন! কোনও কোনও জাহাজে একাধিক 'ক্রনোমিটার' রাখা হচ্ছে তখন। মহাসমুদ্রে নতুন শতক বুঝিবা এই নতুন যন্ত্রের করতলগত। জরিপের জন্য যে-সব বড় বড় জাহাজ সেগুলিতে ৪০টি পর্যন্ত 'ক্রনোমিটার'। ১৮৩১ সালে ডারউইন 'বিগল' নামে যে-জাহাজটি নিয়ে গালাপাগস অভিযান করেছিলেন তাতে ছিল ২২টি 'ক্রনোমিটার'। ১৮৬০ সালে রাজকীয় নৌবহরে জাহাজ যদি মোটামুটি ২০০, তবে সেগুলোতে 'ক্রনোমিটার' ৮০০। সঠিক তারিখ ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে ১৭৩৭ সালে পৃথিবীতে ক্রনোমিটার ছিল ১টি, আর ১৮১৫ সালেই তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ হাজারে! ঘড়িওয়ালা জন হ্যারিসন বাহাদুর বটে!

দাবা সোবেল, 'লংগিচ্যুড: দ্য ট্রু স্টোরি অব আ লোন জিনিয়াস হু সলভড দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিফিক প্রবলেম অব হিজ টাইম'
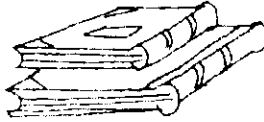
আধি-ব্যাধির ইতিবৃত্ত
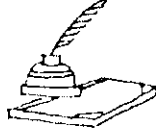
এবার অন্য ইতিহাস। এই ইতিহাসও অভিযানের। সাম্রাজ্যের। মানুষের সাম্রাজ্যের এবং মানুষ নয় এমন শমনের। এই ইতিহাস দুয়ের মধ্যে লড়াইয়ের। জয় এবং পরাজয়ের।

প্রথমে কলেরার কথাই ধরা যাক। পরিচিত ব্যাধি। এখন মোটামুটি সবাই জানেন কলেরা জলবাহিত ব্যাধি। দূষিত জল থেকে এ-ব্যাধির সংক্রমণ। পচা খাবার, পচা মাছ, কাটা ফল এবং নানা সূত্রে সংক্রমণ ছড়ায়। এ-ব্যাপারে মাছিরও কিছু ভূমিকা আছে। কলেরার টিকা আছে, চিকিৎসা আছে, তবু কখনও কখনও মহামারী দেখা দেয়। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মারা যায়। আমরা দুঃখ করি। আতঙ্কিত হই, কিন্তু আশ্চর্য হই না। এই কালান্তক ব্যাধি যদি হঠাৎ হানা দেয় দূর মস্কো কিংবা লন্ডন শহরে, তখন সে-ঘটনা নিশ্চয়ই অন্যরকম ঠেকতে পারে। অন্তত ১৮৩০ সালে ইউরোপের মানুষের কাছে তাই মনে হয়েছিল। তারা অচেনা ব্যাধির মারণক্ষমতা দেখে আতঙ্কে শিহরিত হয়ে উঠেছিল। ইউরোপ তখন সম্পদে ও শক্তিতে অনন্য। শিল্পবিপ্লব চলছে। বিশ্বময় নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমের নানা জাতির সাম্রাজ্য। শহরে শহরে জনসংখ্যা ফুলে-ফেঁপে উঠছে। এ স্ফীতির তুলনা নেই। যাযাবর থেকে মানুষ যখন কৃষি-নির্ভর হয়, তখন দুই ঘটনার মধ্যে দূরত্ব ছিল অন্তত হাজার বছরের। তুলনায় শিল্পসমৃদ্ধির সঙ্গে শহরের রূপান্তর ঘটে কিন্তু অনেক দ্রুত, দুই শতকের মধ্যে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ইউরোপের অনেক দেশে। উনিশ শতকে ঐশ্বর্য যেন উপচে পড়ছে। যন্ত্রযুগের এই সাফল্যের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত মূর্তিমান শমন—কলেরা।

ইউরোপের শহরে শহরে তখন ভিড় করছেন গাঁয়ের মানুষেরা। গাঁয়ে কাজের অভাব, সেখানে সীমাহীন দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্য, সুতরাং নতুন শহরের হাতছানিতে অনেকেই সাড়া দিয়েছিলেন সেদিন। শহরেও কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি তাঁদের পক্ষে উন্নত ছিল না। ভিড় বেশি, আয়োজন কম, পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। কলকারখানার পাশেই গড়ে উঠেছিল গরিবের বসতি। বসতবাড়ির পাশেই আবর্জনার স্তূপ। বাতাস ও জল দুইই দূষিত। ওদিকে বাষ্পীয় জাহাজ এবং রেল চলাচল শুরু হয়েছে, এক বিন্দু থেকে মানুষ দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে

অন্য বিন্দুতে। অভিযাত্রী সৈন্যদল, ব্যবসায়ী, সাধারণ নাগরিক— সবাই এই দৌড়াদৌড়ির শামিল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুরা অভিযানে বের হয়, নতুন নতুন দেশ জয় করতে যেন। ফলে, একসময়ে দেখা গেল, বাংলার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ থেকে কলেরা পৌঁছে গেছে খাস ইউরোপে। ১৮৩০ সালে হঠাৎ রটে যায়, ভারত থেকে এক নতুন ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সীমানার বাইরে। সে-ব্যাধি কি ইউরোপে পৌঁছতে পারবে? কারও কারও মনে প্রশ্ন। অন্যরা তাকে গুজব বলেই ধরে নেন। তার প্রায় দু'শো বছর আগে বিউবোনিক প্লেগ ইউরোপকে ছারখার করে দিয়েছিল। মহাদেশের আরও কোনও কোনও অঞ্চলের মতো ব্রিটেনও পরিণত হয়েছিল মহাশ্মশানে। তার পর থেকে দ্বীপপুঞ্জ মহামারীমুক্ত, ফ্রান্সও তাই। একশো বছর আগে ফ্রান্সে অবশ্য টাইফাস মহামারীর চেহারা নিয়েছিল। তা ছাড়া ইউরোপিয়ানরা ছিলেন মহামারী সম্পর্কে কার্যত নিরুদ্‌বেগ। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন ইউরোপে এখানে-সেখানে হয়তো অল্পবিস্তর ম্যালেরিয়া বা ইয়েলো ফিবার দেখা দিতে পারে, কিন্তু মহাদেশের শীতল আবহাওয়ায় অন্য মহামারীর আশঙ্কা কম। এই নিরুদ্‌বিগ্ন জীবনেই হঠাৎ কলেরার পদধ্বনি।

কলেরা কি কোনও নতুন ব্যাধি? অনেক গবেষকের ধারণা সেরকমই। সাধারণত রোগজীবাণু সুপ্ত থাকে মনুষ্যেতর কোনও প্রাণী বা অন্য কোনও আশ্রয়ে। ক্রমে সংক্রমিত হয় নতুন আশ্রয় মানুষের শরীরে। একজনের শরীর থেকে ক্রমে অন্যদের শরীরে। তার পর দেশ থেকে দেশান্তরে সবর্জনের লক্ষ্যে— 'এনডেমিক' থেকে 'এপিডেমিক' এবং অবশেষে 'প্যানডেমিক'। এক থেকে বহু, বহু থেকে বিশ্বময় মহামারীর এভাবেই পর্ব থেকে পর্বান্তর। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কলেরা নতুন ব্যাধি। বাংলার গ্রামে দূষিত পুকুর এবং অন্য জলাশয় এই জীবাণুর প্রথম ঠিকানা। অবশ্য কারও কারও মতে কলেরা নতুন নয়, পুরনো ব্যাধি, তবে দীর্ঘকাল ধরে দৌরাত্ম্য সীমাবদ্ধ ছিল বাংলা মুলুকে। কখনও কখনও হয়তো তীর্থযাত্রীরা অন্যত্র জীবাণু বহন করে নিয়ে গেছেন, জলপথে কখনও বা পৌঁছেছে চিনের উপকূলে। তবে তার অধিকারের এলাকা কমবেশি পূর্ব পৃথিবীতেই ছিল। এ বিষয়ে তৃতীয় একটি মতও আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে নাকি আড়াই হাজার বছরের এমন ব্যাধির খবর রয়েছে যার সঙ্গে কলেরার লক্ষণ মিলে যায়। হবেও বা। তবে বাইরের পৃথিবীতে কলেরা ঘাতক হিসাবে চিহ্নিত হয় ১৮০০ সালের পর।

এই ব্যাধি প্রথম বিশ্বজয়ে বের হয় ১৮১৭ সালে। কলকাতা তখন দ্রুত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী হয়ে উঠছে। তার সম্পদ ও সমৃদ্ধির মতোই দর্শনীয় শহরের ভিড়। কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা কাঁচা বস্তিতে আচ্ছন্ন। রাস্তাঘাট সরু এবং পঙ্কিল। চার দিকে খোলা নর্দমা আর আবর্জনাপুঞ্জ। তারই মধ্যে কীটের মতো কিলবিল করছে মানুষ আর মানুষ। ওদিকে গোটা দেশ কলকাতার সঙ্গে দ্রুত বাঁধা পড়ছে, শিরার মতো ছড়িয়ে পড়ছে শহর। বন্দর থেকে বন্দরে আনাগোনা করছে মানুষ এবং পণ্য। কলকাতা বন্দর থেকে জাহাজ সমুদ্রে ভাসছে, ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়। ঐতিহাসিক বলছেন, জীবাণুরা যদি স্বপ্ন দেখতে জানত, তা হলে নিশ্চয় ভাবত এই পরিবেশ-পরিস্থিতির চেয়ে আনন্দদায়ক তাদের কাছে আর কী হতে পারত। ১৮১৭ সালে কলকাতা এবং যশোহরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কলেরায় প্রাণ হারান হাজার হাজার মানুষ। তাঁদের মধ্যে সেনাবাহিনীর লোকেরা ছিলেন। সেনাদের সঙ্গেই কলেরা একসময়ে হাজির হয়, এক দিকে নেপাল, অন্য দিকে আফগানিস্তানে। ওদিকে বন্দর

কলকাতা থেকে জলপথ ধরে চিন, জাপান প্রভৃতি দেশে। কাহিনী এখানেই শেষ নয়, দাস-ব্যবসায়ীরা ব্যাধি পৌঁছে দেয় আরব মুলুকে, তার পর পূর্ব আফ্রিকায়। ভারত এবং চিনের বাইরে কলেরা তখন সম্পূর্ণ অচেনা এক ব্যাধি। সুতরাং মানুষ মারা যান দলে দলে। এই মহামারী চলেছিল ছ' বছর ধরে। বিউবোনিক প্লেগের মতোই কলেরা সেদিন নানা দেশের মানুষের কাছে ত্রাস। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলা থেকে যাত্রারম্ভ করে কলেরা এভাবে বিশ্বপরিক্রমা করেছে ছয়-ছয়বার। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সপ্তম বিশ্বমহামারী বা 'প্যানডেমিক'। আপাতত তারই কাহিনী।

১৮৩০ সালের মহামারীতে ইউরোপের যে-শহরটি প্রথম কলেরার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল, তার নাম মস্কো। নেপোলিয়ান এই শহর থেকে মাথা হেঁট করে পিছু হটে এসেছিলেন। হিটলারও হার মেনেছিলেন, কিন্তু কলেরা মস্কোয় আক্রান্তদের শতকরা পঞ্চাশ জনেরই প্রাণ কেড়ে নেয় লহমায়। আতঙ্কিত নাগরিকেরা অনেকে পালিয়ে যান সেন্ট পিটার্সবার্গে। ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে সেখানে। সেখান থেকে পোল্যান্ড এবং জার্মানিতে। তার পর জলপথে ইংল্যান্ডে। ব্রিটেনের সমুদ্র বন্দর থেকে ব্যাধি সড়ক নদী ও খাল ধরে ছড়িয়ে পড়ে গোটা দ্বীপপুঞ্জে। ইউরোপের মানুষদের কাছে কলেরা সেদিন অভিশাপতুল্য শব্দ। এই শব্দটি আর মৃত্যু যেন সমার্থক। ইংল্যান্ড থেকে ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে আয়ারল্যান্ডে। ওদিকে পূর্ব ইউরোপের পর প্যারিস স্টকহোম— কোথায় নয়! ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাধি পৌঁছে যায় নতুন পৃথিবীতে। মেক্সিকো কিংবা অবশেষে মার্কিন মুলুকে। ১৮৩২ সালে ইতালির একটি অপেরা পার্টি ম্যানহাটনে অনুষ্ঠান করতে এসে দেখেন শহরের পথঘাট জনশূন্য। কোনও বাড়িতে প্রাণীর কোনও লক্ষণ নেই। গির্জার ঘণ্টাধ্বনি ছাড়া চার দিক নিস্তব্ধ। সচল বলতে শুধু কবরখানার পথে গাড়িগুলো।

ইংল্যান্ডে কলেরা শুধু মানুষের প্রাণই কেড়ে নেয়নি, সেইসঙ্গে কেড়ে নিয়েছিল শাসকবর্গের গরিমা, জাতির অহমিকা। বিশ্বজয়ী ইংরেজকে মাথা হেঁট করতে হয় কলেরার কাছে। এ ব্যাধি ঔপনিবেশিক ব্যাধি। অনগ্রসর উপনিবেশের অবদান এই ব্যাধি। ভিক্টোরিয়ান ভদ্রলোক তথা মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের কাছে এ-ব্যাধি অপমানস্বরূপ। তাঁদের পক্ষে ঈষৎ সান্ত্বনা এটুকুই যে, গরিবদের তুলনায় তাঁদের শ্রেণীর মানুষজন মরছেন কম কম। যাঁরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করেন, কম খেয়ে বা না-খেয়ে কোনওমতে বেঁচে থাকেন, কলেরার দাপট তাঁদের মহল্লাতেই বেশি। ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতার পক্ষে স্বদেশের গরিবদের এই অবস্থা নিশ্চয় উপভোগ্য ছিল না। বস্তুত, অন্য দেশের মানুষদের শাসন করার নৈতিক অধিকার এর পর ব্রিটেনের শাসকবর্গের কতখানি অবশিষ্ট আছে, সে-বিষয়েও আত্মজিজ্ঞাসার উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায় কলেরা। আমেরিকায়ও কলেরা প্রশ্নচিহ্নবিশেষ, কলেরা কি অহমিকা এবং পাপের ফল নয়? কে জানে। প্রার্থনা, উপাসনা ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়।

কলেরা চিকিৎসকদের পক্ষেও এক অস্বস্তিকর অপমানজনক প্রশ্ন। তাঁরা ভেবে পান না এর আদি কোথায়— দূষিত মাটি, না বাতাসে? ভেবে কূলকিনারা করতে পারছেন না। কলেরা কি ছোঁয়াচে ব্যাধি? সংক্রমণ তবে কীভাবে ছড়ায়? বস্তুত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্রমাগত এগিয়ে চললেও তুলনায় চিকিৎসাবিদ্যা তখনও বেশ পেছনে। বলতে গেলে মধ্যযুগে থমকে দাঁড়িয়ে আছে যেন। জোলাপ আর রক্তপাত— এই দ্বিবিধ ব্যবস্থাপত্র ছাড়া

চিকিৎসকদের খুব বেশি-কিছু করণীয় নেই। হাসপাতালে লোকেরা অতএব মরতে যান, সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে নয়। সাধারণ মানুষের কিন্তু ধারণা ছিল— কলেরা সংক্রামক ব্যাধি। ইউরোপে এই রোগ দেখা দেওয়া মাত্র তাঁরা রোগীদের স্বতন্ত্র রাখার দাবি জানাতে থাকেন। হাসপাতালগুলিকেও শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি ওঠে। কিন্তু চিকিৎসকরা এ-সব দাবি কানে তোলেন না। প্লেগ মহামারীর সময়ে শেষ পর্যন্ত সরকার এবং বৈদ্যরা এ দাবি মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু কলেরা সম্পর্কে তাঁরা পুরনো দাবির যৌক্তিকতা খুঁজে পান না। তা ছাড়া দাউদাউ মহামারীর মধ্যে এ-সব ব্যবস্থা গ্রহণ সহজও ছিল না। ইউরোপের কোনও দেশেই তখনও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা বা সুস্পষ্ট নীতি ছিল না। ইংল্যান্ড অবশ্য অন্যদের তুলনায় এ ব্যাপারে কিছুটা অনগ্রসর ছিল। প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছিল সেখানে কিন্তু স্বাস্থ্য তখনও ব্যক্তিগত ভাবনার বিষয়। এমনকী, মৌলিক স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিগুলিও অনেকের বিচারে ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। রোগীকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব যদিবা মেনে নেওয়া হয়, তবু তা কার্যকর করার ভার ছেড়ে দেওয়া হত পুলিশ, সামরিকবাহিনী এবং বিশেষ উপলক্ষে নিযুক্ত চিকিৎসকদের ওপর। তাঁদের দৃষ্টিতে সব রোগীই সমান ছিলেন না। অরওয়েল-এর ভাষায় বললে— কেউ কেউ বেশি সমান। ফলে রক্ষার নামে গরিবদের ওপর জোর-জবরদস্তি চলত, অনেক সময়ে। যাকে বলে রীতিমতো অত্যাচার। স্বভাবতই দেশে দেশে দেখা দেয় তার প্রতিক্রিয়া।

নিম্নবর্গের মানুষ লক্ষ করেন মহামারীতে তাঁদের তুলনায় উচ্চশ্রেণীর লোকেরা মরছেন কম। এজন্য নয় যে, গরিবদের তুলনায় তাঁদের নৈতিক মান ছিল উন্নত। কিংবা তাঁরা মাত্রাতিরিক্ত ধর্মপ্রাণ। আসলে তাঁরা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করতেন। তাঁদের নাগালে ছিল বিশুদ্ধ পানীয় জল, এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য। সাধারণ নাগরিকদের তুলনায় অতএব কলেরা তাঁদের প্রতি অনেক সদয় ছিল। মহামারী প্রবল আকার ধারণ করার পর ক্ষুব্ধ গরিবেরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। একসময়ে তাঁরা নিজেরাই রোগীদের বিচ্ছিন্ন রাখার দাবি জানিয়েছিলেন। সে-দাবি মেনে নেওয়ার পরে তাঁরা ক্রুদ্ধ। কেননা, জবরদস্তি করে লোকেদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তাঁদের রুজিরোজগার বন্ধ হবার জোগাড়। মহামারীর জন্য খাবারের দামও বেড়ে যায়। গরিবের বিক্ষোভ হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। সরব প্রতিবাদের পর শুরু হয় দাঙ্গাহাঙ্গামা। তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে— ধনীরা ভাল থাকবেন, আমরা গরিব বলেই ঝাঁকে ঝাঁকে মরব, এ কেমন কথা? এ-সব গরিবের ওপর ধনীর অত্যাচার, সম্পন্নদের ষড়যন্ত্র। গুজব রটে যায়, কলেরা কোনও ব্যাধি নয়, উদ্ধত গরিবদের খতম করার জন্য ধনীরা বিষ প্রয়োগ করে গণহত্যা চালাচ্ছে। আগেও এরকম ঘটেছে। মধ্যযুগে প্লেগের সময়ে সন্দেহবশে ইহুদিদের হত্যা করা হয়েছে। একালে 'এডস' নিয়েও কৃষ্ণাঙ্গরা নাকি এ-ধরনের অভিযোগ তোলার চেষ্টা করছেন। রাশিয়ায় তো কলেরা নিয়ে অনেক কাণ্ডই ঘটে যায়। ক্রুদ্ধ কৃষকেরা হামলাবাজি শুরু করেন। যে-সব ডাক্তার বা ম্যাজিস্ট্রেট রোগীকে স্বতন্ত্র করার নামে জবরদস্তি করছিলেন, তাঁদেরকে মেরে ফেলা হয়। হাঙ্গেরিতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে। গুজব রটে; বিষ প্রয়োগ করা হচ্ছে। অশান্ত গরিবেরা সম্পন্নদের গোরু ভেড়া ঘোড়া মেরে ফেলতে শুরু করেন। সামরিক অফিসার এবং অনেক সম্ভ্রান্ত নাগরিক খুন হন তাঁদের হাতে। প্রুশিয়ায়ও একই কাণ্ড। অভিযোগ এক-এক জনের মৃত্যুর জন্য রাজ্য পয়সা দিচ্ছেন

চিকিৎসকদের। অনেক চিকিৎসক এবং সরকারি কর্মচারী গরিবদের হাতে মারা যান। চিকিৎসকদের নিগ্রহের ঘটনাও ঘটতে থাকে। ইউরোপে এমনও রটে যায়, কলেরা এক কল্পকথা। ইংরেজরা ব্যাধির নাম দিয়ে অস্থির এবং দুর্বিনীত ভারতীয় মানুষকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করছিল। সেই বিষেই জর্জর ইউরোপ। কলেরা খুনি ভারতীয় শাসকদের মুখোশমাত্র। এমনও রটে যায় মেডিকেল স্কুলগুলোতে কঙ্কাল বিক্রি করে পয়সা রোজগার করার জন্য মানুষ মারা হচ্ছে।

এভাবেই অসংখ্য মৃত্যু এবং সম্ভব-অসম্ভব নানা গুজব ও ঘটনার মধ্যে একসময়ে ইউরোপে কলেরা মহামারী শান্ত হল। তখনও কেউ জানেন না এ-ব্যাধির পেছনে কার্যকারণ কী! ১৮৩৮-এর মহামারীর পরও কলেরা ইউরোপে কমবেশি রহস্যময় ব্যাধি। কেউ তখনও জানেন না, এ-ব্যাধি আবার কখনও ফিরে আসবে কি না। এক দশক পর আচমকা কলেরা আবার হানা দেয় ইউরোপে। তখনও ইউরোপ সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। ফলে, মহামারী আরও ভয়াবহ। ১৮৩২ সালের মহামারীতে এক মাসে যদি ইংল্যান্ডে দু' হাজার দুশো মানুষ মারা গিয়ে থাকেন, তবে ১৮৪৮ সালে মারা যান এক মাসে এগারো হাজার মানুষ। সেবার পরিবেশ-সম্পর্কিত কিছু সচেতনতা লক্ষ করা গিয়েছিল। দ্বিতীয় মহামারী উপলক্ষে আবির্ভূত হলেন সংস্কারকের দল। লন্ডনে পয়ঃপ্রণালী, জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি এবং ঘরবাড়িতে রোদ-হাওয়া চলাচলের সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা কিন্তু এই কলেরারই অবদান। ১৮৪৮-১৮৫৪ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন সংশোধিত হয়। আবর্জনা সংগ্রহ, পরিশুদ্ধ খাবার জল সরবরাহ, বস্তি উচ্ছেদ ইত্যাদি সরকারি দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হয়। কলেরাকে এজন্য বলা হয়, 'দ্য রিফর্মারস ফ্রেন্ড'। নগর সংস্কারকদের বান্ধব। প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে নাগরিকেরা জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে থাকলেও ক্রমে তাঁরা বুঝতে পারেন, নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, নিছক ব্যক্তিগত নয়। লন্ডন এবং অন্যান্য বড় শহরগুলোতে ব্যাপক সংস্কার কার্যকর করার ফলও হাতেনাতে মিলে যায় দুই দশকের মধ্যে। ১৮৬৮ সালে কলেরা যখন তৃতীয় বারের মতো ইংল্যান্ডে হানা দেয়, তখন সংক্রমণ ও মৃত্যুর ঘটনা অনেক কমে যায়। লন্ডনের সাফল্য দেখে ইউরোপের অন্যত্র এবং আমেরিকায় একইভাবে পরিবেশ উন্নয়ন ও বিবিধ স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্তন করা হয়। ফলে, ১৮৯০ সালে আবার যখন কলেরা মহামারীরূপে অভিযান চালায় সেবার ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা ছিল তার নাগালের বাইরে। পরিশুদ্ধ জল, রসায়ন-যোগে জল বিশুদ্ধকরণ থেকে শুরু করে পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন এবং প্রতিষেধক টিকা প্রবর্তনের ফলে শতকের মধ্যেই পশ্চিম দুনিয়া থেকে মাথা হেঁট করে আবার পূর্ব পৃথিবীতে ফিরে আসে কলেরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জলের সঙ্গে কলেরার সম্পর্ক প্রথম খুঁজে পান জন স্নো নামে লন্ডনের একজন চিকিৎসক। সোহো-র কাছে ব্রড স্ট্রিটের একটি নলকূপের শুধু হ্যান্ডেলটিকে পালটে দিয়ে তিনি ওই এলাকা থেকে কলেরাকে হঠিয়ে দেন। স্নো যখন জানতে পারেন এলাকার সবাই এই টিউবওয়েলের জল পান করেন, তখন তাঁর মনে সন্দেহ জন্মায়; এবং সেই সন্দেহ যে অমূলক নয়, হ্যান্ডেলটি পালটে দেবার পর হাতেনাতে তার প্রমাণও মিলে যায়। জন স্নো এবং ব্রড স্ট্রিটের এই কলের হ্যান্ডেলটিকে ঐতিহাসিকরা তুলনা করেছেন নিউটনের আপেল এবং ওয়াটস-এর কেটলির সঙ্গে।

ইতিহাসে 'যদি' নিয়ে জল্পনার অবকাশ নেই। তবু মনে প্রশ্ন ওঠে: যদি ইংরেজরা ভারতে

পা না দিত, যদি কলকাতায় তারা এক বন্দর-শহর গড়ে না তুলত, যদি স্থল এবং জলপথে পণ্য ও সৈন্য চলাচল শুরু না হত, তা হলে কি বাংলার ব্যাধি কলেরা ইউরোপে বার বার মৃত্যুদূত হয়ে এভাবে হানা দিতে পারত? একটু ভাবলেই বোঝা যায়, কলেরা ঔপনিবেশিক আমলের ব্যাধি না হলেও বিশ্বময় এ ব্যাধি যে মহামারী আকার ধারণ করতে পেরেছিল তার কারণ পূর্ব পৃথিবীতে ইউরোপের আধিপত্যের জন্য। সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্ভব করেছিল কালান্তক কলেরার ইউরোপে অভিযান চালাবার। তাই নয় কি? অবশ্য অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় মৃত্যুর এই উৎসবকে। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নামে অসংখ্য বিদেশির মৃত্যুর প্রতিফল কি উদ্ধত বিজয়ীদের ঘরে মহামারীর এই হানাদারি? কলেরা যেহেতু সভ্যতার শত্রু সেইহেতু এভাবে তাকে গ্রহণ করা ঠিক নয়। কিন্তু কেউ কেউ অবশ্যই ইতিহাসের ওই হাহাকারময় অধ্যায়টিকে গ্রহণ করতে পারেন। সেটা কুসংস্কার-আচ্ছন্নতার লক্ষণ কি না তা অবশ্য অন্য কথা।

এবার ধরা যাক আর-একটি মারাত্মক ব্যাধি সিফিলিসের কথা। ইউরোপে এই ব্যাধির প্রথম ব্যাপক প্রকোপ দেখা দেয় পঞ্চদশ শতকে। ১৪৯৫ সালে ফ্রান্সের রাজা অষ্টম চার্লস ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে নেপল্‌স অবরোধ করেন। এই বিশাল বাহিনীতে ছিল ইউরোপের নানা দেশের ভাড়াটে সৈন্যরা। নেপল্‌স-এর পতনের পর শুরু হয় লুঠতরাজ ও অনাচার-ব্যভিচার। সৈন্যদের পিছু পিছু যৌনকর্মীর দলও ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে। কয়েক মাস পরে শোনা যায়, ইউরোপে এক নতুন ধরনের যৌনব্যাধি দেখা দিয়েছে। ১৪৯৫ সালের আগস্টে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট প্রথম ম্যাক্সিমিলিয়ান ঘোষণা করেন, এ-ব্যাধি আগে কখনও দেখা যায়নি। এ-ব্যাধি ঈশ্বর-নিন্দাজনিত পাপের ফল। সকলেই মেনে নেন, ব্যাধিটি নতুন এবং তার সঙ্গে যৌনজীবনের সম্পর্ক রয়েছে। সে বছরেই সিফিলিস জার্মানি, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডে ত্রাস সৃষ্টি করে। ১৫০০ সালে পৌঁছে দেখা যায় এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে ডেনমার্ক, হল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, গ্রিস— বলতে গেলে গোটা ইউরোপে। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো ডা গামা এই ব্যাধিকে পৌঁছে দেন ভারতে। ১৫২০ সাল নাগাদ উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়া সিফিলিসের নাগালে আসে। তার পর চিনের উপকূল ধরে জাপানে। অবশেষে নতুন পৃথিবীতে, অর্থাৎ আমেরিকায়। এক কথায়, দাবানলের মতো কিছুকালের মধ্যেই বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে মারাত্মক ব্যাধি সিফিলিস। অভিযাত্রীদের মতো এই ব্যাধি এক দিকে যেমন পৌঁছে যায় দূর সাইবেরিয়ায়, অন্য দিকে অস্ট্রেলিয়ায়। সর্বত্রই সিফিলিসের ফলে মৃত্যুহার বেড়ে যায়, জন্মহার কমে যায়, এবং উপনিবেশগুলির মানুষের স্বাস্থ্য ও শক্তি কমিয়ে দেয়। যন্ত্রণাদায়ক এবং ভয়াবহ এই ব্যাধিকে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় পাপের ফল। পৃথিবীর এক দেশে এ-ব্যাধির জন্য দায়ী করা হয় অন্য দেশকে। ফ্রান্সে সিফিলিস 'ইতালিয়ান ব্যাধি', অন্য দিকে ইতালিতে 'জার্মান ব্যাধি' এবং ইংল্যান্ডে 'ফরাসি ব্যাধি'। হল্যান্ডে তার নাম 'স্প্যানিশ ব্যাধি', রাশিয়ায় 'পোলিশ ব্যাধি', সাইবেরিয়ায় 'রাশিয়ান ব্যাধি', ভারতে সম্ভবত, সংগত কারণে বলা হত 'ফিরিঙ্গি ব্যাধি'।

সিফিলিস শব্দটি অবশ্য ইউরোপে প্রথম শোনা যায় উনিশ শতকে। তার আগে এটি ছিল কাব্যে উল্লিখিত একটি শব্দ। ষোড়শ শতকে একজন ইউরোপিয়ান চিকিৎসক এবং কবি একটি দীর্ঘ কাব্য লিখেছিলেন, সেখানে একটি ফরাসি ব্যাধির কথা ছিল। কাব্য অনুসারে

সিফিলিস একজন মেষপালকের নাম। ঈশ্বরনিন্দার ফলে সে অ্যাপোলোর কোপে পড়ে। দেবতার অভিশাপে সে ব্যাধিগ্রস্ত হয়। বলা হয়, বীভৎস রসের কাব্য সেটি। রোগের মতোই বীভৎস। কাব্যে সেই নায়কের নাম থেকেই রোগের নামকরণ করা হয় সিফিলিস।

সিফিলিস ইউরোপে আগেও ছিল কি না তা নিয়ে তর্ক আছে। হতে পারে ষোড়শ শতকে ওই ব্যাধি অন্য চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে অনেকেরই ধারণা এ-ব্যাধি ইউরোপে নতুন। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন, আগে কুষ্ঠ এবং ওই-ধরনের আর-একটি ব্যাধির সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করে রাখা হয়েছিল বলেই সিফিলিসকে আলাদা করে শনাক্ত করা হয়নি। তবে এমনও হতে পারে, জৈবিক প্রক্রিয়ায় নতুন পরিবেশে এক জীবাণু থেকে আর-এক জীবাণু তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ জীবাণু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন চেহারা ধারণ করে। অনেকে অবশ্য মনে করেন এই ব্যাধি 'নতুন পৃথিবী'তে কলম্বাসের অভিযানের সঙ্গী নাবিকদের সঙ্গে ইউরোপ পৌঁছায়। তারা ফিরে আসার পর ১৪৯৩ সালে তাদের কেউ কেউ অষ্টম চার্লসের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। এই অনুমান সত্য হলে মানতে হয়, এ ব্যাধি 'এজ অব এক্সপ্লোরেশন' বা অভিযাত্রীদের নতুন নতুন এলাকায় অভিযানের এক বাড়তি প্রাপ্তিযোগ। ইউরোপকে এ-ব্যাধি উপহার দিয়েছে আমেরিকা মহাদেশের আদিম অধিবাসীরা। আফ্রিকা থেকেও অভিযাত্রীরা এবং দাস-ব্যবসায়ীরা পঞ্চদশ শতকে একটি নতুন ব্যাধি (YAWS) নিয়ে এসেছিলেন আমেরিকা মহাদেশে। হয়তো সে-ব্যাধিও ছিল যৌন ব্যাধি সিফিলিসের নিকট আত্মীয়। ক্রমে তাই পরিণতি লাভ করে সিফিলিসে। ইতিহাসচর্চা করলে মনে হয় টাইফাসের মতোই সিফিলিস পৃথিবীর দুর্গম এলাকায় অভিযান এবং আবিষ্কারের যুগের ব্যাধি। দ্রুত পালটে যাচ্ছিল পৃথিবীর নকশা। এক দিকে ক্ষুধা, অপরিচ্ছন্নতা, জনবাহুল্য, অন্য দিকে নগরায়ণ, কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন, বণিক ও সৈনিকের দৌড়াদৌড়ি, যুদ্ধের কলাকৌশল, অস্ত্রশস্ত্র, মানুষের পোশাক ও যৌন আচরণের পরিবর্তন এই ব্যাধির লালন ও প্রসারের পক্ষে যে বিশেষ সহায়ক ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন ব্যাধি হলেও ষোড়শ শতকে পরিবেশের এবং পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তনই যে সিফিলিসকে গণ-ঘাতকে পরিণত করে, ঐতিহাসিকরা সে-বিষয়ে একমত। কলেরার মতোই এ-ব্যাধিও ইতিহাসে যুগান্তরের খবর বয়ে এনেছিল বিশ্বময়।

অসুখবিসুখের কথা পড়তে কারও ভাল লাগে না। সম্ভবত চিকিৎসকদেরও না। তবু অর্নো কার্লেন-এর 'ম্যান অ্যান্ড মাইক্রোব্‌স' হাতে নিয়ে নামিয়ে রাখতে পারিনি। কারণ, এ-বইয়ের প্রতিপাদ্য শুধুই ব্যাধি নয়, ইতিহাসে মানুষ কখন কীভাবে জীবাণুর কবলে পড়েছে, কীভাবে লড়াই করে তাকে পরাস্ত করেছে, আবার কখনও কখনও কেনই বা হার মানতে বাধ্য হয়েছে— সবই আলোচনা করেছেন লেখক। বলা চলে এ-বই জীবাণুর সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম ও সহাবস্থানের কাহিনীবিশেষ। অন্যভাবে বললে, অর্নো কার্লেন আমাদের শুনিয়েছেন ব্যাধির সামাজিক ইতিহাস, কিংবা সভ্যতার ইতিহাসে রোগ-জীবাণুর ভূমিকা। লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে সভ্যতার প্রতি পর্বে মানুষ নতুন নতুন জীবাণুর কবলে পড়েছে। কীভাবেই বা লড়াই করেছে তাদের সঙ্গে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা গাছ থেকে মাটিতে নামার পর নতুন ধরনের জীবাণুর সঙ্গে স্থাপিত হয় নতুন সম্পর্ক। যাযাবর মানুষ, শিকারি মানুষ আবার হয়তো অন্য কোনও জীবাণুর সংসর্গে আসে। যাযাবর যখন গৃহস্থ হয়, তখন আবার তার সঙ্গে নতুন নতুন জীবাণুর প্রথম পরিচয়। সভ্যতার পত্তনের পর আবার নতুন

অভিজ্ঞতা। তার পর বাণিজ্য এবং সামরিক কারণে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়া, নতুন নতুন জীবাণুকে শরীরে আশ্রয় দেওয়া। শিল্পবিপ্লবের সূত্রে আবার অন্য ধরনের আধিব্যাধি, নতুন নতুন সংক্রমণ। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে মানুষের যে ঐশ্বর্য তার জন্য আবার মূল্য আদায় করতে চেয়েছে নতুন যুগের নব নব জীবাণু। লেখক বলছেন, আজ পৃথিবীতে যে-সব অসুখবিসুখ রয়েছে, তার অনেকগুলি মূলত গত পঞ্চাশ বছরের পৃথিবীর পরিবেশ এবং মানুষের সমাজ-সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের ফল। সুখ, শান্তি, প্রাচুর্য— সব-কিছুর জন্যই দাম দিতে হয়।

অন্য একটি বইতে পড়েছিলাম, শত শত বছর ধরে আফ্রিকা যে পশ্চিমের লুব্ধ অভিযাত্রীদের তার উপকূলে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল, মহাদেশের অন্তরলোকে অনুপ্রবেশ করতে দেয়নি, তার কৃতিত্ব ম্যালেরিয়ার। ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে যে মশা এবং এই ব্যাধির নিরাময় যে আন্ডিজ পার্বত্য অঞ্চলের সিঙ্কোনা নামে এক অচেনা গাছের ছাল, সেটা না জানা পর্যন্ত বার বার ওঁরা ফিরে এসেছেন আফ্রিকার চৌকাঠ থেকে। তার পর অবশ্য ম্যালেরিয়ার সূত্রে কুইনিন নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারও জমে উঠেছে একসময়ে। আফ্রিকাও আর বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারেনি নিজেকে। লুঠেরাদের জন্য খুলে দিতে হয় দরজা।

সভ্যতার পর্বান্তরে মানুষ কীভাবে নতুন নতুন ব্যাধির শিকার হয়, কিছু পরিসংখ্যান শুনলেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। মানুষ যখন গৃহস্থ হয় এবং বনের পশুকে পোষ মানাতে শুরু করে তখন তার পৃথিবী শুধু মিত্র নয়, বলতে গেলে শত্রুবেষ্টিত। টমাস হাল নামে একজন বিজ্ঞানী হিসাব করে দেখেছেন, কুকুর থেকে মানুষ ব্যাধি পেয়েছে ৬৫টি, গোরু থেকে ৪৫টি, ছাগল-ভেড়া থেকে ৪৬টি, শূকর থেকে ৪২টি, ঘোড়া থেকে ৩৫টি, ইঁদুর থেকে ২৬টি, হাঁস-মুরগি থেকেও বেশ-কিছু। এ হিসাব চূড়ান্ত নয়। তালিকা থেকে খরগোশ, গিনিপিগ, বেড়াল, বাঁদর, মাছ বাদ পড়ে গেছে। রাশিয়ার জীববিজ্ঞানী পাবলোভস্কি মনে করেন, গৃহপালিত জীব-জন্তুর সূত্রে মানুষ ৩০০ ব্যাধি পেয়েছে এবং বনের পশুপাখির সূত্রে কমপক্ষে ১০০টি ব্যাধি। অদৃশ্য জীবাণুরা কীভাবে এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে ঠাঁই খুঁজে নেয়, ভাবলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। মাছ থেকে পাখি, পাখি থেকে মানুষ, এবং মানুষ থেকে মানুষ, বিচিত্র তাদের গতিবিধি। সম্প্রতিকালের একটি কাহিনী শোনা যেতে পারে। ’৬০-এর দশকে ফিলিপিনস-এর পুডক বলে একটা জায়গা থেকে এক রহস্যময় ব্যাধির খবর মেলে। সেখানকার উপজাতির লোকেরা এই ব্যাধির কবলে পড়েন। আন্ত্রিকের ব্যাধি, তবে অত্যন্ত কষ্টকর মৃত্যু। সেখানকার লোকেরা কৃষি-নির্ভর। তাঁদের দ্বিতীয় পেশা বলতে গেলে মাছ ধরা। ব্যাধির আক্রমণ শুরু হওয়ার পর তাঁরা ধরে নেন, নিশ্চয় নদীর দেবতা কোনও কারণে তাঁদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ওঝা-গুনিনদের ডাক পড়ে। তাঁরা লোকেদের ঠকান, কিন্তু নিরাময়ের কোনও পথ দেখাতে পারেন না। একজন পুরোহিতও আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ম্যানিলায় খবর যায়, ইতিমধ্যে দেড় বছর কেটে গেছে। সরকারি ডাক্তাররা এসে দেখেন মৃতের সংখ্যা ৬০ জন। গ্রামের তিন ভাগের এক ভাগ লোক তখনও শয্যাগত। ডাক্তারেরাও ভেবে পান না, এ কোন ব্যাধি। রকম্যারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল, সেটি অপরিচিত। ওদিকে কাছাকাছি তাইল্যান্ডেও দেখা দিয়েছে একই ব্যাধি। এমনকী, কিছু কিছু জাপানেও। শেষ পর্যন্ত জীবাণুর সন্ধান

মেলে স্থানীয় জলার মাছের পেটে। গবেষকরা সন্ধান চালাতে শুরু করলেন। ক্রমে জানা যায়, মাছ নয়, এই জীবাণুর আদি আশ্রয় মৎস্যভুক কিছু পাখি। পাখি সংক্রমিত করেছে মাছকে, মাছ মানুষকে। প্রাগৈতিহাসিক কালেও নিশ্চয় মানুষ মাঝে মাঝে মুখোমুখি হত এ-ধরনের রহস্যময় ব্যাধির।

হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হয়তো-বা কোটি কোটি জীবাণু নিয়েই আমাদের পৃথিবী। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া। অফুরন্ত অজানা শমন। তার কিছু কিছু মানুষকে আশ্রয় করে। তারা সবাই বাঁচে না, অনেক ধ্বংস হয়ে যায়, হয়তো-বা সংক্রমিত হয় অন্য কোনও প্রাণিদেহে। যুগ বদলায়, জীবন বদলায়, বদলায় নাকি জীবাণুরাও। গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, প্রতি দশকেই নতুন নতুন ব্যাধি আক্রমণ করেছে মানুষকে। চলতি দশকও ব্যতিক্রম নয়। একসময়ে সে-সব ব্যাধি হার মেনেছে। অর্থাৎ তত্ত্বগতভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে। প্রতিষেধক এবং চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলো থেকে থেকে নতুন করে হানা দিচ্ছে মানুষের পৃথিবীতে। কোনও-কোনওটি নতুন শক্তি নিয়ে। পুরনো প্রতিরোধক এবং প্রতিষেধক আর কাজ করে না। লেখক তারও তালিকা করেছেন। তার মধ্যে আমাদের চেনাজানা ব্যাধি বলতে রয়েছে: ম্যালেরিয়া, কলেরা, ডিপথেরিয়া, হারপিস, এক ধরনের হেপাটাইটিস, নিউমোনিক প্লেগ, ভাইরাল এনকেফেলাইটিস এবং সিফিলিস। অপরাজিত ব্যাধি এখনও অনেক। ক্যানসার এবং এডস-এর কথা হয়তো অনেকেরই মনে উঁকি দেবে। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জাও কি তাই নয়?

ইনফ্লুয়েঞ্জা শুনলে আমরা তেমন গা করি না। কত লোকের হচ্ছে, সেরে যাচ্ছে। দৈবাৎ কেউ হয়তো মারাও যাচ্ছেন। কিন্তু সাধারণভাবে বললে, আমাদের এদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা শুনলে কেউ মৃত্যুর কথা ভাবেন না। অথচ এই ইনফ্লুয়েঞ্জা কিন্তু এক নিষ্ঠুর ঘাতক। ইংরেজি ভাষায় শব্দটি প্রথম আসে ১৭৪৩ সালে, ইতালিয়ান থেকে। সেই আদি শব্দের ইংরেজি ইনফ্লুয়েঞ্জা। ইনফ্লুয়েন্স থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা। কিন্তু কীসের ইনফ্লুয়েন্স? কোন অপদেবতার ইনফ্লুয়েন্স? নাকি মাটি অথবা বাতাসের? গবেষকদের অনুমান, মানুষের মধ্যে ফ্লু প্রথম দেখা দেয় খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে ৫০০০ অব্দের মধ্যে। দেখা গেছে মানুষের মধ্যে যখন ফ্লু দেখা দেয়, তখন শূকর-হাঁস-ঘোড়ারও মড়ক লেগে যায়। কার্যকারণ যাই হোক, হাজার হাজার বছরের সেই আদি পরিচয়ের পর ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে মানুষের সংযোগ কখনও ছিন্ন হয়নি। বিশ্বে অনেকবার ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ দেখা গেছে। ইউরোপে মধ্যযুগ পর্যন্ত। তবে সে-ব্যাধি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েনি। প্যানডেমিক ষোড়শ, অষ্টাদশ এবং উনিশ শতকের ঘটনা। অন্তত পাঁচ থেকে দশ বার ইনফ্লুয়েঞ্জা দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়েছে। তৎকালে সাধারণত ফ্লু শুরু হত রাশিয়া এবং মধ্য এশিয়ায়। তার পর জল ও স্থলপথে ছড়িয়ে পড়ত দূর-দূরান্তরে। উনিশ শতকে ভয়াবহ মহামারী শুরু হয় ১৮৩৩ সালে। কোনও কোনও ইউরোপীয় শহরে অর্ধেক মানুষকে শয্যা নিতে হয়। মারাও যান অসংখ্য মানুষ। ১৮৮৯ সালে আবার ইউরোপে মহামারীর চেহারা নেয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। সেবার শুধু ওই মহাদেশেই নাকি আড়াই লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও লোকেরা যেন ভুলেই গিয়েছিলেন এই শমনটির কথা। ১৯১৮ সালে 'স্প্যানিশ ফ্লু' নামে সে যখন ফিরে আসে, মানুষের ইতিহাসে তখন এক ঘোরতর বিপর্যয়। ইউরোপে পোকার মতো মানুষ মারা যেতে থাকে। সামরিক ছাউনি থেকে গৃহস্থঘর— মৃত্যু হানা দেয় সর্বত্র। একসময়ে এমনও রটে যায় যে,

জার্মানরা জীবাণু-যুদ্ধ শুরু করেছে। আসলে ঘটনা এই, আগেকার তুলনায় সেবার জীবাণু ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী ও সক্রিয়। দ্বিতীয় ব্যাধি অর্থাৎ নিউমোনিয়ার সংক্রমণ ঘটতে শুরু করে খুবই তাড়াতাড়ি। সৈন্যবাহিনী এবং সরবরাহসূত্রে জাহাজে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে নানা দিকে। আফ্রিকায় অনেক মানুষ মারা যান। সাইবেরিয়ায়ও। আমেরিকার কোনও কোনও শহরে অর্ধেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সরকারি অফিস চালানো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশ, দমকল বাহিনীও অচল। স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরি বন্ধ করে দিতে হয়। ফিলাডেলফিয়ায় প্রথম সপ্তাহেই মারা যান সাড়ে চার হাজার মানুষ। নিউইয়র্কে এক সপ্তাহে প্রাণ যায় ১৬০০ জনের। ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী— মৃত্যু কাউকেই রেহাই দিচ্ছে না। মধ্যযুগের প্লেগ মহামারীর মতোই পরিস্থিতি। হাসপাতালে ভিড়, মর্গ উপচে পড়ছে। কবর দিতে হচ্ছে পাইকারি হারে। মৃতের পাশেই পড়ে রয়েছেন শয্যাগত রোগী। কেউ দেখবার নেই। সেবার আমেরিকায় এই মহামারীতে মৃতের যোগফল ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার। প্রথম মহাযুদ্ধে যত আমেরিকান নাগরিক মারা গিয়েছিলেন, তার দশগুণ। কারও কারও অভিমত, মৃতের সংখ্যা আরও বেশি, কমপক্ষে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার। অন্যত্রও অসংখ্য মানুষ মারা যান এই মহামারীতে। বলা হয়, সেবার ইনফ্লুয়েঞ্জার মড়কে পৃথিবী ২ কোটি মানুষকে হারিয়েছিল। কারও কারও মতে ৩ থেকে ৪ কোটি। প্রথম মহাযুদ্ধে চার বছরে মৃতের সংখ্যা ধার্য হয়েছিল দেড় কোটি। 'ফ্লু' ফুৎকারে ছ' মাসে তার দ্বিগুণসংখ্যক মানুষকে মেরে ফেলে। বিউবোনিক প্লেগও এত দ্রুত এত মানুষের প্রাণ হরণ করতে পারেনি। সেই 'ফ্লু' কিন্তু এখনও অপরাজিত।

তবু আতঙ্কিত হবার কারণ নেই। বরং আশাবাদী থাকাই সংগত। কারণ, আদিম কাল থেকে জীবাণুর এই উদ্যানে বাস করেও মানুষ পৃথিবীতে এখনও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে আপন বলে। এদের পর এক জীবাণু তার কাছে হার মেনেছে। আক্রমণ করেছে নতুন নতুন জীবাণু। মানুষ তার সঙ্গে লড়াই করেছে। লড়াইয়ে অনেক জীবাণুই পরাজয় স্বীকার করেছে, কিংবা বশ্যতা। অপরাজিতরাও, ধরে নেওয়া যায়, পরাজিত হবে একদিন। অন্তত লেখকের তা-ই আশা। বইটি আশা জোগায় পাঠকদের মনেও। এডস-এর পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন অর্নো কার্লেন। বলছেন, উন্নত দেশগুলির সম্পন্ন মানুষেরা একালে তাঁদের মা-বাবার চেয়ে তাড়াতাড়ি শরীরে-মনে পরিণত মানুষ হয়ে ওঠেন। তাঁদের যৌনজীবনও শুরু হয়ে যায় আগেকার প্রজন্মের চেয়ে বেশ আগে। স্বাস্থ্যকর আবাস, পুষ্টিকর খাদ্য ইত্যাদি তাঁদের বিশেষভাবে তৈরি করছে। তাঁরা বিয়ে করেন দেরিতে, বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে বেশি হারে, বাঁচেন দীর্ঘদিন। এবং তাঁদের যৌনজীবনও আগের চেয়ে অনেক দীর্ঘ। ফলে, জীবনের অনেকখানিই ওঁরা কাটান একাকী। পরিণতবয়স্ক মানুষ হিসাবে তাঁদের যৌনজীবন কিন্তু থাকে সক্রিয়। সুতরাং যাঁরা অতি সতর্ক নন, তাঁরা বিপন্ন হতে পারেন বইকী!

গরিব দেশের মানুষও একই ব্যাধিতে বিপন্ন কেন, তা-ও নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন কার্লেন। বলছেন, উন্নতিশীল দেশগুলিতেও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবহার বাড়ছে। স্বাস্থ্যরক্ষার পরিকল্পনাদিও নেওয়া হচ্ছে, তাতে শিশুমৃত্যুর হার কমছে; কিন্তু জন্মহার সেভাবে কমছে না। ফলে, জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে, বেড়ে চলেছে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা। এই নবীন বয়স্করা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। তাঁরা কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া এবং বেহিসাবিও বটে। যৌন-জীবনেও সেই প্রবণতা।

তবে কি মানুষ আধুনিক ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ফিরে যাবে আদিম জীবনে। লেখক বলছেন, তা হয় না। মানুষ ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে জানিয়ে দিয়েছে তার সিদ্ধান্ত। সুখ, সম্পদ এবং প্রাচুর্যের জন্য যদি দাম দিতে হয়, জীবাণুরা যদি কখনও কখনও আদায় করে নেয় চড়া দাম, তবু আর পিছু ফেরা নয়। কারণ, এই আধুনিক সভ্যতা অনন্য—অমূল্য। কোনও মূল্যেই তাকে হাতছাড়া করা যায় না।

অর্নো কার্লেন, 'ম্যান অ্যান্ড মাইক্রোবস/ডিজিজ অ্যান্ড প্লেগস ইন হিস্ট্রি অ্যান্ড মডার্ন টাইমস', জি.পি. পুটনাম'স সন্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৫
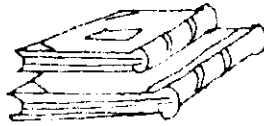
নারীর স্তন: উত্থান ও পতন
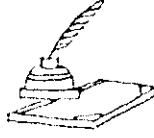
"নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্তসমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটিছে বাহিরে,
সৌরভসুধায় করে পরান পাগল।
মরমের কোমলতা তরঙ্গ তরল
উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের তীরে।
কী যেন বাঁশির ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়,
সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে—
শরমে মরিতে চায় অঞ্চল-আড়ালে।
প্রেমের সংগীত যেন বিকশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।
হেরো গো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হেরো নারীহৃদয়ের পবিত্র মন্দির।..."

স্তন, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ এই 'পবিত্রমন্দির'কে কবিতাটিতে অন্য স্তরে উত্তীর্ণ করেছেন। মানবীর স্তনকে তিনি 'পবিত্রসুমেরু', 'দেবতাবিহারভূমি কনক-অচল', 'পবিত্র দুটি বিজন শিখর' বলেই ক্ষান্ত হননি, বলেছেন এই স্তন 'চিরস্নেহ-উৎসধারে অমৃত-নির্ঝরে/সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর।' শেষ দুটি ছত্রে তাঁর স্তন-বন্দনা— 'ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি,/ দেবশিশু মানবের ওই জন্মভূমি।' এই কবিতা অতএব শুধু বাসনাতাড়িত যৌবনের বন্দনা নয়, মাতৃত্বেরও জয়গান। কিন্তু আমাদের চার পাশে যে পৃথিবী, নিত্য আমরা সেখানে যে নারীকে দেখি তিনি কি এই কবিতার প্রতিমা? অবশ্যই নয়। তিনি লুব্ধ পুরুষের চোখে

মূর্তিমান কামনা-বাসনা যেন। ভারতীয় পুরাণের রতির মতো তিনি কামদীপিকা। তাঁর অন্য কোনও পরিচয় নেই, নিজের লজ্জাহীন দেহকে সর্বজনের সামনে তুলে ধরা ছাড়া অন্য কোনও ভূমিকা নেই। দিকে দিকে চলেছে তথাকথিত সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা। অধুনা রূপের সঙ্গে নাকি বুদ্ধিও পরিমাপ করা হয়, কিন্তু লক্ষ করলেই বোঝা যায় এই রূপ আসলে পরিমাপ করা হয় ফিতে দিয়ে, ইঞ্চি বা সেন্টিমিটারে। চলচ্চিত্রের নায়িকা, বিজ্ঞাপনের মডেল, আদর্শ নারীশরীর নির্মাণের জন্য বিভিন্ন জিমনাসিয়াম, বিউটি পার্লার থেকে শুরু করে অন্তর্বাস, প্রসাধনী, শল্যশাস্ত্র— নারীদেহ আজ সর্বত্র এক পণ্যবিশেষ। আর এই নব্য সৌন্দর্যতত্ত্বে নারীর স্তন যেন এক যৌন-অলংকার, নারীত্বের সংজ্ঞায় এবং বিবৃতিতে শ্রেষ্ঠ ভূষণ। সুতরাং, সর্বত্র তার প্রকাশ এবং সমাদর।

দেখে দেখে মনে প্রশ্ন জাগে— নারীর স্তন কি এই বৈশ্যযুগে এখনও তাঁর শরীরের অপরিহার্য অংশ, তাঁর নিজস্ব অঙ্গ? নারীর স্তন কি শিশুর নাকি কামকাতর পুরুষের সম্পত্তি? তা না হলে নারীর স্তন নিয়ে কেন এই নির্লজ্জ পুরুষালি খেলা? এমন অনেক পণ্যের বিজ্ঞাপনেই রূপসী নারীর ছবি দেখা যায় যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীর কোনও সম্পর্ক নেই। আর সেই সব বিজ্ঞাপনে রূপবতীর উত্তমাঙ্গ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপিত। স্তন কি তবে শিল্পী বা ভাস্করের ইচ্ছাধীন? কিংবা ফ্যাশন-বিধাতাদের? প্রশ্ন জাগে তবে কি স্তন নিয়ে কী করা হবে সেটা ধার্য করার অধিকার নীতিবাগীশ, ধর্মবেত্তা আর মোল্লা-পুরোহিতদের? অন্য নৈতিক প্রহরীর দলও রয়েছেন আসরে। তাঁরা প্রয়োজনে অশ্লীলতার কথা'তুলে নারীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন। রয়েছেন শল্য চিকিৎসকদের দল, যাঁরা পুরুষের নির্ধারিত নকশা-মাফিক নারীর স্তন পুনর্নির্মাণ করেন। রয়েছেন পর্নোগ্রাফাররাও যাঁদের অন্যতম পসরা নারীর এই অঙ্গ। নানাভাবে তা তাঁরা পরিবেশন করেন বইয়ে এবং পত্র-পত্রিকায়। বস্তুত আজকের দুনিয়ায় এই একবিংশ শতকে সংস্কৃত কবি যাকে বলেছেন হেমকুম্ভ, ধনতন্ত্রের এই সুবর্ণযুগে ঘটসদৃশ সেই নারীস্তন বোধহয় সর্বার্থেই পিতৃতন্ত্রের শাসন এবং অন্তহীন লালসার এক অনন্য নিদর্শন।

স্বভাবতই নারী-স্তন নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বই প্রকাশিত হয়েছে শুনে প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলাম। হয়তো ইতিহাসের নামে আবার হাটে ছাড়া হচ্ছে এমন এক পশরা যা এ যুগের ওই বিশেষ পণ্য আরও বেশি খদ্দেরকে প্রলুব্ধ করবে অসহায় নারীকে উদ্দাম যৌনতার সঙ্গী করতে, তাঁকে, তাঁর নিজস্ব শরীরকে আরও অপমানে জর্জরিত করতে। তবু কৌতূহল দমন করতে পারিনি, লেখকের নামটি জানার পর। মনে পড়ল এই ভদ্রমহিলা আমার পরিচিত। পরিচিত মানে মারিলিন ইয়ালুম-এর লেখা একটি বই আমি পড়েছি। তার বিষয় ছিল ফরাসি বিপ্লবে নারী। বইটির নাম— 'ব্লাড সিস্টারস'/'দ্য ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন ইন উইমেনস মেমরি'। ভদ্রমহিলা যদিও বিপ্লব সম্পর্কে উৎসাহী নন, কিন্তু বিপ্লবের সময়ে ফরাসি মেয়েরা যে অভিজ্ঞতার কথা তাঁদের জার্নালে, ডায়েরিতে, চিঠিপত্রে রেখে গেছেন নিষ্ঠা এবং সহানুভূতির সঙ্গে তা ভাষান্তরিত করে পরিবেশন করেছিলেন। মনে পড়ে তার জন্য ফরাসি সরকার তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিতও করেছিলেন। আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ'-এ 'সিনিয়ার ফেলো' নিশ্চয়ই ইতিহাসের নামে নারীর উন্মুক্ত উত্তমাঙ্গের কোনও প্রদর্শনী সাজাননি এই গবেষক। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত সাগ্রহে সংগ্রহ করতে হয় বইটিকে। প্রায় সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠার এই বিশাল ও অসংখ্য

দুষ্প্রাপ্য ছবিতে বোঝাই বইটি আদ্যোপান্ত পড়ার পর নিঃসংকোচে স্বীকার করব, কদাচিৎ এমন একটি বই পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। আফসোস একটাই, বইটি পশ্চিমি দুনিয়ার চৌহদ্দিতেই যুগযুগান্তর ধরে পরিক্রমা করেছে। আমাদের পূর্ব পৃথিবী সেখানে বলতে গেলে পুরোপুরি অস্তিত্বহীন, উহ্য। অথচ ভারতের ভাস্কর্য, চিত্রকলা, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য, সর্বত্র নারীর স্তন কতভাবেই না বর্ণিত ও বন্দিত। 'মেঘদূত'-এ কালিদাসের নায়িকা বর্ণনার কথা মনে পড়ে,— 'শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা, স্তনাভ্যাং/যা তত্র স্যাস্যুবতি বিষয়ে দৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।' কুমারসম্ভব-এ আবার দেখি একই ভঙ্গিতে পার্বতীর রূপের বর্ণনা,— 'অন্যোন্য মুৎপীড়য় দুপেলাক্ষ্যঃ/স্তনদ্বয়ং পাণ্ডু তথা প্রবৃদ্ধম।/ মধ্যে যথা শ্যামমুখ্য তস্য/ মঙ্গলসূত্রান্তরমপল্যভ্যম।' অর্থাৎ, শৈলসুতার পাণ্ডুবর্ণ স্তনদ্বয় উপমর্দন করে সেইভাবে প্রবৃদ্ধ হয়েছিল যে, তার মধ্যে মৃণালজাত সূক্ষ্মসূত্রও স্থান পেত না। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা পরবর্তী লেখক কবিদের কল্পনায়ও। মাইকেলের তিলোত্তমার উত্তমাঙ্গর বর্ণনা— 'দাঁড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ,/উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে/উরস-আনন্দ-বনে; সে বিবাদ দেখি/দেবশিল্পী গড়িলেন মেরু শৃঙ্গাকারে/ কুচযোগ।'... 'উর্বশী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ— 'তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,/অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা;/ নাচে রক্তধারা।' দৃষ্টান্ত আর বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। ভারতীয় সাহিত্য-শিল্পে অসংখ্য দৃষ্টান্ত এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার কথা ভাবলে মনে হয় না কি এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্তে প্রাচ্য, বিশেষ করে ভারতের অনুপস্থিতি এক-ধরনের বঞ্চনা?

তবু যা পাওয়া গেল সে অবশ্যই সামান্য প্রাপ্তি নয়। নারীর স্তনের পঁচিশ হাজার বছরের ইতিহাস, স্বভাবতই কাহিনী শুরু হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। প্রাচীন পৃথিবীতে নারী সামান্য মানবী নন, দেবী। বৃক্ষের মতোই তিনি প্রাকৃতিক এক অস্তিত্ব। তিনি রহস্যময়। তিনি সৃষ্টির আদি, মানবের ধাত্রী। তাঁর বুকে জীবনদায়ী অমৃতধারার উৎস। স্বভাবতই তাঁর স্তন পবিত্র এবং পূজ্য। নারী এক দিকে যেমন উর্বরতার প্রতীক, অন্য দিকে তেমনই মানবের ধাত্রী। সুতরাং প্রাচীন পৃথিবীর দেবীদের স্তন সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার উপলক্ষ। কৃষিকর্ম শুরু হওয়ার আগে ইউরোপের নানা অঞ্চলে আগে যে নারী-প্রতিমার সন্ধান মিলেছে তাদের স্তন শুধু অনাবৃত নয়, আজকের দর্শকের চোখে হয়তো-বা ভীতিপ্রদ। ওঁরা কোনও পুরুষ দেবতার স্ত্রী বা সহচরী নন, ওঁরা নিজেরাই ঈশ্বরী। তাঁদের স্তন শক্তির প্রতীক। ফলে ফ্রান্সের পর্বতগুহার দেওয়ালে স্তন বন্দিত। দশ হাজার বছর পরে তুরস্কে দেখা যায় মৃন্ময়ী স্তন সশ্রদ্ধায় পূজিত। লৌহযুগে পবিত্র পানপাত্র গড়া হয়েছে স্তনের আদলে। (একালে অবশ্য হলিউডে একই বস্তু কখনও কখনও দেখা যায় যৌনতার প্রতীক হিসাবে, পুরুষের কামনার বার্তাবহ তৈজস হিসাবে।) শুধু দেবতা আইসিস নয়, প্রাচীন মিশরে নীলনদের দেবতা হাপিও নারীর মতো স্তনধর। আদিম পৃথিবীর অন্যত্রও স্তন নিয়ে কোনও লজ্জা বা সংস্কার নেই, স্তন দেবীর অন্তর্নিহিত শক্তি এবং অতুলনীয় ঐশ্বর্যের প্রকাশ। অতএব, খ্রিস্টপূর্ব ১৫-১৬ শতকে ক্রিটে যদিও এক ধরনের স্কার্ট ও স্তনাংশুক ছিল তবু দেবীমূর্তির ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। প্রাচীন গ্রিসেও দেখা যায় আর্টেমিস বহুস্তনে অলংকৃত! সুতরাং, নমস্য।

পরিস্থিতিতে পরিবর্তন ঘটে নারীকে স্থানচ্যুত করে বেদিতে পুরুষ দেবতাদের অধিষ্ঠানের পর। নারীর এই ভাগ্যপরিবর্তনের, পর্বটিকে লেখক বলেছেন—'রেইন অব দ্য

ফ্যালাস।' অর্থাৎ, প্রকৃতির বদলে পুরুষের যৌনাঙ্গের রাজত্ব। মাউন্ট অলিম্পাসে প্রাচীন দেবী ওলিম্পিয়ার বদলে প্রতিষ্ঠিত হলেন জিউস। অতঃপর তিনিই দেবলোকে সর্বেসর্বা। তাঁর স্ত্রী বা সঙ্গিনী হেরা যেন নর্মসহচরী মাত্র, একটি ভাস্কর্যে দেখা যায় তিনি হেরার স্তন ধরে আছেন। স্পষ্টতই স্তনমাহাত্ম্য বিলুপ্তির পথে। নবনারীর হাতে বর্শা, মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুক আবৃত অলংকৃত কঠিন বর্মে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে প্রেমের দেবী অ্যাফরোডাইট বা ভেনাস নগ্নিকা মাত্র। তিনি যেন দেহসর্বস্ব। ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিল্পী তাঁকে গড়েছেন। তাঁর বুক 'আপেলের মতো'। ভেনাস যেন ক্রমে পরিণত একালে পশ্চিমে যাকে বলা হয় 'পিন-আপ'। কামদীপিকা ক্যালেন্ডার-সুন্দরী। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে একটি ভেনাস প্রতিমূর্তিকে বলা হয় 'লজ্জাশীল ভেনাস'। তিনি এক হাতে তাঁর একটি সুপুষ্ট স্তন ধরে আছেন, অন্য হাতে ঢেকে রেখেছেন তাঁর যৌনাঙ্গ। এথেন্স-এর নারী খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মধ্যেই পুরুষের বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য হন। তাঁদের শরীর আবৃত, মুখ ও মাথায় ঘোমটা বা চাদর। আর, তাঁদের স্তন পুরুষের কামনার উপলক্ষ। ট্রয়ের যুদ্ধের পর হেলেন যখন ঘরে ফেরেন তখন তিনি নাকি স্বামী মেনেলাউস-এর মুখোমুখি হওয়া মাত্র— তাঁর 'আপেলতুল্য স্তন' সামনে মেলে ধরেছিলেন। ক্রুদ্ধ স্বামীর হাতের তলোয়ার খসে পড়েছিল মাটিতে। এই দৃশ্যের পর স্ত্রীকে হত্যা করতে পারেননি তিনি— ক্ষমা করেছিলেন। নারীর স্তনের আরাধনা, সন্দেহ কী, অন্য মোড় নিয়েছে!

স্তনের প্রাচীন জাদুকরি মাহাত্ম্যের রেশ তবু যেন থেকেই যায়। দেবরাজ জিউসের এক পুত্র ছিল। সে কোনও দেবী নয়, মর্ত্যের মানবীর সন্তান। এই শিশু একদিন ঘুমন্ত দেবরাজপত্নী হেরার স্তন্য পান করছিল। হেরা হঠাৎ জেগে উঠে সরোষে তাকে বুক থেকে সরিয়ে দেন। তাঁর বুকের এবং শিশুর মুখের দুধ ছড়িয়ে পড়ে আকাশে, সেই বিন্দু বিন্দু পীযূষেই রচিত হয় 'মিল্কি ওয়ে'— তারাপথ!

প্রসঙ্গত, অ্যামাজনদের কথাও উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বাস্তবে ছিলেন কি না প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে তাঁদের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। সন্তান (কন্যা সন্তান) লালনের জন্য তাঁরা একটি স্তন রক্ষা করতেন, অন্যটি বাদ দিতেন পুরুষের সঙ্গে লড়াইয়ে স্বচ্ছন্দে ধনুর্বাণ ব্যবহারের জন্য। একজন আধুনিক গবেষক আটশো তথ্যসূত্র যাচাই করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন— নারী-পুরুষের প্রাধান্যের জন্য যে লড়াই ওঁরা তারই প্রতীক। 'আর্কেটাইপ অব দ্য ব্যাটল অব সেক্সেস'। উল্লেখ্য, অ্যামাজনদের হত্যা করা হত 'বুকে' আঘাত হেনে। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে ধর্মবেত্তা ইজাকিয়েল পুরুষালি বিক্রমের জীবন্ত বিগ্রহ যেন। তাঁর চোখে জেরুজালেম আর সামারিয়া এই দুই নগরী লাস্যময়ী নারীর দুই স্তন। মিশরের উপভোগ্য বারবনিতা তারা! অথচ ইহুদিদের কাছেও আদিতে নারীর স্তন ছিল কিন্তু পবিত্র, তারা এমনকী 'দেবগণেরও ধাত্রী'।

রোমেও দেখি প্রাচীন ধারণার প্রতিধ্বনি। অন্য ধরনের স্তনমাহাত্ম্য। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের কাহিনী। নিজের গর্ভধারিণী কারারুদ্ধ। তাঁর কাছে বাইরে থেকে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। প্রহরীরা প্রত্যেক দর্শনার্থীকে পরীক্ষা করে দেখতেন। কন্যাকেও স্বভাবতই বাদ দেওয়া হয়নি। মাকে দেখে কন্যা বিচলিত। খাদ্যাভাবে তিনি রুগ্ণ। মায়ের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কন্যা তাঁকে স্তন্যদান করেন। সে-কাহিনী শেষ পর্যন্ত গোপন রইল না। এই অভূতপূর্ব কাণ্ড দেখে কর্তৃপক্ষ মাকে মুক্তি দিলেন। শুধু তাই নয়, মা এবং মেয়ের সারা

জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র। এই 'রোমান দানশীলতা' থেকেই 'ক্রিশ্চিয়ান চ্যারিটি' বা খ্রিস্টানদের দানের মাহাত্ম্যের ধারণার জন্ম। এই কন্যার স্মরণে নাকি একটি মন্দিরও গড়া হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য মায়ের বদলে কারাগারে বসানো হয়েছে বাবাকে। স্পষ্টতই পবিত্র ঘটনাটিকে অন্য, বিকৃত রূপ দেওয়ার বাসনায়। শুধু যৌনতা নয়, অতঃপর তার সঙ্গে যুক্ত করা হয় অজাচারের কলঙ্ক।

বাইবেলে দেখা মেলে দু'জন মেরির। একজন মেরিমাতা বা কুমারী মেরি, অন্য জন মেরি ম্যাগডালেন। প্রথম জন পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। তিনি পুরুষের সাহচর্য ছাড়াই সন্তানের জননী। স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র তাঁর সন্তান। অথচ তাঁর দেহ কলুষিত নয়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে অতএব 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এর আহ্বান— রক্তমাংসের দেহকে জয় করো। অন্য মেরির পক্ষে সে-ধরনের মাহাত্ম্য দাবি করা সম্ভব নয়। খ্রিস্টান সাধক-সাধিকাদের কাছে আদর্শ কুমারী মা মেরি। তাঁরা দেহের দাবিকে দমন করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং প্রথম দিকের খ্রিস্টীয় ছবিতে দেখা যায় নারীর উত্তমাঙ্গ পুরুষের মতো। লেখক বলেছেন স্তনের প্রাচীন পবিত্রতা আর নেই, খ্রিস্টীয় চিত্রকলায় স্তনহীনতাই পবিত্রতার অভ্রান্ত লক্ষণ। একমাত্র পাপী মেয়েরাই স্তন প্রকাশ করেন। তার জন্য নরকে কী শাস্তি জুটত অনেক ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। (এ-ধরনের ছবি ছাপাখানার যুগে আমাদের দেশেও প্রচারিত হয়েছে।) দৈহিক কামনা-বাসনা ঘৃণ্য পাপ— আর তার অন্যতম নিবাস স্তন। সুতরাং পাপী মেয়ে বাধ্য হচ্ছে শলাকাসহযোগে নিজের স্তন ছিন্নভিন্ন করতে। অন্য দিকে শহিদ খ্রিস্টান সাধিকারা যখন অত্যাচারিত হয়েছেন, তখনও মধ্যযুদ্ধের খ্রিস্টীয় চিত্রকলায় দেখানো হয়েছে নৃশংসভাবে তাঁদের স্তন কেটে ফেলা হচ্ছে। এইসব শহিদ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী মেয়েদের পূজ্য। তাঁরা মায়ের পুষ্ট স্তনের জন্য আশীর্বাদ করেন। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বেশ-কিছু অত্যাচারিত শহিদ সন্ন্যাসিনী এভাবে সম্মানিত হয়েছেন। এইসব ছবি দেখে ফরাসি কবি পল ভ্যালেরি লিখেছিলেন—'প্লেজার অব টর্চার'। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের আনন্দের অনুভূতি। লেখক মন্তব্য করেছেন এইসব ছবিতে শিল্পীরা নারীর স্তনকে পরিণত করেছেন নিজেদের ধর্ষকাম প্রবৃত্তিতে!

দর্শক পুরুষের কাছে নারীস্তনের আবেদন অন্যভাবে স্বপ্রকাশ। সে আর-এক হেলেনের উপাখ্যান। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিসে ফাইরিন নামে এক সুন্দরী গণিকা ছিলেন। তাঁর প্রেমিকেরা তাঁর বিরুদ্ধে দেব-নিন্দার অভিযোগ আনেন। রীতি অনুযায়ী মেয়েটি নিজের পক্ষে সওয়াল করার জন্য হাইপেরাইডেস নামে এক বাগ্মী বা উকিলকে নিয়োগ করেন। ফাইরিন যখন দেখলেন তাঁর উকিল ঠিকমতো যুক্তিতর্ক করতে পারছেন না, তখন তিনি তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গের আবরণ খুলে নিজেকে প্রকাশ করেন। বিচারকরা যুগপৎ স্তম্ভিত ও অভিভূত। তাঁরা এই সুন্দরীকে বেকসুর মুক্তি দিয়ে দিলেন। তখন দেশে নতুন আইন তৈরি করা হয়, কোনও অভিযুক্ত, তিনি পুরুষ বা নারী যা-ই হন-না-কেন, আদালতে তাঁদের 'গোপন অঙ্গ' প্রকাশ করতে পারবেন না।

এবার মা মেরির দিকে তাকানো যাক। খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্র অনুসারে মানুষের আদি জননী ইভ। আবার তিনিই দায়ী মানুষের পতনের জন্য। কামনার তিনি আদি উৎস। যে নিষিদ্ধ ফলটি তিনি আদমের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেটি আসলে আপেল। আর আপেলের সঙ্গে স্তনের সাদৃশ্য তো স্বপ্রকাশ। সুতরাং, মেরির ক্ষেত্রে স্তন বন্দিত হলেও ইভের বেলায় তা

নিন্দিত, পাপ ও পতনের নিমিত্ত। সুতরাং, খ্রিস্টানি শিল্পে প্রথম দিকে মা মেরির স্তন ছিল অপ্রকাশ। মধ্যযুগে আঁকা সাফক-এর এক গির্জার দেওয়ালে যে মেরি-মূর্তি দেখা যায় তাঁর উত্তমাঙ্গে আঁটোসাঁটো 'বডিস' বা জামা। অন্যত্রও দেখা যায় মেরিমাতার স্তন বিমূর্ত— চৌকো। কিন্তু ধীরে ধীরে দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে শুরু করে। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে টাসকানিতে আঁকা একটা ছবিতে দেখা যায় মা মেরি শিশু যিশুকে স্তন্যদান করছেন। হয়তো শত শত বছর আগেও কোথাও-না-কোথাও আঁকা হয়েছে স্তন্যদায়িনী মেরির প্রতিমা, কিন্তু রেনেসাঁসের ইউরোপে তার চর্চা এমন বেড়ে যায় যে, ঐতিহাসিক তার পিছনে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা না করে পারেন না। এতকাল মেরি ছিলেন বাইজেনটাইন সম্রাজ্ঞীর মতো। তাঁর মুখমণ্ডলে স্বর্ণের আভা, আলোয় উদ্ভাসিত পট। তাঁকে ঘিরে স্বর্গের সাধক আর দেবদূতদের নম্র আনন্দ আবির্ভাব। সেই স্বর্গীয় রমণী প্রতিমা কেন শেষ পর্যন্ত মর্ত্যের নারীর ভূমিকায়— প্রশ্ন সেটাই।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গবেষক দুটি প্রাসঙ্গিক তথ্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রথমত, সেই মধ্যযুগেই ইউরোপে ছিলেন মায়ের মতো ধাই-মা বা তথাকথিত 'ওয়েট নার্স'রা। গরিব মায়েরা হয়তো নিজেদের সন্তান লালন করেন গোরুর দুধে। আর তাঁদের বুকের দুধে লালিত হয় সম্পন্নের সন্তান। কারণ ততদিনে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত এবং অভিজাতদের কাছে নারীর স্তন অন্য মর্যাদা লাভ করেছে, এই অঙ্গ যৌবন ও যৌনতার অভিজ্ঞান। দ্বাদশ শতকের ফ্রান্সে নারীর সৌন্দর্যবিলাসীদের মুখে অতএব অহরহ আপেলের উপমা। তা ছাড়া আমাদের সংস্কৃত বা বৈষ্ণব সাহিত্যের মতো নানা উপমার ছড়াছড়ি। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগের অপরাহ্ণেই পরিবর্তিত হতে থাকে নারী ও পুরুষের পোশাক। আগে বলতে গেলে দুই তরফেরই পোশাক ছিল পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা একটা টিউনিক বা আলখাল্লা। কিন্তু চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে দেখা যায় পুরুষের পোশাক খাটো হয়ে উঠে এসেছে হাঁটু বরাবর, আর মেয়েদের পোশাক ঊর্ধ্বাঙ্গে শুধু যে নেমে এসেছে তাই নয়, ফুটিয়ে তুলছে দেহের গড়ন। যাজক, পুরোহিত এবং নীতিবাগীশরা যথারীতি নিন্দাবাদে মুখর হয়েছিলেন, কিন্তু কালের হাওয়ায় সে-সব সুভাষিতাবলি ভেসে যায়। এল নারীদেহ উন্মোচনের যুগ। শুরু চতুর্দশ শতকে, কিন্তু পরবর্তী চারশো বছর ধরে ইতালিয়ান, ফরাসি, জার্মান, ডাচ ছবিতে ম্যাডোনার স্তন উন্মুক্ত। তাঁর খোলা স্তনে শিশু যিশুর মুখ। কখনও শিশু নিরুত্তাপ, স্তনের সৌন্দর্য প্রদর্শনই মুখ্য। ছবিতে প্রতিফলিত কমলালেবু, আপেল, ডালিমের প্রতিরূপ। সাধারণ ইতালিয়ান কি এই মাতৃমূর্তি দেখে আহত, আতঙ্কে শিহরিত, না আবেগ উত্তেজনায় কম্পমান? ইনি কি স্বর্গীয় জননী, না চিরচেনা ধাই-মা? ১৩০০ সাল থেকে উচ্চকোটির মেয়েদের, মায়েদের স্তন যেন সংরক্ষিত পুরুষের আদর ও আমোদের জন্য। শিশুরা ধাই-মা নির্ভর। বলতে গেলে অনেক গরিবঘরের মায়েদের রোজগারের উপায় আপন স্তনের পীযূষ। যাজকেরা আধ্যাত্মিকতাকে প্রচার করতেন মনের পুষ্টি বলে। তবু সত্যকারের পুষ্টির জন্য মায়ের বুকের দুধের বিকল্প কোথায়? ভক্ত খ্রিস্টানদের কাছে খ্রিস্টের রক্ত যেমন পবিত্র তেমনই পবিত্র মাতৃদুগ্ধ। মধ্যযুগে অনেক গির্জায় সযত্নে সঞ্চিত থাকত মা মেরির বুকের দুধ। ভক্ত সেখান থেকে শ্রদ্ধাভরে হিন্দুর কাছে পবিত্র চরণামৃতের মতো দু'-চার ফোঁটা সংগ্রহ করে নিজেদের স্তনের দুধ বাড়াবার চেষ্টা করতেন। ষোড়শ শতকে এক প্রোটেস্ট্যান্ট যাজক প্রশ্ন তুলেছিলেন— কুমারী মাতা গাভীর মতো এমন দুধ

সরবরাহ করে চলেছেন কেমন করে? তিনি সারা জীবন ধরে পৃথিবীকে লালন করে থাকলেও আমাদের কাল পর্যন্ত সে-দুধের ভাণ্ডার গড়ে তোলা কি সম্ভব? কেমন করেই বা এতকাল ধরে সম্ভব হল তার সংরক্ষণ? এই বুজরুকি তবু চলেছিল অনেক কাল ধরে। সেইসঙ্গে চলেছিল আরও একটি অনুষ্ঠান। স্তন্যদায়িনী মেরিমূর্তির প্রতিমা এবং নানা 'স্মারক' ঘিরে পুজো ও প্রার্থনা। বুঝতে অসুবিধা নেই, উচ্চবর্গের স্তনের মতোই সাধারণ নারীর স্তন তৎকালে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। প্রথম দলের কাছে স্তন যদি নারীর অঙ্গভূষণ, দ্বিতীয় দলের কাছে তবে তা রুজিরোজগারের উপকরণ। সেদিনের গরিব স্তন্যদায়িনীর একটি গান ইংরেজিতে তর্জমা করলে তার বক্তব্য: 'উইথ লট্‌স অব গুড ফাইন মিল্ক/ আওয়ার ব্রেস্টস আর ফুল।/ টু অ্যাভয়েড অল সাসপিশান,/ লেট দ্য ডক্টরস সি ইট' ইত্যাদি। এইসব স্তন্যদায়িনীর সঙ্গে নব্য মেরি, স্তন্যদায়িনী 'নগ্নিকা' মেরির কি সম্পর্ক নেই? রেনেসাঁসের প্রথম একশো বছর ধরে ফ্লোরেন্সের শিল্পীদের আঁকা অসংখ্য মা-মেরির প্রতিমা দেখে গবেষকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তৎকালের চিত্রকর এবং ভাস্করেরা অধিকাংশই ছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। তাঁরা মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত, লালিত 'ওয়েট-নার্স' বা ধাই-মাদের বুকের দুধে। এই স্তন্যদায়িনী মেরি তাঁদের স্বপ্নের জননী, যাঁদের পরিপূর্ণ পীযূষভাণ্ড থেকে তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য পাননি। এই মা তাঁদের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার প্রতিকৃতি, তাঁদের— 'ড্রিম মম'! তা ছাড়া চতুর্দশ শতকের ইতালির পরিবেশ-পরিস্থিতিও প্রভাবিত করেছে শিল্পীদের। ক্ষুধা, অপুষ্টি, মহামারির মুখে এই স্তনে আশ্বাস খুঁজেছিলেন হয়তো সে-দিনের অসহায় মানুষ। তার ওপর নবকালের নারীর নব-আঁটোসাঁটো পোশাক, জাগতিক অভিজ্ঞতা, শিল্পে বাস্তবতার উদ্‌বোধন— সব মিলিয়েই এই নব মাতৃমূর্তি। মেরির এই রূপান্তরের তথ্যনির্ভর বিস্তারিত আলোচনার পর লেখকের সিদ্ধান্ত— এই মেরি জন্মান্তরে প্রাগৈতিহাসিক সেই মাতৃস্বরূপিণী দেবীরই নব্য অবতার। পার্থক্য শুধু এই, তিনি স্তন্যদান করেন শুধু আপন সন্তান যিশুকে। সেই সন্তান শুধু যে পুরুষ তা-ই নয়, মায়ের চেয়েও শক্তিধর। খ্রিস্ট না থাকলে মেরি হতেন অপরিচিত এক রমণী। তাঁর প্রতিষ্ঠা অতএব সম্পূর্ণ পুরুষনির্ভর।

সেই শুরু। ক্রমে স্তন্যদায়িনী জননী মেরি দেখতে দেখতে পরিণত হলেন স্তনগৌরবে গরবিনী সামান্য রমণীতে। এই উন্মোচনের উদ্যোক্তা রাজা, আমির-ওমরাহ ও অভিজাতবর্গ। ইতালিতে যখন মাতৃপ্রতিমা ম্যাডোনার ছড়াছড়ি, তার মোটামুটি একশো বছর পরে ক্যানভাস আলো করে আত্মপ্রকাশ, তথা আবরণহীন উত্তমাঙ্গ প্রকাশ করে আবির্ভূত হলেন অন্য ম্যাডোনা। তাঁর সামনে একটি শিশু আছে বটে, কিন্তু মাতৃদুগ্ধের জন্য তার কোনও ব্যাকুলতা নেই। নিঃস্পৃহ সেই শিশু স্বতন্ত্র একটি টুলে বসে আছে। নকল ম্যাডোনার একটি বুক সম্পূর্ণ অনাবৃত। ছবিটি আসলে ফ্রান্সের রাজা সপ্তম চার্লসের রক্ষিতার। এ-প্রতিকৃতি পনেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আঁকা। লেখকের মন্তব্য— পবিত্র স্তন পুনর্নির্মাণ করছে সমাজ, 'নিউ সোশ্যাল কনস্ট্রাকশান অব দ্য ব্রেস্ট'। স্তনে তখন শিশুর অধিকার নেই, গির্জার খবরদারি থেকে মুক্ত নারীর উত্তমাঙ্গ, নারীর স্তনের উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে পুরুষের, বিশেষ করে ক্ষমতাবান পুরুষের আধিপত্য। নারীর এই অঙ্গ তাঁদের কাছে বিশেষভাবে কামোদ্দীপক। উল্লেখ করা প্রয়োজন, মেয়েদের নতুন পোশাক, বুক-পিঠের অনেকখানি যাতে উন্মোচিত তা-ও দরকারি অবদান। রাজা সপ্তম চার্লসের মা নিজেই নাকি

চালু করেছিলেন সেই ব্লাউজ। গির্জা অবশ্য আপত্তি তুলেছিল। যাজকরা এই অঙ্গাভরণকে আখ্যা দিয়েছিলেন— নরকের প্রবেশদ্বার— 'দ্য গেটস অব হেল'। আঁটোসাঁটো করসেট-এর ব্যবহারের বিরুদ্ধেও আপত্তি তুলেছিলেন তাঁরা। তার ব্যবহারের ফলে যেভাবে বুক ঠেলে ফাঁপিয়ে তোলা হয় এবং বুককে দর্শনীয় করা হয় তাকে তাঁরা বলেছেন— পাপের প্রেরণাস্বরূপ। যেন মেছুনি বাজারে তাঁর পশরা ফিরি করতে বের হয়েছেন!

ফ্রান্সের রাজা সপ্তম চার্লসের সমসাময়িক ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম হেনরি তাঁর দরবারে মেয়েদের এই পোশাক পরা নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাঁকে সমর্থন করেছিলেন দেশের নীতিবাগীশরাও। বস্তুত নারী ও পুরুষের পোশাক নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনও চালু করা হয়েছিল। তবু ইউরোপের নব্য-ফ্যাশনের ঢেউ আটকানো যায়নি।

ইউরোপের নানা দেশে চিত্রকলার মতো সাহিত্যেও শুরু হয় নারীর উন্মোচিত স্তনের বন্দনা। মধ্যযুগের অন্তকাল থেকে রেনেসাঁস পর্যন্ত নারী এক আদর্শ— 'দে শুড বি স্মল, হোয়াইট, রাউন্ড লাইক অ্যাপেলস, ফার্ম অ্যান্ড ওয়াইড অ্যাপার্ট।' সংস্কৃত সাহিত্যের রূপের মান যেভাবে নির্দিষ্ট হয়েছিল সেই ঢঙে নির্দিষ্ট হল আদর্শ রূপের সংজ্ঞা। শুধু স্তন নয়, নারীর সম্পূর্ণ দেহই পুরুষের চোখে পুনর্নির্মিত সেদিন। একজন ফরাসি কবি রূপবতীর কায়া-কল্পনা করে লিখেছিলেন— 'দোজ সুইট লিটল শোল্ডারস, দোজ লং আর্মস অ্যান্ড নিম্বল হ্যান্ডস, লিটল ব্রেস্টস অ্যান্ড ফ্রেশলি হিপস।' ইতালিতে নারীদেহের অনুপুঙ্খ বর্ণনা শুরু করেছিলেন কবি পেত্রার্ক, চতুর্দশ শতকে। তার পর সে ধারা টেনে নিয়ে যান পরবর্তী কবি ও লেখকরা। রেনেসাঁসের ইউরোপে নারীর স্তন পরিণত হয় নব যৌন স্বাধীনতার বিজ্ঞপ্তি হিসাবে। শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রশস্তি প্রভাবিত করে মেয়েদেরও। তাঁরাও অনেকে গ্রহণ করেন প্রদর্শিকার ভূমিকা। গণিকারা উত্তমাঙ্গের পোশাক খুলে প্রকাশ্যে বের হয়ে আসেন। প্রাসাদে এবং অভিজাতদের ঘরের দেওয়ালে রাজা-রানির প্রতিকৃতির পাশে ঠাঁই পেতে লাগে তাঁদের নগ্ন প্রতিকৃতি। তবে অন্য পরিচয়ে। কেউ ফ্লোরা, কেউ ভেনাস, কেউ ডায়না। ভাস্কর্য এবং চিত্রে গ্রিক রোমান দেবীর মতো নকল দেবী এইসব রূপোপজীবিনী। তাঁরা যেন কামদেবী। পুরুষের বাসনার প্রতিচ্ছবি। রেনেসাঁসের নগ্নিকারা নারীর নতুন রূপের প্রতিবিম্ব। তাঁর স্তন মুখশ্রীরই অংশ, অতএব চোখ মেলে উপভোগ করতে কোনও দোষ নেই। বস্তুত ষোড়শ শতকের ফ্রান্সে 'ব্লার্জঁ' (Blazon) নামে এক কাব্যধারাই সূচিত হয় নারীর রূপ তথা পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত অঙ্গের অনুপুঙ্খ বর্ণনা করে। একটি পদ্যে স্তনের বর্ণনা থেকে কয়টি ছত্র: 'আ লিটল বল অব আইভরি, ইন দ্য মিডল অব হুইচ সিটস/ আ স্ট্রবেরি অর চেরি!' এই রূপ যে অন্যভাবে পুরুষনির্ভর তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এক কবি: 'ফর এভরি রিজন, হ্যাপি ইজ হি/হু উইল ফিল ইউ উইথ মিল্ক!'

রেনেসাঁস যুগের দুইজন মহিলার কথাও উল্লেখ করেছেন গবেষক যাঁরা নিজেদের বুক নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাঁরা দু'জনই ষোড়শ শতকে লিয়ঁর মেয়ে। একজনের কাব্যে নব্য-প্লেটোনিক প্রেম। তিনি চান দেহের বাধাবন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি। কিন্তু শরীরকে, শরীরের দাবিকে দমন করতে চাইলেও তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারেননি। অন্যজনের কবিতায়— নিষ্ঠুর প্রেমের পীড়নের কথা আবেগের সঙ্গে উচ্চারিত। '—আই লিভ, আই ডাই, আই অ্যাম বার্নিং, আই অ্যাম ড্রাউনিং'। তাঁর বুক, তাঁর স্তন, তাঁর হৃদয় প্রেমের যন্ত্রণায়

অধীর, বিযাক্ত, প্রজ্বলিত, অত্যাচারিত। রেনেসাঁসের ইতালি ও ফ্রান্সে নারীর স্তন প্রতিষ্ঠিত হয় এলিট বা উচ্চবর্গের সংস্কৃতির নব্য যৌনতার কেন্দ্রে। নারীর এই অঙ্গ স্বয়ং কামদেবী যেন। অবশ্য তখনও ইউরোপের শতকরা নব্বই জন নারীই স্বাভাবিক জননী তথা স্তন্যদায়িনী। রেনেসাঁস-পর্বেও ধাই-মা ছিলেন বটে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে গরিষ্ঠ অংশই উচ্চবর্গের সন্তানকে স্তন্য দেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের সন্তানদের লালন করতেন। শতকরা দশ ভাগ মেয়ে ছিলেন প্রদর্শিকা। তাঁদের স্তন সযত্নে রক্ষিত, সন্তান নয়, স্বামী অথবা প্রেমিকের জন্য। সাধারণ মেয়েরা এই বিবিয়ানার বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। তাঁরা শীত এবং লুব্ধ পুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য শরীর ঢেকে রাখতেন। তাঁরা বুকের দুধ 'বিক্রি' করতেন নিতান্তই আর্থিক প্রয়োজনে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন এই রেনেসাঁস-পর্বেই দু'শো থেকে তিনশো বছরের মধ্যে ষাট হাজার থেকে দেড় লক্ষ মেয়েকে ডাইনি হিসাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ইউরোপে। ডাইনি চিহ্নিত করার একটি প্রক্রিয়া ছিল তাঁর স্তন পরীক্ষা করা। পিন ফোটালে সে কষ্ট পাবে না, বাধা দেবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। আঘাতে আঘাতে তার বুক ক্ষতবিক্ষত করা হত। বাড়তি স্তন-বৃন্ত সন্ধানের নামে চরম অসভ্যতা করা হত। এমনকী অষ্টম হেনরির দুর্ভাগা স্ত্রী অ্যানি বোলেনের বিরুদ্ধে ব্যভিচার ছাড়াও অভিযোগ ছিল একটি বাড়তি স্তনাঙ্কুর। মার্গারেট কিং নামে একজন গবেষককে উদ্ধৃত করে লেখক বলেছেন— পুরুষের মতো নবজাগরণের শরিক হননি রেনেসাঁসের নারী। নবচেতনা যেন তাঁদের জন্য নয়। তাঁদের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ ছিল যৌনতায়। অন্য দিকে ডাইনি হিসাবে অসংখ্য নারীকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা প্রমাণ করে এই নিগ্রহ ছিল নারীর বিরুদ্ধে তথাকথিত 'মুক্ত পুরুষের যুদ্ধ'— 'ট্যান্টামাউন্ট টু আ ওয়র ওয়েজড বাই মেন আপন উইমেন'।

রেনেসাঁসে স্তনের সৌন্দর্য ঘিরে যে যৌনতা তা মূলত নব্য স্বাধীনতা-বোধেরই এক প্রকাশ। ইহুদি-খ্রিস্টান জগতে প্রথমবারে দেবতা নয়, মানুষই সব-কিছুর কেন্দ্রে। মানুষই সব-কিছুর পরিমাপ। কোনও স্বর্গীয় অস্তিত্ব নয়, মানবসমাজ সেদিন অর্জন করে নতুন মর্যাদা। শারীরিক আনন্দানুভূতি, শরীরের দাবি বিশ্বমানবের অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই অধিকার ছিল অবশ্য খণ্ডিত, নিতান্তই সীমাবদ্ধ। শুধু তা-ই নয়, সেদিনের অভিযাত্রী মানুষ, নব নব অঞ্চলের আবিষ্কারকদের কাছে নারীদেহ ছিল নব যুগের প্রতীক। লেখক প্রসঙ্গত ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ডায়েরির উল্লেখ করেছেন। ১৪৯৮ সালে দক্ষিণ আমেরিকার তটরেখার দিকে তাকিয়ে তিনি লিখেছিলেন, যেন কোনও স্তনের বৃন্ত। কখনও বলেছেন তাঁর চোখে ধরিত্রী পিয়ারশেপড মেয়েদের স্তনের মতো। লেখক মন্তব্য করেছেন— 'রেনেসাঁস যুগে মেয়েরা সাক্ষাৎ প্রকৃতি। নতুন পৃথিবী, আমেরিকা তাঁদের কাছে কুমারী জমি, পুরুষের প্রতীক্ষায়।' (স্মরণীয় ভারতে কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে নারীদেহের কল্পনা। লাঙল থেকে লিঙ্গের ব্যবহার।) তাকে উন্মোচিত করতে হবে, কর্ষণ করতে হবে, মানুষের বিজয়াভিযান যেন সেই লক্ষ্যে।

লক্ষণীয়, রেনেসাঁস-পর্বে ইতালি এবং ফ্রান্সের শিল্পী ও লেখকরা যেভাবে নারীস্তনের বন্দনা করেছেন, নারীর ঊর্ধ্বাঙ্গকে পরিণত করেছেন যৌনতার প্রতীকে, ইংলিশ-চ্যানেলের ওপারে প্রথম এলিজাবেথের আমলে (১৫৫৮-১৬০৩) কিন্তু সেই উন্মাদনা দেখা যায়নি। এলিজাবেথের বাবা অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে যে যৌনতার বাড়াবাড়ি দেখা গেছে

উচ্চবর্গের মধ্যে তাঁর কন্যার শাসনকালে তা বহুলাংশে স্তিমিত। লেখক বলছেন তার কারণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ইহুদি-খ্রিস্টান ভাবধারার বদলে ইংল্যান্ডে তখন নর্ডিক-খ্রিস্টতন্ত্রের প্রভাব বেশি। ওই অঞ্চলের মানুষের কাছে দৈহিক ভোগবাদ ছিল নিন্দনীয়, সুতরাং ত্যাজ্য। প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম এবং পিউরিটানদের অনুশাসনে যৌনতা ছিল বলতে গেলে অবদমিত। এলিজাবেথ তাঁর রাজত্বের প্রথম পর্বেই চেষ্টা করেছেন কি পোশাকে, কি আচার-আচরণে সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনের আদর্শ জনমানসে প্রতিষ্ঠা করতে। অ্যানি বোলেনের কন্যা এলিজাবেথ সিংহাসনে বসেন পঁচিশ বছর বয়সে। এই কুমারী-রানি যেন না-পুরুষ, না-নারী। নারীর কোমলতায় তাঁর আগ্রহ নেই, আবার পুরুষের কঠোরতাও তাঁর নেই। হাত আর মুখখানা ছাড়া তাঁর সর্বাঙ্গ আবৃত। স্প্যানিশদের আদলে এক বর্মের মতো পোশাক পরতেন তিনি। তৎকালের উচ্চবর্গের ইংরেজ মেয়েদের কাছে করসেট অজানা ছিল না। বডিসও ছিল। অবশ্য সেটিকে বলা হত 'বডি' বা 'আ পেয়ার অব বডি'। কিন্তু বর্মাবৃত রানিকে দেখলে মনে হয় বুঝি-বা তিনি এক লৌহমানবী, 'আয়রন লেডি'।

সত্যি বলতে কী, অনেকের মধ্যে সেদিন দেখা গেছে নারীর স্তন সম্পর্কে এক নঞর্থক মনোভঙ্গি। এলিজাবেথের কালে অধিকাংশ ইংরেজ শিশুই লালিত হত মায়ের দুধে। এমন নয় যে, ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে ধাই-মা সম্পূর্ণ গরহাজির ছিলেন। কিন্তু তাঁরা একমাত্র বড়মানুষের সন্তানকেই লালন করার দায়িত্ব পেতেন। সম্পন্নদের ঘরে তাঁরা ছিলেন 'স্টেটাস-সিম্বল' বা নিজেদের অর্থকৌলীন্যের অন্যতম একটি স্মারক। কিন্তু সমাজের অন্য শ্রেণীর মধ্যে তাঁদের বিশেষ কদর ছিল না। যাজকেরা ধাই-মা নিয়োগ না করতে পরামর্শ দিতেন। তাঁরা বাইবেলের একাধিক মায়েদের উদাহরণ তুলে ধরে প্রচার করতেন। ফলে এমন দৃশ্যও সে দেশে দেখা গেছে যে, রাজা প্রথম জেমসের (১৫৬৬-১৬২৫) রানি অ্যান ধাই-মাদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন!

কিন্তু শেষরক্ষা হল কই? ষোড়শ শতকের শেষ দিকে দেশে ছাপাখানা চালু হওয়ার পর কবি-লেখকরা মহিলা-পাঠকদের কথাও মাথায় রেখে কলম ধরেন। এলিজাবেথের আমলে কবিরা নারীর স্তনকে বন্দনার বদলে কখনও কখনও আক্রমণও করেছেন। শেক্সপিয়ার পর্যন্ত তাঁর নায়কদের দিয়ে আঘাত হেনেছেন নারীর স্তনে। কিন্তু ক্রমে শুরু হয় ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো কুচ-যুগের বন্দনা, যদিও ইংল্যান্ডের চিত্রশিল্পে নগ্ন নারী সেদিন প্রায় অনুপস্থিত, কিন্তু সাহিত্যে তথা কাব্যে স্তনের কত না উপমা। এক কবি লিখেছেন— 'হার পাপ্‌স আর সেন্টার অব ডিলাইট/হার ব্রেস্টস আর অর্বস অব হেভেনলি ফ্রেম'। ইতালি-ফ্রান্সের হাওয়া শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে। এলিজাবেথ নিজেও স্তন নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু সে উরসিজ জাগতিক কামনার বস্তু নয়, নারীর অন্তরস্থিত হৃদয়ের আবেগের প্রকাশ মাত্র। শুধু তা-ই নয়, একটি কবিতায় বেদনা ও অনুশোচনার আসন বুক। কিন্তু অন্য কবিরা, এমনকী কোনও কোনও মহিলা তাঁদের কবিতায় খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেছেন যৌনতা। বিশেষত সপ্তদশ শতকের দু'জন কবি। নায়ক-নায়িকার আলিঙ্গন বর্ণনা করতে গিয়ে একজন লিখেছেন— 'হিজ প্যানটিং ব্রেস্ট, টু হার নাউ জয়েনড'। (প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।) আর-একজন লিখেছেন তাঁর প্রেমিকের রূপ তাঁর 'হার্ট' বা হৃদয়কে উত্তাল করে তোলে। প্রেমের দেবতার কাছে তাঁর প্রার্থনা—'তার শীতল জমাট-বাঁধা বুককে আমার মতো তপ্ত করে দাও।'

এই পরিবেশে জননী-প্রতিমা কিন্তু পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি সেদিনের ইংল্যান্ডে। লেখক জানাচ্ছেন সাসেক্স-এর একটি কবরখানায় রয়েছে একজন মহিলার সমাধি (১৬৫৮)। ছয়টি পুত্র এবং দুটি কন্যার জননী এই মহিলা ছিলেন আর্ল অব ম্যাঞ্চেস্টারের স্ত্রী। তাঁর স্মারকলিপিতে অন্যান্য পরিচয়ের সঙ্গে তৎকালের বানানে লেখা রয়েছে এই বাক্য, 'সি নার্সড উইথ হার ওন ব্রেস্টস'।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন তৎকালে নারীর মাতৃরূপের যে-প্রকাশ ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের হল্যান্ডে দেখা গেছে ইউরোপে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। লেখক ডাচ মেয়েদের স্তন-বিষয়ক আলোচনার অধ্যায়টির নাম দিয়েছেন— 'দ্য ডোমেস্টিক ব্রেস্ট', গার্হস্থ্য-স্তন। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে স্বতন্ত্র ডাচ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সে-দেশের গির্জা তো বটেই, চিকিৎসক, ভাবুক সকলেই মায়ের বুকের দুধে শিশুপালনের জন্য ব্যাপক প্রচার চালিয়েছেন। এমনকী মেয়েরা নিজেরাও। ফলে সমকালের ডাচ চিত্রকলায় স্তন্যদায়িনীর চিত্রের ছড়াছড়ি। নিজেদের ঘরে, গির্জায়, সর্বত্র তাঁরা। এমনকী একজন ডাচেসও তাঁর তিন সন্তানকে নিয়ে ছবি আঁকিয়েছেন শিল্পীকে দিয়ে। তাঁর একটি স্তন খোলা। এ স্তন পবিত্র। পানশালা এবং আমোদকেন্দ্রে হয়তো যৌনতাও দেখা যেত, কিন্তু অন্যত্র, সর্বত্র নারী কল্যাণী। পুরুষের হাত যখন তাঁর বুকে, তখনও কামনার বদলে সেখানে যেন স্নেহস্পর্শ। ডাচ চিত্রশিল্প, সন্দেহ কী, তৎকালের ইউরোপে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

নারীর স্তন আবার রাজনৈতিক অভিজ্ঞানও বটে। অষ্টাদশ শতক থেকে তার সঙ্গে জাতীয়তার নিবিড় সম্পর্ক। অষ্টাদশ শতকে পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালে (১৭১৫-৭৪) ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে চালু হয় স্তনের যৌনতাকরণের প্রক্রিয়া হিসাবে 'করসেট'। স্ফীত উত্তমাঙ্গ একই সঙ্গে হয়ে ওঠে দর্শনীয় ও কামোদ্দীপক। এই ক্ষীণকটি-পীনপয়োধর মূর্তির বাসনা ক্রমে সঞ্চারিত হয় অন্য শ্রেণীর মধ্যেও। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে যায় ধাই-মা'দের কদর। অনেকেই প্রচার করেছেন তার বিরুদ্ধে। অষ্টাদশ শতকের একজন সুইডিস বিজ্ঞানী প্রথম মানুষকে আখ্যা দেন 'মাম্মালিয়া'। কেউ কেউ আপত্তি করেন। কারণ মেয়েদের মতো পুরুষদের স্তন নেই। কিন্তু 'ম্যামাল' বা স্তন্যপায়ী শব্দটি শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়। মাতৃদুগ্ধের পক্ষে বিশিষ্টদের সওয়াল অতএব পুরো বিফলে যায়নি, মারি আঁতোয়ানেত (Antoinett) নাকি মায়ের দুধকে উৎসাহিত করার জন্য বিশিষ্ট কারুশিল্পীদের নিয়ে স্তনের মতো একজোড়া চিনামাটির পানপাত্র গড়িয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন— সেই পাত্র দুটি আসলে নিজের স্তনের প্রতিরূপ। (হেলেনের মতো?)।

দরবারি রূপসীর স্তন নয়, ফরাসি বিপ্লবের সময়কার অনেক ছবিতে স্তন্যদায়িনীর যে প্রতিকৃতি, তা সাধারণ নারীর। অভিজাতদের স্তন ক্রূর, বিষভাণ্ড। সাধারণের স্তন পবিত্র, কারণ তা সন্তানকে লালন করে। এই স্তন সাধারণতন্ত্রের বার্তাবহ। লেখক বলছেন— নিজের সন্তানকে বুকের দুধে লালন বলতে গেলে একটি রাজনৈতিক ঘোষণা। পিতৃভূমিকে সেদিন কল্পনা করা হয় এমন এক জননীরূপে যিনি আপন সন্তানদের নিজের বুকের দুধে পুষ্টিদান করেন। এমনকী ফরাসি উপনিবেশের কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা স্তন্যদায়িনী শ্বেতাঙ্গ বোনদের মতো সম্মানিত। বিপ্লবের ছবিতে নতুন প্রজাতন্ত্র কখনও কখনও এথেনার মতো শিরস্ত্রাণে শোভিত, হাতে তাঁর বর্শা, একটি স্তন উন্মুক্ত। অগণিত ছবিতে, ভাস্কর্যে, মেডেলে—স্তন পরিবর্তিত হয় জাতীয় বিগ্রহে। অথচ বিপ্লব মেয়েদের অধিকার মেনে নেয়নি। ধর্মীয়

সংখ্যালঘু এবং ক্রীতদাসদেরও যে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, দুঃখ, যন্ত্রণা এবং ত্যাগের বিনিময়েও ফরাসি মেয়েরা তা পাননি। তাঁরা যার জন্য লড়াই করেছেন সেই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বৃত্তের বাইরে তাঁদের অবস্থান। কে জানে, ওই সব ছবি, মূর্তি, প্রতীক সান্ত্বনা পুরস্কার কি না!

ফ্রান্সে উনিশ, এমনকী বিশ শতকেও প্রজাতন্ত্রের প্রতীক হিসাবে দেখা গেছে বুক খোলা নারীপ্রতিমা। ডেলাক্রোয়ার (Delacroix) পতাকাধারী বিখ্যাত উন্মুক্তবক্ষ 'লিবার্টি' নামক নাটকীয় নারীমূর্তিটি অনেকেরই দেখা। সেটা কিন্তু ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের কোনও বীরাঙ্গনার ছবি নয়, এটি আসলে ১৮৩০ সালের রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের সময় আঁকা। এ-ছবিও, দর্শকরা জানেন, রাজনৈতিক, তাঁদের দৈহিক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য রচিত নয়। তারও একশো বছর পরে, প্যারিসের মুক্তির পর জনপ্রিয় একজন ফরাসি গায়িকা হঠাৎ লাফিয়ে একটি গাড়িতে উঠে সেই ছবির নায়িকার মতো তাঁর বুক উন্মোচন করে গাইতে শুরু করেন ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত। লেখকের বক্তব্য, 'লাইফ, টেকিং ইটস কিউ ফ্রম আর্ট, হ্যাভ নো বেটার সিম্বল ফ্রম ফ্রিডম দ্যান দি আনফেটারড্ ব্রেস্টস'। বাধাবন্ধহীন উন্মুক্ত স্তনের মতো স্বাধীনতার প্রতীক আর কী হতে পারে!

১৮৫০ সাল নাগাদ ফরাসি প্রজাতন্ত্রের প্রতীক হন— 'মারিয়ানি' (Marianne)। যুবতীর মতো মুখ তাঁর, বুক খোলা, মাথায় টুপি। এই নারীর অসংখ্য ছবি আঁকা হয়, মূর্তি গড়া হয়। সৌন্দর্য, সাহস, শক্তি, চরিত্রবল— ফরাসি চরিত্রের গরিমায় গরবিনী এই কন্যা। অন্য দেশেও জাতীয় চরিত্রের প্রতীক হয়েছেন নারী। ব্রিটেনে— ব্রিটানিকা, জার্মানিতে— জার্মানিয়া, আমেরিকায়— কলম্বিয়া। কিন্তু তাঁদের উত্তমাঙ্গ আবৃত, ফ্রান্সই একমাত্র দেশ যেখানে তাদের জাতীয় প্রতিমার স্তন খোলা।

ইতিমধ্যে ইউরোপে মেয়েদের পোশাকে রকমারি পরিবর্তন ঘটে গেছে। মা ও ধাই-মা'র দুধ নিয়ে বিতর্ক নব নব মোড় নিয়েছে। সে-প্রসঙ্গ বাদ দিচ্ছি। রাজনৈতিক স্তনের কাহিনীই বরং শোনা যাক। অবশ্য মাতৃস্তনেও রাজনীতি ছিল। প্রজা বৃদ্ধি, জাতির জন্য সুস্থ সন্তান, শ্রমশক্তির উৎপাদন, স্তনের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভূমিকাও ছিল বটে। আপাতত যে-স্তন সরাসরি জাতীয় রাজনীতির সেবায় নিযুক্ত তার কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের ফরাসি পোস্টারে জাতীয়তার সেই প্রতীক ফরাসি রমণীমূর্তি মারিয়ানিকে দেখা গেল প্রুশিয়ান ঈগলকে প্রতিহত করতে নাগরিক যুদ্ধের ঋণপত্র কিনতে আবেদন করছেন। তাঁর উত্তমাঙ্গ অনাবৃত। অন্যান্য যুদ্ধ-সংক্রান্ত পোস্টারে তিনি আরও খোলামেলা। ১৭৮৯-এর বিপ্লবের দিনগুলি বুঝি বা ফিরে এসেছিল সেদিন। জার্মানরা অবশ্য এইসব ছবিকে প্রচার করে ফরাসিদের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত হিসাবে। তাদের যুদ্ধ-উদ্‌যোগে যুবতী মেয়েদের ছবির অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁরা নতদৃষ্টি, তাঁদের পুষ্ট দেহ আবৃত। আমেরিকানরা তাদের পোস্টারে জার্মানদের চিত্রিত করে বন্য গেরিলার মতো, তার রোমশ পরুষ হাতে একটি উলঙ্গপ্রায় মেয়ে। ছবির নীচে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান— 'ডেস্ট্রয় দিস ম্যাড ব্রুট!' বাইশ বছর পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গোয়েবলস এই ছবিটিই পুনর্মুদ্রণ করে নাতসিদের রণবাদ্যকে আরও উচ্চকিত করেন। জার্মানদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় আমেরিকানরা অতীতে কীভাবে এই গর্বিত জাতিকে অপমান করেছিল।— 'নো সেকেন্ড টাইম!!!', তাঁর হুংকার। যুদ্ধে আমেরিকানরা তাঁদের 'মিস লিবার্টি'কে বলতে গেলে নগ্নিকা হিসাবে চিত্রিত করেছিল।

বক্তব্য ছিল: 'তোমরাই ভরসা, জাতির সম্মানকে রক্ষা করো!' ব্রিটেন, ইতালি, রাশিয়া, যুদ্ধকালে সকলেই নারী-প্রতিমা ব্যবহার করেছে। কিন্তু ব্রিটানিকা বর্মাবৃত। ইতালি পীনোন্নত মেয়েদের এমনভাবে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেছে যেন তাঁরা শক্তির মতো যৌনতারও বিজ্ঞাপন। রাশিয়ান মেয়েদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। একমাত্র রুশ মেয়েরাই সেদিন অস্ত্রধারী। ১৯১৫ সালে জার্মান হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁরা অংশ নিয়েছেন, উত্তর রণাঙ্গনে মেয়েদের একটি ব্যাটেলিয়ান পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। নভেম্বর বিপ্লবের দিনগুলোতে বলশেভিকরা নিজেদের প্রচারে এই 'নতুন নারী'র কথা সগর্বে বিশ্ব-মানুষের গোচরে এনেছেন। তারই মধ্যে কিন্তু কোনও কোনও কাগজে তাঁদের নিয়ে আদিরসাত্মক কার্টুন ছাপা হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকায় যুদ্ধোদ্যোগে মেয়েদের নানাভাবে কাজে লাগানো হয়। সৈন্যদের সেবা থেকে আনন্দদান— এবং আরও নানা ভূমিকায়। আর নগ্নতা? তা দেখা যায় বোমারু বিমানের মুখপাতের ছবিতে, যার তলায় সতর্কবাণী— 'স্লাইটলি ডেনজারাস'! কিংবা মুক্তদেহী নারীকে বলা হয়েছে—'মিস লেইড'! তা ছাড়া লক্ষ লক্ষ 'পিন-আপ' ঝকঝকে কাগজে ছাপিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রণাঙ্গনে সৈন্যদের উৎসাহিত করার জন্য। নামী আলোকচিত্রীদের সহযোগিতায় অভিনেত্রীদের পীনপয়োধর এবং লাস্য ও হাস্যময় দেহবল্লরী ক্যামেরাবন্দি করে পাঠানো হয়েছে ছেলেদের জন্য, 'ফর আওয়ার বয়েজ'! ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে শুধু 'এস্কোয়ার' ম্যাগাজিন থেকে সুন্দরী 'পিন-আপ'দের ষাট লক্ষ ছবি পুনর্মুদ্রণ করে দেশে দেশে বিলি করা হয়েছিল মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে। লেখক বলেন— 'আমেরিকানদের স্তন নিয়ে বাড়াবাড়ি, নারীর ঊর্ধ্বাঙ্গের প্রতি গভীর ও ব্যাপক আসক্তির একদিক থেকে সেদিনই শুরু। যুদ্ধের পর ঘরে-ফেরা সৈন্যরা রুপোলি পর্দায় দেখা পেলেন যেমন মেরিলিন মনরো, জিনা লোলোব্রিজিডা, জেনি ম্যানসফিল্ড, আনিটা একবার্গের, তেমনই সঙ্গিনী হিসাবে পেতে চাইলেন তাঁদের মতো নতুন নারীকে।

একসময় নানা সমাজে দেখা গেছে নারীদেহে আকর্ষণীয় ছিল নানা অঙ্গ। চিনে সুন্দরীর লক্ষণ খোঁজা হত পায়ে, জাপানে গ্রীবায়, আফ্রিকায় নিতম্বে। অনেক সমাজে গোপনীয়তাই ছিল বিশেষ আকর্ষণের হেতু। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকায় সুন্দরীদের উত্তমাঙ্গ যদি কখনও উত্তুঙ্গ, তবে কখনও বা সমতল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশেষ করে আমেরিকায় যাকে বলে 'ম্যামারি গ্ল্যান্ড' তার স্ফীতি যেন ক্রমেই বর্ধমান। কেন, সে কি মেয়েরা নিজেদের আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে চেয়েছেন বলে? লেখক বলেন— 'সেটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এই নির্মাণ আসলে পুরুষের কারিগরি। মেয়েরা তার শিকার মাত্র। এই নব্য তিলোত্তমা পুরুষের উদ্যোগে তিল তিল করে রচিত। এই স্তন আসলে 'পণ্য'। সরকার, শ্রেষ্ঠীকুল, ধর্মীয় নেতা, স্বাস্থ্যের প্রহরী চিকিৎসকদল, সকলেরই কমবেশি অবদান রয়েছে এই সৃষ্টিতে। তাঁরা কিন্তু বলতে গেলে সকলেই পুরুষ। এই স্তন নারীদেহে পিতৃতন্ত্রের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার আর-এক উদ্যোগ।

এমন একটা সময় ছিল যখন মায়ের বিকল্প হিসাবে ধাই-মা নিয়োগের বিরুদ্ধে ইউরোপের অনেক দেশে বিশিষ্ট প্রতিবাদীদের দেখা গেছে। অনেক স্বনামধন্য লেখক ও চিন্তাবিদ মাতৃদুগ্ধের সপক্ষে সওয়াল করেছেন। এমনকী কখনও কখনও রাজরানিরাও সানন্দে স্বীকার করে নিয়েছেন সে দায়িত্ব। ইংল্যান্ডের এক রানির কথা আগে বলা হয়েছে।

ইংল্যান্ডে এমনও দেখা গেছে বাচ্চাদের দুধ খাওয়াবার বোতল দেখতে কৌতূহলী সাধারণ মেয়েদের ভিড় জমে গেছে। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী, অস্ট্রিয়ার রানি— বড়ঘরের মেয়েরাও আদর্শ-জননী হিসাবে নিজেদের তুলে ধরেছেন। আমেরিকায় ধাই-মা, এমনকী শ্বেতাঙ্গ শিশুর জন্য কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েও নিয়োগ করেছেন কেউ কেউ। লুই পাস্তুরের কৃতিত্বের ফলে ১৮৮০ সাল নাগাদ গোরুর দুধ বোতলে পুরে শিশুকে পান করাবার চিন্তা অনেকের মাথায় আসে। কিন্তু লেখক বলছেন— ১৯৩০ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় ধাই-মা নিয়োগ খুব জনপ্রিয় ছিল না। মায়েরা নিজেরাই সন্তানের পুষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করতে পছন্দ করতেন। কিন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে দেখা যায় স্তন্যদায়িনী মায়ের সংখ্যা অত্যন্ত কমে গেছে। কেননা, বিকল্প হিসাবে বোতলের দুধের মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে যেন বোতলই শিশুর প্রকৃত মা। এর জন্য দায়ী শুধু মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা নন, তাঁদের সহযোগী চিকিৎসকরাও। এই বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত কোটি কোটি ডলারের প্রশ্ন। আর তার পিছনে চালিকাশক্তি— মুনাফা! আর মুনাফা!

স্তন নিয়ে বাণিজ্যের তথ্যবহুল আলোচনার আগে লেখক একটি মূল্যবান অধ্যায় ব্যয় করেছেন মনস্তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্ররোচনা নিয়ে। পরের অধ্যায়ের বিষয় চিকিৎসকদের ভূমিকা। নারীস্তনে ক্যান্সার নিয়ে কীসব কাণ্ড চলেছিল তার ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে ওই অধ্যায়টিতে। এখানে তা নিয়ে পর্যালোচনার সুযোগ নেই। মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে কুলগুরু ফ্রয়েডের একটি উক্তি এখানে বিশেষ করে স্মরণীয়। তিনি বলেন— 'স্তন্যপান শিশুর প্রথম একটি 'ক্রিয়া', এবং তার প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা।' স্তনকে যৌনতার কেন্দ্রে স্থাপনের নব্য স্থাপত্যে এই 'সিদ্ধান্ত'-এর প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়।

স্তন যৌনাঙ্গ হিসাবে 'বিজ্ঞানে' স্বীকৃত হওয়ার পর, পুরুষ যেমন তা অধিকার এবং রক্ষায় তৎপর হন, মেয়েরাও অনেকেই নিজেদের সুরসুন্দরী হিসাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী হবেন, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

উনিশ শতকে এমনকী ফ্রান্সেও 'করসেট' ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। ঘুমের সময়, হাঁটা চলা, ঘোড়া কিংবা সাইকেলে চড়া, স্নান করা, এমনকী গর্ভাবস্থায়ও মেয়েরা অন্তর্বাস হিসাবে 'করসেট'ই পরতেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে (১৯০৭) ফ্রান্সে উদ্ভাবিত হল অন্য স্তনাবরণ— ব্রেসিয়ার। ১৯১৪ সালে আমেরিকায় এক ভদ্রমহিলা আকস্মিকভাবে ফ্রান্সের সেই নব-অন্তর্বাসের সঙ্গে তুলনীয় একটি নতুন পোশাক তৈরি করেন। পরবর্তীকালে তার বিনিময়ে তিনি পনেরো লক্ষ ডলার সেলামি পান। ব্রোসসিয়ার (Brassiere) শব্দটি আমেরিকায় প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৯০৭ সালে 'ভোগ' (Vogue) ম্যাগাজিনের পাতায়। অক্সফোর্ড ডিকশনারি তা গ্রহণ করে ১৯১২ সালে। ১৯২৬ সালে দু'জন আমেরিকান ভদ্রমহিলা স্তনের স্বাভাবিক গড়ন এবং স্বচ্ছন্দ আন্দোলন বজায় রাখার জন্য তৈরি করেন পরবর্তীকালে বহুবিদিত 'মেইডেন ফর্ম'। ১৯০০ সাল নাগাদ আবিষ্কৃত হয়েছিল কৃত্রিম তন্তু রেয়ন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উদ্ভাবিত হয়, নাইলন। ১৯৩০ সালেই ব্রেসিয়ার 'ব্রা' হয়ে গেছে। অতঃপর শুধু মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার অপেক্ষা। ১৯৪৯ সালে সওদাগররা শিল্পীর মতো নারীদেহ গড়ে তুলতে যত্নবান হলেন সোৎসাহে। 'মেইডেন ফর্ম' নির্মাতারা স্বপ্নবিক্রেতা হিসাবে শুরু করলেন তাঁদের ব্যাপক অভিযান। দীর্ঘ দুই দশক সেই তরঙ্গ ছিল বাধা-বন্ধহীন। মেয়েরা তার তোড়ে ভেসে যেতে লাগলেন। বিশেষত পঞ্চাশের দশকে

টিভির ব্যাপক প্রচলনের পর। তা পর 'ওয়ান্ডার-ব্রা', 'টর্পেডো-ব্রা', 'বুলেট-ব্রা', আরও কত কী। এমনকী কিশোরীদের জন্যও বাজারে ছাড়া হয়—'ট্রেনিং ব্রা'!

শুধু কি অন্তর্বাস? স্বপ্নের তিলোত্তমা হওয়ার বাসনা জাগিয়ে তোলার আগে ও পরে বাজারে আসে আদর্শ দেহবল্লরী গড়ে তোলার জন্য হাজার প্রসাধনী। মধ্যযুগে, হয়তো প্রাচীন যুগেও স্তনের পুষ্টি সুস্থতা ও শিশুর প্রয়োজনের কথা ভেবে মায়েরা রকমারি ভেষজ ও টোটকা ব্যবহার করতেন। কিন্তু এবার এল মনোলোভা আধারে, বর্ণাঢ্য লেবেল পরে, বিজ্ঞানের জয়গান গাইতে গাইতে। তা ছাড়া দেহ-ভাস্কর্য গড়ার নামে যন্ত্রপাতি, শল্য চিকিৎসকদের সৌজন্যে খোদার উপর খোদকারি, প্ল্যাস্টিক সার্জারি, এমনকী স্তন বৃদ্ধির জন্য 'সিলিকন' প্রয়োগ। (এই বিপজ্জনক খেলা আইনবলে বন্ধ করা হয় ১৯৮৮ সালে।) নারীর উত্তমাঙ্গ পশ্চিমে পরিণত হয় বৃহৎ শিল্পে। মেয়েরা সেখানে যেমন ক্রেতা, তেমনই বিক্রেতাও বটে। ম্যাগাজিনের মলাটে এবং মলাটের ভেতরে পর্নোগ্রাফির পাতায়, মডেলের বেশে, পানশালায়, বিভিন্ন নিশিবাসরে, সিনেমা এবং সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায়, তাঁরা অনেকে নিজেদের স্তনকে তুলে ধরেন অর্থের বিনিময়ে।

এই নবহুল্লুড়ে ষাটের দশকে শোনা গেল অন্য এক শিহরনকারী সংবাদ— 'ব্রা-বার্নিং'। সেটা অবশ্য গুজবমাত্র। কিন্তু সেদিন যা ঘটছিল তা অন্তর্বাস-পোড়ানোর চেয়েও অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। 'দ্য লিবারেটেড ব্রেস্ট' শীর্ষক অধ্যায়টি এই বইয়ে অত্যন্ত জরুরি-পাঠ। কারণ, ষাট এবং সত্তরের দশকের নারীবাদীদের ঐতিহাসিক আন্দোলনে শুধু সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট পটভূমিই রচনা করেননি গবেষক, বিশ্বময় নারীচেতনায় তার প্রভাব এবং পুরুষতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ারও একটি বুদ্ধিদীপ্ত দলিল এটি। আমেরিকায় একটি সভায় মেয়েরা সেদিন নিজেদের 'ব্রা' খুলে হলের এক কোণে রাখা আবর্জনার বাক্সেই ছুড়ে দেননি, আরও অনেক কাণ্ডই করেছেন। শুধু আমেরিকায় নয়, ফ্রান্সে, জার্মানিতে, ইতালিতে, উন্মুক্ত উত্তমাঙ্গ নিয়ে মিছিল, নগ্ন হয়ে প্রতিবাদ জানানো, বুক খুলে সমুদ্রসৈকতে রোদ পোহানো, অবিশ্বাস্য নানা কাণ্ড। এখানে সে-কাহিনী সবিস্তারে নতুন করে শোনাবার সুযোগ নেই। বোধহয় তার প্রয়োজনও নেই। জগৎ-কাঁপানো নারীবাদী আন্দোলনের কাহিনী কে না জানেন? লেখক তার বিবরণ দিতে গিয়ে সবিনয়ে জানিয়েছেন— তথাকথিত এই 'ব্রা-বার্নিং' 'ব্রা' পোড়ানোর এক লক্ষ্য ছিল— মেয়েদের যৌনতা নিয়ে পুরুষের বাড়াবাড়ি, তাঁদের হাজার সমস্যা এড়িয়ে স্তন নিয়ে মাতামাতির বিরুদ্ধে স্পষ্টভাষায় প্রতিবাদ জানানো। এমন প্রতিবাদ যা সমাজকে শিহরিত করে, আহত করে, এবং ভাবিত হতে বাধ্য করে। ওঁরা নিজেদের শরীরের উপর নিজেদের অধিকার দাবি করতে যেমন সেদিন লড়াইয়ে অবতীর্ণ, তেমনই বৃহত্তর লক্ষ্যও ছিল তাঁদের সামনে। নারীর নানা দাবিকে সরবে উত্থাপন করেছিলেন ওঁরা সেদিন বধির শাসক এবং পুরুষতন্ত্রের অন্য ধ্বজাধারীদের সামনে। সে-প্রশ্নের মধ্যে ছিল পর্নোগ্রাফি, যৌনতা (সেক্সইজম), মেয়েদের স্বাস্থ্য, রুজি-রোজগারের সমস্যা, নিরাপদ যৌনজীবনের প্রয়োজনীয়তা— অন্যভাবে বললে পুরুষের অধিকারের সমান অধিকার। সত্য ওঁদের এক উচ্চারণ— 'উই রিক্লেম আওয়ার ইনহেরেন্ট রাইট টু গভর্ন আওয়ার ওন বডিজ'। কিংবা অন্য আওয়াজ— 'আওয়ার ব্রেস্টস আর ফর দ্য নিউবর্ন, নট ফর মেন্স পর্নো'। কিন্তু আসল লড়াই— একই তুলাদণ্ডে নারী আর পুরুষের মূল্যায়ন। নরনারীর স্বীকৃতি।

ওঁদের আন্দোলন, বলাই বাহুল্য, বিফলে যায়নি। ইউরোপ-আমেরিকায় রাষ্ট্র ও সমাজপতিরা নতুনভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অধিকারের স্বীকৃতিও দিতে হয়েছে। কিন্তু লেখক স্বীকার করেছেন আশির দশকে স্তনের মহিমা আবার প্রতিষ্ঠা খুঁজে পায় আমেরিকায়। সত্য, অনেক মেয়েই নিজেদের শরীর মন, এমনকী নিজেদের যৌনতার উপর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করতে সমর্থ নন। তাঁরা আর কারও অঙ্গুলিহেলনে নিজেদের পছন্দের জীবনভঙ্গি বদলাতে সম্মত নন। বিবাহবন্ধনের বাইরে দাম্পত্য, সংসারে নারী-পুরুষের সমদায়িত্ব ও মর্যাদা, সন্তান চাওয়া-না-চাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও বেতন আদায় করা, প্রয়োজনে একা সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ, এমনকী সমকামিতাকে স্বাভাবিক বলে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নেওয়া— কী নয়? তা ছাড়া নতুন ভাষাও আয়ত্ত করেছেন ওঁরা। তাঁরা নিজেদের কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধে খোলাখুলি নিজেদের যৌনতা নিয়ে আলোচনা করতে আর লজ্জিত বা দ্বিধাগ্রস্ত নন। বেশ-কিছু নারী নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন লেখক, চিত্রকর, ভাস্কর এবং আলোকচিত্রী হিসাবে। সৃজনশীলতার এই বিস্ফোরণও অবশ্যই বিরাট প্রাপ্তি।

তবু লেখক স্বীকার করেন ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' যখন সদর্পে ঘোষণা করে— 'ব্রেস্টস আর ব্যাক ইন স্টাইল'। তখন ওঁরা মিথ্যা বলেননি। আমেরিকা কিছুদিনের জন্য থমকে দাঁড়ালেও আবার যেন বাঁধা পড়ছে নারীর বুকের মায়ায়। এ কি 'ব্যাকল্যাশ', বা ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া? প্রত্যাঘাত? লেখক বলছেন— 'তার পটভূমি রচনা করেছে আমেরিকায় সমকালের সনাতন দক্ষিণপন্থী রাজনীতি, নবলব্ধ পৌরুষের আস্ফালন, অর্থনৈতিক কার্যকারণ, বিশেষ করে শিল্পবাণিজ্যে ধনতন্ত্রের নব্য অভিযান।' তবে তিনি দৃশ্যাবলি দেখে নৈরাশ্য-পীড়িত নন। আশা প্রকাশ করেছেন— এই স্তনমাহাত্ম্য চিরস্থায়ী হবে না। কোনও ফ্যাশনই চিরজীবী নয়। তাঁর প্রত্যাশা— হয়তো আমাদের নাতনিরা ইচ্ছা করলে তাদের স্তন অনাবৃত রাখতে পারবে। তাদের তার জন্য নিন্দিত বা ধিক্কৃত হতে হবে না, আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না, এই প্রদর্শনের জন্য কোনও কামার্ত পুরুষ তার দিকে হাত বাড়াতে সাহস পাবে না। হয়তো সেদিন স্তনের আবেদন অনেক কমে যাবে, তার বদলে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে হাঁটু কিংবা উরু। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন একদিন শুধু নারীর নয়, এমনকী টেবিলের পা পর্যন্ত ঢেকে রাখা হত। কোথায় গেল সেই কুসংস্কার? সুতরাং, স্তন নিয়ে এই পাগলামিও থাকবে না। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন কবে সেই সুদিন আসবে, তবে এই চিন্তাশীল গবেষকের উত্তর— একুশ শতকের প্রথম দিকে। কেননা, ইউরোপ-আমেরিকায় নারীস্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি দেখেছেন কুচগিরি শান্ত সমতল উপত্যকায় পরিণত হয় মোটামুটি প্রতি চার দশক অন্তর। সুতরাং তিনি অপেক্ষায় আছেন।

তাঁর সঙ্গে পাঠকেরাও নিশ্চয় সম্মত হবেন প্রতীক্ষা করতে। কারণ, তথ্যের সঙ্গে তত্ত্ব, যুক্তির সঙ্গে আবেগের অপূর্ব সমন্বয়, এই ইতিহাসের পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয় অন্য কিছু ভাবা।

মারিলিন ইয়ালুম, 'এ হিস্ট্রি অভ দ্য ব্রেস্ট', আলফ্রেড এ. নফ, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৭
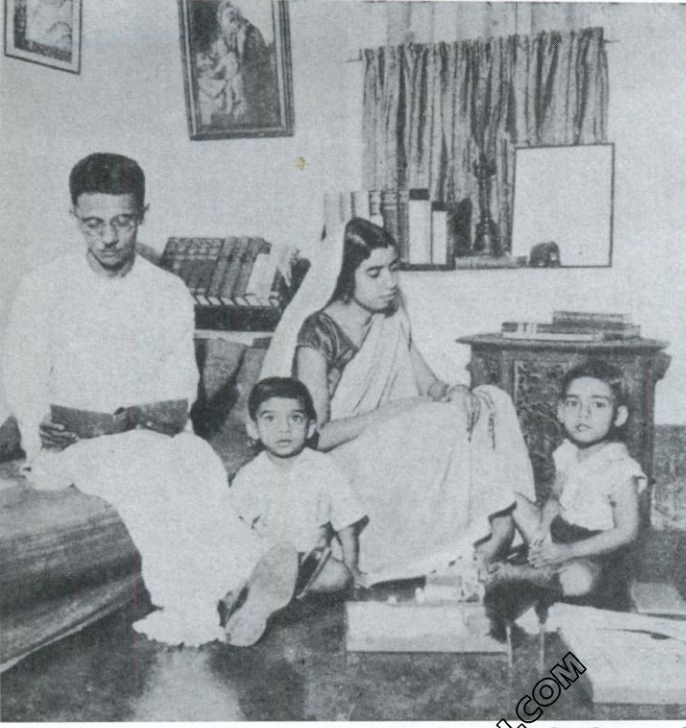
স্ত্রী অমিয়া চৌধুরানীর সঙ্গে দুই শিশুপুত্র সহ নীরদচন্দ্র চৌধুরী। ১[illegible]৩। ছবি: পরিমল গোস্বামী
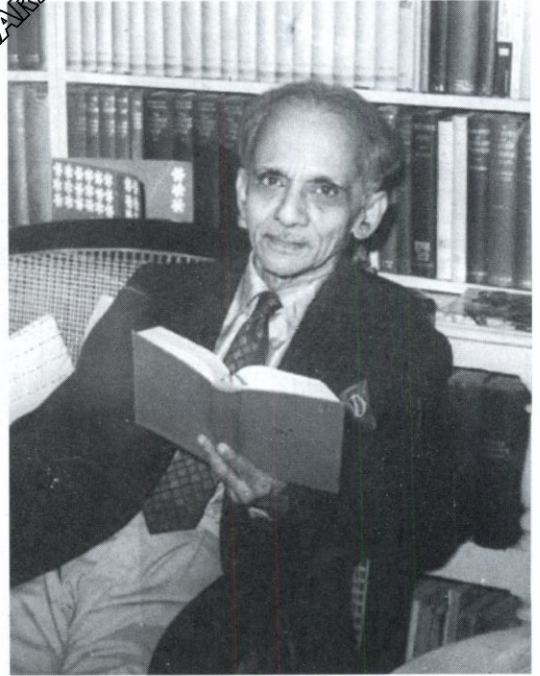
শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী

কথায় ও আত্মকথায় নীরদচন্দ্র

অমিতাভ ঘোষ
ভারতীয় কন্যা আর পরদেশি প্রেমিক

বৌদ্ধনাথ, প্রাচীন স্থাপত্য। শিল্পী: ডেসমন্ড ডয়েগ। (মূল ছবি রঙিন)

গঙ্গা, ভাস্কর্য। ছবি: ডেসমন্ড ডয়েগ। (মূল ছবি রঙিন)
মঞ্জুশ্রীর তলোয়ার

ঔপনিবেশিক ভারত। মেমসাহেব হাওয়া খেতে বের হয়েছেন। সাহেবরা কিন্তু অনেকেই খুশি স্থানীয় মেয়েদের নিয়ে।

কলকাতার সাহেবকুঠিতে সন্তান লালনের দায়িত্ব থাকত ভারতীয় আয়াদের উপর। প্রায়শ তারা হত সাহেবদের লালসার শিকার।

ম্যাডোনা। শিল্পী জাঁ ফোঁকে (Jean Fonquet)। পঞ্চদশ শতক। ম্যাডোনা এখানে আসলে সপ্তম চার্লস-এর একজন রক্ষিতা অ্যাগনেস সোরেল (Agnes Sorel)।

দুই নারী। বলা হয় প্রতিকৃতিটি রাফায়েল-এর আঁকা। রেখাচিত্রটি উনিশ শতকের একটি ফরাসি নারীর বেশভূষা বিষয়ক বই থেকে।

নারীর স্তন: উত্থান ও পতন

ঔপনিবেশিক লালসার আগুনে
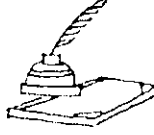
এখন আমি নিয়মিত দেশীয় নারীর সঙ্গে সহবাস করি। ওরা ভালবাসার সব কলাকৌশল জানে। জানে যে-কোনও রুচির মানুষকে তৃপ্ত করতে। তাদের মুখের ছাঁদ এবং শরীরের গঠন পৃথিবীর যে-কোনও নারীর চেয়ে সুন্দর। এই অপ্সরাদের বাহুবন্ধনে আমি যে আনন্দ উপভোগ করেছি তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।—এই জবানবন্দি এডোয়ার্ড সেলোন নামে একজন ব্রিটিশ অফিসারের। ১৮৪০ সালের কথা। সেলোন তখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক। তিনি একজন বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিকও। ভারতীয় নারীর রূপ এবং যৌনতা তাঁর অন্যতম চর্চার বিষয়। উপভোগেরও।

—সাদা মানুষেরা নাকি কখনও মিথ্যে বলে না। কিন্তু গোপন সম্পর্ককে তারা গোপন রাখতে পারে। খুব চেষ্টা করলেও কেউ সাদা পুরুষ মানুষদের গোপন জীবনের কথা জানতে পারবে না। তবে একবার তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে হয়তো পারা যাবে। আমি এক সাহেবকুঠিতে আয়ার কাজ করতাম। বিবাহিত সাহেব। ঘরে বিবি-বাচ্চা আছে। বিবির চোখে ধুলো দিয়ে সাহেব গাড়িতে আমার সঙ্গে মিলিত হতেন। মালিকের সঙ্গে কাজের মেয়েদের হামেশাই এ ধরনের সংসর্গ ঘটে। হয়তো অন্য কোনও আয়া সাহেবের নজরে পড়েছে। তিনি আমাকে আড়ালে জিজ্ঞাসা করতেন, মেয়েটি কি ভাল? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বলবেন, তবে একটা ব্যবস্থা করো। আমিও রাজি হয়ে যেতাম।—এই স্বীকারোক্তি কেনিয়ার একজন কৃষ্ণাঙ্গ আয়ার। একজন না বলে দু'জন বলাই ঠিক। কারণ, মেয়ে সংগ্রহ করার দায়িত্বটি যে নিয়েছিল সে অন্য একজন আয়া।

টোনি ফ্রিথ ছিলেন সিয়ারালোন-এ বন-বিভাগের একজন কর্মী। তিনি লিখছেন, মেয়েটি ছিল ইউরো-আফ্রিকান। সে ছবি আঁকত। তার সঙ্গেই আমার প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা। পশ্চিম আফ্রিকা যাওয়ার আগে আমার সে-অভিজ্ঞতা ছিল না। আমার বয়স তখন সবে একুশ বছর। তরুণী সোনিয়া ছিল পেশায় নার্স। আমি তখন ফ্রি টাউনে আছি। সোনিয়া তখন একটি স্থানীয় হাসপাতালে কাজ করে। একদিন সে আমার কুঠিতে এসে দরজায় টোকা দেয়। আমি ভেতরে আসতে বলি। সোনিয়ার প্রশ্ন, তোমার কোনও বান্ধবী নেই? আমি বলি,

না। সে বলে, তবে আমিই তোমার মেয়েমানুষ। আমার জীবনে সেই প্রথম সুযোগ। সোনিয়া বলে, আমি একজন নার্স। সুতরাং আমাকে নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। আমি জানি কী করতে হয়। আমি প্রতিবার ওকে এক পাউন্ড করে দিতাম।

এইসব কাহিনী ঔপনিবেশিক আমলের। সাম্রাজ্যের ইতিহাস শুধু দূর দূর দেশে নতুন নতুন জনগোষ্ঠী, তাদের সম্পদ ও সম্পত্তি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর আধিপত্যের ইতিহাস নয়, সেই কাহিনী অনেকখানিই বিজেতা এবং বিজিত জাতির মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের কাহিনী। আর তার আড়ালে রয়েছে নরনারীর সম্পর্কের বিশেষ কাহিনী। ইদানীংকালে সাম্রাজ্যের মতো এই সম্পর্কের ইতিহাসও আলোচ্যের তালিকায় ঠাঁই করে নিয়েছে। প্রায় এক যুগ আগে আমরা হাতে পেয়েছিলাম কেনেথ বালহ্যাচেট-এর বিস্ময়কর বই, 'রেস, সেক্স অ্যান্ড ক্লাস আন্ডার দ্য রাজ'। তার পর আটলান্টিকের এপারে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওপারে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই দশকেই বেরিয়েছে দু'-দুটি বই। ঔপনিবেশিক আমলে উপনিবেশগুলোতে সাম্রাজ্যনির্মাতাদের যৌন জীবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এইসব বইয়ে! সর্বশেষ হাতে এল নতুন আর একটি বই, অ্যান্টন জিল-এর 'রুলিং প্যাশনস' বা 'সেক্স রেস অ্যান্ড এম্পায়ার'। এই বইটি অবশ্য সেই অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা-পুস্তক নয়। 'রুলিং প্যাশনস' আসলে রজার বল্টন প্রোডাকশনস-এর একটি টিভি সিরিয়াল। চলতি বছরেই বিবিসি-তে দেখানো হয়েছে সেটি। দৃশ্যকাহিনীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই প্রায় দু'শো পৃষ্ঠার এই সচিত্রপাঠ্য। এমন খোলামেলা আলোচনা, বিশেষত প্রয়োজনীয় দৃশ্য সহযোগে বোধহয় বিবিসি-র পক্ষেই সম্ভব। উল্লেখ্য, 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার'-এর উপলক্ষে ওল্ড বেইলি থেকে ছাড়া পাওয়ার পর একদা নিষিদ্ধ চার অক্ষরের সেই শব্দটি এ-বইয়ের যত্রতত্র। সুতরাং বাংলা মতে বলতে গিয়ে কিছু রাখঢাক করতে হচ্ছে। তাতে অবশ্য মূল বক্তব্যের কোনও হেরফের ঘটার সম্ভাবনা নেই। লক্ষণীয় শুধু এটাই যে, ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের রুচিশীলতা, শুচিবাইয়ের পর্যায়ে চলে গেলেও সেদিনের অনেক ইংরেজের জীবনে তো বটেই, ডায়েরি, চিঠিপত্র, এমনকী গোপন লেখালিখিতেও অবিশ্বাস্য অকটপতা। ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের প্রকাশ্য মুখাবয়ব-এর আড়ালে যে একটি মুখোশ ছিল, লিটন স্ট্র্যাচির বিখ্যাত ভিক্টোরিয়ানরাই যে সে-যুগে একমাত্র ভিক্টোরিয়ান ছিলেন না সে-কথা আজ আর গোপন নেই। জানা গেছে, সুরভিত প্রস্ফুটিত কুসুমে কীট ছিল। অ্যান্টন জিল-এর এই কাহিনী পর্দায় সরাসরি দেখিয়ে দিল কীট যেমন পেছনের বাগানে ছিল, তেমনি ছিল ঘরের বাইরেও দূর-দূরান্তে— নগরে, বন্দরে, ছাউনিতে, বাগিচায় এবং এখানে-সেখানে সর্বত্র। এমনকী, শীর্ষ শাসকদের অট্টালিকাগুলিতে পর্যন্ত। লর্ড ওয়েলেসলির মতো জাঁদরেল গভর্নর জেনারেলকেও যৌন ক্ষুধা মেটাতে হানা দিতে হয়েছে এই কলকাতায় আনন্দের হাটে! ভাবা যায়!

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। পৃথিবীর বিস্তীর্ণ জমি ও সম্পদ সেদিন সামান্য এক দ্বীপপুঞ্জের অধিকারে। দরিয়ায়ও তাদেরই দাপট। সাম্রাজ্যের মধ্যাহ্নে ৩৭০০ লক্ষ মানুষ মানচিত্রে রক্তবর্ণে লাঞ্ছিত দেশগুলোতে বাস করেন। তার মধ্যে ৫০ লক্ষ মাত্র শ্বেতাঙ্গ। এই সাম্রাজ্যের সামগ্রিক উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ অবশিষ্ট দুনিয়ার চেয়ে বেশি। সত্য, সেখানে নির্মম বলপ্রয়োগ ছিল, নিষ্ঠুরতা ছিল, বর্ণবিদ্বেষ ছিল, অবিচার-অত্যাচার ছিল, সর্বোপরি ছিল লুণ্ঠন। তবু ইংরেজের কৃতিত্ব কোনও বিচারেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশে শ্বেতাঙ্গ পুলিশবাহিনীতে যত মানুষ ছিলেন, বলতে গেলে তা ব্রিটেনের পুলিশবাহিনীর সমান। ব্রিটিশ বাহিনীতে শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা কখনও নাকি এক লক্ষের বেশি ছিল না। তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের রথ চলেছে মোটামুটি মসৃণভাবে। বিরোধ, বিদ্রোহ, বিস্ফোরণ— সবই ঘটেছে; তবু উনিশ শতকের অনেকখানি জুড়ে সাম্রাজ্য-নির্মাতা এবং সেবকেরা ছিলেন তৃপ্ত। কোথায় বা এই সাফল্যের চাবিকাঠি! কেনই বা এমন প্রশান্তি! অ্যান্টন জিল লিখছেন, ১৭৫০ থেকে ১৮৫০-এর মধ্যে যে ইংরেজ সন্তান তরুণ ছিলেন, যাঁর সামান্য শিক্ষাদীক্ষা ছিল, তিনি রীতিমতো ভাগ্যবান। সাত সমুদ্র তেরো নদীর তরঙ্গকে শাসন করছে ব্রিটানিয়া, পাউন্ড স্টার্লিং শাসন করছে বিশ্বের অর্থনীতি। ব্রিটিশ তরুণের সামনে অ্যাডভেঞ্চারের অপূর্ব সুযোগ। শুধু আত্মিক উন্নতি নয়, অর্থ বিত্ত উপার্জনের জন্যও সামনে ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ জগৎ। অধিকাংশ পশ্চিমি মানুষের কাছে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার তাড়না ছিল, এক দিকে অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানি, অন্য দিকে ধনদৌলতের স্বপ্ন। স্বদেশের জীবনযাপন সহজ ছিল না। রুজি-রোজগারের পথে অসুবিধা ছিল; তা ছাড়া শ্রেণী-বিভক্ত ব্রিটিশ সমাজে সচলতার সুযোগও ছিল কম। তবে নতুন স্বপ্নের পথেও বাধাবিঘ্ন ছিল। প্রথমত, দূরত্ব। ক্লান্তিকর দুর্গম সমুদ্রযাত্রা। নিরাপদে পৌঁছতে পারলে সেখানে অপেক্ষা করে আছে অচেনা পৃথিবীর বিপরীত পরিবেশ। অপরিচিত সমাজ এবং সংস্কৃতি। অপরিচিত মানুষজন, অজানা ভাষা, অচেনা খাদ্য, জল-হাওয়া, ব্যাধি, কীটপতঙ্গ। তবু সাম্রাজ্যের হাতছানি যেন অপ্রতিরোধ্য। অ্যান্টন জিল বলছেন, বিপরীত পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও অভিযাত্রী ব্রিটিশ তরুণের সামনে সেদিন খোলা অজস্র সহস্রবিধ পথে চরিতার্থতার পথ। সে-পথে আরও অনেক কিছু প্রাপ্তির মতো যৌনতারও মুক্তি। লেখক অন্যান্য কারণের মধ্যে একটিকেও স্থান দিতে চান গুরুত্বের সঙ্গে। তাঁর ভাষায়, 'অ্যানাদার ভেরি অবভিয়াস, ইভন সেন্ট্রাল অ্যাট্রাকশন ওয়াজ— সেক্স।'

ভিক্টোরিয়ান ব্রিটেনে সবচেয়ে গুরুতর পাপ যেন যৌনতা। যৌনতাকে অবদমন করা বলতে গেলে সেদিন জাতীয় নেশা। যতভাবে পারা যায়, যেভাবে পারা যায়, ওই অপরিহার্য, অপ্রতিরোধ্য অথচ নীচ ও অশুদ্ধ প্রবণতাকে দমন করতে হবে। সর্বশক্তি দিয়ে করতে হবে গোপন। শুচিবায়ুগ্রস্ত ওই সমাজে তরুণ-তরুণীদের পক্ষে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করা বলতে গেলে প্রায় দুঃসাধ্য। বিদেশে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেখানে নৈতিকতার বিধিনিষেধ মানুষকে পঙ্গু করে রাখে না। সেখানে মুক্ত হাওয়া, অবাধ স্বাধীনতা। সুতরাং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া বাইরে!

ইংল্যান্ডের পরিবেশ-পরিস্থিতি কতখানি কঠোর ছিল, দু'-একটি তথ্য থেকেই তা বোঝা যায়। ১৮৭৫ সালে মেয়েদের বিয়ের বয়স যখন বারো থেকে বাড়িয়ে তেরো করা হয়, তখন দেশ জুড়ে প্রবল প্রতিবাদ। এই বয়স পনেরো-য় টেনে নিতে সময় লেগেছিল দশ বছর। সেবারও তুমুল প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। ইউরোপের কোনও কোনও দেশে সমকামিতা তখন অনুমোদন লাভ করেছে। কিন্তু ইংল্যান্ডে শব্দটি উচ্চারণযোগ্য নয়। মেয়েদের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক তো স্বপ্নেও চিন্তা করা চূড়ান্ত অনৈতিকতা। দিকে দিকে নিষেধের ভ্রূকুটি 'রকমারি ট্যাবু'। বাংলা পঞ্জিকার মতো কি সিদ্ধ কি অসিদ্ধ, নীতিবাগীশদের মুখে সততার ফতোয়া। অন্য দিকে ভারত কি মুক্ত দুনিয়া নয়? সেখানে রয়েছে খাজুরাহো, কামসূত্র এবং তাম্রবর্ণ নর্তকীর দল—'নচগার্লস'। সেখানে বিয়ের বয়স নিয়ে যেমন কারও মাথাব্যথা নেই,

তেমন কার ঘরে ক'টি বিবি তা নিয়েও কোনও গুঞ্জন নেই। ফলত, উনিশ শতকের অভিযাত্রী ইংরেজ যুবকের কাছে ভারত এক সব-পেয়েছির দেশ যেন।

উনিশ শতকের তুলনায় অষ্টাদশ শতকের ব্রিটেনের নৈতিকতা অবশ্য অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী সমাজের মতোই অনেক ঢিলেঢালা ছিল। ওলন্দাজ, ফরাসি, পর্তুগিজ এমনকী জার্মানরা ছিলেন নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ে উপনিবেশগুলোতে বেশ উদার। ইংরেজের কাছেও তখনও কোম্পানির কর্মচারীদের নৈতিকতা বা ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে বিশেষ দুর্ভাবনা ছিল না বলেই মনে হয়। পরিস্থিতি পালটে যায় উনিশ শতকে, ভিন দেশের মাটিতে সাম্রাজ্যের পতাকাদণ্ডটি ঠিকঠাক স্থাপন করার পর। অষ্টাদশ শতকের ভারতে একবার উঁকি দিলেই সেটা বোঝা যায়।

বলতে গেলে ভারতীয় সেই 'বিবি'দের যুগ। সে যুগের কথা এর আগে মিলড্রেড আর্চার চিত্রসহযোগে কিছু আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন অন্যরাও। অ্যান্টন জিল তদুপরি কিছু নতুন সংবাদ দিয়েছেন। ডিউক অব ওয়েলিংটনের বড় ভাই রিচার্ড ওয়েলেসলি ভারতে গভর্নর জেনারেল ছিলেন ১৭৯৮ থেকে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত। কলকাতার এই রাজভবন তাঁর আমলেই গড়া। তাঁর আমলেই বিশাল ভারতের তিন ভাগের দু' ভাগ এলাকায় কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রথম স্ত্রী ছিলেন ইংরেজ-কন্যা। বিয়ের আগেই ওয়েলেসলি তাঁকে পাঁচটি সন্তান উপহার দিয়েছিলেন। সে মহিলা স্বামীর সঙ্গে ভারতে আসতে রাজি হননি। সুতরাং কলকাতায় ওয়েলেসলির প্রথম দুটি বছর কাটে নিঃসঙ্গ অবস্থায়, রাজকার্যের ব্যস্ততায়। কিন্তু বরাবর নয়। ওয়েলেসলি নাকি শহরের লাল আলোর বৃত্তে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর আরও একবার বিয়ে হয়েছিল বটে, রক্ষিতাও ছিল বেশ-কয়েকজন। তাঁর সফল তৃপ্ত জীবনের ছেদ পড়ে তিরাশি বছর বয়সে। ১৮১২ সালে ভারতীয় বিবি নিয়ে ঘর করেছেন, দিল্লিতে কোম্পানির রেসিডেন্ট সুশিক্ষিত চার্লস মেটকাফ। আট বছর ধরে এই ঘরকন্নার ফলে ভারতীয় জননীর গর্ভে তিনটি পুত্রসন্তান লাভ করেন তিনি। তাঁর উত্তরসূরি দিল্লির আর-এক রেসিডেন্ট উইলিয়াম ফ্রেজারও ছিলেন বিবিবিলাসী ইংরেজ। তাঁর ছয়-সাতজন ভারতীয় বিবি ছিলেন। তিনি তাঁদের নিয়ে নবাব-বাদশার মতো হারেম সাজিয়ে বসেছিলেন। একজন সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটক তাঁর ঘরকন্না দেখে লিখেছিলেন, পারস্যরাজের মতোই অগণিত সন্তান ছিল মেটকাফের।

এ-ধরনের আরও অনেক ইউরোপীয়ের কাহিনী রয়েছে ইতিহাসে, যাঁরা অষ্টাদশ শতকে দেশীয় বিবি নিয়ে সানন্দে ঘর করে গেছেন। এবং প্রকাশ্যে। লজ্জা ঘৃণা ভয় (অর্থাৎ, পাপ-ভয়) কিছুই ছিল না তাঁদের। আমরা কলকাতায় অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকির কাহিনী জানি। তাঁর বন্ধু মুর্শিদাবাদে কোম্পানির রেসিডেন্ট বব পটও ছিলেন বিবিবিলাসী। মারাঠা দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি উইলিয়াম পামার, নিজাম দরবারে কর্নেল কার্কপ্যাট্রিক, লখনউ-এ লা মার্টিন সাহেব ছাড়াও অ্যান্টনি পোলিয়ের, শিল্পী টিলি কিটল এবং আরও অনেকেই ছিলেন তাম্রবর্ণা ভারতীয় সুন্দরীদের অনুরাগী। কিপলিংয়ের কবিতায় পরামর্শ ছিল, 'অ্যা ম্যান শুড, হোয়াটএভার হ্যাপেনস, কিপ টু হিস ওন কাস্ট, রেস অ্যান্ড ব্রিড/লেট দ্য হোয়াইট, গো টু দ্য হোয়াইট, অ্যান্ড দ্য ব্ল্যাক টু দ্য ব্ল্যাক।' এ-সব উনিশ শতকের সাহেবি কানমন্ত্র। আগের শতকে সাহেবটোলায় স্লোগান—'অ্যান্ড দ্যাট উই আর ফার ফ্রম দ্য লিপস

উই লাভ/ উই মেক লাভ টু পিপলস দ্যাট আর নিয়ার।'

ধীরে ধীরে সেই বাধাবন্ধনহীন স্বাধীনতার দিন ফুরিয়ে এল। এক কারণ, পরদেশে আধিপত্য কায়েম হয়েছে। সাম্রাজ্যের ভিত মোটামুটি পাকা। শাসক এবং শাসিতের, বিজেতা এবং বিজিতের মধ্যে ভেদরেখা স্পষ্ট। এমন সময়ে রাজা আর প্রজার মধ্যে অবাধ মেলামেশা ক্ষতিকর। তাতে অহমিকাবোধ খর্ব হয়। প্রজাদের মধ্যে এই ধারণা সঞ্চারিত করা দরকার যে, ভিনদেশি শাসকেরা অন্য মানুষ। তাদের গায়ের রং আলাদা, ধর্ম আলাদা, ভাষা আলাদা, সভ্যতা-সংস্কৃতিও আলাদা। তাঁদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপ্রণালী সবই নেটিভদের থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য এমনকী যৌন জীবনেও। সুয়েজে জাহাজ চলাচল শুরু হওয়ার পরে এই ধারণাটি বিশেষভাবে শাসক মহলে দানা বেঁধে ওঠে। খাল বেয়ে ইংরেজ মেয়েদের ভারত অভিযান শুরু হয়। সুয়েজ দিয়ে প্রথম জাহাজ চলতে শুরু করে ১৮৩০ সালে। অবশ্য 'পি অ্যান্ড ও'-র জাহাজের আসা-যাওয়া শুরু হয় চার দশক পরে, ১৮৭০ সালে। এই জলপথে ঝাঁক ঝাঁক অবিবাহিত ইংরেজ মেয়ে পৌঁছয় ভারতের উপকূলে। তাঁরা স্বপ্নের পৃথিবীতে সফল ইংরেজ যুবাদের বিয়ে করে সুখে সংসার করতে চান। পূর্ববঙ্গে কুলীন বরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া ব্রাহ্মণ কন্যাদের নাকি একসময়ে বলা হত 'ভরার মেয়ে'। কনে-বোঝাই পশ্চিমি জাহাজগুলোকে তেমনই বলা হত 'ফিশিং ফ্লিট'— জেলে ডিঙির বহর। স্বভাবতই নেটিভ মেয়েদের নিয়ে ঘরকন্না তখন খুবই অসামাজিক এবং অভব্য ব্যাপার। যারা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও এদেশের মেয়েদের কাছে সমর্পিতপ্রাণ, তাদের বলা হত ওরা 'নেটিভ' হয়ে গেছে, 'গন-নেটিভ'। স্বভাবতই 'স্লিপিং ডিকশেনারি' বা দেশি বিবিরা আড়ালে চলে যেতে থাকেন, সাহেবের ঘর আলো করতে পটের বিবি হয়ে বসেন ইংরেজ মেয়েরা।

কেমন মেয়ে তাঁরা? ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতায় লালিত পুরুষদের মতোই তাঁরাও একই সমাজ-সংস্কৃতির অবদান। পুরুষেরা সযত্নে তাঁদের গড়ে তুলেছিলেন বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসাবে। ইংরেজ মেয়ে মানে শুধু সদাচারী বোন, মা অথবা স্ত্রী। বিবাহিত মেয়েরা সন্তানের অভিভাবক, স্বামীর নর্মসহচরী। তিনি পবিত্রতার প্রতিমা। 'ইংরেজি গোলাপ'ও বলা চলে তাঁদের। সুতরাং বিপরীত জলহাওয়া থেকে যেমন করে হোক তাঁদের রং, রূপ, সৌরভ বাঁচাতে হবে। অসংখ্য দাসদাসী-পরিবৃত এই গোলাপেরা তবু সবসময়ে অমলিন রাখতে পারেননি নিজেদের। তাঁদের অনেকেই ছিলেন মানসিকভাবে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত, বিচ্ছিন্ন, বিষণ্ণ; নিঃস্পৃহ এবং উদাসীন। কেউ কেউ কুচুটে এবং খিটখিটে। অনেকেই বাড়ির কাজের লোকেদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, অনেকেই উন্নাসিক, জাতিবিদ্বেষে ভরপুর এবং সংকীর্ণতার কবলে। তারই মধ্যে কোনও কোনও ইংরেজ নারী রীতিমতো সাহসী জীবনযাপন করেছেন অবশ্য। উপনিবেশের মানুষদের প্রতি তাঁরা ছিলেন সহানুভূতিশীল। তাদের জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী। স্থানীয় মানুষজনের ভালমন্দের সঙ্গেও জড়িয়ে গিয়েছিলেন কেউ কেউ। তবে বেশির ভাগ ইংরেজ মেয়েই মনের চার পাশে দেওয়াল তোলার চেষ্টা করেছেন। নিদেনপক্ষে বিচ্ছিন্নতার লাল পর্দা টেনে তার আড়ালে বাস করতে চাইতেন। সকলের নৈতিকতাও প্রশ্নাতীত ছিল না।

বায়রন লিখেছিলেন 'হোয়াট ম্যান কল গ্যালানট্রি, অ্যান্ড গডস অ্যাডালটারি/ইজ মাচ মোর কমন হোয়ার দ্য ক্লাইমেট ইজ সালট্রি।' উপনিবেশগুলিতেও স্বভাবতই পরকীয়া

অজানা ছিল না। বড় ঘরের দুই বড় মানুষের কথাই ধরা যাক। একজন সুপরিচিত লর্ড কার্জন। তিনি ভারতের ভাইসরয় ছিলেন ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয়জন স্যার আলফ্রেড মিলনার। ১৮৯৭ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ হাই কমিশনার। ওঁরা দু'জনই ইলিনর গ্লিন নামে এক রোম্যান্টির ঔপন্যাসিকের প্রেমে পড়েছিলেন। তাই নিয়ে সেদিন অজ্ঞাতনামা কবির ছড়া— 'উড ইউ লাইক টু সিন/ অন অ্যা টাইগার স্কিন/উইথ ইলিনর গ্লিন?/ টু আর উইথ হার/ আপন সাম আদার কাইন্ড অব ফার?' পরবর্তীকালে মিলনার এক বিবাহিত মহিলার প্রেমে পড়েন। তাঁকে বিয়ে করার জন্য মিলনারকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তিনি পরস্ত্রীকে নিজের ঘরে তোলেন ৬৭ বছর বয়সে। কার্জনকেও আর-একজনের প্রেমে পড়ার পর বিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল অন্তত পাঁচ বছর। অ্যান্টন জিল বলছেন, 'বোথ মেন হ্যাড আ নাম্বার অব অ্যাফেয়ার্স, দো নট উইথ লোকাল উইমেন।'

উনিশ শতকে উপনিবেশগুলিতে সাহেবদের আর-এক চিন্তা ছিল কালো মানুষদের হাত থেকে শ্বেতাঙ্গ বিবিদের রক্ষা করা। আর-এক দুশ্চিন্তা শ্বেতাঙ্গদের হাত থেকে শ্বেতাঙ্গ বউদের রক্ষা করা। ভিক্টোরিয়ান যুগে শ্বেতাঙ্গ কিছু নৃতাত্ত্বিক রটিয়েছিলেন কৃষ্ণাঙ্গদের যৌনতা এবং ক্ষমতা দুই-ই বেশি। আফ্রিকার উত্তমাঙ্গে বসনহীন কৃষ্ণাঙ্গ ভেনাসদের দেখে আকর্ষণ বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে আঁতকে উঠেছিলেন কেউ কেউ। কেননা, তাঁদের ধারণা, সুযোগ পেলে শ্বেতাঙ্গ মেয়েরাও হয়তো বা এভাবে উদ্দাম প্রকৃতির সন্তানে পরিণত হবেন! আফ্রিকায় ধর্ষণ, এমনকী ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। ধর্ষণ শব্দটা পরাজয়সূচক। কোনও মেমসাহেব বা তাঁর রক্ষাকর্তা প্রকাশ্যে তা স্বীকার করতে রাজি হবেন না। সুতরাং ধর্ষণের চেষ্টা ধর্ষণেরই শামিল। ঐতিহাসিক বলেন, না জানি কত নিরপরাধ কৃষ্ণাঙ্গকে এই অভিযোগে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে! ভারতেও ইংরেজ মহিলাদের ভাবমূর্তি অম্লান রাখার জন্য সে কী প্রাণপণ চেষ্টা! ১৯২৬ সালেও দেখি একজন ইংরেজ বিশপ বলছেন, ভারতে আমেরিকান চলচ্চিত্র দেখানো উচিত নয়, তাতে চাঞ্চল্যকর খুন ছাড়াও রকমারি অপরাধ, প্রেম এবং বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি থাকে। ফলে, ভারতীয় দর্শকদের চোখে শ্বেতাঙ্গ নারীর ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। তার দু' বছর আগে লন্ডনের 'দ্য টাইমস' কাগজে একই বিষয়ে এক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। বলা হয় একজন শ্বেতাঙ্গ অফিসারের স্ত্রীকে নেটিভরা অপহরণ করে। সেটি আমেরিকান চলচ্চিত্র দেখারই ফল। তারও আগে একই বিষয়ে 'ওয়েস্ট মিনিস্টার গেজেট'-এ তুমুল আলোচনা হয়ে গেছে। তাতেও জনৈক লেখক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, পশ্চিমের রীতিনীতি, নৈতিকতা, মেয়েদের পোশাক-আশাক, সর্বোপরি অবিশ্বস্ত স্ত্রী এবং নৈতিকতাবর্জিত স্বামীদের কাণ্ডকারখানা চলচ্চিত্রে দেখানো হলে নেটিভরা কী ভাববে! বিশেষত, ওদের শরীর যত পুষ্টই হোক, মস্তিষ্ক যখন বিচারবুদ্ধিহীন। ১৯১০ সালে শরীরী নৃত্যে পটু মট অ্যালেন-এর ভারতে আগমন উপলক্ষে অতএব রীতিমতো কোলাহল। তরুণ ভারতীয়রাও নিশ্চয় টিকিট কাটবে এই কাম-নৃত্য দেখার জন্য। শেষ পর্যন্ত নর্তকীর আর এদেশে আসা হয়নি।

তা সত্ত্বেও বলা নিষ্প্রয়োজন, ইংরেজ কন্যারা তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট পাদপীঠটিতে মাথা উঁচু করে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। ভারতীয় রাজা-মহারাজারা হামেশাই ব্রিটেন থেকে রূপসী ইংরেজ দুহিতাকে নিয়ে ঘরে ফিরতেন। ১৮৯৩ সালে পাতিয়ালার মহারাজা যখন

একজন ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করেন, তখন লর্ড ল্যান্সডাউন সরাসরি জানিয়ে দেন আপনার মতো একজন মহারাজার পক্ষে এ-মেয়ে অবশ্যই যোগ্য স্ত্রী নয়। তা ছাড়া ইউরোপিয়ানরা একটি ইংরেজ মেয়েকে একজন দেশীয় রাজার অনেক স্ত্রীর একজন হিসাবে দেখে নিশ্চয় খুশি হবেন না। কয়েক বছর পরে লর্ড কার্জন যখন শুনতে পেলেন যে, ঝিন্দের রাজা একটি শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে বিয়ে করেছেন, তখন তিনি রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। দেশীয় রাজা-রাজড়ারা ইংল্যান্ডে গেলে শ্বেতাঙ্গ সমাজে তাঁদের খাতির-যত্ন দেখে কার্জন বিপন্ন বোধ করতেন। তিনি ফতোয়া জারি করেন, ভারতীয় রাজা-রাজড়ারা শুধু বিশেষ কারণেই কালাপানি পার হতে পারবেন এবং দেখেশুনে বাছাই করে তাঁদের ছাড়পত্র দেওয়া হবে। কার্জন সেক্রেটারি অব স্টেট লর্ড হ্যামিলটনকে বলেন, এ বড়ই অদ্ভুত যে, শুধু বাড়ির কাজের মেয়েরাই নয়, এমনকী উচ্চবর্গীয় মেয়েরাও ভারতীয়দের কাছে নিজেদের সমর্পণ করছেন। হয়তো তাঁদের দীর্ঘ দেহ, ইউনিফর্ম ইত্যাদি দেখে তারা ভাবছে, এই সৈনিকরা সবাই প্রাচ্যের রাজপুত্র। হ্যামিলটন তাঁকে আশ্বস্ত করেন, ভয় নেই, ভারতীয়রা সভ্যভব্যই আছে; মুশকিল আমাদের শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের নিয়েই। অদ্ভুত ঘটনা এই, 'দ্য ক্রেজ অব হোয়াইট উওমেন রানিং আফটার ব্ল্যাক মেন!' কখনও কখনও এই ছোটাছুটি কোনও বাধাবন্ধই মানত না। এমনকী, উচ্চনীচ ভেদাভেদ পর্যন্ত লোপ পেয়ে যেত। জিল কলকাতার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি ঘটে ১৮৮৩ সালের মাঝামাঝি। চাঞ্চল্যকর ঘটনা। একজন সরকারি আইনজীবীর স্ত্রী মিসেস জেমস হিউমকে তাঁর বাড়ির ঝাড়ুদার হরো মেটা (সম্ভবত হরি মেথর) ধর্ষণ করেছে। স্বামী দু'জনকে স্নানঘরে একসঙ্গে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিশোধ নেন। মেটা ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যায়। আদালতে মামলা হয়। শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে লোকটির আট বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কিন্তু বেচারা আসলে ছিল নির্দোষ। মিসেস হিউমের সঙ্গে ছয় মাস ধরে তার গোপন সম্পর্ক চলছিল। নিজের সম্মান বাঁচাতেই হিউম মামলা দায়ের করেছিলেন। দু' বছর পরে তিনি নিজেই লর্ড ডাফরিনের কাছে এই স্বীকারোক্তি করেন।

নেটিভদের কাছ থেকে শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের ইজ্জত সব সময়ে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অনধিকারী শ্বেতাঙ্গদের শরনিক্ষেপও প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। ব্যবসায়ী, বাগিচামালিক, সরকারি কর্মচারী এবং অন্যান্য ইউরোপীয়রা তথ্যগতভাবে উপনিবেশগুলোতে বিয়ে করার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ক'জন আর বিয়ে করতে পারতেন? সাধারণভাবে সৈন্যবাহিনীতে নিয়ম ছিল সাব-অলটার্নরা বিয়ে করতে পারবেন না, ক্যাপ্টেনরা ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পারবেন! মেজরদের বিয়ে করা উচিত এবং কর্নেলদের অবশ্যই বিয়ে করতে হবে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, অনেকেরই বিয়ের ফুল ফুটত না। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ অফিসারদের মধ্যে শতকরা ত্রিশজন মাত্র ছিলেন বিবাহিত। আর চব্বিশ বছরের নীচে যাঁদের বয়স তাঁদের মধ্যে শতকরা মাত্র দুই ভাগের ঘরে ছিল বউ। সুতরাং এদিক-সেদিক উঁকি-ঝুঁকি দেওয়া ছাড়া গতি কী? নৈতিকতার মান ক্রমে সিঁড়ি ভেঙে নীচের দিকে যাচ্ছে দেখে কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিলেন, শ্বেতাঙ্গদের সকলেরই বিয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। সি ই ট্র্যাভেলিয়ান তাই শুনে মন্তব্য করেছিলেন— বাট হোয়ার ওয়ার ওয়াইভস টু বি ফাউন্ড ফর সাকসেসিভ রিলেস অব ৭০,০০০ মেন! স্বভাবতই ক্যান্টনমেন্টগুলিতে ব্যাচেলরই থাকতেন বেশি, বউ কম। আর সে-কারণেই শহরে বা ছাউনিতে সুদর্শনা শ্বেতাঙ্গিনীটি হয়ে দাঁড়াতেন সকলের চোখের

মণি। জীবনে তাঁদের রোমাঞ্চ ছিল বইকী! ছিল কিঞ্চিৎ ঝুঁকিও। স্বামীরা নানাবিধ বিধিনিষেধ দিয়ে তাঁদের বেঁধে রাখতে চাইতেন, তবু মাঝে-মধ্যেই অন্যরকম ঘটে যেত। ভারত জুড়েও সেদিন অনেক সেজো মেজো ছোট মাপের ইংরেজ যুবাও যেন এক-একজন লর্ড কার্জন কি আলফ্রেড মিলনার। পার্টি, ক্লাব, অ্যামেচার থিয়েটার এবং সামাজিকতার নানা সূত্রে গোরা বিবিরা অন্য পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার যে সুযোগটুকু পেতেন তার অন্যরকম সদ্‌ব্যবহারও তাঁরা কখনও-সখনও করতেন বইকী। এলাহাবাদের 'দ্য পাইওনিয়ার' কাগজ ১৮৮২ সালে লিখেছিল ভারতে ইংরেজ সমাজ অনেক বেশি খোলামেলা। এখানে শ্বেতাঙ্গ নারীপুরুষ ব্রিটেনের তুলনায় অনেক বেশি একসঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পান, ফলে এখানে প্রেমপ্রণয় তথা ফস্টিনস্টি এক উপভোগ্য ক্রীড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য কখনও কখনও অন্যরকমও ঘটে। মেয়েটি যদি নির্বোধ হয়, এবং যুবক অনভিজ্ঞ, তবে পরিণাম যে খারাপ হবে, তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে? সিমলায় অনেক কাণ্ডই হত। স্বামীরা হয়তো রোদে পুড়ে ঘেমে-নেয়ে দূরে সমতলে কোথাও সাম্রাজ্য গড়ার কাজ করছেন, বউ তখন শীতের সিমলায় আনন্দ উপভোগ করছেন। 'দ্য ট্র্যাকল টার্ট'! 'বেটি-বেড আন-ব্রেকফাস্ট' এ-সব নাকি কোনও কোনও হিল স্টেশনের বোর্ডিং হাউসের ডাকনাম। কলকাতার একজন যৌন কর্মীকে কে যেন প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি সিমলায় গেলে না? তার সহাস্য উত্তর, 'উই শুড হ্যাভ নো চান্স উইথ দ্য অ্যামেচার!'

ওঁরা স্বজাতির মেয়ে। খাঁটি ইংরেজ কন্যা। ভারতের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা শ্বেতাঙ্গ হলেও রক্তে খাঁটি ইংরেজ নয়। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা মাখামাখি যতই চলুক, বিয়ের প্রশ্ন ওঠে না। যদি বা বিয়ে হয়, অধিকাংশ স্বামীরা সন্তানসন্ততিসহ তাঁদের ফেলে রেখে নিজের দেশে ফিরে যান। ঔপনিবেশিক যুগে নর-নারীর সম্পর্কের ইতিহাসে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কাহিনী বিশেষ করে করুণ। ওঁরা সব দিয়েও বলতে গেলে কিছুই পাননি। সেকালে যদি বা পেয়েছেন, একালে কিছুই নয়।

মার্টিন শ' খাঁটি ইংরেজ। এই শতকের প্রথম দিকে তিনি এদেশে এক বড় সওদাগরি অফিসে কাজ করতেন। অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে বাস করতেন বোম্বাইয়ের এক বাড়িতে। মার্টিন শ' একসময়ে সেখান থেকে উঠে এসে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবারে পেয়িং গেস্ট হিসাবে বাস করতে শুরু করেন। পলিন সে-বাড়ির রূপবতী অষ্টাদশী মেয়ে। তার মাথায় সোনালি চুল। যদিও জন্ম তার ভারতে। সে লেখাপড়া শিখেছে ইংল্যান্ডে। তার বাবা টেলিফোন কোম্পানিতে কাজ করেন। মা ছিলেন আধা গ্রিক। মার্টিন শ' দেশে ফেরার সময় পলিনের আঙুলে আংটি পরিয়ে দিয়ে যান। সে বাগদত্তা। কিন্তু আরও অনেক খাঁটি ইংরেজের মতো মার্টিনের মনে প্রশ্ন—পলিন কি খাঁটি ইংরেজ? ভাবতে ভাবতে একসময়ে তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন। পলিনের বাবাকে প্রশ্ন করেন—আপনাদের মধ্যে কি ইউরোপিয়ান রক্ত আছে? ভদ্রলোক প্রথমে চুপ করে থাকেন। মার্টিন সাহেব ধরে নেন, অনিশ্চয়তার দিন শেষ। শেষ হয়ে গেল তার সুখের দিনও। পলিনের বাবা হঠাৎ ফেটে পড়লেন, আমার মধ্যে কালো-সাদা-হলুদ-পীত বা অন্য কোনও রক্ত আছে কি না আমি তা নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তিনি পলিনকে বললেন, আংটি ফিরিয়ে দিতে। হঠকারী মার্টিন শ' তার পরও পলিনকে প্রশ্ন করেন, তুমি কি খাঁটি শ্বেতাঙ্গ? সে কোনও উত্তর দেয় না। শুধু বলে তুমি আমাদের গোটা পরিবারকে অপমান করলে। মার্টিন

শ' দেশে ফিরে যান। সেখানেই তিনি বিয়ে করেন। ভারতে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রতিটি ঘটনা সবিস্তারে তিনি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন দেশে তাঁর মা-বাবাকে। কন্যার সূত্রে সেই পত্রাবলি আজ ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসে দরকারি দলিল। কন্যা বলছেন, বাবার উচিত ছিল সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে দেশে নিয়ে আসা। কিন্তু উচিত-অনুচিত নিয়ে ভাববার সময় কোথায় খাঁটি ইংরেজদের? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার স্মৃতিচারণ করেছেন একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা। তিনি তখন লখনউতে। বলছেন, হজরতগঞ্জে নাচের হলে ইংরেজ সৈন্যরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের নিয়ে যা-তা করত। টানাহ্যাঁচড়া তো বটেই, এমনকী শারীরিকভাবে নির্যাতন পর্যন্ত। যাকে বলে যৌন পীড়ন। এজন্য আমি ওদের ঘৃণা করতাম। শেষ পর্যন্ত ওরা যখন চলে যেত, তখন এই মেয়েরা বিশেষ করে বাচ্চা কোলে বউরা কাঁদতে কাঁদতে তাদের বিদায় জানাতেন। বলতেন, বিল তুমি ফিরে এসো, ফিরে এসো কিন্তু। এবং সৈন্যরা উত্তর দিত— হ্যাঁ, জেন, আমরা ফিরে আসব। কিন্তু কোনওদিন ওঁরা ফেরেননি।

'I naturally prefer to satisfy myself with a woman, a friend and a lady of my own class, but in the absence of the best I gladly take the next best available, down the scale from a lady for whom I do not care, to prosititutes of all classes and colours, men, boys and animals, melons, and masturbation.'— এই উক্তি এই শতকের একজন ইংরেজ ঔপনিবেশিকের। সুতরাং শুধু খাঁটি ইংরেজি গোলাপ বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সুন্দরীদের চার পাশে ঘুরপাক খেয়ে হয়রান হবেন কেন! মাথায় থাক ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতা। চুলোয় যাক ওপরঅলাদের নীতিকথা। অ্যান্টন জিল বলছেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও কেউ কেউ নেটিভ মেয়েদের নিয়ে বসবাস করতেন। যথা— উত্তর রোডেশিয়ার 'নেটিভ কমিশনার' পাক্কা সাহেব জে ই চিরুপেলে স্টিভেনসন। তাঁর একটি স্থানীয় 'স্লিপিং-ডিকশেনারি' বা বিবি ছিল। সরকারের তরফে প্রশ্ন তোলা হলে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নিজের মতো করে থাকতে শুরু করেন। তিনি জীবনাচারে খাঁটি ইংরেজ ছিলেন। পোশাক-আশাক চাল-চলনে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে যাকে বলে ষোলো আনা অ্যাংলো-স্যাক্সন। ব্যতিক্রম শুধু নারী-রুচিতে। তিনি নাকি বেশ কয়েকজন স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েকে বিয়ে করেন। আটজন কন্যাসন্তানের গর্বিত পিতা তিনি। কেনিয়ায় ক্যাপ্টেন ডবলিউ আ সি হিউজেস নামে এক ইংরেজের নামই হয়ে গিয়েছিল 'ব্ল্যাক হিউজেস'। তিনি প্রকাশ্যেই একটি কালো মেয়েকে নিয়ে বাস করতেন। তার চেয়েও অবাক করা ঘটনা ঘটেছে আফ্রিকায়। কেমব্রিজে পড়া একটি ইংরেজ মেয়ে তার প্রেমিক স্বামীর সঙ্গে পোর্ট হেরাল্ড পৌঁছে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারেন ভালবাসার সম্পর্ক হলেও তার সঙ্গে ঘর করা যায় না। শিক্ষিত স্ত্রী যা-ই করতে চান, স্বামীর তা না-পছন্দ। এমনকী শোওয়ার ঘরেও তিনি যেন কালো মেয়ে পেলেই খুশি হন বেশি। পরিস্থিতি দেখে অসহায় মেয়েটিকে একজন ওপরঅলা সাহেব কিছুদিনের জন্য দূরে সরিয়ে নিয়ে যান। মাস-দুই পরে আবার স্বামী-স্ত্রীর দেখা। স্বামী বলেন, স্থানীয় রীতি অনুযায়ী একটি আফ্রিকান মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছেন এবং তাকে নিয়ে বেশ সুখেই আছেন। ১৯০৫ সালে কেনিয়ায় আরও একটি ঘটনা ঘটে। স্থানীয় একজন পুলিশ অফিসারের স্ত্রীর সঙ্গে ওপরঅলার এক সাহেবের ভাবভালবাসা হয়। তাই দেখে আর-এক সাহেব কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করেন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টে

নেটিভ নারীর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের বিয়ে-শাদি নিয়ে জোর এক পশলা বিতর্ক হয়ে যায়। সেক্রেটারি অব স্টেটস লর্ড কেরু ১৯০৯ সালে উপনিবেশগুলিতে ব্রিটিশ নাগরিকদের নৈতিকতা রক্ষার লক্ষ্যে এক ফতোয়া জারি করেন। কী করা উচিত, কী নয়, নিয়ম ভঙ্গ করলে সাজা কী, সবই বলা হয়েছিল সেই সর্বজনীন হুকুমনামায়। কিন্তু কাজ খুব হয়েছিল বলে মনে হয় না। কেননা, তার পরেই দেখি ভারতের ঔরঙ্গাবাদে নিযুক্ত এক সাহেব রীতিমতো বড়াই করে বলছেন, 'মহকুমা শহর সীতামারি চমৎকার জায়গা। আমি দিনভর সেখানে কাজ করেছি, রাতভর আমোদ!' অ্যান্টন জিল ভারতে আরও দুই সাহেবের বিবি-বিলাসের একটি কাহিনী শুনিয়েছেন। এ-ঘটনা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের। ক্যাপ্টেন ওয়াল্টারস এবং ডক্টর নেল দুই বন্ধু। ডা. লেন-এর একজন দিশি বিবি ছিল। ছুটিতে দেশে যাওয়ার সময়ে তাকে দেখাশোনার ভার তিনি দিয়ে যান ক্যাপ্টেন ওয়াল্টারসকে। এই বিবির সঙ্গে তারও পরিচয় ছিল। কিন্তু নেল-এর অনুপস্থিতিতে সে-পরিচয় অন্য মোড় নেয়। বিবি বলে, নেল তাকে মারধর করেন, সে আর তাঁর কাছে যাবে না। ফলে, নেল ফিরে আসার পর এক বিবিকে নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে রীতিমতো মারামারি। সাহেবপাড়ায় স্ক্যান্ডাল। শেষ পর্যন্ত দু'জনের জীবনই ওপরঅলাদের হস্তক্ষেপে কার্যত বরবাদ। অ্যান্টন জিল ইচ্ছে করলে এ-ধরনের আরও কাহিনী শোনাতে পারতেন। মার্গারেট ম্যাকমিলান-এর লেখা 'উওমেন অব দ্য রাজ'-এর কথা মনে পড়ছে। তিনি লিখেছিলেন, সরকারি নির্দেশ যাই হোক, বিশেষত চা-বাগানে শ্বেতাঙ্গরা তার খুব-একটা তোয়াক্কা করতেন না। বুদ্ধিমতী ইউরোপিয়ান মেয়েরা এদেশে স্বামীর ঘর করতে এসে বিবির সন্ধান পেলে পেনশন দিয়ে তাদের বিদায় করতেন। একবার একটি মেয়ে এসে দেখেন তাঁর পতিদেবতার ছয়-ছয়টি সন্তান রয়েছে বাগানের এক মেয়ের ঘরে। তিনি বিবাহবিচ্ছেদ ছাড়া এই নেশা কাটাবার আর কোনও পথ খুঁজে পাননি। আর-একটি মেয়ে নববধূ হয়ে ভারতে স্বামীর এই পরিচয় পেয়ে লজ্জায়, অপমানে, ক্ষোভে, দুঃখে আত্মহত্যা করেন।

অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ অভিযাত্রীর সঙ্গে উনিশ শতকের ভিক্টোরিয়ান ইংরেজ অভিযাত্রীর নৈতিকতার পার্থক্য বোঝাতে একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, অষ্টাদশ শতকে কোনও ইংরেজ সৈন্য ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়ার সময়ে পাঠ্য হিসাবে অনায়াসে 'ফেনি হিল' সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সেই বিখ্যাত বইটি, যাতে একজন ইংরেজ যৌন কর্মী সাধারণ আমোদিনী থেকে নিজেকে উন্নীত করেছিলেন সমাজের ওপরতলার এক নায়িকা হিসাবে। আর উনিশ শতকে সেই সৈনিকই বুয়র যুদ্ধে 'ফেনি হিল' সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারতেন না। তাঁর থলিতে থাকত 'থ্রি মেন ইন আ বোট'। দেশপ্রেমের আদর্শবান ধর্মপ্রাণ কর্তব্যপরায়ণ ইংরেজ যুবকের কাছে উনিশ শতকে এমনটিই প্রত্যাশা করত তাঁর স্বদেশ ও সমাজ। কিন্তু ভারত তথা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের খোলা হাওয়ায় বিপুল বৈচিত্র্যে এবং রকমারি প্রলোভনের হাতছানিতে পড়ে সে যুবকের পক্ষে নিজের আদর্শ ভাবমূর্তিটি অটুট রাখা শক্ত ছিল বইকী। বিশেষত, ভারত এমন এক দেশ যেখানে কামনা-বাসনা নিন্দিত নয়, জীবনের পক্ষে বাঞ্ছিত বলে গণ্য। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ ভারতীয় হিন্দুর কাছে ধর্মতুল্য। সুতরাং ইংরেজ তরুণের পায়ের তলা থেকে মাটি ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে, সে বুঝি বা ডুবে যায় আনন্দ সাগরে। পরদারে তার উৎসাহে ঘাটতি নেই, আপত্তি নেই

অসবর্ণে। দেশি বিবি, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বান্ধবী এবং স্বদেশীয় প্রেমিকা যদি না জোটে তা হলে উদ্‌বেগের কিছু নেই। উনিশ শতকের ইংরেজ অভিযাত্রীদের কাছে আয়া, দুধওয়ালি, ঘেসুড়ে, জেলেনি, ফেরিওয়ালি, ঝাড়ুদারনি, তাঁতি কোনও মেয়েই অচ্ছুৎ নয়। কেউ কেউ তো ভারতীয় ঘেসুড়ে নারীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত। সাহেবকুঠির আয়া বা খিদমতগার বাবুর্চিরা সাহেবের পছন্দমতো মেয়েদের সংগ্রহ করে আনত। সাম্রাজ্যের অন্যত্রও একই কাহিনী। কেনিয়ায় কেরুর সার্কুলারের পর গেভাঘান নামে এক সাহেবের জবানবন্দি: একটি মেয়ের কথা সানন্দে আমি মনে রেখেছি। বেশ কয়েক বছর সম্পর্ক ছিল আমাদের। সে তার নিজের গ্রামে নিজের পরিবারের সঙ্গে বাস করত, আমি আমার কুঠিতে। এটাই ছিল নিয়ম। বোঝাপড়া ছিল সে কখনও সরাসরি আমার বাড়িতে এসে হাজির হবে না। বিশেষ করে বাড়িতে কোনও পার্টি থাকলে তো নয়ই। এক দিনের কথা মনে পড়ে, আমরা দু'জনে একসঙ্গে আনন্দে সময় কাটাচ্ছিলাম, তার পর আমি বলি, অত্যন্ত দুঃখিত, আমাকে বাড়ির বাইরে খেতে যেতে হবে। অন্য এক সাহেব-কুঠিতে নেমন্তন্ন আছে। সেখানে খেতে খেতে আমার হাসি পাচ্ছিল। অন্য অতিথিরা যদি জানতেন, আমি কাকে বাড়িতে রেখে এসেছি এবং কার কাছে ফিরে যেতে চাইছি, তবে তাঁরা কী ভাবতেন? এই শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের সঙ্গে আফ্রিকায় আরও কিছু কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ের ভাব-ভালবাসা ছিল। আর-একটি মেয়ে সম্পর্কে তিনি লিখছেন, সে তরুণীটি ছিল খুব লম্বা, রং ছিল তার ঘোর কালো। শরীরে লম্বা পোশাক, মাথায় সিল্কের স্কার্ফ। সে আসত 'বাস্কেট' ফিরি করতে।... তার সঙ্গ কী আনন্দদায়কই না ছিল! আমার এখনও মনে আছে, তার হাসি, তার কথাবার্তা, গল্পগুজব, তার অন্তরঙ্গতার কথা। তার মুখ, তার অসাধারণ নজরকাড়া শরীর, এমনকী তার সামনের উঁচু দাঁতটি পর্যন্ত আমার মনে আছে, যেন গতকালের কথা!

ওরা পেশাদার যৌন কর্মী নয়। বিশেষ পরিবেশে ক্ষমতাবানের হাতে অনেকেই ছিল অসহায়তার শিকার। সাম্রাজ্য শুধু এদের দিয়ে লালনপালন করা যায় না। পৃথিবী জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। সেখানে সূর্য অস্ত যায় না। ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে, রকমারি নির্মাণ কাজে, বাগ-বাগিচায়, খনিতে শহরে বন্দরে, লড়াইয়ের মাঠে, প্রশাসনের আনাচেকানাচে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ব্রিটিশ নাগরিক। এক ভারতেই নাকি ২০ লক্ষ ইংরেজ সমাধিস্থ। এই সাম্রাজ্য গড়ার কারিগরদের অধিকাংশই ছিলেন পরিবারহীন নিঃসঙ্গ পুরুষ। স্বভাবতই টুকিটাকি আয়োজনে তাদের তৃপ্ত করা সম্ভব ছিল না। তাদের সঙ্গদানের জন্য সেদিন গড়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক স্তরে যৌনতার বাণিজ্য। বিশ্বকরণ কথাটা ইদানীং খুব চালু হয়েছে। সারা পৃথিবীকে ভাবা হচ্ছে অখণ্ড এক বাজার হিসাবে। ঠিক তেমনি সেদিন ঔপনিবেশিক পৃথিবীতেও মেয়েরা পরিণত হয় এক আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্যে। হ্যাঁ, পশ্চিমের শ্বেতাঙ্গ মেয়েরাও। তৎকালীন বাজারের ভাষায় এ বাণিজ্যের নাম 'হোয়াইট স্লেভ ট্রাফিক'। হাজার হাজার শ্বেতাঙ্গ মেয়ে যোগ দেন সেই নিঃশব্দ অস্পষ্ট, অথচ জমজমাট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে। বাষ্পীয় পোত এবং রেলপথের দৌলতে এক দেশের নারী দ্রুত পণ্য হয়ে পৌঁছে যেতেন অন্য দেশে, উপনিবেশের আমোদের হাটে। কলকাতায়ও তাঁদের কথা শোনা গেছে। বার বার। উনিশ শতকের শেষ দিকে ফ্যানি অ্যাবস্টেন নামে একটি শ্বেতাঙ্গ তরুণীর কাহিনী শুনিয়েছেন অ্যান্টন জিল। এই অষ্টাদশী তরুণী চৌত্রিশ বছরের আলেকজান্ডার কান নামে এক যুবকের সঙ্গে লন্ডন থেকে নিরুদ্দেশ হন। তাঁর বাবা কোনও এক পতিতোদ্ধার সমিতির

সহায়তায় মেয়েকে খুঁজে পান বোম্বাইয়ে। সেখানে তিনি অ্যানি গুল্ড নামে আর-একটি সমবয়স্ক শ্বেতাঙ্গ মেয়ের সঙ্গে বাস করছিলেন। তাঁরা দু'জনে শহরে একটি 'সেলুন' বার চালাচ্ছিলেন। পুলিশের কাছে মেয়েটি বলেন, বোম্বাই এসেছেন তিনি স্বেচ্ছায়, এবং তিনি দিব্যি সুখে আছেন। তবু কান-এর বিরুদ্ধে নাবালিকা হরণের মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। শুধু কলকাতা বা বোম্বাই নয়, যেখানে ঔপনিবেশিকদের আড্ডা সেখানেই সাদা, কালো, বাদামি বা তাম্রবর্ণ মেয়েদের ভিড়। স্বভাবতই সাম্রাজ্যের অন্যান্য ক্ষুধার মতো এই বিশেষ ক্ষুধা মেটাবার দায় বহন করতে হয় উপনিবেশগুলোরই। সুতরাং মানচিত্রে রক্ত-লাঞ্ছিত দেশগুলোর মতোই ঔপনিবেশিক শহরগুলোতেও সেদিন 'লালবাজার'। একালে 'রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট' বলে শহরের বিশেষ প্রমোদ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করার মতোই ভারতে ঔপনিবেশিক আমলে শহরে শহরে সেই পল্লীগুলোকে সাহেবরা বললেন, 'লালবাজার'। কর্তৃপক্ষ সাধারণ ইংরেজ যুবকদের মতোই সৈন্যদেরও নৈতিক মান যার-পর-নাই সু-উচ্চ রাখায় যত্নবান ছিলেন। তাদের বলা হত, নিয়মিত ব্যায়াম করবে, স্বাস্থ্যসচেতন থাকবে, পুষ্টিকর খাদ্য খাবে, ঠান্ডা জলে স্নান করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। নিষেধের মধ্যে ছিল— ব্যারাকে নিজেদের মধ্যে মারামারি বা দাঙ্গাহাঙ্গামা না করা। হুকুম ছিল—স্থানীয় মেয়েদের ওপর হামলা করবে না। এমনই আরও কিছু উপদেশামৃত। কিন্তু তাঁরা জানতেন, এই দূর দেশে সৈন্যদের পক্ষে এ-সব পরামর্শ মেনে চলা সম্ভব নাও হতে পারে। অথচ তাঁদের যদৃচ্ছ স্বাধীনতা দিলে যৌনব্যাধির কবলে পড়ার সম্ভাবনা। সুতরাং এই নিয়ন্ত্রিত আমোদশালা বা লালবাজারের বন্দোবস্ত। ভারতে যেখানেই সৈন্য ছাউনি ছিল, সেখানেই গড়ে তোলা হত লালবাজার। দেখাশোনার ভার থাকত বয়স্ক স্থানীয় মেয়েদের ওপর। বাহিনীর ক্যান্টিন থেকে তাঁদের মাসে গড়ে পাঁচ টাকা বেতন দেওয়া হত। মিরাটে একবার নিয়মিত বেতন না পেয়ে এই মহিলারা চলে যান। ফলে তিন মাসের মধ্যে যৌনব্যাধির প্রকোপ নাকি বেড়ে যায়। রোগীর সংখ্যা চার থেকে বাইশে পৌঁছয়। এইসব প্রমোদশালা নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ ছিল না। পুলিশ কোনও অসুস্থ মেয়েকে শনাক্ত করলে সে ঘুষ দিয়ে দিব্যি থেকে যেত। তা ছাড়া লালবাজারের বাইরের মেয়েরাও এসে ইউরোপিয়ান ছাউনির আশপাশে আস্তানা গেড়ে বসে যেতেন। সৈন্যরা তাঁদের ঘরেও উঁকি দিত। কেননা, তুলনায় ওঁরা সস্তা। তালিকাভুক্ত মেয়েরা পয়সা নেয় বেশি।

আতঙ্কিত কর্তৃপক্ষ সৈন্যদের মারাত্মক যৌনব্যাধি থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আরও একটি কৌশল চালু করেছিলেন। লালবাজারের মতোই তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'লক হসপিটাল'। অসুস্থ মেয়েদের ধরে এনে আক্ষরিক অর্থে তালা বন্ধ করে রেখে তাঁদের চিকিৎসা করা হত। তখনও ও-সব ব্যাধির যথার্থ চিকিৎসা মানুষের করায়ত্ত নয়। ফলে তথাকথিত সুস্থ মেয়েরা আবার ফিরে এসে রোগ ছড়াতেন। ১৮৬৬ সালে ব্রিটেনেও এ ধরনের উদ্‌যোগ শুরু হয়েছিল। সে বছরই চালু হয় সংক্রামক ব্যাধি সংক্রান্ত আইন। ভারতে একই আইন চালু হয় দু'বছর পরে, ১৮৬৮ সালে। এই 'লক হাসপাতাল' উপলক্ষে লন্ডনে বিস্তর হট্টগোল শোনা গেছে। কলকাতায়ও রীতিমতো আন্দোলন। চিকিৎসার নামে অসহায় ভারতীয় মেয়েদের ধরে এনে অত্যাচার করা হচ্ছে। তাদের নানাভাবে অপমান, এমনকী ধর্ষণ করা হচ্ছে, এই অভিযোগও ওঠে। বস্তুত তাই নিয়ে কলকাতায় রীতিমতো উত্তেজনা। বটতলা থেকেও কয়েকখানা প্রহসন বের হয়েছিল এই

উপলক্ষে। যতদূর মনে পড়ে তার একটির নাম ছিল— 'বাহবা চৌদ্দ আইন'।

আন্দোলনের ফলে ইংল্যান্ডে শেষ পর্যন্ত এই আইন তুলে নিতে হয়। তুলে নেওয়া হয় ভারত থেকেও। তার পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে চালু করা হয় 'মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট'। তারও উদ্দেশ্য যৌনব্যাধির কবল থেকে ব্রিটিশ সৈন্যদের রক্ষা করা। লালবাজারের মতো প্রমোদের স্বতন্ত্র এলাকা এই আইনে নির্দিষ্ট করা হয়নি। ইউরোপীয়দের জন্য বেশি খরচের কিছু বাড়ি সংরক্ষিত করা ছিল এই যা। অবশ্য সৈন্যদের জন্য অন্যভাবেও প্রমোদকন্যা সংগ্রহ চলত। ১৮৮৬ সালে কাগজে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, আম্বালা ছাউনির কমান্ডিং অফিসার তাঁর রেজিমেন্টের জন্য ছয়জন সুন্দরী নারী সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা চারশো। হাতের কাছে মেয়ে রয়েছেন মাত্র ছয়জন। তিনি আরও জনা-ছয়েক মেয়ে চান। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সব ধরনের প্রমোদশালা থেকেই আইন তুলে নেওয়া হয়। ঐতিহাসিকরা বলছেন, তাতে ব্রিটিশ বাহিনীর ক্ষতিই হয়েছিল। ফরাসি এবং জার্মানরা নিয়ন্ত্রিত আমোদশালার ব্যবস্থা রাখতেন। তাতে দেখা যায় ১৮৯৬ সালে ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে যখন এক হাজার জনের মধ্যে ৫৫২ জনই ব্যাধিগ্রস্ত, জার্মান বাহিনীতে তখন তাদের অনুপাত মাত্র সাতাশ জন। ফরাসি বাহিনীতে পঁয়তাল্লিশ জন। আইন অবশ্য আবার পালটানো হয়েছিল। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, পৃথিবীর আদিমতম পেশা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। আমরা ব্যাধিগ্রস্ত ইংরেজ সৈন্যদের পরিসংখ্যান জানি, কিন্তু তৎকালে দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিলে তিলে ভুগে মরেছেন যে মেয়েরা, তাঁদের কোনও পরিসংখ্যানই আমাদের জানা নেই।

বাইরে এক ভেতরে অন্য। ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতা আজ উপকথা মাত্র। উপনিবেশগুলিতেও ওদের আসল মুখ ছিল মুখোশের আড়ালে। সমকামিতার নামে ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ড কানে আঙুল দিত, অথচ লন্ডনের ক্লিভল্যান্ড স্ট্রিটে ১৮৮৯ সালে সমকামীরা নাকি রীতিমতো গড়ে তোলেন বাজার। সেখানে অনেক গণ্যমান্য ইংরেজের আনাগোনা। অথচ এক দশক বা তার কাছাকাছি সময়ে অস্কার ওয়াইল্ডের বিচার হয়ে গেল। 'লাভ দ্যাট ডেয়ার নট স্পিক ইটস নেম' বা পুরুষে পুরুষে সম্পর্ক খাস ইংল্যান্ডে যদি থাকতে পারে, তবে উপনিবেশগুলোতে যে আরও প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে তাতে আর বিস্ময় কী! অবশ্য 'কেলেঙ্কারি' জানাজানি হয়ে গেলে পতন ছিল তৎকালে অনিবার্য। স্যার হেক্টর ম্যাকডোনাল্ড উনপঞ্চাশ বছর বয়সে সিংহল তথা আজকের শ্রীলঙ্কার প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সৈনিক। দুটি যুদ্ধে লড়াই করে সম্মান পদক লাভ করেছেন, স্বদেশ স্কটল্যান্ডে বলতে গেলে তিনি জাতীয় বীর। একসময়ে বিয়েও করেছিলেন। পরে অবশ্য বিয়ে ভেঙে যায়। স্বদেশে তাঁর অন্য কোনওরকম আসক্তির কথা শোনা যায়নি। কিন্তু কান্ডিতে এক রেল-কামরায় চারজন সিংহলি তরুণের সঙ্গে ভ্রমণকালে তাঁর আচরণে একজন বাগিচা-মালিক অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেন। অভিযোগ ওঠে। তিনি প্রথমে অভিযোগ অস্বীকার করেন, কিন্তু সে বছরই নিজ হাতে নিজের জীবন কেড়ে নেন। আর-একজন স্যার রজার কেসমেন্ট। তিনি ছিলেন দাসবিরোধী আন্দোলনের একজন নেতা। বেলজিয়াম কঙ্গো এবং পেরুতে দাসদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছেন। ম্যাকডোনাল্ড যে বছরে মারা যান, সে বছরেই তাঁর গোপন ডায়েরি লিখতে শুরু করেন। সেই ডায়েরি পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে দেখা যায়, তিনিও সমকামী ছিলেন।

পাতার পর পাতা জুড়ে তিনি লিখে গেছেন তাঁর যৌনজীবনের কাহিনী। ১৯১৬ সালে ইংরেজরা তাঁকে গুলি করে মারে। কারণ, কেসমেন্ট আইরিশ বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি নাকি তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। ওই গোপন ডায়েরিটি তখন কারও হাতে পড়লে হয়তো তাঁকেও আত্মঘাতী হতে হত সেদিন!

এই আবহাওয়ার মধ্যে কিন্তু ইংরেজরা চেষ্টা করেছেন সাম্রাজ্যের কর্মীদের শুদ্ধ ও পবিত্র রাখতে। এমনকী দখল-করা দেশগুলোতেও কিছু কিছু সংস্কার আন্দোলন চালাতে। তা করতে গিয়ে কখনও কখনও সংস্কারকরা জাতীয় আবেগকে জাগিয়ে তুলেছেন। কিন্তু কিছু কিছু অনিষ্টকর প্রথা তাঁদের চেষ্টায় অবশ্যই লোপ পেয়েছে। তবে সাধারণভাবে যৌনজীবনে সদাচার বা নৈতিক বিশুদ্ধতা যে তাঁদের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, সে কাহিনী আজ আর গোপন নেই। শাসকদের হাত ধরে উপনিবেশগুলোতে হানা দিয়েছিলেন পাদ্রিরা। শুধু বাণিজ্য নয়, মুনাফার সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম প্রচার যোগ করা সম্ভব হলে এক ধরনের নৈতিকতা জন্মায়। তাতে অন্য দেশের উপর হামলাবাজি অন্তত কিছুটা এক ধরনের বৈধতা পায়। কিন্তু অ্যান্টন জিল-এর ইতিহাস বলছে পাদ্রিরাও সব সময় উচ্চাদর্শ রক্ষা করতে পারেননি। বালহ্যাচেট রেভারেন্ড উইলিয়াম হান্তি এবং ম্যারি পিগট-এর কাহিনী শুনিয়েছিলেন। অ্যান্টন জিলও কলকাতার সে-কাহিনীটি আবার শুনিয়েছেন। সেইসঙ্গে আরও কিছু খ্রিস্টান যাজকের কথাও। সেবার পপুয়া নিইগিনিতে অ্যাংলিকান চার্চ গোলমালে পড়ে। জানা যায় একজন পাদ্রি পপুয়ান যুবকদের নিয়ে পড়েছেন। তিনি তাদের শারীরিক সৌন্দর্যের প্রশংসায় মুখর। তারা নাকি চরিত্রে সেন্ট জন, চেহারায় অ্যাপোলো। অরেঞ্জ ফ্রি-স্টেট থেকে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে একজন যাজককে পালিয়ে যেতে হয় ইংল্যান্ডে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সমকামিতার। প্রায় একই সময়ে দাহমিতে এক যাজক ছিলেন, তিনি নাকি দুই দশক ধরে তাঁর মিশন-বাড়িটিকে রীতিমতো প্রমোদশালা করে রেখেছিলেন। এই যাজক ছিলেন অলস এবং মদ্যপ। তিনি তেলের ব্যাবসা করতেন। নিজের বড় মেয়েকে নাকি নামিয়েছিলেন শরীরের ব্যবসায়ে। আর-একজন ইংরেজ যাজক সাতটি কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ের সঙ্গে সহবাস করার গৌরবে রীতিমতো গৌরবান্বিত। তাঁর কথা ছিল খ্রিস্টানের সঙ্গে সহবাস না করলে কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা সত্যিকারের খ্রিস্টান হবে কেমন করে!

রোনাল্ড হায়াম, 'এম্পায়ার অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি', ম্যানচেস্টার, ১৯৯২

অ্যান্টন জিল, 'রুলিং প্যাশনস্/সেক্স, রেস অ্যান্ড এমপায়ার', বি. বি. সি. বুকস্, লন্ডন, ১৯৯৫

মঞ্জুশ্রীর তলোয়ার
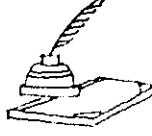
ছবি। ছবি। ছবি। আবার পাতার পর পাতা জুড়ে ছবি। কখনও পাতা ছাড়িয়ে। ভাঁজ করা পাতায়। অধিকাংশই রঙিন ছবি। কিছু কিছু সাদা কালো। পরিচিত হাতে ছবি। লেখার কলমটিও অপরিচিত নয়। তবু পাতা খোলার পর চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। প্রথম পাতায়ই চোখ আটকে যায়।

প্রথমে ছবিতে তার পর হরফে। বলতে গেলে প্রথম পৃষ্ঠাতেই শুরু হয়ে যায় পাঠকের অভিযান। না, প্রথম বাক্য থেকেই। ডাকোটার জানলা দিয়ে এক ঝলক কাঠমাণ্ডু দেখা হতে-না-হতে মেঘের রাজ্যে। এক রত্তি উড়োজাহাজ ঝড়ের কবলে। এমনকী এয়ারহোস্টেস মেয়েটি পর্যন্ত ভয়ে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে সিটের সঙ্গে। যেন সাংগ্রিলা থেকে পালিয়ে আসা দু'শো বছরের প্রাচীন কোনও মমি। এভাবেই শুরু হয়েছে ডেসমন্ড ডয়েগ-এর কাঠমাণ্ডুর কাহিনী (Desmond Doig, *My Kind of Kathmandu, An Artist's Impression of the Emerald Valley*, Harper Collins/ Indus, New Delhi) শুধুই কি পান্নার উপত্যকা? ডেসমন্ড ডয়েগ যা দিয়ে গেলেন সেখানে হীরা পান্না মণিমুক্তা, এক কথায় জহুরির বাছাই করা মণিমাণিক্যের একটি বাহারি শো-কেস যেন। পার্থক্য একটাই, কাচের আড়ালে নয়, তাঁর আঁকা ছবি এবং লেখা দুই-ই স্পর্শ করা যায়। শিল্পী-লেখকের অনুভব আর অন্তরঙ্গতা অবলীলায় সঞ্চারিত হয়ে যায় দর্শক-পাঠকের মনে। আবেগ-উত্তেজনায় আন্দোলিত হতে হয়। কখনও বা উত্তেজিত। তবু সর্বক্ষণ স্মিত হাসিটুকু তিনি পাঠক-দর্শকের মুখে ছড়িয়ে রাখেন। সেটাও কিন্তু তাঁর তুলি আর কলম থেকেই সংক্রামিত। এমন ছোঁয়াচে ছবি আর লেখা কদাচিৎ দেখা যায়।

অ্যাংলো-আইরিশ পরিবারের সন্তান ডেসমন্ড ডয়েগ-এর জন্ম ভারতে। বড় হয়েছেন তিনি দার্জিলিঙে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলেন। কিছু সময়ে যুদ্ধে ছিলেন কোনও এক গোর্খা রেজিমেন্টের সঙ্গে। অল্পস্বল্প নেপালি ভাষা জানতেন। সত্যিকারের অভিযাত্রীর জীবন তাঁর। তিনি লেখক, শিল্পী, আলোকচিত্রী এবং অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ভ্রমণকারী। ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে পৌঁছেছিলেন কলকাতায়। 'দ্য

স্টেটসম্যান' কাগজে যোগ দেন শিল্পী হিসাবে। কিছুকাল পরে দেখা গেল তিনি সে-কাগজের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি। নানা উপলক্ষে দেশময় ঘুরে বেড়ান তিনি। সাহিত্যগুণসম্পন্ন প্রতিবেদন পাঠান। সঙ্গে থাকে নিজের আঁকা ছবি। আমার মনে পড়ে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের আড়াই হাজার বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশে যখন নানা অনুষ্ঠান শুরু হয়, ডেসমন্ড ডয়েগ তখন বুদ্ধের পথ ধরে তীর্থগুলো পরিক্রমা করছেন। তাঁর সেইসব সচিত্র প্রতিবেদন তখনকার প্রেক্ষাপটে অবশ্য নতুন ধরনের সাংবাদিকতা। তার পর সাময়িকপত্র 'জে এস ' ওরফে জুনিয়র স্টেটসম্যান। ১৯৭৭ সালে সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ডেসমন্ড আবার অভিযাত্রী। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কলকাতা চিত্রমালা— 'ক্যালকাটা: অ্যান আর্টিস্ট ইম্প্রেশন'। নিজের আঁকা ছবির পাশাপাশি নিজের চোখে দেখা কলকাতার বেশ-কিছু দর্শনীয় ঘরবাড়ির বর্ণনা। ডেসমন্ড ডয়েগ আরও বই লিখেছেন। স্যার এডমন্ড হিলারির সঙ্গে লেখা হিমালয় অভিযানের কাহিনী, 'হাই ইন দ্য থিন কোল্ড এয়ার'। মাদার টেরেসাকে নিয়ে লিখেছেন, 'মাদার টেরেসা: হার ওয়ার্ক অ্যান্ড হার পিপল'। ১৯৮৩ সালে হঠাৎ মৃত্যুর আগে ডেসমন্ড ডয়েগ দিল্লি এবং গোয়া নিয়েও দুটি চিত্রিত বই প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তা ছাড়া তেষট্টি বছরের বিচিত্র জীবনকাহিনী লেখারও নাকি ইচ্ছা ছিল তাঁর। 'মাই কাইন্ড অব কাঠমান্ডু' ঘরানা বিচারে বলা চলে তাঁর কলকাতার আলেখ্যের আত্মীয়। তবে কলকাতার তুলনায় কাঠমাণ্ডু আকারে-প্রকারে বেশ বড়সড় এবং রঙিন ছবির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং অলংকার-গৌরবে হয়তো কিছু পরিমাণে অহংকারী, এই যা।

ডেসমন্ড ডয়েগ প্রথম কাঠমাণ্ডুর উদ্দেশে ডানা মেলেন ১৯৫৪ সালে। উপলক্ষ ছিল রাজা ত্রিভুবনের শেষকৃত্য। ঝড়ের জন্য ডাকোটা মাটি ছুঁতে পারেনি। ফিরে আসতে হয়েছিল পাটনা। সেখানে ঘটাঘট টাইপরাইটার চালিয়ে প্রতিযোগী এক কাগজের প্রতিবেদক রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন কলকাতায়, উড়োজাহাজের জানালা দিয়ে তিনি দেখেছেন রাজকীয় চিতা থেকে ধোঁয়া উঠছে আকাশে। পরের দিন অবশ্য ডেসমন্ড কাঠমাণ্ডুতে নামেন। নেপাল তখনও নিষিদ্ধ দেশের মতো। এয়ারপোর্ট একটা ফুটবলের মাঠের মতো। পাশেই বাগমতী নদী। উড়োজাহাজ আসতে দেখে আশপাশের লোকেরা মাঠ ঘিরে ভিড় করেন। একটা কুঁড়ে ঘরে বিমানবন্দরের অফিস। কাস্টমস, ইমিগ্রেশন সবই এক বাড়িতে। উড়োজাহাজ বলতে যুদ্ধের পর কুড়িয়ে নেওয়া দু'-একখানা ডাকোটা, পাইলটরাও যুদ্ধের উদ্বৃত্ত। ট্যাক্সি বলে কিছু নেই।

কিন্তু একটা জিপ ছিল। সেটি রয়াল হোটেলের। কাঠমাণ্ডুতে তখন তিনখানা মাত্র হোটেল। অন্যতম— দি রয়াল হোটেল। রাজাদের একটা পুরনো প্রাসাদের একাংশ নিয়ে সেই হোটেল। বাড়ির মালিকের পার্টনার হিসাবে সেটি চালান বোরিস নামে বিপুলদেহী এক রাশিয়ান। ট্যাক্সিডার্মি করা বাঘ কুমির পেছনে ফেলে কার্পেট পাতা সিঁড়ি ভেঙে তাঁর মুখোমুখি।— উল্লো, উল্লো বলে হাত বাড়িয়ে দেন বোরিস। রাশিয়ান উচ্চারণে বলেন ওয়েলকাম টু কাঠমাণ্ডু।

সে-ই প্রথম। দ্য রয়াল হোটেলের এক নম্বর ঘরে। বোরিসের আড্ডায়। বোরিসের চারপাশে ঘুরঘুর করে তিন বিদেশি সুন্দরী। 'ওয়ান ওয়াজ ভেরি ব্লন্ড অ্যান্ড কার্ভসাম, ওয়ান

র‍্যাভেন-হেয়ারড অ্যান্ড কার্ভসাম, অ্যান্ড ওয়ান রেড হেডেড অ্যান্ড কার্ভসাম।' বোরিস তাঁদের সঙ্গে নতুন অতিথির পরিচয় করিয়ে দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাঁর আড্ডায় রকমারি লোকের ভিড়। ভূতপূর্ব জেনারেল, কূটনীতিক, রানা, কে নয়। ডেসমন্ড ঘরে বসে না থেকে শহরে বেরিয়ে পড়তে চান। কিন্তু রাত আটটা থেকে কাঠমাণ্ডুতে কার্ফু। তবে উপায়? আড্ডাধারীদের একজন বললেন, কোনও ভয় নেই।

—কে যায়? শোনা মাত্র উত্তর দেবে— কাঞ্চি। কাঞ্চি মানে, ডেসমন্ড জানেন, তরুণী। তা-ই হল। 'কাঞ্চি' বলতে বলতে তিনি শহরের নির্জন পথ ঘুরে ঘুরে একটা প্রাসাদের চত্বরে হাজির হলেন। দরবার স্কোয়ার। প্রাসাদ এবং বাহারি কাজ করা মন্দির! দেওয়ালের কাঠখোদাইয়ে তারার আলোয় প্রেমিক-প্রেমিকাদের রতিবিলাস। তাঁরা চমকে ওঠেন। অন্য দিকে তাকাতে গিয়ে ভয়াবহ কালভৈরবের মুখোমুখি। তার গলায় মুণ্ডমালা। চার পাশ ঘিরে আরও অনেক দেবতা এবং মানবমূর্তি। গিল্টি করা সোনালি রঙের এক মল্লরাজার প্রতিমাকে অভিবাদন জানিয়ে সেই অমৃতলোক থেকে বিদায়। 'কাঞ্চি' বলতে বলতে আবার হোটেলের এক নম্বর ঘরে ফিরে আসা। সেখানে আবার অপ্রত্যাশিত নানা অভিজ্ঞতা। বিছানায় রোমশ লালপাণ্ডা। রাত্তিরে যখন-তখন সেই মেয়েদের আসা-যাওয়া। কারণ আর কিছু নয়, হোটেলের এদিকটায় বাথরুম-টয়লেট বলতে একটাই—এই নাম্বার ওয়ান-এ!

শুধু বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা নয়। শুধুই রসালো ভ্রমণকাহিনী নয়, এ-বই বলতে গেলে কাণ্ডমাণ্ডুর চরিত-কথা। কফি টেবিলে ফেলে রাখার জন্য নয়, বেকনের পরামর্শমতো এ বই চিবিয়ে পড়ে হজম করার মতো বই।

চিন থেকে বেগবান বায়ুর মতো, বজ্রের মতো, বর্ণাঢ্য কোনও রাজকীয় শোভাযাত্রার মতো এসেছিলেন মঞ্জুশ্রী। কাঠমাণ্ডু উপত্যকা তখন হ্রদ মাত্র। তিনবার সেই হ্রদ পরিক্রমা করে জ্বলন্ত তলোয়ার দিয়ে তিনি পাহাড়ের প্রতিরোধকে দু' ভাগ করে জল বের করে দিলেন। এখনও পাহাড়ের গায়ে জ্বলজ্বল করছে সেই আঘাতের চিহ্ন। নাকি, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বজ্র নিক্ষেপ করে পাহাড় ধ্বংস করে মুক্তি দিয়েছিলেন বন্দি জলাশয়কে। তাও হতে পারে।

দেখতে দেখতে হ্রদ পরিণত হয় অমরাবতীর চারণক্ষেত্রে। সেখানে বিশ্রাম করতে আসে তিনটি পদ্ম। কাঠমাণ্ডুর আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ায় তিনটি মন্দির। স্বয়ম্ভূনাথে বৌদ্ধ স্তূপ, পশুপতিনাথে হিন্দু মন্দির, আর সর্বদর্শী অপলক চোখ নিয়ে বৌদ্ধনাথ। আদি এই তিন নিয়ে আরও নানা উপাখ্যান। প্রথম বাসিন্দারা এসেছিলেন মঞ্জুশ্রীর সঙ্গে। অন্য উপকথা বলে— না, প্রথমে এসেছিলেন গোপালরা। তার পর বাংলার উত্তর থেকে আহিররা। হয়তো বা ওঁরা এসেছিলেন উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে, ব্রহ্মদেশ থেকে, তিব্বত থেকে। পরে আসেন কিরাটিরা, পূর্ব দিক থেকে। লড়াই করে সিকিম, ভুটান এবং তিব্বতের লোকেরা নেপাল পৌঁছন। প্রথম কিরাটি রাজার নাম—ইয়ালাম্বার। তাঁর আমলেই নাকি দেবরাজ ইন্দ্র কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় নেমে এসেছিলেন তাঁর মায়ের জন্য ফুল কুড়োতে। সাকুল্যে আটাশ জন কিরাটি নরপতি রাজত্ব করেছেন নেপালে। চতুর্দশের আমলে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দে বুদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অশোক এসেছিলেন নেপালে। তিনি না এলেও, মানতেই হবে তাঁর কন্যা চারুমতী বিয়ে করেছিলেন নেপালের এক রাজকুমারকে। ছাবাল আর দেওপাতনে ওঁরা যুগল শহর গড়ে তোলেন। এক শহর পশুপতিনাথের পাশে, দ্বিতীয়

বৌদ্ধনাথের ধারে-কাছে। মাঝখানে সৌম নামে সূর্যবংশের রাজারাও রাজত্ব করে গেছেন। তাঁদের পরে চন্দ্রবংশের লিচ্ছবি রাজারা গদিতে বসেন। তাঁদের এক কন্যার বিয়ে হয়েছিল তিব্বতে। তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র। সেইসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম। নেপালের ধ্যানে তিনি সবুজ তারা। আরও একজন রাজকন্যার কাহিনী সুবিদিত। তিনি সাদা তারা।

সবুজ তারার এক বোন ছিল। তিনিও তিব্বতে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনুমতি মেলেনি। তাঁকে শেকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল। দুঃখী রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে শুকিয়ে যান। অশ্রুজলের সঙ্গে তাঁর সব সৌন্দর্য ঝরে পড়ে। দুঃখী এই রাজকন্যা লাল তারা। ডেসমন্ড ডয়েগ লিখছেন—আমেরিকায় একজন নবীন নর্তকী তাঁর দুঃখ আর যন্ত্রণা নিয়ে নাচের পরিকল্পনা করেছিলেন একসময়ে।

শত শত বছর ধরে অন্ধকার, আবছা অন্ধকার, কুয়াশাময় মোড়া ইতিহাস। অস্ত্রের ঝংকার। পাহাড়ে পাহাড়ে রণবাদ্যের প্রতিধ্বনি। এক বাহিনীর পিছু পিছু অন্য কোনও অভিযান। তারই মধ্যে একসময়ে মুঘলদের তাড়া খেয়ে ভারতের উত্তরের সমতল থেকে অস্ত্রধারী মল্লদের পদসঞ্চার। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আগন্তুক বিজয়ী দলের রক্তের মিশ্রণ, ফলে নতুন এক জনগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ। তাঁদের মধ্যে ক্রমে আবির্ভূত হন কবি, শিল্পী, স্থপতি, নির্মাতা এবং নরপতি। তিনজন মল্লরাজার মূর্তি রয়েছে এখনও কাঠমাণ্ডুতে। প্রতাপ মল্ল বিদ্বান, শিল্পী এবং কবি। তিনি সপ্তদশ শতকের রাজা। পাটানে ছিলেন যোগেন্দ্র মল্ল। তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকেও বেঁচে ছিলেন। বলা হয় যতদিন তাঁর প্রতিমূর্তির রং উজ্জ্বল থাকবে এবং মাথার উপরে ছত্রে বসানো পাখিটির সোনালি রং থাকবে ততদিন তিনি বেঁচে থাকবেন। এবং একদিন তিনি ফিরেও আসবেন। ডেসমন্ড জানাচ্ছেন, এখনও নাকি প্রাসাদে তাঁর জন্য পাতা থাকে একটি বিছানা। শুধু তা-ই নয়, একটি জানালাও থাকে খোলা।

তার পর দূর কর্ণাটক থেকে হানা দেন অন্য আর-এক দল হানাদার। মল্ল রাজারা পাহাড়ে পালিয়ে গেলেন। কর্ণাটকরাজ হরি সিং দখল কায়েম করে ফিরে যান স্বদেশে। কাঠমাণ্ডুতে রেখে যান তাঁর দরবার আর এক পুত্রকে। সেইসঙ্গে পারিবারিক দেবতা তেলেজু ভবানীকে। কর্ণাটকরাজের এক কন্যার সঙ্গে বিয়ে হয় মল্ল পরিবারের এক মান্য যুবার। শুরু হয় নতুন এক মল্ল রাজবংশের। অনেকের ধারণা, কর্ণাটকের রাজকুল এবং তাঁদের নায়ার বাহিনীর সৈনিকদের সঙ্গে মেলামেশার ফলেই নেপালের বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী, উন্নত নানা শিক্ষায় দক্ষ নেওয়ারদের আবির্ভাব। আবার কেউ কেউ বলেন, নায়াররা নেপালের মাটিতে পা রাখার আগেই নেওয়াররা ছিলেন উপত্যকায়। তবে দক্ষিণ ভারতের প্রভাব এখনও নেপালের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে সুস্পষ্ট। ভরতনাট্টম এবং মুদ্রা এখনও বেঁচে আছে নেপালের কোনও কোনও নৃত্যশৈলীতে।

নেপালের ইতিহাসে আরও নানা কাণ্ড। মল্লদের পরাজিত করে গোর্খাদের সিংহাসন দখল। তাঁরা নেপালের এলাকা এবং শক্তি দুই-ই বাড়াতে লাগলেন। ফলে এক দিকে চিন, অন্য দিকে ভারতে ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ। জেনারেল অক্টরলনির বাহিনীর সঙ্গে গোর্খাদের তুমুল লড়াই। ১৮১৬ সালে কাঠমাণ্ডুতে মোতায়েন হলেন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট। রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের রীতি চালু হল। শুরু হল পাণ্ডে আর থাপাদের বকলমে শাসন। সাধারণত ওই দুই পরিবার থেকেই নিযুক্ত হতেন প্রধানমন্ত্রীরা। তাঁদের উপাধি মহারাজা।

ক্ষমতার চাবিকাঠি ক্রমে চলে যায় তাঁদেরই হাতে। রাজারা কার্যত প্রাসাদে বন্দি। তাঁদের জন্য বরাদ্দ যথেচ্ছ ব্যভিচার, বিলাসিতা, আর খেয়ালখুশির অবাধ স্বাধীনতা। একশো চার বছর ধরে তা-ই চলছিল। প্রথম বিদ্রোহী রাজা ত্রিভুবন। তিনি পালিয়ে ভারতে আশ্রয়ে নিয়েছিলেন। প্রজারা অবসান ঘটিয়েছিলেন রানাশাহীর। রানাদের মধ্যে কিছু কিছু ভাল রানাও ছিলেন বটে। ডেসমন্ড ডয়েগ একজনের কথা বলেছেন।— যিনি তিনশো প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলেছিলেন, দাস প্রথার উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, এবং নিজের স্ত্রীর ললিত করপুট অমর করে রেখে গেছেন পথের ধারে পানীয় জলের কলগুলোর মুখে তা ঢালাই করে বসিয়ে দিয়ে। এই রানা রাজত্ব করতে পেরেছিলেন মাত্র পাঁচ মাস। তাঁর জন্য কেঁদে কেঁদে মারা যান এক প্রিয় রক্ষিতা।

প্রাসাদ। মন্দির। স্তূপ। ধাতুমূর্তি। দারুমূর্তি। কাঠখোদাই। বাহারি ঘরবাড়ি। কারুকর্ম। কাঠমাণ্ডুতে চোখের জন্য অফুরন্ত আয়োজন। কানের জন্য রয়েছে নেপালের নিজস্ব রাজতরঙ্গিণী। ওয়াকিবহালরা কথাসরিৎসাগর যেন। ইতিহাস আর উপকথা, প্রকৃতি আর অতিপ্রাকৃত, ধর্ম এবং লোকাচার, দেবতা এবং মানুষ, ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানব, পাপী আর পুণ্যাত্মা—পান্না উপত্যকায় সব মিলে-মিশে একাকার। ডেসমন্ড ডয়েগ বলছেন—আমি বোধহয় আগের কোনও জন্মে ওঁদেরই কেউ ছিলাম। তা না হলে সাতাশ বছর ধরে কেন ঘুরে ঘুরে এখানেই আসি! অনেক পরিবর্তন ঘটেছে নেপালে। কাঠমাণ্ডুতেও। কিন্তু কাঠমাণ্ডুর মানুষের মুখ থেকে হাসিটুকু মিলিয়ে যায়নি। স্মিত, অথবা প্রাণখোলা হাসি এখানে পাহাড়ের মতোই চিরস্থায়ী। পাহাড়ি ঝরনার কলধ্বনির মতোই আন্তরিক, মন্তব্য করেছেন ডেসমন্ড।

রাজা ত্রিভুবনের শ্মশান-যাত্রা তাঁর দেখা হয়নি। তবে আরও অনেক দৃশ্যই দেখেছেন ডেসমন্ড ডয়েগ নেপালে। রাজা মহেন্দ্র এবং রাজা বীরেন্দ্রের অভিষেক, বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলন। তা ছাড়া লুম্বিনিতে ছবি আঁকা, ডাইনি-ওঝাদের সঙ্গে মেলামেশা, ইয়েতির খোঁজে এভারেস্টের পথে অভিযান, বলতে গেলে নক্ষত্রলোকে শেরপাদের আস্তানায় পদার্পণ, হাতির পিঠে চড়ে কাঠমাণ্ডুর গলিতে ঘুরে বেড়ানো, এবং আরও নানা অভাবিত কাণ্ডের নায়ক ডেসমন্ড ডয়েগ।

মহেন্দ্র বীরবিক্রম শাহর অভিষেকের একটি জীবন্ত ছবি এঁকেছেন ডেসমন্ড কলমে। রাজপুরোহিত রাজার মাথায় আনুষ্ঠানিকভাবে মুকুট তুলে দিচ্ছেন এমন সময়ে হঠাৎ হাঁক শোনা গেল—'হোল্ড ইট কিং!' কেননা, আমেরিকান আলোকচিত্রী ছবি তুলতে চান। ব্রিটেনের একটি কাগজে সে-ছবি যখন ছাপা হয় তখন একই ক্যাপশন—'হোল্ড ইট কিং!' কোন দেশ থেকে উপহার কী এসেছিল তার ফর্দও দিয়েছেন ডেসমন্ড। প্রধানমন্ত্রী টঙ্কাপ্রসাদ আচার্য আশায় আশায় ছিলেন ব্রিটেন থেকে একটা ছাপাখানা পাওয়া যাবে। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ পাঠিয়েছিলেন একটা ছোট্ট রুপোর প্লেট। তার ওপর খোদাই করা—'ফ্রম হার ম্যাজেস্টি কুইন এলিজাবেথ-টু'। আমেরিকানরা আবার এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেন। কী দেওয়া যায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নাকি কারও মাথায় উঁকি দেয় আইডিয়াটা। নেপালের রাজার মুকুটে থাকে বার্ড অব প্যারাডাইসের একটি পালক। দুষ্প্রাপ্য পাখির পালক তখন আমেরিকায় নিষিদ্ধ বস্তু। কাস্টমস-এর ধরা পড়া এক বস্তা পালক পড়ে ছিল কোনও এক দ্বীপে। তা-ই দিয়ে একটা পাখা তৈরি করে পাঠিয়ে দেওয়া

হল নেপালে। ডেসমন্ড বলছেন—সে বস্তু হলিউডে ক্লিওপেট্রার সেটে মানাত ভাল।

আমেরিকানদের নিয়ে আরও গল্প শুনিয়েছেন ডেসমন্ড। কাঠমাণ্ডুর দূতাবাস থেকে ইঙ্গিত মেলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এক জোড়া তিব্বতি-কুকুর পেলে খুশি হবেন। রাজা মহেন্দ্র উদ্‌যোগী হলেন। কুকুর সংগ্রহ করা হল। পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন ভারতে মার্কিন দূত বাঙ্কার। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স সবিনয়ে জানাল আমাদের ছোট বিমানে এত বড় খাঁচা বহন করা সম্ভব নয়। সুতরাং, ট্রাকে কাঠমাণ্ডু থেকে দিল্লি। কাগজে খবর বের হয়ে গেল। হোয়াইট হাউস থেকে বলা হল—প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তবে? হয়তো মার্কিন বিদেশ দপ্তরের কেউ চেয়েছিলেন। কে এল এম-কে বলে-কয়ে দিল্লিতে থামিয়ে খাঁচা তো তুলে দেওয়া হল। কিন্তু আটকে দিল কাস্টমস। কেননা, তিব্বত চিনের অংশ। আর চিনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায়। দিল্লির নেপালি-দূতাবাস থেকে অনেক বুঝিয়ে সার্টিফিকেট আদায় করলেন উদ্‌যোগীরা। নেপাল-দূত লিখেছিলেন রাজা কাউকে কিছু উপহার দিলে ধরে নিতে হবে তা নেপালেরই কিছু! এ সারমেয়যুগল নেপালের নাগরিক! শেষ রক্ষা হল। ডেসমন্ড লিখছেন— তারা আরিজোনার কোনও খামারে নিশ্চয় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ভাবতে ইচ্ছে করে 'দ্য টিবেটান মাসটিফ ক্লাব অব আমেরিকা'র সূচনা এই দুই কুকুরের আবির্ভাবেরই ফল! নেপালিদের রসবোধ লক্ষ করেছেন তিনি। এক মার্কিন দূতের স্ত্রীর ব্যাবসা ছিল 'ওয়াশিং মেশিন'। নেপালিরা আড়ালে মহিলাকে বলতেন— ধোবি আর দূতাবাসকে— ধোবিখানা!

স্যার এডমন্ড হিলারির সঙ্গে ডেসমন্ড ডয়েগ আর-একজন শেরপা ইয়েতির খুলি নিয়ে বিশ্বপরিক্রমা করেছিলেন সে-খবর অনেকেরই জানা। কাঠমাণ্ডুর শহরতলিতে ডেসমন্ড একবার ইয়েতির মৃত বাচ্চা দেখতে তিনশো টাকা খরচ করেছিলেন। ফোটো তুলব বলায় গুণিনের উত্তর—তিন হাজার টাকা! যাক, থমথমে পরিবেশে টর্চের আলোয় শেষ পর্যন্ত যা দেখা গেল সেটা যে ইয়েতি নয় তা স্পষ্ট। টঙ্কাপ্রসাদ আচার্য বলেছিলেন, এটা ম্যানড্রেকের শেকড়। চিনারা বলেন জিনসাঙ। তেজোবর্ধক হিসাবেই তার খাতির, ইয়েতির সন্তান বলে নয়। আর-একবার শোনা গেল সাংগ্রিলা-র টিকিট বিক্রি হচ্ছে। বৌদ্ধনাথে উত্তেজনা। একজন লামা সাংগ্রিলা উপত্যকার তোরণ খুঁজে পেয়েছেন। তিব্বতিরা জায়গাটাকে বলে—শাম্বালা। সেখানে হামেশা বাহার, অনন্ত যৌবন। মাথাপিছু তিনশো টাকা দিয়ে লামা সঙ্গী হিসাবে নিয়ে যাবেন। স্বর্গের টিকিট হিসাবে দাম সস্তাই বলতে হয়। অনেকেই টাকা দিলেন। লামা তাঁদের কারুকার্য করা একটা চাবিও দেখালেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত উদ্‌যোগটা বিফলে যায় বেরসিক পুলিশের জন্য। তাঁরা আগ্রহ দেখালেন। ফলে লামা, চাবি, টাকা— সবই উবে গেল। ডেসমন্ড ডয়েগ বলছেন— 'বাট কাঠমাণ্ডু মাই সাংগ্রিলা রিমেইন্ড!'

কাঠমাণ্ডু কি শুধু ডেসমন্ড ডয়েগ-এরই সাংগ্রিলা? ডেসমন্ড-এর এই বই বলছে, না, আরও অনেকেরই। রয়ালের বোরিস, তাঁর স্ত্রী ইঙ্গের আর কন্যা মর-এর কথাই ধরা যাক। ওঁরা কেমন করে কাঠমাণ্ডু এলেন, আর কেনই বা থেকে গেলেন, যদি এ শহর তাঁদের সাংগ্রিলা না হত! মর-এর স্বামী স্কট সাহেব থাকেন সিঙ্গাপুরে। কিন্তু মর ভালবাসে তাঁর মাকে। একসময়ে সে সুইজারল্যান্ডে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ফিরে আসে কাঠমাণ্ডুতে। এক নম্বর ঘরের লাল পাণ্ডাটি তাঁরই। হোটেলের একতলায় তাঁর একটি কিউরিও শপ আছে। কিন্তু সুযোগ পেলেই সে ঘুরে বেড়ায় বৌদ্ধ স্তূপ আর মন্দিরে মন্দিরে। তার পর ধরা যাক

সেই শিল্পী-যুগলের কথা। মেয়েটি হাঙ্গেরিয়ান, ছেলেটি ফরাসি। পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে চটি পায়ে ওঁরা লুম্বিনি যাত্রা করেছিলেন। সঙ্গী ছিল এক নেপালি নর্তক, একটি কুকুর আর অভিযানপ্রিয় ডেসমন্ড ডয়েগ। এলিজাবেথ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন। ভাবতেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড় ওই ফরাসি সঙ্গী ছিলেন জন্মান্তরে তাঁর মা। ডেসমন্ড বলছেন—বোধহয় নেপালে ওঁরাই প্রথম হিপি। আরও অনেকেই আছেন নেপাল যাঁদের কাছে বেহেস্ত। ইংরেজ মেয়ে মার্গট নাচেন। তিনি নেপালের একটি প্রাচীন নৃত্যশৈলী খুঁজে পেয়েছেন, এবং স্থানীয় কয়টি মেয়ে নিয়ে 'দ্য স্পেস থিয়েটার' নামে একটা মঞ্চ গড়ে তুলছেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন এক আমেরিকান যুবক। একসময়ে তিনি ফিরে যান। মার্গট কিন্তু থেকে যান কাঠমাণ্ডুতেই। তার পর এক ফরাসি বৌদ্ধ নান বা সন্ন্যাসিনী জিনা আর তাঁর মা। জিনার ভূতপূর্ব আমেরিকান স্বামী সন্ন্যাসিনী স্ত্রীর সঙ্গে খানাপিনা করেন, ডেসমন্ডকে বলেন—তাঁকে নিয়ে একটি বই লিখতে। কারণ, জিনা একসময়ে ছিলেন মডেল। ডেসমন্ড বলছেন—জিনা পরেও একবার বিয়ে করেছেন। তিনি শুনেছেন দ্বিতীয় স্বামী তাঁকে নিয়ে একটা ফিল্ম করতে চান। কিন্তু আপাতত জিনা তাতে রাজি নন। তিনি যাবেন পাহাড়ে, একটি তিব্বতি মঠে তপস্যা করতে। বেচারি সেখানেই ঠাণ্ডায় মারা যান।

কাঠমাণ্ডুতে পরবর্তীকালে অনেক বিদেশিরই আনাগোনা। কাঠমাণ্ডু বিশ্বের মানচিত্রে পর্যটকদের কাছে একটি স্বপ্নের দেশ বলে চিহ্নিত। অনেক টুরিস্টই আসেন সেখানে উড়োজাহাজ বোঝাই করে। এই রমরমার পেছনে ডেসমন্ড ডয়েগের অবদানও কম নয়। প্রথম দিকে তিনিই ছিলেন টুরিস্টদের কাছে বিশেষজ্ঞ গাইড-বিশেষ। একবার স্থির করেছিলেন কাঠমাণ্ডুতে ৮০০ মন্দিরের মধ্যে একটি আমেরিকান দলকে অন্তত তিনশো দেখিয়ে ছাড়বেন। দিনশেষে দলের নেত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন—কেমন দেখলেন?—চমৎকার! কিন্তু ম্যানহাটনের স্কাইলাইন কোথায়! ডেমসন্ড মনে মনে উচ্চারণ করেছিলেন—মঞ্জুশ্রী, তোমার তলোয়ার কোথায়! অনেকেই প্রবেশ করতে পারেন না কাঠমাণ্ডুর অন্তরে। তাঁরা আসেন, দেখেন, চলে যান। কিন্তু কেউ কেউ ভুলে যান ফেরার পথ। ডেমসন্ড বলছেন—গোর্খা রেজিমেন্টের অন্তত চারজন ব্রিটিশ অফিসার স্থায়ীভাবে থেকে গেছেন নেপালে। কর্নেল জিমি রবার্টস, মেজর ডার্লিং স্পেন, গর্ডন টেম্পল, এবং আরও একজন। এ দেশে কিছু কিছু ভারতীয়ও আছেন। আছেন ডেসমন্ড ডয়েগ-এর মতো কিছু কিছু সাংবাদিকও।

এলিজাবেথ হাউলি এসেছিলেন সাংবাদিক হিসাবে। কাঠমাণ্ডু থেকে ইউরোপ-আমেরিকার নানা কাগজে লিখতেন। খুবই জ্ঞানী মহিলা। এক সময়ে তাঁকে 'মাতাহারি' খেতাবও দিয়েছিলেন কেউ কেউ। বছর কুড়ি আগে তাঁকে 'অবাঞ্ছিত' বলেও নাকি ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এলিজাবেথ নেপাল ছাড়েননি। বারবারা অ্যাডমস্‌ও ছিলেন সাংবাদিক। বড়জোর তাঁর এক মাস থাকার কথা। কিন্তু ফেরা আর হয়নি। পাদ্রি মোরান সাহেবের মতো বারবারা সাইকেলে নয়, শহর ও শহরতলিতে ঘুরে বেড়াতেন ঘোড়ার পিঠে!

ডেসমন্ড ডয়েগ-এর কাঠমাণ্ডু আর সবাইয়ের মতো এঁদেরকেও নিয়ে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী, রানা, ফিল্ড মার্শাল এবং বড় মানুষেরা যেমন আছেন তেমনই আছে তরুণ বন্ধু উৎপল সেনগুপ্ত এবং আরও কেউ কেউ। মাকালু হোটেলের রাজু যেমন আছে, তেমনি

আছেন সাংবাদিক নরেন্দ্র সাকসেনা, এবং বলতে গেলে ম্যাজিশিয়ান ট্যাক্সিচালক হ্যাপি। হ্যাঁ, অ্যালিস, কথোপকথনও আছে বইকী!—কনভারসেশন। শেষ করার আগে তারই কিঞ্চিৎ। দুটি মাত্র উদ্ধৃতি।

এয়ারপোর্ট। ডেসমন্ড ডয়েগ-এর সঙ্গে নতুন ক্যামেরা। তাঁকে নিতে এসেছেন স্থানীয় সাংবাদিক বন্ধু। কাস্টমস আটকে দিল পথ।— সরি স্যার, আপনার কি এই ক্যামেরা আমদানি করার লাইসেন্স আছে? উত্তর: এটি আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।— সরি স্যার, এর জন্য লাইসেন্স দরকার। উত্তর: এটা প্রেস-ক্যামেরা। এবং আমি একজন সাংবাদিক।— সরি স্যার, আপনার লাইসেন্স থাকতেই হবে। কাস্টমস ক্যামেরা আটকে দিল। সঙ্গী সাংবাদিক বললেন— ওঁর জন্য প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা করছেন। কিন্তু সেই এক কথা,— সরি স্যার। ওঁরা তক্ষুনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি বললেন— সে কী কথা? দেখছি। ওঁরা আবার এয়ারপোর্টে। এবার কথোপকথন খুবই সংক্ষিপ্ত।— ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে স্যার!— হ্যাঁ, তা বটে।

দ্বিতীয় কথোপকথন রানা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে—গোর্খা রেজিমেন্টের সঙ্গে একসময় যুক্ত ছিলেন এমন একজন বিদেশি অফিসারের। ওঁরা সাধারণত প্রধানমন্ত্রী ওরফে মহারাজের সামনে হাজির হন ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে সঙ্গে নিয়ে। রানা দিব্যি ইংরেজি জানেন। কিন্তু কথা বলেন নেপালি ভাষায়। তাঁর পার্শ্বচর সেটা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। অফিসার রেসিডেন্টকে ইংরেজিতে তাঁর উত্তর দেন। রেসিডেন্ট তা বলেন মহারাজার পার্শ্বচরকে। হ্যাঁ, ইংরেজিতে। তিনি আবার নেপালিতে তা বলেন, মহারাজকে। কথোপকথন এই রকম:— ইওর হাইনেস, আমার অভিযাত্রা চমৎকার হয়েছে। তার পর, নেপালিতে বলা হল— ইওর হাইনেস, ওঁর যাত্রা চমৎকার হয়েছে। রাজার উত্তর— আমি শুনে প্রীত হলাম। আবার শোনা গেল— হিজ হাইনেস, তিন-সরকার প্রীত হয়েছেন। এবার রেসিডেন্টের পালা। তিনি উমেদার সাহেবকে বলেন— হিজ হাইনেস ইজ গ্ল্যাড।...

অ্যালিস, তুমি খুশি তো!

ডেসমণ্ড ডয়েগ, 'মাই কাইন্ড অব কাঠমান্ডু, অ্যান আর্টিস্টস ইমপ্রেশন অব দ্য এমারেল্ড ভ্যালি'—হার্পার কলিন্স, ইন্ডাস, নিউ দিল্লি।
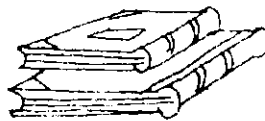
ভারতীয় কন্যা আর পরদেশি প্রেমিক
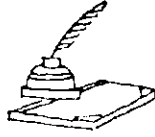
এম. এস. এইচ. সিক্স। পাণ্ডুলিপি নম্বর— এইচ. ছয়। পাণ্ডুলিপি মানে এক ফালি একটি কাগজ। বলা চলে একটি নাতিদীর্ঘ ছিন্নপত্র। চিঠিটি লিখেছিলেন এডেনের এক বণিক খালাফ ইবন ইসাক। যাঁকে লিখেছিলেন তিনি ম্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা আর-এক ইহুদি সওদাগর। নাম— আব্রাহাম বেন য়িজু। চিঠিটির তারিখ ১১৪৮ সালের গ্রীষ্ম। এই চিঠি নিয়ে ১৯৪২ সালে জেরুজালেম থেকে প্রকাশিত একটি হিব্রু কাগজে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন একজন পণ্ডিত। দীর্ঘকাল পরে ১৯৭৮ সালে অক্সফোর্ডের একটি লাইব্রেরিতে বসে বইপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ ওই প্রবন্ধটি নজরে পড়ে একজন নবীন বাঙালি গবেষকের। নাম তাঁর অমিতাভ ঘোষ। বয়স মাত্র একুশ। সবে কয়েক মাস হল তিনি একটি বৃত্তি নিয়ে অক্সফোর্ডে এসেছেন। ইচ্ছা— সোশ্যাল অ্যানথ্রপোলজি বা সমাজ-নৃতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে পি. এইচ-ডি. করেন। প্রবন্ধে উদ্ধৃত ওই ছোট্ট চিঠিটি সহসা তাঁকে উদ্দীপিত করে তোলে। তিনি নড়েচড়ে বসেন। বিশেষত চিঠিতে শুধু দুই সওদাগরের খবর নয়, রয়েছে একজন ক্রীতদাসের কথাও। ইবন ইসাক ভারতে তাঁর বন্ধুকে লেখা চিঠির শেষে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁর ক্রীতদাসকেও। রাজা-বাদশা উজির-নাজির নন, একজন সাধারণ ক্রীতদাস ঠাঁই করে নিয়েছেন মধ্যযুগের একটি দলিলে। এবং নিছক একজন ক্রীতদাস হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে। অমিতাভের কাছে এই ছোট্ট সংবাদটি এক বিরাট খবর বইকী!

তার পর আরও এক টুকরো কাগজ। প্রথম প্রবন্ধটির একত্রিশ বছর পরে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির এক গবেষণা পত্রে মধ্যযুগের ইহুদি বণিকদের ব্যাবসা প্রসঙ্গে আবার উঁকি দেয় ম্যাঙ্গালোরে বেন য়িজু-কে লেখা একটি চিঠি। এ চিঠির কাল— ১১৩৯ সাল। ক্রীতদাসের বয়স তখন অন্তত ন'বছর কমে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে তখন ঘোরতর অশান্তি, কিন্তু ম্যাঙ্গালোর আর এডেনের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন চলছে যথাপূর্ব। চলছে চিঠির আনাগোনা। অমিতাভ অস্থির হয়ে ওঠেন। এইসব প্রবন্ধ সূত্রেই তিনি জানতে পেরেছেন এ-সব চিঠি পাওয়া গেছে কায়রোর এক 'গেনিজা' থেকে। আর চিঠি লেখা হয়েছে এক মিশ্র ভাষায়। এই ভাষার উদ্ভব সপ্তম শতকে। একে বলা যায় জুডো-অ্যারাবিক। লিপি হিব্রু

হলেও ভাষা মধ্যযুগের প্রচলিত মৌখিক আরবি। তাতে হিব্রু শব্দ যেমন আছে তেমনি রয়েছে অ্যারামিক-ও। খুব কম পণ্ডিতই এ ভাষায় দক্ষ। অথচ অমিতাভকে ওইসব বণিক আর সেই ক্রীতদাসের পৃথিবীকে খুঁজে পেতেই হবে। সুতরাং দেখা গেল অক্সফোর্ডের ওই লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে দু'মাসের মধ্যেই তিনি টিউনিশিয়ায় আরবি শিখছেন। পরের বছর, ১৯৮০ সালে তিনি মিশরে। আলেকজান্দ্রিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে গাড়িতে ঘণ্টা দুয়েকের পথ পেরিয়ে তিনি লাতাইফা নামে একটি গ্রামে। তার পর সেখান থেকে নাশাউয়ি নামে আর-এক গ্রামে। একসময় আবার একই সন্ধানী মালাবার উপকূলে ম্যাঙ্গালোরে। প্রায় দশ বছর ধরে নিবিড় গবেষণা এবং মধ্যযুগের পৃথিবীর সন্ধানে আজকের মিশর ও ভারতে বিস্তর ঘোরাঘুরির পর নবীন বাঙালি লেখক আমাদের উপহার দিয়েছেন সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠার আশ্চর্য এক বই 'ইন অ্যান অ্যান্টিক ল্যান্ড' (রবিদয়াল, নিউ দিল্লি)। অমিতাভ ঘোষের লেখার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল। তাঁর প্রথম বই 'দ্য সার্কেল অফ রিজন', দেশ-বিদেশে সাড়া জাগানো এক উপন্যাস। প্রথম বই হাতেই বিশ্বজোড়া পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন তিনি। এই বইয়ের ফরাসি অনুবাদ সে-দেশে উচ্চ সম্মানে ভূষিত। দ্বিতীয় বই 'দ্য শ্যাডো লাইনস' তাঁর খ্যাতিকে আরও প্রতিষ্ঠিত করে। কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ঢাকা। আধুনিক কালের একটি বিশেষ পর্বে পূর্ব-পশ্চিমের এক অনবদ্য উপাখ্যান 'দ্য শ্যাডো লাইনস।' কাহিনী, ঘটনাবলি, চরিত্র তো বটেই, রচনা পদ্ধতি, কাহিনীর বুনট সব-কিছুই পাঠককে চমৎকৃত করে। এ-বইটি স্বদেশেও সম্মানিত। 'আনন্দ পুরস্কার' এবং 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কারে পুরস্কৃত। কিন্তু তৃতীয় বই 'ইন অ্যান অ্যান্টিক ল্যান্ড'-এ আমরা যে-অমিতাভ ঘোষের দেখা পাই তিনি ঔপন্যাসিক মাত্র নন, একজন অদম্য গবেষক ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি পর্যটক। এ-বইকে কোন কোঠাতে ফেলা যায়, উপন্যাস, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী না সামাজিক নৃতত্ত্ব, তা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে। কোনও উপন্যাসে কি পঞ্চাশ পৃষ্ঠার কাছাকাছি 'নোট' থাকে? জানি না। আমার কাছে এ-বই একই সঙ্গে মনে হয়েছে উপন্যাস, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী এবং সমাজ-নৃতত্ত্ব।

কেমন উপন্যাস?

তার আগে ওইসব ছিন্ন পত্রাবলি সম্পর্কে কিছু কথা। যে-সব চিঠির ভিত্তিতে মধ্যযুগের কাহিনীকে পুনর্নির্মাণ করেছেন অমিতাভ ঘোষ সেগুলো পাওয়া যায়, মিশরের এক 'গেনিজা' থেকে। মিশর পশ্চিমের কাছে ইজিপ্ট। ভূগোল-ইতিহাসে সর্বত্রই ওঁরা লেখেন ইজিপ্ট। ওই শব্দের আদি একটি গ্রিক শব্দ। তার নানা অনুষঙ্গ। আমরা যখন বলি মিশর, তখন ওই শব্দের সূত্রেই সরাসরি মিশরে পৌঁছে যাই। কেননা মিশরিরা নিজের দেশকে বলেন মাস্‌র্‌। মাস্‌র্‌ থেকে আমাদের মিশর। 'গেনিজা' হিব্রু শব্দ। তার আদি পারসিক গঞ্জ। ভারতে গঞ্জের অভাব নেই। কলকাতা শহরেই রয়েছে বালিগঞ্জ, ওয়াটগঞ্জ। পারসিক গঞ্জের অর্থ স্টোর-হাউস। সেই থেকে হাট-বাজার, জনবসতি। 'গেনিজা'ও এক ধরনের ভাঁড়ার। ইহুদিদের ধর্মস্থানের সঙ্গে থাকত একটি বিশেষ কক্ষ—'গেনিজা'। অমিতাভ উল্লেখ করেননি, কিন্তু কোথাও যেন পড়েছিলাম ভারতে জৈন মন্দিরের সঙ্গেও এই ধরনের একটি ভাঁড়ার থাকত। তাকে বলা হত 'ভাণ্ডার'। ভাণ্ডারে রাখা হত ধর্মীয় পুথি ইত্যাদি। গেনিজায় ধর্মপ্রাণ ইহুদিদের যাবতীয় কাগজপত্র। তৎকালে প্রায় সব লিখিত কাগজই শুরু হত ঈশ্বরের নাম দিয়ে। পাছে অপবিত্র হয়ে যায়, সে-কারণে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ধর্মপ্রাণ

ইহুদিরা যাবতীয় লিখিত কাগজপত্র জমা দিয়ে আসতেন গেনিজায়। সে কাগজ ধর্ম-সংক্রান্ত হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। সুতরাং সব কাগজই জমা পড়ত সেখানে। আজকের কায়রো শহরের উপান্তে একসময় ছিল রোমানদের একটি দুর্গ। সে জায়গাটারও নাম ছিল ব্যাবিলন। বলা যায় ছোট ব্যাবিলন। তার পুব দিকের দেওয়ালের কাছে ছিল কায়রোর তিনটি ইহুদি ভজনালয় বা সিনাগগ-এর একটি। এই ভজনালয়টি ছিল প্রধানত প্যালেস্টাইন থেকে আগত ইহুদিদের। বেন য়িজু যখন ম্যাঙ্গালোরে, অর্থাৎ খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের ভারতে, তার শ' খানেক বছর আগে এই ধর্মকেন্দ্রটি নতুন করে গড়া হয়েছিল। সেটা ১০২৫ সালের কথা। অমিতাভ অনুমান করেছেন বেন য়িজু সেই ইহুদি মন্দির স্বচক্ষে দেখেছেন। কারণ তার পরও প্রায় সাতশো বছর দাঁড়িয়ে ছিল বাড়িটি। সেটি ভেঙে ফেলা হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে, ১৮৯০ সালে। সুতরাং অমিতাভ ঘোষ সেখানে পুরনো মন্দির দেখতে পাননি। দেখলেন একই জমিতে, একই ভিতে নতুন এক সিনাগগ। তার সঙ্গেও 'গেনিজা' রয়েছে। কিন্তু সেটিও পুরনো নয়। বেন য়িজু যে বাহারি সিনাগগ দেখেছিলেন অমিতাভ জানালেন তার টুকরো টুকরো স্মৃতি এখনও রয়েছে কায়রোর জেরুজালেমে এবং প্যারিসের জাদুঘরে। স্মৃতি মানে কাচের জানলা, বাহারি কাঠের কাজ ইত্যাদি। পুরনো গেনিজায় কাগজ জমা পড়েছিল টানা আটশো বছর ধরে। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাগজ রাখা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তিনশো বছর পরে আবার জমা পড়তে থাকে। এ ধারা চলে উনিশ শতক অবধি। সেখানে যে-সব কাগজ পাওয়া গেছে তাতে সর্বশেষ তারিখ দেখা যায় ১৮৭৫ সাল। বোম্বাইয়ে বসে লেখা একটি বিবাহবিচ্ছেদের দলিল। বেন য়িজুকে লেখা মধ্য এশিয়ার আত্মীয় বন্ধুদের চিঠি এবং ম্যাঙ্গালোর থেকে লেখা বেন য়িজুর চিঠিপত্র ওই ভিড়েই খুঁজে পাওয়া। কিছু সম্পূর্ণ, কিছু ছেঁড়া— অসম্পূর্ণ। কিছু স্পষ্ট এবং পাঠযোগ্য, কিছু আবার পাঠোদ্ধারের বাইরে। উল্লেখ্য, এইসব ছিন্নপত্র ছড়িয়ে আছে বলতে গেলে ভুবনময়। ইজরায়েল, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, রোমানিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকায়। কোনও কোনও কাগজ যদি গ্রন্থাগারে, কিছু আবার ব্যক্তিগত সংগ্রহে।

অমিতাভ ঘোষের বিবরণ পড়তে পড়তে মনে হয় যেন কোনও গোয়েন্দা কাহিনী পড়ছি। ধোপার নম্বর ধরে গোয়েন্দারা যেভাবে খুনিকে খুঁজে বেড়ান, অনেকটা সেভাবেই তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন বেন য়িজু এবং তাঁর ভারতীয় ক্রীতদাসকে। কখনও যদি তিনি অক্সফোর্ডে, কখনও তিনি কেমব্রিজে, কখনও বা নিউইয়র্কে। এ-সব কাগজ কীভাবে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে সেও এক বিচিত্র কাহিনী। এই কাহিনীতে পশ্চিমি পণ্ডিতরা একই সঙ্গে যদি উদ্যমশীল অতীতসন্ধানী, তবে কখনও কখনও তাঁরা কার্যত লুঠেরার ভূমিকায়। হাজার বছর ধরে মিশর নিজের জমিতে ওই তথ্য ভাণ্ডার রক্ষা করলেও অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে শেষ কাগজের টুকরোটিও হাতছাড়া হয়ে যায় তার। কেননা, মিশর ইতিমধ্যে পরিণত এক দুর্বল রাষ্ট্রে। অস্ত্রশস্ত্রে এবং আধুনিক শিল্পে ততদিনে অনেক এগিয়ে গেছে ইউরোপ। ভারত মহাসাগরের পথে বাণিজ্যে আর অধিকার নেই মিশর কিংবা পশ্চিম এশিয়ার বণিকদের। পশ্চিমি নৌবহরের দৌরাত্ম্য সেখানে। ক্রমে মিশর সব-কিছু খুইয়ে সরাসরি ঔপনিবেশিক শক্তির পদানত। সুতরাং লুঠেরাদের কবলে। ওই বিশেষ 'গেনিজা'টি প্রথমে পশ্চিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি। ইউরোপে তখন ভারত-চর্চার মতো মিশর-চর্চা বেড়েই চলেছে। ফলে, ছলে বলে কৌশলে 'গেনিজা'র

কাগজ সংগ্রহের ধুম পড়ে যায়। যে যেমন পারেন নিজের অথবা নিজের দেশের দলিলের ভাণ্ডার বাড়িয়ে চলেন। এই শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে পৌঁছে দেখা গেল গেনিজায় আর-এক টুকরো কাগজও অবশিষ্ট নেই। এমনকী কাছাকাছি ইহুদি গোরস্থানের দলিল দস্তাবেজ পর্যন্ত পাচার হয়ে গেছে বিদেশে। অথচ এ দৌলত ছিল মিশরের নিজস্ব ইতিহাসেরই সম্পদ। অমিতাভ সখেদে বলছেন, প্যালেস্টাইন ভাগ হওয়ার অনেক আগেই ইহুদি-অতীত আলাদা হয়ে যায় মিশর থেকে। দেশবিভাগের আগে আত্মিক বিভাজন।

এবার বেন য়িজুর দিকে তাকানো যাক। এ-বইয়ে উপন্যাস বলতে যদি কিছু থাকে তবে সে উপন্যাসের নায়ক এই ইহুদি সওদাগর বেন য়িজু। তাঁর ক্রীতদাস বোম্মাইকে আমরা বলতে পারি সহনায়ক বা উপনায়ক। কেননা, দাস হয়েও তিনি তাঁর প্রভুর বিশ্বস্ত সহকারী এক বণিক যেন। বেন য়িজুর মধ্যপ্রাচ্যের সওদাগর বন্ধুদের কাছে বোম্মাই সম্মানের পাত্র। সবাই তাঁকে ভালবাসেন, সমীহ করেন, সম্মান করেন। উপন্যাস যখন নায়কের মতো, নায়িকাও আছেন বইকী। তার কথা পরে। আগে বেন য়িজুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার।

বেন য়িজুর আদি ভদ্রাসন আজকের টিউনিশিয়ার মাহদিয়া নামে একটি শহরে। ভূমধ্য সাগরের তীরে এই শহরের দ্বাদশ শতকের নাম ছিল ইফরিকিয়া। একাদশ শতকের শেষে অথবা দ্বাদশ শতকের প্রথমে এক সম্ভ্রান্ত ইহুদি পরিবারে জন্ম বেন য়িজু। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ইহুদি যাজক। সুসংস্কৃত পণ্ডিত ব্যক্তি। চিঠিপত্র থেকে জানা যায় বেন য়িজুর আরও দুই ভাই এবং এক বোন ছিলেন। বেন য়িজু নিজেও সুশিক্ষিত। তিনি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অবহিত জ্ঞানী ব্যক্তি। ব্যবসায়ী হলেও তাঁর মন ছিল কবিভাবাপন্ন। হাতের লেখাও ছিল অতি চমৎকার। বেন য়িজু টিউনিশিয়ার ইফরিকিয়া থেকে প্রথমে পাড়ি জমান মিশরে, কায়রোর কাছাকাছি ছোট ব্যাবিলনের গায়ে ফুসতাত বলে একটি জায়গায়, যেখানে এখনও নব কলেবরে দাঁড়িয়ে সেই সিনাগগ এবং 'গেনিজা'। সেখান থেকে তিনি চলে আসেন এডেনে। তার পর আরব বণিকদের চিরচেনা জলপথ ধরে ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার এলাকায়। মালাবার নামটিও নাকি, অমিতাভ জানাচ্ছেন, আরবদের দেওয়া। বেন য়িজু মালাবারে এসেছিলেন কি শুধুই ব্যবসায়ের স্বার্থে? এখানে চিঠির সূত্র ধরেই অমিতাভ প্রশ্ন তুলেছেন, তিনি কি পাওনাদারদের ফাঁকি দিতে ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন, নাকি খুনের মতো কোনও গুরুতর অপরাধ করে? কারণ যাই হোক, বেন য়িজু ১১২০ সালে বা তার আগে যে এডেনে পৌঁছেছিলেন, চিঠিতে তার ইঙ্গিত মেলে। আর তার কাছাকাছি সময় থেকে তিনি যে ম্যাঙ্গালোরের বাসিন্দা তা নিয়েও তর্ক নেই। সাধারণত আরব ব্যবসায়ীরা মধ্যযুগে আসা-যাওয়া করতেন। বেন য়িজু কিন্তু সেই সওদাগর দলে পড়েন না। প্রায় দুই দশক ধরে ম্যাঙ্গালোর ছিল তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। আসা-যাওয়ার দায়িত্ব ছিল একদা ক্রীতদাস পরবর্তীকালের সহকারী ও প্রতিনিধিবিশেষ বোম্মাইয়ের ওপর। সে-কারণেই তাঁর ম্যাঙ্গালোরবাসের পেছনে গূঢ় কার্যকারণ সন্ধানের কথা ওঠে। নয়তো বেন য়িজু স্বাভাবিক একজন বণিক মাত্র। এডেনে তাঁর ব্যবসায়ে একজন শরিক ছিলেন। এ ছাড়া আরও দু'জন বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসায়িক ও আত্মিক সম্পর্ক ছিল তাঁর। সুতরাং তাঁর ভারতবাসকে পুরোপুরি অজ্ঞাতবাস বলার উপায় নেই। বেন য়িজু ভারত ত্যাগের কথা ভাবতে শুরু করেন ১১৪০ সালের মাঝামাঝি। ১১৪৯ সালে আমরা দেখি তিনি ফিরে গিয়েছেন এডেনে। সঙ্গে তাঁর এক পুত্র, এক কন্যা। তা ছাড়া সেই

বোম্মাই। বোম্মাই ইতিমধ্যে 'শেখ' এই সাম্মানিক পরিচয় লাভ করেছেন।

পুত্র এবং কন্যার পিতা। বুঝতে অসুবিধা নেই পরদেশি সওদাগর বেন য়িজু ভারতে সংসারও পেতেছিলেন। হিন্দি চলচ্চিত্রে এ-ধরনের কাহিনীকেই বোধহয় বলে— এক মুসাফির আউর এক হাসিনা। পরদেশি বণিক বেন য়িজুর সুন্দরী ঘরনীর নাম ছিল আসু। 'সুন্দরী', লেখক বা এই পাঠকের নিজস্ব কল্পনা নয়, অমিতাভ ঘোষের আগে নায়ার-কন্যা আসুকে 'সুন্দরী' কল্পনা করতে চেয়েছেন পূর্বসূরি এক গবেষক। সমকালের এবং পরবর্তীকালের অনেক বিদেশি পর্যটকই বলে গেছেন হিন্দুস্থানের নগরে বন্দরে সুন্দরীর হাট। বেন য়িজু কি আসুকে সেই হাট থেকে ঘরে তুলে এনেছিলেন? আমরা জানি না। মালাবারে তখন অনেক ইহুদিরও বাস ছিল। কিন্তু আসু তাঁদের কেউ নন। তিনি নায়ার-দুহিতা। তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল বেন য়িজুর। বেন য়িজু যখন আবার মধ্যপ্রাচ্যে ফিরে যান আসু তখন কোথায়? তিনি জীবিত না মৃত আমরা জানি না। এটা জানি অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় অভিযাত্রীরাও এ দেশের 'বিবি'দের জন্য কিছু বন্দোবস্ত করে ছেলেমেয়ে নিয়ে দেশে ফিরে যেতেন। বেন য়িজুর কালে হয়তো সেটাই ছিল অনেকের ক্ষেত্রে রীতি। সুতরাং মালাবার-কন্যা বিচ্ছেদ-কাতর আসু যদি মালাবারেই পড়ে থাকেন লেখকের কিছু করণীয় নেই।

এডেনে ফেরার পরও বেন য়িজুর জীবনে নানান সমস্যা। বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়। অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে ঘরে ফিরেছিলেন তিনি। অনেক জিনিসপত্র। নিজের ভাই-বন্ধুদের নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর সংসার করবেন এই ছিল তাঁর বাসনা। কিন্তু সহজে তা হওয়ার নয়। এক ভাই তাঁর বিস্তর টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করে, ছেলে অকালে মারা যায়। মেয়েকে এডেনের এক বন্ধুর বাড়িতে রেখে তিনি নিজে চলে যান ইয়েমেনের এক পাহাড়ি অঞ্চলে। তাঁর একমাত্র চিন্তা মেয়েকে সৎপাত্রে বিয়ে দেওয়া। সৎপাত্র বলতে আপনজন। অর্থাৎ সম্ভব হলে কোনও ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে। কিন্তু বন্ধু খালাফ যাঁর বাড়িতে মেয়েটি ছিল তিনি প্রস্তাব দিলেন তাঁর পুত্রের সঙ্গে আসুর মেয়ের বিয়ের। বেন য়িজু তাতে রাজি নন, ফলে সম্ভবত বন্ধুবিচ্ছেদ। এক ভাই ইউসুফ তখন সিসিলিতে। তার ছেলে সুরুর, বেন য়িজুর বিবেচনায় সৎপাত্র। সিসিলি থেকে সে-ছেলে রওনা হল মিশর। শেষ পর্যন্ত আসুর কন্যা সিত-আল-দান-এর সঙ্গে বেন য়িজুর এক ভাই ইউসুফের পুত্র সুরুর-এর বিয়ে হল মিশরের মাটিতে। সেটা ১১৫৬ সালের কথা। বিয়ে হয়েছিল কায়রোর উপান্তে সেই সিনাগগ-এ যার কাগজপত্রের ভিড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল মধ্যযুগের এক সওদাগরের উপাখ্যান। ওদের বিয়ের দলিল এখন রয়েছে সেন্ট পিটার্সবার্গে। এটি শেষ কাগজের টুকরো। তার পর থেকে বেন য়িজু, আসু, বোম্মাই কারও আর কোনও খবর নেই। কিন্তু রয়েছে ওদের পৃথিবীর অনেক খবর। হ্যাঁ, এখনও।

বলা যায় গবেষণারই আর-এক দিক। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে মোটরে ঘণ্টা দুয়েকের পথ। গ্রামের নাম লাতাইফা। আবু আলির বাড়িতে দোতলায় হাঁস-মুরগির ঘরের পাশে আস্তানা গেড়েছেন অমিতাভ ঘোষ। নীচে আবু আলির মুদির দোকান। তাঁর হাঁকডাক, মাঝে মাঝে মোপেডে চড়ে বিশালদেহী আবু আলির কাছাকাছি বড় শহর দামানআওয়ার (Damanhaur) যাত্রা। অনেক দৃশ্য, অনেক ঘটনা। বেন য়িজু যাত্রা করেছিলেন ভারতের দিকে। বলতে গেলে আটশো বছর পরে এক নবীন ভারতীয় পরিব্রাজক হয়েছেন মিশরে।

তিনি বেন য়িজু এবং বোম্মাইয়ের পৃথিবীকে খুঁজে পেতে চান। অনেকটাই শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন তিনি। আবু আলি, শেখ মুসা, ইমাম ইব্রাহিম, ওস্তাদ সাব্রি, ওস্তাদ মুস্তাফা, তাঁতি জগগুল, স্বাধীনচেতা বসনিয়া এবং আরও অনেককেই। বর্ণাঢ্য বিচিত্র এক পৃথিবী। একই সঙ্গে মধ্য যুগ এবং বর্তমান দুনিয়া। লাতাইফার পর নাশাউয়ি। আরও একটি গ্রামে কিছুদিন। আরও কিছু মানুষ।

সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষ। তাঁরা এখনও অনেকেই ভারত সম্বন্ধে অজ্ঞ। ওস্তাদ মুস্তাফার মতো আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মানুষ কিছু খবর রাখেন বটে, কিন্তু সব খবর নয়। হিন্দু বা হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তিনি শুনেছেন বটে, কিন্তু ভেবে পান না, যাঁরা খ্রিস্টান নয়, ইহুদি নয়, মুসলমানও নয়, তবে তারা কী হতে পারে? অগ্নি উপাসক কি? হিন্দুদের ঈশ্বর কে, অমিতাভ নিজেও তার উত্তর খুঁজে পান না। স্বভাবতই গোরু পুজোর প্রসঙ্গ ওঠে এবং একসময় শবদাহ করার প্রসঙ্গও। সাত বছর পর আবার একই গ্রামে ফিরে যান অমিতাভ। কিছু কিছু ব্যাপারে পরিবর্তন ঘটেছে সেখানে। কিন্তু সব ব্যাপারে নয়। সেটা ১৯৮৮ সালের কথা। ইরাক-ইরানের যুদ্ধ চলছে দু'বছর ধরে। ইরাকে শ্রমিকের অভাব। কুড়ি থেকে তিরিশ লক্ষ মিশরি শ্রমিক কাজ করছেন সেখানে। বলতে গেলে দেশের ছ' ভাগের একভাগ মানুষই তখন প্রবাসী। সে-দলে ওইসব গ্রামের ছেলেরাও আছেন। সুতরাং গ্রামে 'বাইরের' পয়সা আসছে। অমিতাভ যখন প্রথম লাতাইফা যান, তখন গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না, সাড়ম্বরে যে মেশিনটি শহর থেকে গ্রামে কিনে আনা হয়েছিল সেটি জলের পাম্প। ওরা বলে 'আল-মাকানা-আল হিন্দি'। অর্থাৎ ভারতীয় মেশিন। ওই পাম্প ভারতে তৈরি কিনা তাই। সুতরাং কেমন মেশিন যাচাই করার জন্য ওঁরা টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন 'ডক্টর-আল হিন্দি', অমিতাভকে। কথা ছিল শহরে পরের মেশিনটি কেনার সময় যাচাই করার জন্য তাঁকেই নিয়ে যাওয়া হবে সঙ্গে করে। কেননা, মেশিনটি ভারতীয় এবং 'ডক্টর-আল-হিন্দি'ও ভারতীয়। দ্বিতীয় দফায় গিয়ে দেখেন গাঁয়ে বিদ্যুৎ এসেছে। ঘরে ঘরে রেফ্রিজারেটর। সগর্বে বরফ দেওয়া জল খাওয়ালেন ওঁরা ডক্টর-আল-হিন্দিকে। ইরাকি অর্থে স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে ওই অঞ্চলে। আবু আলি মোপেডের বদলে টয়োটা ভ্যান কিনেছেন। এবং কারও কারও বাড়িতে দোতলা উঠছে। তৃতীয় দফায় আরও একবার একই এলাকায়। ঐশ্বর্য আরও বেড়েছে। ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে। কেউ কেউ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও যাচ্ছে। কিন্তু ধর্মান্ধতা তখনও কাটেনি। আবার হিন্দুত্ব, সুন্নৎ করা না করা, মেয়েদেরও অস্ত্রোপচার না করে কেন অপবিত্র রাখা, এ-সব নিয়ে প্রশ্ন। নাসাওয়েতে ইমাম ইব্রাহিম প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করেন ওঁকে। তর্ক একসময় তপ্ত হয়ে ওঠে। ইব্রাহিম বলেন, পশ্চিমে কি কেউ মড়া পোড়ায়? অমিতাভ উত্তর দেন, হ্যাঁ, সেখানেও রয়েছে একই উদ্দেশ্যে বৈদ্যুতিক চুল্লি। ইমাম চিৎকার করে ওঠেন, মিথ্যে কথা, হতেই পারে না। পশ্চিমের লোকেরা অজ্ঞ নন, তাঁরা শিক্ষিত। তাঁদের কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক আছে। উত্তেজিত অমিতাভ উত্তর দেন, আমাদেরও এ-সব আছে। আমাদের যা আছে মিশরের তা নেই। ক্রুদ্ধ ইমামের জবাব— পশ্চিমের তৈরি বন্দুক-বোমার পরেই, আমাদের বন্দুক-বোমা। অমিতাভ বলেন, বাজে কথা। আপনি এ-সব ব্যাপারে কিছুই জানেন না। জানেন আমাদের দেশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে? মিশর একশো বছরেও তা পারবে না।

অনেক ঘটনা, অনেক চরিত্র, অনেক অভিজ্ঞতা। আজকের মিশরে কি সত্যিই খুঁজে পাওয়া সম্ভব বেন য়িজু, কিংবা বোম্মাইকে?

ম্যাঙ্গালোরেও অভিজ্ঞতা কম নয়। এই মালাবার উপকূলেই কাপ্পা কারাভু নামে একটি বিন্দুতে ১৪৯৮ সালের ১৭ মে নোঙর করেছিলেন ভাস্কো ডা গামা। বেন য়িজু ম্যাঙ্গালোর ছেড়ে যাবার সাড়ে তিনশো বছর পরের ঘটনা সেটা। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সমুদ্র-বাণিজ্যে প্রথম বলপ্রয়োগের উদ্‌যোগ। এর আগে কখনও কেউ যা করেননি, পশ্চিমিরা তাই করতে চাইল। পর্তুগিজরা ভারত মহাসাগরকে পরিণত করতে চাইল নিজেদের সম্পত্তিতে। কালিকটের সমুদ্ররাজের কাছে পর্তুগিজদের দাবি ছিল মুসলমান বণিকদের হটাতে হবে। রাজা এ-প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত কালিকটের হিন্দু রাজা, গুজরাতের মুসলিম শাসক এবং মিশরের সুলতান একযোগে পশ্চিমি বন্দুকবাজদের প্রতিহত করতে নৌ-বহর ভাসিয়েছিলেন দরিয়ায়। কিন্তু গুজরাতের দিউ-এর কাছে পর্তুগিজরা সে প্রতিরোধকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। শুরু হয় ভারতীয় বাণিজ্যে নতুন পর্ব। আজকের ম্যাঙ্গালোরে অতএব বেন য়িজু বা আসু কিংবা বোম্মাইকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যে-জেলেপল্লীর মানুষ বলে অনুমান করা যায় ওঁদের, সেখানেও এখন সচ্ছলতার পরিবেশ। উপসাগরীয় এলাকা থেকে অর্থ রোজগার করে আনছেন ওই এলাকার মানুষ। ইরাক-ইরান থেকে মিশরের গাঁয়ের মানুষ যদি পয়সা নিয়ে ঘরে ফেরেন তবে মালাবারের মানুষও মধ্য এশিয়া থেকে বিস্তর অর্থ রোজগার করছেন একালে। তবে বাণিজ্যে যত না, বুঝিবা তার চেয়ে বেশি শ্রমের বিনিময়ে।

আটশো বছরের ব্যবধানে দুই এলাকার মধ্যে ঐক্য কিন্তু শুধু সেখানেই নয়। পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হবে আরও কিছু কিছু ব্যাপার বিষয় বোধহয় সমান্তরাল চলেছে। এডেন আর ম্যাঙ্গালোরের মধ্যে দ্বাদশ শতকে বাণিজ্য চলত কী নিয়ে, এইসব টুকরো টুকরো চিঠিতে তার আভাস মেলে। সওদাগরি পণ্য ভারত থেকে যা রপ্তানি হত তার মধ্যে অবশ্যই প্রথম এবং প্রধান ছিল মশলা। তা ছাড়া লোহার জিনিসপত্র এবং ধাতুর ঢালাই করা অন্যান্য পণ্য। প্রথমেই এডেন থেকে লেখা যে-চিঠিটির উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে এডেনের বন্ধু জানাচ্ছেন বেন য়িজুর পাঠানো সুপারি, তালা এবং পেতলের তৈরি পাত্র পৌঁছেছে। ম্যাঙ্গালোরে বন্ধুকে পাঠাচ্ছেন তিনি ব্যক্তিগত উপহার হিসাবে কিছু 'মুল্যহীন' জিনিস; একপাত্র বাদাম, একপাত্র কিশমিশ ইত্যাদি। দ্বিতীয় চিঠিতে দেখি গোলমরিচ এডেনে পৌঁছয়নি। জাহাজডুবির ফলে লোহা লক্কড় বাঁচলেও গোলমরিচ তলিয়ে গেছে। দারুচিনি পৌঁছেছে। এডেন থেকে পাঠানো হচ্ছে রেশমি কাপড়। আর-একটা চিঠিতে জানা যায়, সেখান থেকে বেন য়িজুকে পাঠানো হয়েছে আফ্রিকায় তৈরি মাদুর, চামড়ার টেবিল ক্লথ, লোহার রান্না করার পাত্র, চালুনি, সাবান, মিশরীয় আলখাল্লা ইত্যাদি। মধ্য এশিয়া থেকে আমদানি জিনিসের মধ্যে দুটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক, সাবান; দ্বিতীয়, কাগজ। আরবরাই নাকি প্রথম চর্বির বদলে জলপাই তেল দিয়ে সাবান তৈরি করেন। সাবানকে সুগন্ধী করতেও জানতেন তাঁরা। আর, আমাদের দেশে যখন লেখালেখি চলছে তালপাতায়, তখন সেই দ্বাদশ শতকে মিশরে ব্যাপকভাবে তৈরি হচ্ছে উচ্চমানের কাগজ। আয়ু থেকে বোঝা যায় সে কাগজ কোন দরের ছিল। বেন য়িজু এডেন থেকে আখের চিনিও পেতেন মাঝে মাঝে। অমিতাভ বলছেন শর্করা সংস্কৃত শব্দ। আরবি সুক্কর শব্দটি তা থেকেই

এসেছে। আখের চিনির কথা বেদেও রয়েছে। তবে এমন হতে পারে মালাবারে ছিল তালের গুড়। আখের গুড় বা চিনির চল হয়তো ওই অঞ্চলে ছিল না। কিন্তু মিশর থেকে যে চিনি আসত তার প্রমাণ ভারতীয় শব্দ মিছরি। মিশরের বস্তু বলেই মিছরি। এখন কি শুধুই 'আল-মাকানা আল হিন্দি'? শুধুই ভারতে তৈরি ডিজেল ইঞ্জিন? মিশরের ওই গ্রামে ওস্তাদ সাব্রির মতো ওয়াকিবহাল মানুষ পেয়েছেন অমিতাভ, এমন মানুষ যিনি গান্ধী-জগলুল পাশা, নেহরু-নাসের থেকে শুরু করে সুয়েজ যুদ্ধে ভারতের ভূমিকার কথা জানেন। এমন মানুষকেও পেয়েছেন যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজের পাশাপাশি ভারতীয় ফৌজ দেখেছেন, বিশালদেহী যে-সৈনিকদের কাছে একটি সিগারেট চাইলে আস্ত একটি প্যাকেট দিয়ে দেয়। নয়তো, সাধারণ মানুষের অপরিমেয় ভালবাসা, ঔদার্য, আন্তরিকতা আর সীমাহীন অজ্ঞতাজনিত অবিশ্রান্ত প্রশ্নবাণের বাইরে ডক্টর-আল হিন্দি ভারতীয় পণ্য বলতে স্বচক্ষে দেখেছেন এই একখানা মাত্র ডিজেল ইঞ্জিন। যাকে ওঁরা বলেন 'আল-মাকানা আল হিন্দি'। বলাই বাহুল্য, অমিতাভ আজকের ভারত এবং মিশরের মধ্যে বাণিজ্যের ফিরিস্তি লিখতে বসেননি। তিনি লিখছেন মিশরের বিশেষ গ্রামে তাঁর নিজের চোখে দেখা সাধারণ মানুষের জীবন এবং সমাজের কথা। তাদের ভাষা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধর্ম সবই ঠাঁই পেয়েছে তাঁর সেই খতিয়ানে। তারই মধ্যে ঠাঁই করে নিয়েছে একটি ভারতীয় যন্ত্রও।

তার পর মালাবার উপকূলে ম্যাঙ্গালোরে। ১৯৯০-এর গ্রীষ্মকালে আমরা দেখি অমিতাভ ঘোষ ম্যাঙ্গালোরে একটি কফির দোকানে বসে আছেন। তিনি স্থানীয় একজন গবেষকের জন্য অপেক্ষা করছেন। প্রথমেই তিনি জানতে চান, 'বোম্মা' না 'বামা' না 'বাম্মা'? জানতে চান শব্দটির আদি কি ব্রহ্মা? আলোচনায় প্রকাশ পেল সেই দাসের নাম আসলে 'বম্মা'। ম্যাঙ্গালোরে ওই অঞ্চলের একসময় নাম ছিল তুলুনাড়। তুলুভাষীদের রাজ্য। বেন য়িজু যখন সেখানে তার কিছুকাল আগের একটি প্রত্নলিপিতে জনৈক মাসালিয়া বাম্মার উল্লেখ আছে। ওই লিপির কাল ১১২৬ সাল। কাছাকাছি সময়ে একই এলাকায় আরও একটি লিপিতে পাওয়া গেছে আরেকজন 'বম্মা'কে। হিন্দুদের ব্রহ্মার সঙ্গে কোনও যোগ নেই এঁদের। বরং খুঁজতে খুঁজতে ভূত-বিশ্বাসের সঙ্গে এক ধরনের সম্পর্ক নির্ণীত হতে পারে। তুলুনাড়ে ভূত পুজোর রেওয়াজ এখনও রয়েছে। ম্যাঙ্গালোর এলাকায়ও রয়েছে অনেক ভূত মন্দির। ভূত-বিশ্বাস লৌকিক স্তরে এখনও বেঁচে আছে। মিশরের গ্রামেও কিন্তু তাই। ওস্তাদ সাব্রির শত চেষ্টা সত্ত্বেও লৌকিক মন থেকে অশরীরী আত্মা এখনও বিদায় নেয়নি। তারা এখনও মানুষের ভালমন্দ ঘটাবার সামর্থ্য রাখে। ম্যাঙ্গালোরেও তা-ই। একটি মন্দির দেখিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার বলছিল নতুন সড়ক করার সময় এ মন্দির ভেঙে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। বুলডোজার থমকে যায়। অমিতাভ নিজেও কি মিশরের গ্রামে এ-ধরনের একটি কাহিনী শোনেননি? সেখানেও উপলক্ষ ছিল বহিরাগত এক সাধকের কবর। সুফি সাধক। ম্যাঙ্গালোরেও সুফিবাদ অজানা নয়। সেকালে মরমিয়া বাচনকর সাধকদের প্রভাব রয়েছে সুফি সাধকদের প্রতি অনুরাগের। ম্যাঙ্গালোরে তাঁর একটি বিশেষ আবিষ্কার মগবির বা মগেরা নামক জেলেসমাজে বব্বেরিয়া ভূত নামে এক সন্তের প্রতি বিশেষ অনুরাগ। কে এই বব্বেরিয়া ভূত? তিনি মধ্যযুগের কোনও এক আরব নাবিক, সওদাগর। মালাবারের বিশেষ সম্প্রদায়ের জেলেদের কাছে উপাস্য। একটি ভূতমন্দিরে অমিতাভ দেখলেন বহিরঙ্গের মতোই গর্ভগৃহের সংস্কৃতায়ন প্রায় সম্পূর্ণ। বেদিতে অধিষ্ঠিত হিন্দু দেবলোকের

ত্রয়ীর এক, বিষ্ণু। অথচ কী আশ্চর্য বেদির নীচেই এখনও রয়েছে বব্বোরিয়া ভূতের প্রতীক, অনতিউচ্চ একটি স্তম্ভ ও দণ্ড। হারানো পৃথিবী পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি এখনও। শুধু ভারতে কেন মিশরেও। মিশরের গ্রাম থেকে শেষ বারের মতো চলে আসার সময় কায়রোর পথে দামনআওয়ার-এ নেমেছিলেন অমিতাভ ঘোষ একটি ধর্মীয় পীঠস্থান দেখতে। সিদি-আবু-হাসিরা নামে এক সাধকের সমাধি ঘিরে প্রতি বছর সেখানে উৎসব হয় এখনও। দেশ-বিদেশের ভক্তরা সমবেত হন তাঁকে ভক্তি নিবেদন করতে। বব্বোরিয়ার মতোই তিনি এক পরদেশি সাধক। বব্বোরিয়ার মতোই অলৌকিক ক্রিয়ার অধিকারী তিনি। আদিতে সিদি-আবু-হাসিরা ছিলেন ইহুদি। তবে তাঁকে মুসলমানেরা একজন মুসলিম সাধক বলেই মনে করেন। আসলে হাসিরা একজন সুফি সাধক। তাঁর মধ্যে অতএব ইহুদি বা মুসলমান কারও যোগ দিতে অসুবিধে নেই। ম্যাঙ্গালোরে পরদেশি নাবিক কি এখনও পুজো পাচ্ছেন না ভক্তদের? এমনও তো হতে পারে এই সিদি-আবু-হাসিরা নামে পীর, তিনি আমাদের সেই বোম্মাই! ভাবতে দোষ নেই।

লৌকিক স্তরে যেমন ইতিহাসের ঘটনাবলিতেও তেমনি অমিতাভ ঘোষের এই বইতে কাহিনী যেন সমান্তরাল চলেছে। মধ্যযুগে ওই এলাকায় তুমুল অশান্তি। বেন য়িজু যখন ভারতে পাড়ি জমাচ্ছেন তখন ইউরোপের নানা রাষ্ট্র ধর্মযুদ্ধের নামে মিলিত বাহিনী নিয়ে মধ্য এশিয়ায় হাজির। ওই বাহিনী যখন সিরিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন কোনও কোনও আরব রাষ্ট্র মনে মনে খুশি হয়েছিল। কেননা, সিরিয়ার বিরুদ্ধে নানা কারণে তাদের ক্ষোভ ছিল। বেন য়িজু যখন এডেনে ফিরে যাচ্ছেন তখনও সেখানে লড়াই চলেছে। এক দেশের মানুষ পালাতে বাধ্য হচ্ছে অন্য দেশে। তার পর প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। অমিতাভ ঘোষ দ্বিতীয়বার যখন মিশরের গ্রামে হাজির হয়েছেন, তখন ইরাক-ইরানের যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধশেষে অসংখ্য মিশর-সন্তান বেকার হয়ে ঘরে ফিরছে। যেন মধ্যযুগেরই দৃশ্যচিত্র। অমিতাভ শেষবার যখন সেই গ্রামে, তখন ইরাক কুয়েত আক্রমণ করেছে। ইরাককে উপযুক্ত সাজা দেওয়ার জন্য আধুনিক রণসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে পশ্চিমি শক্তিগুলো। আবার কি সেই ক্রুসেড? অন্যভাবে একই ধর্মীয় যুদ্ধ? অমিতাভ ঘোষ এই প্রশ্ন তোলেননি। সদ্দাম হোসেন তুলেছিলেন বইকী! অনেক আরবও মনে মনে ক্রুসেডের দীর্ঘ ইতিহাস স্মরণ করেছিলেন। আমরা আর প্রতীক খুঁজব না। কেননা, অমিতাভ ঘোষ আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন প্রতীক নিয়ে বাড়াবাড়ি ভয়াবহ হতে পারে। আগের বইগুলোতে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বই 'দ্য শ্যাডো লাইনস'-এ অমিতাভ ঘোষ নিজেকে ঢাকার নিপুণ তাঁতশিল্পীদের মতো দক্ষ কারুশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জামদানির মতোই বুনট আর নকশা দেখেছি আমরা সেই উপন্যাসে। এখানেও আবার একই রূপদক্ষ শিল্পীর মুখোমুখি। ইতিহাসের দলিল আর চোখে দেখার প্রতিবেদন আগাগোড়া যেভাবে তিনি বুনে গেছেন তা সত্যিই দেখবার মতো। সেই নকশায় হঠাৎ একসময় উঁকি দেয় এক কালের তাঁর পরিবারের ঠিকানা, ঢাকা শহর। দেশবিভাগের পর ঢাকা। ইতিহাসের ঘোরপ্যাঁচ, ভাগ্যের এমনই পরিহাস সেই ঢাকা শহরেই নিতান্ত নাবালক অমিতাভর বাবা একসময় একজন পরদেশি বাসিন্দা। তিনি ভারতীয় দূতাবাসের দ্বিতীয় ব্যক্তি। হঠাৎ দাঙ্গার ঢাকা। উত্তেজনা, আগুন, হত্যা। অমিতাভ তখন ছয় বছরের শিশু। তাঁর চোখের সামনে ভূতের নৃত্য। মিশরের গ্রামে তাঁকে ঘিরে যখন ঢিলের মতো ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে এক-একটি

প্রশ্ন, তখন হঠাৎ শৈশবে দেখা দাঙ্গা-কবলিত ঢাকার কথা—কেন তোমরা মরা মানুষকে পোড়াও? কেন তোমরা ত্বকচ্ছেদ কর না? কেন তোমরা মেয়েদের অস্ত্রোপচার করে শুদ্ধ করে নাও না? (অমিতাভ জানাচ্ছেন ৫২ সালের বিপ্লবের পর মিশরে এই অস্ত্রোপচার আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু খ্রিস্টান ও ইসলামদের মধ্যে বহুল প্রচলিত) কেন তুমি— অমিতাভ তখনকার মতো ওঁদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। আর তখন তাঁর মনে পড়ছিল ঢাকার সেই ভয়ানক স্মৃতি। তিনি লিখছেন, ঢাকায় যা ঘটে পরে বড় হয়ে কাগজপত্র থেকে জেনেছি কলকাতায়ও তা ঘটেছে। যেন আয়নায় প্রতিচ্ছবি। কলকাতায় যেমন, ঢাকায়ও তেমনি হিন্দুকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন মুসলমানেরা। কলকাতায় যেমন বিপন্ন মুসলমানকে হিন্দুরা কখনও কখনও বাঁচিয়েছেন তেমনি বিপন্ন হিন্দুকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন মুসলমানরা। ফলে দাঙ্গায় যত মানুষ মারা যান, বেঁচে যান তার চেয়ে বেশি। প্রতীক কতখানি বিস্ফোরক হতে পারে, তা এই দাঙ্গাকে কেন্দ্র করেই জানা হয়ে গেছে তাঁর। দাঙ্গার কারণ— কোনও মন্দিরে মৃত গোরু পড়েছিল, কিংবা কোনও মসজিদে পড়েছিল কাটা শুয়োর। একজন মানুষ মরে গেলেন অন্যদের হাতে কারণ, তাঁর পরনে ছিল হয়তো লুঙি, কিংবা ধুতি। মেয়েরা খুন হচ্ছেন কেউ কপালের সিঁদুরের জন্য, কেউ বোরখার জন্য। পুরুষেরা মারা পড়েন কার ত্বকচ্ছেদ করা হয়েছিল, কার নয় সে-কারণে। তা-ই দেখে অমিতাভ অতএব প্রতীক নিয়ে বেশিদূর যেতে রাজি হননি সেদিন মিশরের ওই সহজ সরল বিশ্বাসীদের গ্রামে। কিন্তু তাঁর এই অসাধারণ বই আমাদের অবলীলায় নিয়ে গেল আটশো বছর আগেকার এমন এক পৃথিবীতে যা হারিয়ে গিয়েও এখনও আমাদের চোখের সামনে। মিশরের গ্রামে, মালাবার উপকূলে ম্যাঙ্গালোরের শহরতলিতে নারকেল গাছের ছায়ায় এখনও যেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন খালাক ইবন ইসাক, মাদ্‌সুন ইবন আল-হাসান ইবন বন্দর, বেন য়িজু, বম্মা আর আসু। ম্যাঙ্গালোরে যে মেয়েটি তাঁর ছেলের সঙ্গে ফিস ফিস করে পরামর্শ সেরে ঘরে গিয়ে সচিত্র সেই ছোট্ট ইতিহাসটি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন সন্ধানীদের কাছে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল এই মেয়েটিই বুঝিবা ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যাওয়া মালাবার-দুহিতা আমাদের সেই— আসু।

অমিতাভ ঘোষ, 'ইন অ্যান অ্যান্টিক ল্যান্ড', রবি দয়াল, নিউ দিল্লি
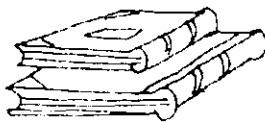
বিদেশিনীর বাঁকা চোখে

দু'জনের নামই বস্কে। অথবা বেটসি। বেটসি এক নম্বর, বেটসি দু'নম্বর। মা আর মেয়ে। দিঙ্‌বসনা হাঙ্গেরিয়ান এই দুই শিল্পী টাটা বিল্ডিংকে ঘিরে এক স্বর্গোদ্যান গড়ে তুলেছেন। চর্মসার এই দুই নারী বীরভূমের কঠিন মৃত্তিকায় টমাটো চারা রোপণ করে তাতে ফল ফলাবার চেষ্টা করেন। তাঁরা কাঁচা সবজি খান, রান্নাবান্নার ধার ধারেন না। শান্তিনিকেতনে বলতে গেলে তাঁরা পুরোপুরি টমাটো-ভুক। বেটসিরা যখন ঘরে, তখন তাঁরা নিজেদের আড়াল করবার জন্য দরজায় লম্বালম্বি মাদুর ঝুলিয়ে পর্দা তৈরি করার চেষ্টায় মাতেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দূরবিনে ওঁদের কাণ্ডকারখানা দেখেন। ওঁরা যেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ জাপান যাত্রা করেন দিনুবাবু তখন বৃথাই দূরবিনের কাচে ওঁদের খোঁজেন। বেচারা দিনুবাবু, বেটসিরা তাঁর এই সামান্য আনন্দটুকু কেড়ে নিয়ে গেল।...

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু যখন শুনলেন আমরা হাঙ্গেরিয়ান, তখন তিনি সগর্বে জানালেন তিনি বুদাপেস্ট গিয়েছেন এবং সেখানে অনেক সৌন্দর্যই উপভোগ করেছেন। কথোপকথন চলছিল দার্জিলিঙের এক জমাটি আসরে। ইউরোপিয়ান এবং বিশিষ্ট ভারতীয়দের মিলিত আড্ডা। খানা-পিনা, নাচ-গান। কথাচ্ছলে জগদীশচন্দ্র সাফ জানিয়ে দিলেন তিনি বুদাপেস্টে ঐতিহাসিক ঘরবাড়ি বা বিশেষ অন্য দ্রষ্টব্য কিছু দেখেননি, দেখেছেন শহরের নিষিদ্ধ এলাকায় সুন্দরী রমণীদের। জগদীশচন্দ্রের ভাষায়—তারা ছিল বর্ণাঢ্য অর্কিড আর ডালিয়ার মতো! এখানেই শেষ নয়, এই আসরেই একসময় ভারীদেহী জগদীশচন্দ্র নাচতে শুরু করেন বিপুলা এক শ্বেতাঙ্গিনীর কোমর ধরে। নাচ মানে, নাচার চেষ্টা। কখনও তিনি মহিলার পা মাড়িয়ে দিচ্ছেন, কখনও নিজের।...

এমনই সব টুকরো খবর। কখনও স্মিতহাস্যসহ, কখনও ঈষৎ তির্যক মন্তব্য সহযোগে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বাদ পড়েননি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বেঠোফেনের সংগীত আমি শুনেছি। বলতে পারছি না, আমি তা উপভোগ করেছি। মনে হচ্ছিল তিনি পাখির গান অনুকরণ করার চেষ্টা করছিলেন।— আর ইউরোপীয় চিত্রকলা? ভদ্রমহিলার বিনত জিজ্ঞাসা, গুরুদেব

নিজেই যখন ছবি আঁকেন, তখন ইউরোপে নিশ্চয়ই রাফেলের আঁকা ছবি দেখেছেন। হ্যাঁ দেখেছি বটে, ফ্লোরেন্সে, রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন।— তবে সে-সব ছবিকে আমার শিল্প বলে মনে হয়নি। মনে হচ্ছিল রঙিন ফোটোগ্রাফ।...

আরও আছে।

তাঁর সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণীদের রচনা নিয়ে 'অ্যা গোল্ডেন বুক অফ টেগোর' নামে এক সংকলন প্রকাশের উদ্‌যোগ চলছে শুনে কবির মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই শুভ সংবাদটি শুনেছিলেন তিনি সুরুলে ডক্টর টিম্বার্সের হাসপাতালে। শোনামাত্র তাঁর বয়স যেন হঠাৎ কমে গেল। হাতের লাঠি ফেলে রেখেই তিনি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে বসেন।

প্রাণচঞ্চল জার্মান তরুণী গার্ট্রুড রুডিগার-এর সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাৎকারটি কি এভাবে পরিবেশন করার কোনও অর্থ হয়? দৃশ্যটা অনেকটা এরকম: গার্ট্রুড তাঁর মাথা ঈষৎ নত করে কবির দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। কবি উষ্ণতার সঙ্গে সে হাত নিজের হাতে তুলে নেন। বেশ-কিছুক্ষণ জার্মান তরুণীর শ্বেতবর্ণ, বলিষ্ঠ অথচ নমনীয় হাতটি তিনি চেপে ধরে থাকেন। শান্তিনিকেতনে কেউ কখনও কবিকে কারও সঙ্গে করমর্দন করতে দেখেননি। ওঁরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের বাদামি চিন্তাশীল সতর্ক চোখ আর জার্মান তরুণীর শীতল ইস্পাতের মতো নীল চোখ। নীল চোখ অপ্রতিরোধ্য,... বাদামি চোখ গভীর চিন্তায় মগ্ন।... পুব আর পশ্চিম মুখোমুখি। শেকড়ের মতো।

তা ছাড়া ভুল আর ভুল। শিব কামদেবকে ভস্মীভূত করেন তাঁর তৃতীয় নেত্রের আগুনে নয়, অগ্নিকুণ্ডে ছুড়ে দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করেছিলেন বীণা দাস। এ-সংবাদ আমাদের সকলেরই প্রায় জানা। কিন্তু এ-বইয়ে দেখা যাচ্ছে সে বীরাঙ্গনার নাম পার্বতী। তাঁর বয়স ষোলো এবং তিনি বিধবা। তিনি শান্তিলাল নামে এক যুবককে ভালবাসেন। গান্ধীর নামে ওঁরা যুগ্মভাবে মৃত্যুপণ গ্রহণ করেছেন ইত্যাদি। সময়েরও গোলমাল আছে। জ্যাকসন-হত্যার চেষ্টা আসলে ঘটে লেখকের এ দেশে থাকাকালীন নয়, এক বছর পরে। এখানেই শেষ নয়। বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সব গান রচনা করেছেন খড়ের ঘরে বসে। কবির সংগীত কখনও কাগজে-কলমে লেখা হয় না। ভ্রাতুষ্পুত্র দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিতে সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে। সুতরাং তিনি যখন থাকবেন না, কী আক্ষেপের কথা, তাঁর সঙ্গে কবির গানও হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো!

এ-সব কথা শোনার পর 'ফায়ার অফ বেঙ্গল' যে আমাদের সমালোচকদের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেবে তা আর বিচিত্র কী! কার্যত তা-ই ঘটেছে। রোজা হাজনোকজির (Rozsa Hajnoczy) 'ফায়ার অফ বেঙ্গল' (*Fire Of Bengal*) নামে প্রায় ছ'শো পৃষ্ঠার বিশাল বইটি (অনুবাদক— ইভা ভাইমার এবং ডেভিড গ্রান্ট, প্রকাশক, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।) আমাদের অধিকাংশ সমালোচক শুধু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাতিল করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, কেউ কেউ রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। পারলে কলমের আগুনে এই বই তাঁরা ভস্ম করে দিতেন। তাঁদের মতে হাঙ্গেরিয়ান মহিলার এই বই নিছক অপপ্রচার। অপপ্রচার শান্তিনিকেতন সম্পর্কে, বাংলা সম্পর্কে, ভারত সম্পর্কে। ইচ্ছাকৃতভাবেই তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় মানুষদের প্রতিমাকে কলঙ্কিত করেছেন। ইচ্ছা করেই তিনি রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন সহ ভারতের সমাজ-সংস্কৃতিকে বিশ্বমানুষের

কাছে বিকৃতভাবে উপস্থিত করেছেন। রোজার বইকে কেউ কেউ তুলনা করেছেন এক কালের কুখ্যাত বই মিস মেয়োর 'মাদার ইন্ডিয়া'র সঙ্গে। 'মাদার ইন্ডিয়া' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন, তার উদ্ধৃতি দিয়ে একজন সমালোচক কল্পনা করার চেষ্টা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে এ-বই সম্পর্কে তিনি কী বলতেন। কেউ কেউ এমনকী এ-বই প্রকাশের পেছনে উদ্দেশ্য কী, ভ্রূ কুঁচকে সে-প্রশ্ন তুলেছেন। এতই যদি দরকারি বই, তবে উদ্যোগীরা বিলেতে প্রকাশক পেলেন না কেন?— কেন ঢাকা থেকে বের করতে হয় এই বই? সুতরাং মানতেই হয় এটা আমাদের সৌভাগ্য, এ-বই নিষিদ্ধ করার জন্য কোনও দাবি ওঠেনি। উঠতেই পারত। সেকালে মিস মেয়ো-র 'মাদার ইন্ডিয়া', কিংবা বিভারলি নিকোলস-এর 'ভার্ডিক্ট অন ইন্ডিয়া' নিয়ে উত্তেজনা, আলোড়ন কিন্তু আমাদের স্পর্শকাতরতার শেষ নজির নয়। একালেও আমরা দেখেছি রোনাল্ড সেগাল, নইপল, মির্চা এলিয়াদকে নিয়ে আমরা হঠাৎ হঠাৎ কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারি। কলকাতা শহরে হাজার হাজার মানুষে টানা রিকশা চলতে পারে, কিন্তু বিদেশি চিত্র-পরিচালক রিকশাওয়ালার জীবন নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করতে গেলে আমাদের আত্মসম্মান আহত হয়। আমরা রে-রে করে তেড়ে যাই। 'লা নুই বেঙ্গলি' নিয়েও কত কাণ্ড না হয়ে গেল। বেচারা লুই মাল তো কলকাতা নিয়ে তোলা তাঁর ছবিটি এ দেশে দেখাবারই সুযোগ পেলেন না! মির্চা এলিয়াদের বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে একজন ক্ষুব্ধ পাঠকের জিজ্ঞাসা, আপনি পড়েছেন?— একটি ভদ্র পরিবারের বাঙালি তরুণীকে নিয়ে বিদেশি যুবকের ওই উদ্দাম প্রেমলীলা আপনি সমর্থন করেন? আপনি কি খেয়াল করেছেন ওই যুবক গুরুদেব সম্পর্কে কী অশালীন ভাষা ব্যবহার করেছেন? বাধ্য হয়েই নিরুত্তর থাকতে হয়। রোজার বই সম্পর্কেও কোনও তর্কে আমার আগ্রহ নেই। যাঁর যেভাবে ইচ্ছে তিনি সে ভাবে নেবেন। আমি কীভাবে নিতে চাই সংক্ষেপে তা বলতেই এই ভূমিকা। এ-সুযোগ পাবার জন্য আমি অবশ্যই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব দু'জন রবীন্দ্রানুরাগী কেতকী কুশারী ডাইসন এবং উইলিয়ম রাদিচের কাছে। অনুবাদকদের একজন কেতকী কুশারীকে বইটি সম্পর্কে সহজেই আগ্রহী করতে পেরেছিলেন জেনে আমি আশ্বস্ত হই। ভাবতে ভাল লাগে তিনি এখনও শুচিবাইগ্রস্ত বড়পিসিমায় পরিণত হননি। উইলিয়ম রাদিচের কাছে কৃতজ্ঞ তিনি উদ্যোগী হয়ে শেষ পর্যন্ত এই বিশাল বইয়ের একজন যোগ্য প্রকাশক খুঁজে বের করেছেন। এবং বের করেছেন বাঙালি সংস্কৃতির আর-এক প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। সম্পাদক হিসাবে উইলিয়ম রাদিচের বিরুদ্ধে আমার অবশ্য কিছু নালিশ আছে। আরেকটু উদ্যোগ নিলেই তিনি নিশ্চয় লেখক এবং তাঁর স্বামী সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে পারতেন। কিছু কিছু তথ্যগত তুচ্ছ ভুলভ্রান্তিও সংশোধন করতে পারতেন। অন্যভাবে বললে এই বইয়ের একটি 'সটীক' সংস্করণ প্রকাশ করার সুযোগ ছিল। ঢাকার ইউনিভার্সিটি প্রেসের অবশ্য নিঃশর্ত তারিফই প্রাপ্য। এত বড় বইয়ে ছাপার ভুল নেই বললে চলে। এক জায়গায়, পৃষ্ঠা মনে নেই, চোখে পড়েছিল একই ছত্র ছাপা হয়েছে দু'বার, আরেক জায়গায় মনে হয়েছিল কাল-নির্দেশে কিছু গোলমাল। ব্যস, এটুকুই।

অমিতাভ ঘোষের বইয়ের মতোই রোজার বইটি বুঝি বা একসঙ্গে একাধিক বই। আমি একের মধ্যে তিন বলতে পারি। সে-আলোচনায় প্রবেশ করার আগে সংক্ষেপে বইটির প্রকাশনা ইতিহাস: রোজা এক হাঙ্গেরিয়ান পণ্ডিতের স্ত্রী। তাঁর স্বামী ড. গিয়ুলা গরমানুস

(Dr. Gyula, Germanus) আরবি ভাষা ও ইসলামি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। একসময় লন্ডনেও প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা করেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বের নানাপ্রান্ত থেকে জ্ঞানীগুণীদের সমবেত করছেন তাঁর স্বপ্নের বিশ্বভারতীতে, তখন দূর হাঙ্গেরির এই পণ্ডিতের কাছেও পৌঁছেছিল শান্তিনিকেতনের আমন্ত্রণপত্র। এ-ব্যাপারে প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন মনে হয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। স্বামী-স্ত্রী তিন বছরের জন্য পাড়ি জমান ভারতে। স্ত্রী রোজা অনেকটা অনিচ্ছায়। কিছুটা উদ্‌বেগসহ। ওঁরা ভারতে পৌঁছন ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে। ফিরে যান '৩১ সালের গ্রীষ্মে। যতদিন এদেশে ছিলেন থেকে থেকেই বাড়ির জন্য, দেশের জন্য মন খারাপ হয়ে যেত নিঃসন্তান রোজার। তিনি বিষণ্ণ বোধ করতেন। সময় কাটত প্রধানত ইংরেজি বই পড়ে। আর সূচিশিল্পে। একজন মন্তব্য করেছেন, তাঁর সেই শিল্পে চোখের জলের ছাপ। অন্য দিকে এই রোজাই কিন্তু দিব্যি এক সামাজিক মানুষ। তিনি স্বচ্ছন্দে শান্তিনিকেতনের পাড়া-পড়শিদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। প্রতি বছরই গরমের ছুটিতে দল বেঁধে ওঁরা বেরিয়ে পড়েন ভারত দর্শনে। প্রবাসের দিনগুলোও শুধুই কেঁদে কেঁদে কাটাননি তিনি, পাতার পর পাতা জার্নাল লিখেছেন। দেশে যখন ফেরেন তখন আঠারো খণ্ড দিনলিপি তাঁর তোরঙ্গে। তেরো বছর পরে ১৯৪৪ সালে সেই দিনলিপির ভিত্তিতেই লেখা তাঁর এই বই প্রকাশিত হয়। নাম 'বেঙ্গলি তুজ' (Bengali Tuz)। বইয়ের ভাষা 'মাগিয়ার' (Magyar)। হাঙ্গেরির বাইরে এ ভাষা কম মানুষই জানেন। বইটি যখন প্রকাশিত হয় লেখক রোজা তখন বেঁচে নেই। তার দু বছর আগে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। আত্মহত্যার হেতু অস্পষ্ট। বলা হচ্ছে হিটলারের গেস্টাপো বাহিনী হাঙ্গেরি দখল করার পর ওঁর স্বামী ইহুদি পণ্ডিতকে আটক করেন।

ইতিমধ্যে তিনি অবশ্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তবু রেহাই নেই। রোজা পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতি এবং স্বামীর ওপর এই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হন। স্বামী গিয়ুলা অবশ্য তার পরও অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। রোজার বইয়ের প্রথম প্রকাশে তাঁর উদ্‌যোগ ছিল। পরবর্তী সংস্করণের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। প্রথম প্রকাশের পর এক বছরের মধ্যে দুটি সংস্করণ হয় বইটির। পরবর্তী সংস্করণ কিন্তু অনেক পরে। ১৯৭২ সালে। কেননা, ইতিমধ্যে হাঙ্গেরির জীবনে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। সোভিয়েত বাহিনী জার্মান ফ্যাসিস্তদের কবল থেকে হাঙ্গেরিকে মুক্ত করে ১৯৪৫ সালে। হাঙ্গেরিতে নতুন জমানা। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ট্যাঙ্কের মুখে হাঙ্গেরি। গণবিদ্রোহের পরিস্থিতি। এ-সব কারণে বইয়ের প্রকাশ ছিল অনিয়মিত। অনুবাদক বলছেন চৌদ্দ বছর পাঠকের নাগালে না থাকলেও অন্তত ত্রিশ লক্ষ মানুষ সেদিন রোজার বই পড়েছেন। হাঙ্গেরির পাঠকদের কাছে এ-বই ধ্রুপদী সাহিত্য বলে স্বীকৃত। কারও কারও কাছে অনবদ্য এক ভ্রমণকাহিনী। 'ফায়ার অফ বেঙ্গল' সেই জনপ্রিয় বইয়েরই ইংরেজি অনুবাদ।

এই অনুবাদেরও ছোট্ট একটি ইতিহাস আছে। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ট্যাঙ্ক যখন হাঙ্গেরির রাজধানীতে পেশি প্রদর্শনে মেতে ওঠে তখন ইভা ভাইমার (Eva Wimmer) নামে সতেরো বছরের এক হাঙ্গেরিয়ান তরুণী বুদাপেস্ট থেকে পালিয়ে লন্ডনে এসে পৌঁছন। তাঁর সূত্রেই ১৯৭৫ সালে রোজার লেখা বইটির নতুন সংস্করণ লন্ডনে আসে। ইভা ততদিনে সেখানে সংসার পেতেছেন। তিনি ইংরেজি শিখেছেন। একজন ইংরেজ যুবককে বিয়ে করেছেন। রোজার বই পড়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ইংরেজ স্বামীকে অনুবাদ করে

শোনান। দু'জনে মিলে ধীরে ধীরে পুরো বইটি ভাষান্তরিত করেন হাঙ্গেরিয়ান থেকে ইংরেজিতে। কিন্তু হায়, লেখিকার মতো দুর্ভাগ্য অনুবাদকেরও। ১৯৮৫ সালে অকালমৃত্যু কেড়ে নেয় ইভাকে। স্বামী তথা সহ-অনুবাদক ডেভিড গ্রান্ট (David Grant) ভেবে পান না পাণ্ডুলিপি নিয়ে তিনি কোথায় যাবেন, কী করবেন। বুদাপেস্ট থেকে ভায়া লন্ডন, লন্ডন থেকে ভায়া ঢাকা হয়ে সেই অনুবাদই আমাদের হাতে। 'ফায়ার অফ বেঙ্গল' অতএব মানতেই হয় এক অপ্রত্যাশিত প্রাপ্য। বইটি অনায়াসে হাঙ্গেরির রাজনৈতিক আগুনে পুড়ে যেতে পারত। তলিয়ে যেতে পারত ইংলিশ চ্যানেলেও।

এ-বইয়ে প্রবেশ করার আগে গোড়াতেই নিষেধের মতো যে সতর্ক বাণীগুলো উচ্চারিত হয়েছে, আগে সেই দেউড়িগুলো ডিঙাবার চেষ্টা করা দরকার। যে বইয়ে এমন সব আপত্তিকর কথাবার্তা রয়েছে সে-বই আমরা কষ্ট করে পড়তে যাব কেন, পাঠকের মনে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। এ সম্পর্কে এই সামান্য পাঠকের স্পষ্ট বক্তব্য, আমাদের শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে রোজার দেওয়া বিবরণ যদি অক্ষরে অক্ষরে সত্যও হয় তা হলেও কিন্তু আমার চোখে তাঁদের কারও মান-মর্যাদা বিন্দুমাত্র লাঘব হবে না। হয়নি। আমি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে দূরবিন, কিংবা জগদীশচন্দ্র বসুর হাতে হুইস্কির গ্লাস দেখে মোটেই বিচলিত বোধ করিনি। দার্জিলিঙে এ-ধরনের একটি আসরে বসে জগদীশচন্দ্র যদি বুদাপেস্টের রূপোপজীবিনীদের সম্পর্কে লঘুভাবে কোনও উক্তি করে থাকেন, তা হলেও তা শুনে আমার মোটেই মনে হয়নি মাথায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ভেঙে পড়ল। এমনকী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ওঁর বক্তব্য শুনেও আমি এই বিদেশি লেখককে 'রবীন্দ্র-বিদ্বেষী' বলে চিহ্নিত করতে গররাজি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে বিলক্ষণ স্নেহ করতেন এ-বইতে সে খবরও রয়েছে। কবি তাঁর হাতে চার ছত্রের একটি বাংলা কবিতা ও তার ইংরেজি তর্জমা নিশ্চয় রবীন্দ্র-বিরোধিতার জন্য তুলে দেননি। রোজার কাছেই আমরা শুনি শান্তিনিকেতনে আনুষ্ঠানিক কোনও ভোজের আসর থাকলে কবি তাঁকেই ডেকে এনে পাশে বসাতেন। সেটাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল রীতি। ইউরোপীয় সংগীত বা বাস্তবানুগ দেশি-বিদেশি ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত রোজা যে নিন্দার্থে বানিয়ে বলেননি, তা রবীন্দ্রানুরাগীরা নিশ্চয়ই মানবেন। আমি কোনওভাবেই নিজেকে 'রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ' বলে দাবি করতে পারি না। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে রোমাঁ রলাঁর স্মৃতিকথায় ইউরোপীয় সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রায় অনুরূপ ধারণার উল্লেখ পেয়েছিলাম। শিল্পকলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণা যে কী তা শুধু তাঁর নিজের আঁকা ছবিতেই নয়, নানা সময়ে নানা প্রসঙ্গে কবি নিজের কলমেই তা জানিয়ে গেছেন। এটা ঠিক চিত্রকলা সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও এই হাঙ্গেরিয়ান মহিলা সব সময় যথার্থ বোধের পরিচয় দিতে পারেননি। অজন্তার ছবিকে তিনি তারিফ করেছেন। বলেছেন খ্রিস্টপূর্ব দুই শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম-শতক পর্যন্ত যে-সব ভারতীয় শিল্পী অজন্তায় ছবি এঁকেছেন তাঁদের মধ্যে রেনেসাঁস-এর ওস্তাদ শিল্পীদের মতো শিল্পীরাও ছিলেন। কিন্তু নন্দলাল বসু পরিচালিত শান্তিনিকেতনের কলাক্ষেত্রে যে চিত্র-চর্চা চলছে রোজা সেখানে বিশেষ মৌলিকতা খুঁজে পাননি। অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথকে তিনি বলেছেন ফরাসি ইম্প্রেশনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের ছবিকে একজায়গায় তিনি বলেছেন কিউবিস্ট, অন্যত্র শৈশবের স্বপ্নতাড়িত। উল্লেখ্য, বস্কেরা এ-দেশে সমালোচকদের তারিফ পেলেও এবং তাঁদের ছবি বিক্রি হলেও, রোজা কিন্তু

সে-সব ছবি নিয়েও রসিকতা করতে ছাড়েননি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে নিন্দা করার জন্য তিনি তাঁকে শিল্পবোধহীন অবোধ বলে প্রচার করতে চেয়েছেন এ-ধরনের কথাবার্তা বললে সেটা হবে মিথ্যা নিন্দাচার। ভুললে চলবে কেন, আজকের মতো একদিন আমাদের দেশেও কবির ছবির এত ভক্ত ছিলেন না, তাঁর ছবিকে ব্যঙ্গ করে এক-একজন নাকি আখ্যা দিয়েছিলেন— 'ছবিতা'! বস্তুত, 'ফায়ার অফ বেঙ্গল'-এ নিজের এবং অন্যদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে কবির কথোপকথনের যে-সব দীর্ঘ উদ্ধৃতি রয়েছে তা পড়তে পড়তে এক-এক সময় মনে হয় এই বিদেশি মহিলা অনেকের তুলনায়ই কবির ভাবলোকের গভীরে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন আন্তরিকভাবে। ফলে কবির বক্তব্যে আত্মখণ্ডন বা স্ব-বিরোধিতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও ব্যতিক্রমী আচরণও স্বভাবতই তিনি অকপটে উল্লেখ করেছেন। আর তার ফলে আমরা পাই সত্যকারের একজন রক্তমাংসের মানুষকে। যিনি বিরাট কবি, বিরাট লেখক, বিরাট ভাবুক— একই সঙ্গে তিনি একজন স্বাভাবিক মানুষ। পৌত্তলিকতার দেশ আমাদের। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিলিয়ে রচিত হয় আমাদের আরাধ্য প্রতিমা। এই নির্মাণে খড়মাটির কোনও ভূমিকা থাকতে পারে তা আমরা মানি না। সুতরাং কোথাও তা বেরিয়ে পড়লে আমাদের চোখে তা খুঁতবশত পুজোর অযোগ্য হয়ে যায়, ভক্ত আমরা আহত বোধ করি। রোজার কৃতিত্ব শুধু ভক্তিকে সম্বল করেই তিনি বিশ্ববন্দিত ভারতীয় কবির সামনে এসে দাঁড়াননি। তাঁর কথা, সবাই আমরা দৃষ্টিশক্তি নিয়ে জন্মাই, কিন্তু আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি হুবহু এক নয়। সুতরাং তাঁর রবীন্দ্রনাথ যদি আমাদের চেনাজানা রবীন্দ্রনাথ থেকে ঈষৎ অন্যরূপে প্রকাশিত হন তবে হাহাকারের কোনও হেতু দেখি না।

'ফায়ার অব বেঙ্গল'-এ যে-সব তথ্যগত ভুলভ্রান্তি রয়েছে তার সপক্ষে কৈফিয়ত একটাই, এই হাঙ্গেরিয়ান আগন্তুক কোনও তথ্যভিত্তিক ঘটনা পরম্পরা লিখতে বসেননি। 'ফায়ার অব বেঙ্গল' বাস্তব ও কল্পনার এক উপাদেয় মিশ্রণ। এ-বইয়ে চোখে দেখা, কানে শোনা ঘটনাবলির সঙ্গে মিলেমিশে আছে বই থেকে পাওয়া তথ্যাবলি। ফলে বীণা দাস পরিণত হন পার্বতীতে, অগ্নিযুগের মন্ত্রগুপ্তি শপথ উচ্চারিত হয় বালবিধবা পার্বতী আর তাঁর প্রেমিক শান্তিলালের মুখে। যিনি 'গান্ধীর নামে' পরদেশি শাসককের হত্যায় এঁদের প্ররোচিত করেন, মনে হয় না কি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস থেকে ভুল পরিচয় নিয়ে উঠে এসেছেন তিনি? এমনও হতে পারে '৫৭-র মহাবিদ্রোহে ফৈজাবাদের সেই মৌলবী ঘটনার খাতিরে অন্য পরিচয় নিয়ে ভর করেছিলেন রোজার কল্পনায়। উল্লেখ্য, আঠারো শ' সাতান্ন, পাতার পর পাতা অধিকার করে আছে এই বইয়ে। দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের বিলুপ্তি মনে হয় 'সকল গানের ভাণ্ডারী' হিসাবে তাঁর পরিচয় সূত্রে। এ-সব অনায়াসে সংশোধনযোগ্য ছিল না কি? এ-ধরনের আরও কিছু কিছু ভুল খুঁতধরা বুড়োরা নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন এই বইয়ে। কিন্তু আমার মনে হয়, পাশাপাশি তুলনায় অনেক অনেক বেশি পরিমাণে পাবেন, প্রয়োজনীয় নানান খবর এবং উপভোগ্য আরও অনেক কিছু। আগেই বলেছি এ-বই দুই মলাটের মধ্যে অন্তত তিন-তিনটে বই । একের মধ্যে তিন কখনও কখনও হয়তো পাঠকের বিরক্তির কারণ হতে পারে, এ-বইয়ে কিন্তু সে-ধরনের কোনও বিপত্তির সম্ভাবনা নেই। পড়তে আরম্ভ করলে 'ফায়ার অব বেঙ্গল' হাত থেকে নামিয়ে রাখা যায় না। অথচ কখনও এ-আগুন পাঠককে পোড়ায় না, বড়জোর পাঠক কখনও কখনও তপ্ত বোধ করেন, তবে ঈষৎ সহনশীল হলে একই সঙ্গে উদ্ভাসিত হতে পারেন হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে।

প্রথম প্রাপ্তি, হারানো শান্তিনিকেতন। তিরিশের দশকের প্রথম দিকের শান্তিনিকেতন রোজার কলমের জাদুতে লহমায় যেন ফিরে আসে পাঠকের সামনে। আমরা বিশ্বভারতীর গৌরবের দিনগুলো ফিরে পাই। রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে ঘিরে দেশি-বিদেশি পণ্ডিতমণ্ডলী। শান্তিনিকেতনে কবির আসা-যাওয়া। অতিথিদের আনাগোনা। সব মিলিয়ে বিশ্বভারতীর একটি সুন্দর বর্ণাঢ্য চিত্র। সব চেয়ে জীবন্ত মনে হয় বিদেশি পণ্ডিতদের পল্লীটি। আমরা বলতে পারি— সাহেবটোলা। রীতিমতো দর্শনীয় সেখানকার বাসিন্দারা। বিপ্লবী-রাশিয়া থেকে পলাতক রুশ পণ্ডিত সস্ত্রীক বোগদানভ। সঙ্গে মুস্তাফা আর ইউসুফ নামে দুরন্ত দুই আফগান সহচর। সেইসঙ্গে কিছু চতুষ্পদ পোষ্য। কুকুর বেড়াল এবং ব্যাঙ। পশ্চিমি বেড়ালের ভারতীয় বেড়ালের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের ফলে আশ্রমে কিছু বর্ণ-সংকরেরও আবির্ভাব ঘটে। তাই নিয়ে সাহেবটোলায় রসিকতা। প্রেমিক শুধু জাতিগৌরবে গরীয়ান বোগদানভদের মার্জারই নয়, তাঁর দুই আফগান ভৃত্যও। প্রভুর বোতল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তারা মদ্যপান করে। জমাদারের বোন দুগ্গাকে কয়লার ঘরে লুকিয়ে রেখে গোপনে তার সঙ্গে ফুর্তি করে। মেয়েটিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। রোজা বলেছেন, খোঁজা হয়েছে এমনকী তাঁর সুটকেসে পর্যন্ত! দুগ্গা যখন ধরা পড়ল তখন আশ্রমের তরফে বলা হল, দুই আফগানকে ছুটি দিতে হবে এবার রুশ অধ্যাপককে। বোগদানভ-এর পক্ষে কিছুতেই এ প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তিনি নিজেই বিদায় নিলেন আশ্রম থেকে। যাওয়ার সময় ভারত সংক্রান্ত যাবতীয় বইপত্র ফেলে দিয়ে গেলেন। কুকুর বেড়ালদেরও রেখে যেতে হল। তবে কথা দিয়ে গেলেন খোরপোশের জন্য নিয়মিত মাসোহারা পাঠাবেন তিনি। কথা রেখেছিলেন রুশ পণ্ডিত। ফরাসি ভাষার অধ্যাপক বেনোয়া সাহেব আবার অন্যরকম। ভারতকেই তিনি ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছিলেন। একটি হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে আশ্রম থেকে কিছু দূরে সংসার পেতেছেন। অন্য ইউরোপিয়ানদের তিনি কিছুটা এড়িয়ে চলেন। বিচিত্র মানুষ ইংরেজ অধ্যাপক মার্ক কলিন্স। বিরাট পণ্ডিত। চল্লিশটি ভাষা জানেন। অপরিচ্ছন্ন ঘর। বইপত্রে বোঝাই। তারই মধ্যে কলিন্স দিনরাত্রি বইয়ে মুখ গুঁজে থাকেন। স্নানাহার, পোশাক-আশাকের দিকে কোনও ঝোঁক নেই তাঁর। মোটে এক প্রস্ত পোশাক। পাইপের আগুনে ফুটো হয়ে গেলে তাঁর ভৃত্য কালি মাখিয়ে ফুটো আড়াল করে দেয়। অন্য ঘরানার রিপুকর্ম! কলিন্স তাই পরে কবির ভোজসভায় যোগ দেন। পরে জানা যায় কলিন্স শান্তিনিকেতনে পালিয়ে আছেন তাঁর রঙ্গিলা বউয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। সে-বিবি আঁচ পেয়ে তাঁর তখনকার প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে হানা দেন আশ্রমে। ফলে ধরা পড়ার আগেই বইপত্র ফেলে রেখে কলিন্স পালিয়ে যান মাদ্রাজে। বেশ-কিছুদিন পরে জানা যায় তাঁর নতুন ঠিকানা— মাদ্রাজের থিয়োজফিকাল সোসাইটির লাইব্রেরি। ও-পাড়ায় আরও অনেকেই আছেন। ইতালিয়ান অধ্যাপক গুয়াদাগনি (Guadagni)। তিনি নিজের দেশ সম্পর্কে কবিকে অনেক কথাই বলেন। ইতালিতে কেমন শান্তি ও শৃঙ্খলার সুপবন বইছে, লোকেরা কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে রয়েছেন, তার গোলাপি চিত্র তুলে ধরেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর ফাঁকিতে পড়তে রাজি নন। তিনি এই অধ্যাপককে জানিয়ে দেন ইতালি ভ্রমণকালে তাঁরও তা-ই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে অন্যত্র গিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছেন সেটা জবরদস্তির রাজত্ব। সেখানে স্বাধীনতা নেই। কবির স্পষ্ট কথা, শান্তি আর শৃঙ্খলাই শেষ কথা হতে পারে না।

তা ছাড়া আরও অনেকেই রয়েছেন ওই গুরুপল্লীতে। তরুণ জার্মান ছাত্র ট্রাপ। তিনি

সংস্কৃত পড়তে এসেছেন। ধুতিপাঞ্জাবি পরে ভারতীয় হতে চাইছেন। সহপাঠিনী সরস্বতীর প্রেমে পড়েন এই জার্মান যুবক। 'বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষ দিনে' হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে মেয়েদের হস্টেলে গিয়ে হাজির হন ট্রাপ। তাঁর ধারণা সরস্বতীও তাঁর প্রেমে হাবুডুবু। সুতরাং আর দ্বিধা কেন? ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে ট্রাপ প্রেমিকার ঠোঁটে চুমু খেয়ে প্রেমকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্‌যোগ নিলেন। ফলে বিরাট বিপর্যয়। হট্টগোল। সরস্বতী ভয়ে পিছিয়ে গেলেন। বেচারা ট্রাপ আশ্রম ছেড়ে কাশীবাসী। অতঃপর সেখানেই তিনি সংস্কৃত পড়বেন। ও-পাড়া এবং আশেপাশের আরও অনেকে বাসিন্দা। সুরুলে হাসপাতাল-পরিচালক ডা. টিম্বার্স ও তাঁর স্ত্রী। লিন্ডসে নামে আমেরিকান মিশনারি। ইনি আবার ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। তা ছাড়া ধূমকেতুর মতো এসে হাজির হয়েছিলেন প্রাণোচ্ছল যে জার্মান তরুণীটি সেই গার্টুড রুডিগার। কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে যে জার্মান দলটি বেরিয়েছিল সে-দলে একমাত্র মেয়ে অভিযাত্রী। সুন্দরী, সাহসী, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, ভূগোলের ছাত্রী গার্টুড আশ্রমিকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তিনি ড্রিল করান। রোদ বৃষ্টি ঝড়ের পরোয়া না করে সাইকেলে চড়ে চারদিকের গ্রামাঞ্চলে চষে বেড়ান। ফলিত ভূগোল চর্চা করেন। ভূ-তাত্ত্বিক নানা নমুনা সংগ্রহ করেন। তাঁর ঘরে বিয়ার পার্টি বসে। জার্মান বিয়ার। গার্টুড ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গানের আসর বসান। মেয়েদের তিনি স্বাধীন এবং স্বাবলম্বী হতে উৎসাহ দেন। অনেকেই আন্দোলিত তাঁর উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতায় এবং সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনাচারে। গার্টুড একসময় হাসপাতালের মিশনারিদের সহকারী হিসাবে যোগ দেন। পরে তাঁকে নিয়ে নানা কাণ্ড।

শান্তিনিকেতনে বিদেশি অধ্যাপক এবং অতিথিদের সম্পর্কে আমরা নানা সূত্রে অনেক খবরই শুনেছি। কিন্তু রোজা আমাদের হাত ধরে যে পণ্ডিতপাড়া পরিক্রমা করিয়েছেন, তার তুল্য বিবরণ আমি অন্তত কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ছে না। নখের আঁচড়ে আঁকা জীবন্ত সব চরিত্র-চিত্র। অসাধারণ এক আলেখ্য লহরী। মাঝে মধ্যে বিশিষ্ট যে-সব বিদেশি অতিথি আসা-যাওয়া করেছেন, রোজা তাঁদের ছবি আঁকতেও ভোলেননি। বস্কেরা তো বটেই জাপানি জুজুৎসু শিক্ষক, এলমহার্স্ট, এমনকী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান থেকে আসা ফুলের মতো সেই মেয়েটি, সবাই ঠাঁই পেয়েছেন তাঁর অ্যালবামে।

ভারতীয় পণ্ডিত এবং পড়ুয়ারাও গরহাজির নন। গায়ে চাদর, পায়ে খড়ম, শুদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং যথার্থ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাই রয়েছেন। রয়েছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, স্কুলের পরিচালক খ্রিস্টান অধ্যাপক গাঙ্গুলি মশাই। রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী চেনাজানা অনেকেই আছেন। আছেন বাইরের পড়ুয়া নবাবজাদা আলি হায়দর। সুদর্শন তরুণ। চাল-চলন কথাবার্তায় অভিজাত। ইংরেজি শিখেছেন কেমব্রিজে। শান্তিনিকেতনে এসেছেন রোজার স্বামী ইসলামি শাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে আরবি ভাষা এবং ইসলাম সম্পর্কে পাঠ নিতে। স্বদেশি অধ্যাপকদের মধ্যে আরও একজনের কথা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। তিনি অক্সফোর্ড-ফেরত ইংরেজির অধ্যাপক অতনু রায়। বাঙালি হয়েও ভাবে-ভাবনায় পুরোপুরি ইউরোপিয়ান। সঙ্গে তাঁর বিদেশিনী স্ত্রী হিমঝুরি। ডেনমার্কের কন্যা। হিমের দেশের মেয়ে হিমঝুরির আগের নাম ছিল হেলগা। স্বয়ং কবি অতনুর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে দিয়েছেন তাঁর। এঁদের সবাইকে নিয়েই শান্তিনিকেতনের বিশাল
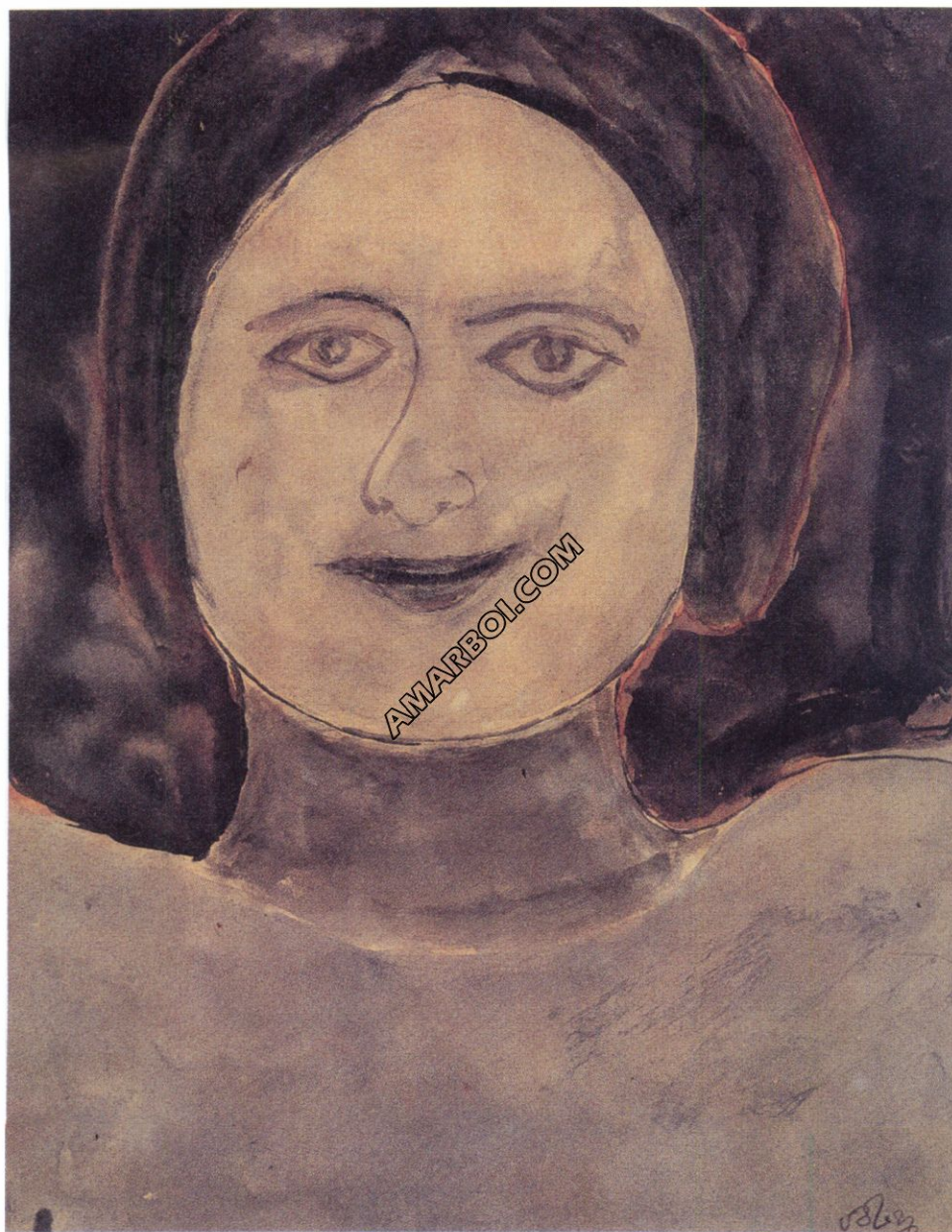
রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি প্রতিকৃতি। ১৯৩৩-৩৪।
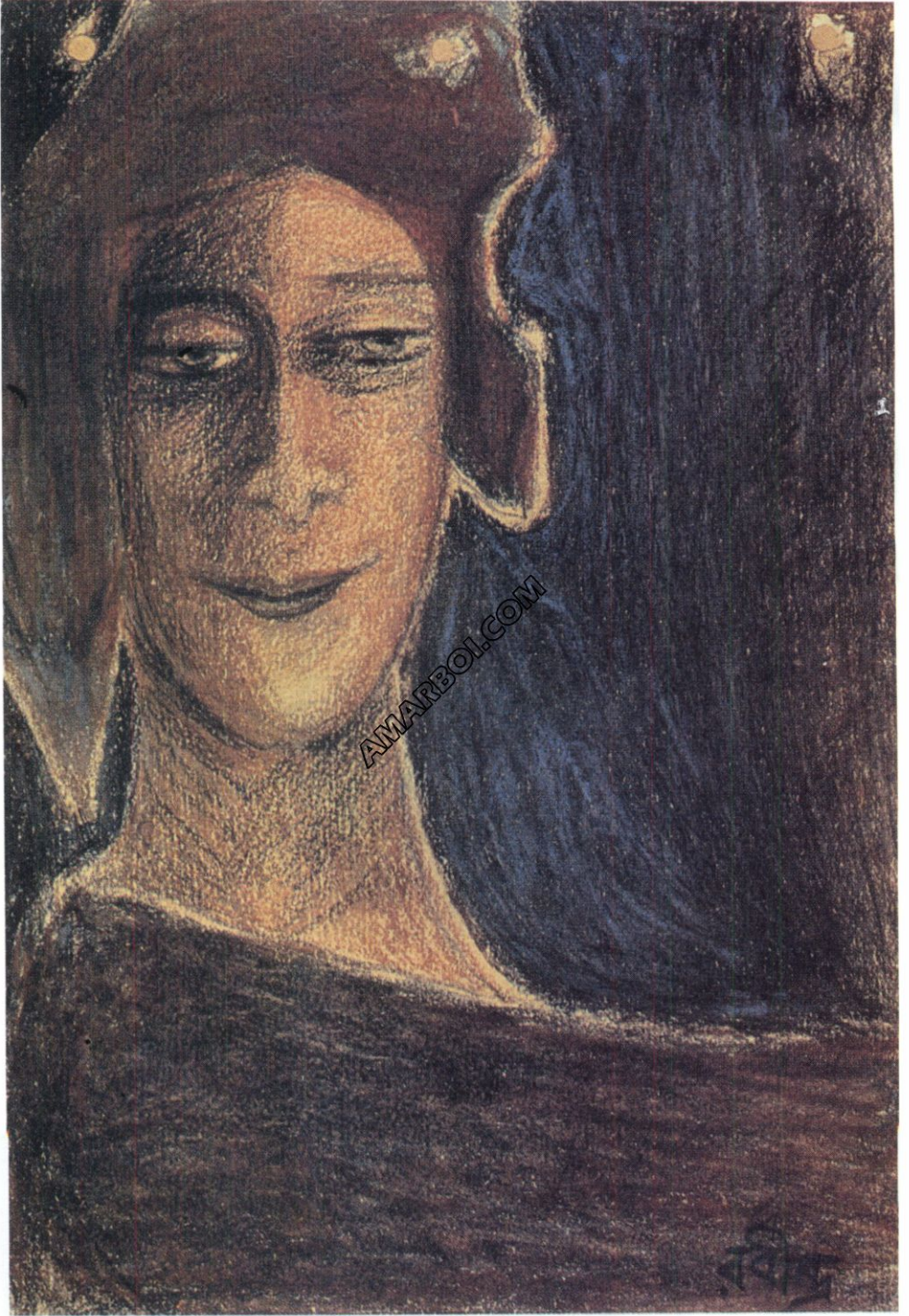
রবীন্দ্রনাথের আঁকা আরও একটি প্রতিকৃতি।

সংসার। বসুধা কুটুম্ব সেখানে। রোজা আর তাঁর স্বামীও সে পরিবারের বাইরে নন। তাঁর চোখেই আমরা পড়তে পড়তে চোখের সামনে দেখতে পাই সেদিনের শান্তিনিকেতন। সেখানকার মানুষজন, তাঁদের দৈনন্দিন জীবন, সুখদুঃখ, সংস্কার, কুসংস্কার, সমস্যা এবং সংকট। হ্যাঁ, প্রেম-প্রসঙ্গও আছে বইকী। কণ্বমুনির আশ্রমে যদি পঞ্চশর ছুটতে পারে, তবে এখানেই বা নয় কেন! রোজার শান্তিনিকেতন তপোবন মাত্র নয়, এক জীবন্ত জনপদ। সেখানে মানুষ আর প্রকৃতি মিলেমিশে আছে গাছগাছালি, পশু, পাখি, কীট পতঙ্গ। সেখানে ঋতুরঙ্গ।

তবে রোজা কিন্তু শান্তিনিকেতনেই বন্দি করে রাখেননি আমাদের। তাঁর বইয়ের পটভূমি বিশাল। শান্তিনিকেতনের পথ ধরে এই বিদেশি লেখক আশ্চর্য এক ভারত-পথিক। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর শান্তিনিকেতনে ভারত-আত্মার স্পর্শ লাভ করেই রোজার ভারত-জিজ্ঞাসা যেন তৃপ্ত হয়নি। প্রতি বছরই গরমের ছুটিতে এই হাঙ্গেরিয়ান দম্পতি আরও দু'-একজন আশ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন ভারতের নানা দিকে। ওঁদের পিছু পিছু আমরা আমাদের নিজেদের দেশকে আবার নতুন করে দেখি! কিছু কিছু আবিষ্কারে চমকিতও হই।

রোজার ভ্রমণ কাহিনী শুরু হয়েছে খাস হাঙ্গেরি থেকে। ভেনিসে 'এস. এস. পিলসনার' নামে জাহাজে চড়ে স্বামীর সঙ্গে তাঁর ভারত-যাত্রা। উনিশ শতকের কিছু কিছু বিদেশি-বিদেশিনীর জলপথে ভারত-যাত্রার বিবরণ আমি পড়েছি। গুনলে বেশ কয়েকটি। কিন্তু এমন জীবন্ত জাহাজি-সমাজ কখনও পড়েছি বলে মনে পড়ে না। প্রত্যেকটি যাত্রীর চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা, বেশ-ভূষা, দোষ-গুণ সব অনুপুঙ্খ বিবৃত করেছেন এই হাঙ্গেরিয়ান সহযাত্রী। একসময় বলছেন, একটা সপ্তাহ এখনও পার হল না, এরই মধ্যে চোখের সামনে প্রেমের ফুল ফুটতে দেখলাম, দেখলাম ঘৃণা, বিরোধ-বিতর্ক, আবার ভাবসাব। চোখের সামনেই দেখলাম এক সম্পর্কে ফাটল ধরেছে, আবার নতুন বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে। সবাই যখন পূর্ব পৃথিবীর বিচিত্র পোশাকে পোর্ট সৈয়দ-এ কেনাকাটায় ব্যস্ত, তখন তাঁর মন্তব্য, সবাই আমরা এক জাহাজের যাত্রী, কিন্তু এখন প্রত্যেকেরই চেহারা যেন অন্য রকম। অতনু রায় আর তাঁর স্ত্রী হিমঝুরিকে এই জাহাজেই আমরা প্রথম দেখি। দেখি মেহতাদের সেই সুন্দর প্রাণচঞ্চল অথচ গম্ভীর পুত্রটিকেও, নাম যার— সাম। আমরা তাকে ভুলতে পারি না। শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে সাঁওতাল পল্লীর এবং সাঁওতালদের নাচ দেখে আমরাও তাঁরই মতো অভিভূত। সেখান থেকে রোজার অধ্যাপক-স্বামীর সঙ্গে যখন রামপুরহাট থেকে মোটরে দেড় ঘণ্টার পথ পেরিয়ে মহুল পাহাড়িতে নরওয়ের বৃদ্ধ পাদ্রি পল বোর্ডিং আর তাঁর ডেনিশ স্ত্রীর বিশাল গ্রন্থাগারে পৌঁছই তখন মনে পড়ে যায় হ্যাঁ, ইনিই না সেই বোর্ডিং, যিনি সাঁওতালি ভাষার অভিধান রচনা করেছিলেন। সাঁওতালি নিরাময় নিয়ে মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন। কী লজ্জা, কী লজ্জা! কত বার বীরভূমের পথে যাওয়া-আসা করেছি, কই এ অসাধারণ কর্মীর সাধনপীঠের কথা তো কখনও মনে পড়েনি!

দার্জিলিঙেও তাই ঘটল। সেখানে আমরা ক্লিফোর্ড মার্সন-এর মতো বাগিচা মালিককেই পেলাম না, আরও অনেক কিছুই পেলাম। খানদানি ভারতীয় আর ঔপনিবেশিক শাসকদের মিলিত আড্ডা, চিনাদের নেশার ঠেক, সাধকের আখড়া এবং আরও কত কী! ক্লিফোর্ড মার্সন শুধু চা বাগিচা নিয়ে ব্যস্ত মোটেই তা নয়। চা তাঁর অর্থের উৎস বটে, কিন্তু নেশা তাঁর

নাচ-গান, ঘোড়ায় চড়া, টেনিস খেলা এবং সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে আমোদ করা। রোজার ভ্রমণ কাহিনীতে এই বাগিচা মালিক একটি দর্শনীয় চরিত্র। গ্ল্যাডি এবং তাঁর বন্ধু বিশালদেহী আর্মি মেজর জাফর তাঁরাও অবশ্যই নজর কেড়ে নেন। মেজর জাফরের কোরান শরীফ মুখস্থ। কিন্তু কোনও অনুশাসনই তিনি মানেন না। পরে আমরা জানি গ্ল্যাডি নামে তাঁর বাহুসংলগ্ন ওই-যে মেমসাহেব একদা ইনিই ছিলেন শান্তিনিকেতনের বহুভাষাবিদ কলিন্স সাহেবের ধর্মপত্নী। গার্ট্রুডকেও আমরা প্রথম দার্জিলিঙেই দেখি। রোজা আমাদের নিয়ে যান জীবজন্তুর পালক এবং ব্যবসায়ী বিচিত্র মানুষ এডগার সাহেবের আস্তানায়। এমনকী বিখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান পণ্ডিত চোমা দ্য কোরস-এর সমাধি যে এই দার্জিলিঙে সেটাও তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন। নামের উচ্চারণটা বোধহয় ঠিক হল না। রোজা এই নামে তাঁকে চিনতেই পারছিলেন না। আমার এই আলোচনায়ও দুটি বইয়ে উল্লেখিত স্থাননাম ব্যক্তিনামের উচ্চারণ বোধহয় ত্রুটিমুক্ত নয়। পাঠককেই নিজ গুণে শুদ্ধ উচ্চারণ খুঁজে নিতে হবে। রোজা এই পণ্ডিতের নাম বলছেন— কোরোসি সোমা সান্দর (Korosi Csoma Sandor)। নামটি শোনামাত্র কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে দেখা এই জ্ঞানতাপসের মূর্তিটি চোখে ভেসে ওঠে। মনে পড়ে তাঁর তিব্বত অভিযান এবং পুথিপত্র নিয়ে পায়ে হেঁটে কলকাতা পৌঁছবার অবিশ্বাস ঘটনাবলি। কাশ্মীরের পীর পাঞ্জাল পার হতে হতে এই হাঙ্গেরিয়ান মহিলার আবার মনে পড়েছিল এই জ্ঞানীকে, এ-পথেই না তিনি একদিন পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছিলেন! রোজা স্বদেশের এই জ্ঞানীর সমাধিতে কিছু ফুলের চারা রোপণ করে এসেছিলেন, দার্জিলিং ছেড়ে আসার আগে। রেভারেন্ড বোর্ডিং, চোমা কোরস কি আমাদেরও নয়?

মাঝখানে একবার মুর্শিদাবাদে। আরেক যাত্রায় রোজা পৌঁছন শিলং পাহাড়ে। সেবার ওঁদের সঙ্গে সহযাত্রী জার্মান তরুণী গার্ট্রুড। সেখানেও নানা অভিজ্ঞতা। চেরাপুঞ্জিতে হঠাৎ অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় গার্ট্রুডকে হারানো, প্রবল উৎকণ্ঠার মধ্যে আবার তাঁকে ফিরে পাওয়া, জাহাজে পরিচিত মেহতাদের ফুটফুটে সেই যে ছেলেটি নাম যার সাম, মৃত্যুশয্যায় তার পাশে দাঁড়ানো, কেশব সেনের পরিবার-পরিজনের সঙ্গে আকস্মিকভাবে আলাপ-পরিচয়। —অনেক কাণ্ড। দেখে অবাক হই সাদউল্লার সঙ্গে নাচছেন এই রোজা। আসামের মুসলিম নেতাদের সঙ্গে আমরা নতুনভাবে পরিচিত হই। জগদীশচন্দ্রের মতোই ওঁরা যেন আনকোরা নতুন মানুষ।

ভ্রমণ কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে রোজা শুনিয়েছেন প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক ইতিহাস। ভারতীয় মানুষের সমাজ ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবন। সমকালের কাহিনীও। ফলে তিরিশের দশকের গান্ধীজির নেতৃত্বে দেশব্যাপী যে তুমুল আন্দোলন তার কথাও বাদ পড়েনি। কেমন করে পড়বে? রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন পর্যন্ত আন্দোলিত সেদিন সেই ঝড়ে। সুতরাং লবণ আন্দোলন, সবরমতি আশ্রম, গান্ধী দর্শন সবই এসেছে। এসেছে বিশাল ভারতের ধর্মজীবনের বৈচিত্র্যের কথাও। চলতে চলতে অবলীলায় অনেক খবরই পরিবেশন করেছেন এই শক্তিমান লেখক। তাঁর বাহাদুরি এখানেই, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেও তাঁর ভ্রমণ এবং পাঠকের মনোযোগ কোথাও বাধাগ্রস্ত হয়নি। শেষবার ওঁরা আগ্রা, দিল্লি, আজমির, রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে পৌঁছন কাশ্মীরে। এবার আশ্রমিকদের মধ্যে একজনই মাত্র সঙ্গী। তিনি বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ হিমঝুরি। বলতে গেলে কাশ্মীরের গুলমার্গে রোজার ভ্রমণ

কাহিনীর সমাপ্তি। রক্তাক্ত ট্র্যাজিক যবনিকাপাত। এ বইয়ের পাতায় যে উপন্যাসের বীজ রোপণ করেছিলেন তিনি, স্বাভাবিক উন্মেষ এবং বিস্তারের পর তারও উপসংহার ওই কাশ্মীরেই।

হাঙ্গেরির পাঠকরা এ-বইকে নাকি গ্রহণ করেছেন ভ্রমণ কাহিনী হিসাবে। আমরা যদি উপন্যাস হিসাবে পড়ি তাতে কোনও দোষ নেই। আগেই বলেছি এ-বইয়ে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে আছে তিন-তিনটে বই। বিশেষ পর্বে শান্তিনিকেতন কাহিনী, এক অস্থির রাজনৈতিক অধ্যায়ের ভারত দর্শন এবং তারই মধ্যে ধীরে ধীরে একটি উপন্যাসের উন্মোচন। উপসংহারে তারই কথা। বইটিকে উপন্যাস হিসাবে গ্রহণ করলেও অন্য পরিচয় দুটি আগে তুলে ধরা হল, এ-কারণে যে, শান্তিনিকেতন এবং তৎকালের ভারতই এই উপন্যাসের যথার্থ প্রেক্ষাপট।

উপন্যাসের নায়কের নাম অতনু। অক্সফোর্ডে শিক্ষিত সুদর্শন সপ্রতিভ বাঙালি যুবক। নায়িকা হেলগা নামে এক ডেনিস সুন্দরী। তিনি সুশিক্ষিত বাঙালি যুবক অতনুকে ভালবেসে জীবনসঙ্গিনী হয়েছেন তাঁর। ভারতীয় নাম নিয়েছেন এই পশ্চিমি কন্যা। সবাই বলেন হিমঝুরি। ওঁদের সঙ্গে হাঙ্গেরিয়ান দম্পতির প্রথম পরিচয় ভারতের পথে সেই জাহাজে। জানা যায় অতনুও দেশে পৌঁছে অধ্যাপক হিসাবেই যোগ দেবেন শান্তিনিকেতনে, বিশ্বভারতীতে। সহযাত্রীরা অচিরেই প্রতিবেশী হবেন। সুতরাং হিমঝুরির সঙ্গে রোজার বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লাগে না। তিনি লক্ষ করেন, হিমঝুরি অতনুকে ভালবাসতে গিয়ে ভালবেসেছেন ভারতকেও। ভারতের যা-কিছু সবই আপন করে নিতে চাইছেন এই পশ্চিমি মেয়ে। ক্রমে তাই নিয়ে সংঘাত। পশ্চিমে শিক্ষিত অতনু বাইরে বাঙালি হলেও ভেতরে ভেতরে পুরোপুরি যেন ইউরোপিয়ান। পশ্চিমের জীবন শিক্ষা সংস্কৃতি বিজ্ঞানমনস্কতা যান্ত্রিক উন্নয়ন সব-কিছুর মধ্যেই তিনি যেন খুঁজে পান জীবনের পরিপূর্ণতা। অন্য দিকে তাঁর প্রিয় সঙ্গিনী এবং সহধর্মিণী হিমঝুরি দিনে দিনে ভারতকন্যায় পরিণত হতে চলেছেন। স্বামীকে ভালবাসতে গিয়ে এ দেশের সব-কিছুকেই ভালবেসে আপন করে নিচ্ছেন তিনি। হিমঝুরি খাদির শাড়ি পরে, এবং ভারতীয়দের সঙ্গে সহমর্মিতায় গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলনেও জড়িয়ে পড়েন। অতনু কিছুতেই তাকে রাশ টেনে রাখতে পারেন না। তিনি ক্রমেই হতাশ। হিমঝুরি বুঝতে পারেন না, অতনুর এই নৈরাশ্যের হেতু কী। ভারতীয় নারীর মতো তিনিও তো সমর্পিতপ্রাণ।

পূর্বদেশের নায়ককে পশ্চিম টানে। পশ্চিমের নায়িকাকে পূর্বের সভ্যতা, সংস্কার, সংস্কৃতি। বিচ্ছেদ বুঝিবা অনিবার্য হয়ে ওঠে। আর তখনই সহসা শান্তিনিকেতনে টগবগে সর্ব-সংস্কারহীন স্বচ্ছন্দ স্বাধীন জার্মান তরুণী গার্ট্রুড-এর আবির্ভাব। অবশ্য অতনু নয়, গার্ট্রুডের প্রেমে পড়ে যান নবাবজাদা আলি হায়দর। দু'জনের মধ্যে পূর্বরাগ চলতে থাকে। রোজা এবং তাঁর স্বামী যখন দার্জিলিঙে তখন ওঁদের সহযাত্রী ছিলেন অতনু আর হিমঝুরি। সেবার ওঁরা যখন মুর্শিদাবাদে বেড়াতে যান, তখন তার ব্যবস্থা করেছিলেন নবাবজাদা আলি হায়দর। ওঁদের সঙ্গে ছিলেন গার্ট্রুড। রোজার মারফতে আলি হায়দর গার্ট্রুডকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিয়ের। গার্ট্রুড ভেবে দেখব বলে তখনকার মতো এড়িয়ে গিয়েছিলেন। প্রণয় পর্বে অতএব তখনই ছেদ পড়েনি। ক্রমে ত্রিকোণ কাহিনী গড়ে ওঠে। আলি হায়দর শান্তিনিকেতন থেকে ঘরে ফিরতে বাধ্য হন। অতনু একদিন আবিষ্কার করেন হিমঝুরি থেকে

তিনি অনেক দূরে সরে এসেছেন। তাঁর সামনে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের পশ্চিমের এক কন্যা। ওঁরা ধীরে ধীরে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যান। সুরুলের হাসপাতালের সামনে অতনু মোটর নিয়ে অপেক্ষা করেন। গার্ট্রুড কাজ সেরে ওঁর পাশে গিয়ে বসেন। কাহিনী এগিয়ে চলে।

এই উপন্যাসের সূচনা মাত্র, শুনতে পাই, কিছু কিছু পাঠক আঁতকে ওঠেন— না, না কিছুতেই তা সত্য হতে পারে না। তাঁরা এখানেও ইচ্ছাকৃতভাবে কুৎসা প্রচারের অভিযোগ আনেন রোজার বিরুদ্ধে। কেননা, গল্পের নায়ক আর নায়িকা স্পষ্টতই একজন শ্রদ্ধেয় বাঙালি অধ্যাপক এবং তাঁর পশ্চিমি পত্নীর ছায়া। যাঁরা এভাবে নিজেদের কল্পনাকে প্রসারিত করে স্বেচ্ছায় বেদনাবোধ করতে চান, কিংবা নিখরচায় উপভোগ করতে চান পরিচিত মানুষের জীবনের অজ্ঞাত স্ক্যান্ডাল, তাঁরা নিজ দায়িত্বেই তা করুন। আমার মনে হয় না এভাবে বিশেষ কারও সঙ্গে মিলিয়ে এই উপন্যাস পড়াটা খুব জরুরি। চরিত্র দুটি কতখানি বাস্তব এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে, সেটাই কি উপন্যাস পাঠে বেশি প্রাসঙ্গিক নয়? কায়া যখন চোখের সামনে তখন অহেতুক ছায়া খুঁজে খুঁজে হয়রান হব কেন? আমরা বরং উপন্যাসের পরিণতি কী, তাই জানতে বেশি আগ্রহী। আর সত্যি বলতে কী, সেখানেই হতাশ করেছেন রোজা।

আমরা দেখি একসময় আলি হায়দরকে মন থেকে পুরোপুরি ছুটি দিয়ে দিয়েছেন গার্ট্রুড। আলির ভালবাসা নিয়ে তাঁর কোনও সংশয় নেই। সংশয় নবাবের প্রাসাদে চার দেওয়ালের ভেতরে একবার বন্দি হলে তার পর? সুতরাং অতনুর কাঁধে কাঁধ রাখেন গার্ট্রুড। ওদিকে জেলখানা, সবরমতী আশ্রম, ভারতীয়দের নব নব সংস্কার আত্মস্থ করে দীক্ষা সাঙ্গ প্রায় হিমঝুরির। অতনু শেষ পর্যন্ত মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। একটি চিঠি লিখে তিনি হিমঝুরির কাছ থেকে পালিয়ে যান। চিঠিতে লেখা, চেক রইল, ওই অর্থে দেশে ফিরে যেয়ো। 'হে বন্ধু বিদায়' স্টাইলে লেখা চিঠি। অতনুর সঙ্গে শোনা গেল, যুগপৎ গার্ট্রুডও উধাও। কবি সান্ত্বনা দেন হিমঝুরিকে— আমি তাঁকে ফিরিয়ে আনবই। রোজারা কাশ্মীরের দিকে যাচ্ছে জেনে কবি হিমঝুরিকে ওঁদের সঙ্গে দিলেন। আর, ঘুরতে ঘুরতে দূর কাশ্মীরে হঠাৎ অতি নাটকীয়ভাবে উপন্যাসের অপমৃত্যু।

ক্ষিপ্ত আলি হায়দরকেও দেখা যায় কাশ্মীরে। গার্ট্রুডের প্রেমে তখন তিনি উন্মাদ-প্রায়। তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন দেশময়। চার দিকে নাকি ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর লোকজন। এ সংবাদও তিনি রাখেন যে গার্ট্রুডও পালিয়েছেন অতনুর সঙ্গে। আমরা আবার ত্রিভুজের অন্তর্গত। শেষ দৃশ্য: গুলমার্গে দূরবিনের চোখে ধরা পড়েছেন অতনু আর গার্ট্রুড। ঘোড়ার পিঠে পুব আর পশ্চিম। পাশাপাশি, কাছাকাছি। উন্মত্ত আলি হায়দর ছুটে যান তাঁদের দিকে। ধস্তাধস্তি। একসময় পিস্তলের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয় পাহাড়ে পাহাড়ে। সে ধ্বনি যখন শান্ত হয়, মাটিতে তখন হাহাকার। গার্ট্রুডের প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে শীতল মৃত্তিকায়। বিমূঢ় শোকস্তব্ধ অতনু। আলি হায়দরের কাতর উক্তি, আমি ওকে মারতে চাইনি। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি এমন এক বিয়োগান্ত নাটক যা সমগ্র উপন্যাসের পক্ষে সম্পূর্ণ বেমানান এক উপসংহার। অথচ কী আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গেই না রোজা গড়ে তুলেছিলেন অতনু আর হিমঝুরির প্রণয় এবং ক্রমে দু'জনের মধ্যে দূরত্বকে। অতনু আর গার্ট্রুড-এর প্রেমকেও যেভাবে দক্ষতার সঙ্গে ধীরে ধীরে নির্মাণ করেছেন তিনি, তাও রীতিমতো পাকা হাতের কাজ। তুলনায় এই উপসংহার অনেকটা সস্তা হিন্দি চলচ্চিত্রের মতো হয়ে গেল নাকি? আমরা আরও অবাক হয়ে যাই যখন দেখি এখানেও প্রথাসিদ্ধ সতীত্বের জয়জয়কার।

অতনু আবার ফিরে আসেন তাঁর পতিগতপ্রাণ ধর্মপত্নীর কাছে। এবং অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে পড়ে যায় 'যোগাযোগ'-এর 'কুমু'-র কথা। সে স্বামীর কাছে ফিরে গিয়েছিল। কারণ পেটে তার স্বামীরই সন্তান। হিমঝুরিও অতনুকে বলেন, আমার গর্ভে তোমার সন্তান।

অস্বস্তিকর এবং অপছন্দের এই উপসংহারটুকু বাদ দিলে মানতেই হয় রোজা এই উপন্যাসে একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত করেছিলেন। সে দ্বন্দ্ব পুব বনাম পশ্চিমের। যেভাবে এই মৌলিক প্রশ্নটি তিনি তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন তা আমাদের চোখে যথার্থ হয়ে উঠেছিল। আমরা শান্তিনিকেতনের ধ্যানেও কি একই প্রশ্নেরই মুখোমুখি দাঁড়াই না? রোজা তাকে ব্যক্তিজীবনে স্থানান্তরিত করে আরও স্পষ্ট ও প্রখর করে তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন কই? আমরা তাঁর উপন্যাসে আবার পুব আর পশ্চিমের মিলন প্রত্যক্ষ করি বটে, কিন্তু সে কি সত্য সত্যই পুব আর পশ্চিমের মিলন? গার্ট্রুড আর অতনুর মধ্যে যে চিরবিচ্ছেদ ঘটে গেল, সেটা কি অতনুর ঘরে ফেরার চেয়ে বেশি সত্য নয়? অথচ হিমঝুরি তাঁর স্বামীকে ফিরে পেলেন কিন্তু সম্পূর্ণ আপন শর্তে। সে-শর্তে তিনি পশ্চিমি নারী নন, পতিব্রতা সনাতন ভারতীয় রমণী।

এই উপসংহার, বলতে দ্বিধা নেই, আমার মোটে ভাল লাগেনি। তবু শুধু এ-কারণে 'ফায়ার অব বেঙ্গল' বাতিল করে দিতে আমি সম্মত নই। কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি, এবং কখনও কখনও সাংস্কৃতিক অসহিষ্ণুতা এবং উন্নাসিকতার লক্ষণ ধরা পড়লেও এ-বই নিঃসন্দেহে এক উচ্চমানের সাহিত্য। তাঁর দৃষ্টির দ্যুতি তথা পর্যবেক্ষণ শক্তি, তাঁর মননশীলতা, তাঁর বোধের গভীরতা,— একই সঙ্গে অমলিন রসসৃষ্টির ক্ষমতা দেখে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। তাঁর স্নিগ্ধ স্মিত রসিকতা অবলীলায় পাঠকের ঠোঁটের কোণেও সংক্রামিত করে অনুচ্চারিত নির্মল হাসি। চাবুক হাতে ঘোড়সওয়ার রাজপুরুষ ব্রোঞ্জের উটরাম ক্রমাগত চক্কর খাচ্ছেন গায়ে এবং মাথায় বসা পাখিদের তাড়াতে, কিন্তু উপদ্রব কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না,— এ-রকম একটি ছবির কল্পনা কি যে-কোনও লেখকের আয়ত্ত? কিংবা সুদর্শন সিংহলি যুবক উইলিয়াম অ্যারিয়ামকে যখন কৌতুক করে আমরা নাম দিলাম 'উইলিয়াম দ্য কংকারার' তখন রীতিমতো গর্বিত বলে মনে হল তাঁকে, এ-ধরনের অনেক বাক্যই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই বইয়ে। কলকাতার গরমে রোজাদের সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন মহলানবিশ, শান্তিনিকেতন কিন্তু তুলনায় ঠান্ডা। কেন? উঁচুতে কিনা তা-ই। কূটনীতিকের মতো উত্তর দিয়েছিলেন মহলানবিশ।— কত উঁচু?— আশি ফুট!

রোজা শুধু আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করেন না, কখনও কখনও তিনি কাঁদেনও। অবিস্মরণীয় বইয়ের শেষ পাতাখানা। ঘরে ফিরছেন ওঁরা। জাহাজ ভূমধ্যসাগরে। চোখের সামনে যেন ভাসছে তাজমহল, দার্জিলিঙে ফুলে ঢাকা একটি কবর, কাশ্মীর, কানে শান্তিনিকেতনে পাখির কাকলি। রোজা লিখছেন— হঠাৎ একটি তীর যেন আমার হৃদয় বিদীর্ণ করে গেল। আমি জাহাজের রেলিং আঁকড়ে ধরলাম, আমার চোখে জলের ধারা। আমি আবার ঘর-কাতর।— এবার ভারতের জন্য! সেই ভারত যা অলৌকিক।

এই নারী কি নিছক এক পরদেশি নিন্দুক? এ মেয়ে কি আমাদের পর!

রোজা হাজনোকজি, 'ফায়ার অব বেঙ্গল', দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৩

কথায় ও আত্মকথায় নীরদচন্দ্র
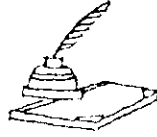
নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে আমি যখন প্রথম দেখি তখন তিনি মোটেই আমার কাছে 'অজ্ঞাত ভারতীয়' নন। সেটা পঞ্চাশের দশকের শেষ অথবা ষাটের দশকের প্রথম দিকের কথা। ততদিনে তাঁর আত্মজীবনী আমার পড়া হয়ে গেছে। বইটি সম্পর্কে আগের দশকে যে-বিতর্ক হয়ে গেছে তার কিছু কিছু নমুনা আমার জানা ছিল। 'পরিচয়'পত্রে সমালোচনা লিখেছিলেন সুশোভন সরকার। 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ সরোজ আচার্য। তা ছাড়া নীরদচন্দ্র তখন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এ সপ্তাহে সপ্তাহে লিখছেন। আমি তাঁর নিয়মিত পাঠক। ব্যক্তি নীরদচন্দ্র সম্পর্কেও ভাসা-ভাসা ধারণা ছিল। দিল্লিতে তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের মধ্যে আমার দুই-একজন সাংবাদিক বন্ধু ছিলেন। তাঁদের মুখে কিছু গল্প শুনেছি। ডম মোরায়েজ এবং বেদ মেটার কলমে তাঁর সকৌতুক কাহিনী শুনেছি। শুনেছি নতুন লেখক ষষ্ঠীব্রতের মুখে, এবং পরিমল রায়ের নাম-না-করে লেখা ব্যঙ্গাত্মক রচনায়। ষষ্ঠীব্রত বলছিলেন— আশ্চর্য লোক বটে, দেখা করতে গিয়ে কী বিপদেই না পড়েছিলাম! বেল বাজাবার পর আদুর গায়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন ছোটখাটো মানুষটি। ইংরেজিতে বললেন— কী নাম? ষষ্ঠীব্রাটা। তিনি ভ্রূ কোঁচকালেন, বললেন, সে আবার কেমন নাম? তবে কি ষষ্ঠীব্রত? ষষ্ঠীব্রত, পদবি কী? বললাম— চক্রবর্তী। দেশ— বললাম— বরিশাল। বাঙালির ছেলে, তবে আমার কাছে ইংরেজি ফলাতে এসেছ কেন? বেরোও! দড়াম করে নাকের ডগায় বন্ধ করে দিলেন দরজা। তাঁর সঙ্গে আর কথা বলা হল না।

সেই নীরদচন্দ্রের মুখোমুখি আমি। ঘটনাস্থল— আনন্দবাজার অফিস। সরোজ আচার্য মশাইয়ের ঘর। আমাকে দেখে নীরদচন্দ্র কথা থামিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সরোজবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। সরোজবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্নেহবশত আমার সম্পর্কে দু'-একটা ভাল বাক্যও বললেন। নীরদচন্দ্র আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। আবার শুরু হল কথার ফোয়ারা। দিল্লির কথা। দিল্লির বাঙালির কথা। নিজের কথা। নিজের লেখালেখির কথা। তিনিই একমাত্র বক্তা। সরোজবাবু আর আমি শ্রোতা। কথায় কথায় একসময় ইউরোপের কথাও এল।— হ্যাঁ, শিভ্যালরি। নীরদবাবু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে

পড়লেন, তার পর আমার একটা হাত মুখের কাছে নিয়ে আলতো করে চুমু খেলেন। মুখে তৃপ্তির হাসি। বললেন— পারবে একালের ছেলেছোকরারা প্রেম নিবেদন করতে? তার পর লড়াই-খ্যাপার মতো আরও একটা কাণ্ড করে বসলেন তিনি। হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে চেয়ারে উঠে সটান দাঁড়িয়ে গেলেন। যেন জিমনাস্টিক দেখাচ্ছেন। সরোজবাবু মিটিমিটি হাসছেন। সম্ভবত তিনি এই খেলা আগেও দেখেছেন। এবার কি তবে আমাকে নতুন দর্শক পেয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন? কে জানে! ঠান্ডা হয়ে বসার পর এক সুযোগে বললাম— আমি আপনার ভদ্রাসন দেখেছি। আত্মজীবনীর সেই বনগ্রামে আমি একাধিকবার গিয়েছি। সেই পুকুরটিও দেখেছি।— তাই নাকি! নীরদচন্দ্র অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখেমুখে বিস্ময়। বললাম— সম্ভবত উপেন্দ্রকিশোর রায়ের বাড়িও আমি দেখেছি। কারণ, যতদূর মনে পড়ে গচিয়াহাটা স্টেশনে নেমে বনগ্রামের পথ মশুয়ার পাশ দিয়েই গিয়েছে। তিনি আরও অবাক হলেন। বললেন, আপনার দেশ কি ময়মনসিংহ? উত্তর শুনে কী ভাবলেন, জানি না। আমার মনে হল তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন। সুতরাং সাহস করে মাঝে মাঝে বাচালতা প্রকাশ করতে লাগলাম। সব কথা এখন আর মনে নেই। তবে একটা ঘটনা মনে পড়ে। বাঙালি প্রসঙ্গে যখন কথা চলছে তখন আমি বললাম— স্টিভেনস নামে গত শতকের একজন ইংরেজের লেখা 'ইন ইন্ডিয়া' নামে একটা বই পড়েছিলাম। তাতে বাঙালি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন তাদের পা দেখলেই বোঝা যায় ওরা দাসের জাত। নীরদবাবু ঝটিতি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন সে-লেখা আমিও পড়েছি, কিন্তু দেখুন, আমার পা অন্যরকম। তিনি ট্রাউজারস গুটিয়ে পায়ের পেশি দেখালেন! কলমে পেশি প্রদর্শন এক কথা, তাই বলে সত্যসত্যই পেশি দেখানো! তাও দেখলাম। এবং প্রথম দর্শনেই। মনে মনে ভাবলাম আমিও বঞ্চিতের দলে নই। নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পর্কে যে-সব উদ্ভট কাহিনী শুনেছি, অতঃপর অনায়াসে আমি এই কাহিনীটিও জুড়তে পারি।

নীরদচন্দ্রের সঙ্গে সেবারই দ্বিতীয় বার আমার দেখা ক্রিক রো-তে তাঁর ভাই প্রখ্যাত শিশুচিকিৎসক ক্ষীরোদ চৌধুরী মশাইয়ের বাড়িতে। সঙ্গে ছিলেন সাংবাদিক-বন্ধু হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড-এর সন্তোষ বাগচী। বাড়ি চেনাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন— দেখবেন ওই রাস্তায় একটিমাত্র বাড়িতে একটি 'ক্রিপার' উঠে গেছে। ও পাড়ায় আর কারও বাড়িতে কোনও লতানো গাছ নেই। সুতরাং বাড়ি চিনতে অসুবিধা হল না। খবর পেয়ে দোতলায় ডাকলেন। গিয়ে দেখি তিনি অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত। বললেন, একটা ডিনারে যেতে হবে। তৈরি হচ্ছি।— এই দেখুন, আসুন আমার সঙ্গে। বলে আমাদের পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। একটা খাটের উপর সাজানো রয়েছে ডিনারের পোশাক। আন্ডারওয়ার থেকে কোট, রুমাল— কিছু বাদ নেই। বিলাত থেকে ফেরার পর সেই প্রথম কলকাতায় আসা। বললেন, অমুককে দিয়ে স্যুটটা তৈরি করিয়েছি। দাম পড়ল—। তার পর আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগলেন কোনটার পর কী পরবেন। স্ফূর্তিতে ভরপুর বালকের মতো কাণ্ডকারখানা। তার পর যা করলেন তা আরও হাস্যকর। সে-ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি আবার ঢুকলেন। তার পর দু'হাতে বুকে ধরে হাজির করলেন গুচ্ছের শিশি-বোতল-কৌটো।— প্রসাধনী। বললেন— হ্যাঁ, এগুলো আমার। আমিই সব ব্যবহার করব। আমার স্ত্রীর জন্য রয়েছে অন্য সেট। সবই বিলাতি। বুঝতে পারলাম আজ অন্য কোনও কথাবার্তা হবে না। কারণ, সন্ধে হয়ে গেছে। প্রসাধন এবং সাজগোজ করতে ওঁর সময় লাগবে। একসময় স্ত্রীকেও তাড়া

দিলেন। বললেন, হ্যাঁ, তিনিও আমার সঙ্গে যাবেন। আমি স্বামী-স্ত্রীর পৃথক সামাজিক জীবনে বিশ্বাস করি না। এতক্ষণে এই একটা স্থির বক্তব্য শোনা গেল। সেদিন দ্বিতীয় আরও একটা কথা বলেছিলেন কথাচ্ছলে। বলেছিলেন, আমি এই ভাইয়ের বাড়িতে উঠেছি কারণ এঁরা ইংলিশ ফুড খান। আমি নামমাত্র দানাশস্য খাই। খাই মাংস আর কিছু সবজি। পরে নিজের লেখায় আরও বিশদ করেছেন তাঁর খাদ্যতত্ত্ব। লিখেছেন—'হিন্দু বিধবার মতো 'একাহারী' হইলেও আমি নিরামিষাশী হই নাই। আমি মনে করি, সর্বভুক না হইয়া নিরামিষাশী হইলে আমি মনুষ্য না থাকিয়া গো-জাতীয় জীবে পরিণত হইব।' এই তত্ত্বকে আরও সম্প্রসারিত করে অন্যত্র বলেছেন— তাঁর বিশ্বাস ভারতীয়দের যা খাদ্যাভ্যাস তাতে তাদের পক্ষে ভাল ইংরেজি লেখা সম্ভব নয়! হাস্যকর তত্ত্ব, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-সব নিয়েই নীরদচন্দ্র চৌধুরী। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তিনি প্রথম সাহেবি পোশাক পরেছেন। প্রথম মদ্যপান করেছেন পঞ্চাশ বছর বয়সে। প্রথম বিলাতযাত্রা সাতান্ন বছর বয়সে। অথচ মদ্যপান সম্পর্কে তিনি বাংলা আত্মজীবনীতে লিখেছেন—'দেশেও আমি যথাসম্ভব উচ্চশ্রেণীর ওয়াইন কিনিতাম, এখানে (অক্সফোর্ডে) উচ্চতম শ্রেণীর কিনি। এই শ্রেণীর মদ্য দূরে থাকুক, গলাধঃকরণের মতো মদ্যও দেশে থাকিলে পাইতাম না। এখানে আমি যে-সব 'ওয়াইন' কিনি তাহার নাম করিলে নিজের জাঁক দেখাইবার মতো হইবে।' তার পরও যেন জাঁক দেখানো বাকি রইল। একজন ইংরেজ অনুরাগী তাঁর এইসব কথাবার্তাকে বলেছেন— 'চিয়ারফুল ননসেন্স!' নীরদচন্দ্র তবু অপ্রতিরোধ্য।

সেবারই ক্রিক রো-র ওই বাড়িতেই দ্বিতীয় বারের মতো ফের আবার তাঁর মুখোমুখি। কোনও 'সাক্ষাৎকার'-এর প্রস্তাব ছিল না, ছিল না কোনও প্রশ্নোত্তর পর্বও। খুব একটা কথাবার্তা হয়েছে তা-ও বলা যাবে না। তিনিই কথক, আমরা শ্রোতা মাত্র। আর কথা বলতে, বেশির ভাগই নিজের কথা। কীভাবে সাহেবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টাকা না থাকা সত্ত্বেও একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে দামি ডিনার সেট কিনেছিলেন তার গল্প। দিল্লির সরকারি আমলাদের সম্পর্কে তাচ্ছিল্যও তিনি গোপন করলেন না। বললেন— একদিন পরিচিত একজন উচ্চপদস্থ আমলা আমার হাতে একটা দামি হুইস্কির বোতল ধরিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, এটা এখন রাখুন, আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি। শুনে আমি প্রচণ্ড রেগে গেলাম। বললাম— যাঁরা মাগের ভয়ে লুকিয়ে মদ্যপান করেন আমি তাঁদের সঙ্গে পানাহারে রাজি নই। আমার মূর্তি দেখে তিনি সুড়সুড় করে পালিয়ে গেলেন। একসময় বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কথা উঠল। পরিষ্কার বললেন— আপনাদের 'আধুনিক' সাহিত্য আমি পড়ি না। কোথাও থামাতে হয়, তাই না? তবু বললাম অমুকের মেঘদূত পড়েছেন? কার লেখা বললেন? আবার সেই বিশিষ্ট লেখকের নাম বললাম। বললেন ওটি একটি মর্কট। সংস্কৃত জানেন না, তবু বসেছেন মেঘদূত অনুবাদ করতে! তাঁর একজন বাঙালি সমালোচকের কথা বললাম— ওঁর লেখা পড়েছেন? কেন পড়ব? কাগজে কাগজে আমার লেখার কত সমালোচনাই না ছাপা হয়। আমি উত্তর দিতে যাব কেন? তার মধ্যে 'বগ্‌ড ডাউন' হয়ে গেলে আমি নিজের লেখা কখন লিখব? তবে হ্যাঁ, লক্ষ করবেন কারও লেখায় যদি সত্যকারের কোনও প্রশ্ন থাকে তবে তা আমি মনে রাখি, পরে কোনও লেখার মধ্যে পাইকারিভাবে সে-সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিই। সে দিন একমাত্র ভাল কথা যা তিনি বলেছিলেন তা বাঙালি মেয়েদের সম্পর্কে। বলেছিলেন, বাংলার এবং বাঙালির অবস্থা

নৈরাশ্যজনক। একমাত্র ভরসা হয় বাঙালি মেয়েদের দেখে। বাঙালি সংস্কৃতি এদের মধ্যেই এখনও বেঁচে আছে। দিল্লিতে পঞ্জাবি মেয়েদের দেখি, ওরা অসংস্কৃত, বন্য। যৌনতা ছাড়া যেন ওদের আর কিছু নেই। অন্য দিকে বাঙালি মেয়েদের মধ্যে দেখি সভ্য নম্র সুসংস্কৃত চলনভঙ্গি। তারা কথা বলে অনুচ্চ স্বরে। তাদের মধ্যে রয়েছে কোমল লাবণ্য।

এর পর নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে আবার দেখা কিছুকাল পরে। দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রার আগে। সেবার তিনি উঠেছিলেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে দাদা চারুচন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে। যাওয়ার আগে খবর পাঠিয়েছিলাম। বললেন, সকালের দিকে আসুন। চারুবাবুর সঙ্গে আনন্দবাজারের সুবাদে পরিচয় ছিল। তিনি মাঝেমধ্যে আমাদের অনুরোধে কাগজে লিখতেন। বাড়িটাও জানা ছিল। যথাসময়ে হাজির হলাম। কড়া বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে সামনে হাজির নীরদচন্দ্র। পরনে খাটো ধুতি। গায়ে পাঞ্জাবি। এক গাল হেসে বললেন— কী, আপনারা তো বলেন নীরদ চৌধুরী সাহেব! কোনও বাঙালি সাহেব কি এভাবে দরজা খুলে দিত? তার আগে খানসামা পাঠাত। তার পর কোটপ্যান্ট পরে আধঘণ্টা পরে নিজে দর্শন দিত। বলি, দিল্লিতে বাঙালির পতাকাটাকে কে তুলে ধরে রেখেছে? এই নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

সেবার উপলক্ষ একটা ছিল। সেটি ছিল আমার এক পরিবারিক বিপর্যয়। নীরদচন্দ্র তা জানতেন। সুতরাং প্রথমেই আলোচনা শুরু হল মৃত্যু নিয়ে। সেবারেই তিনি প্রথমে আমাকে বলেছিলেন তাঁর কোনও প্রিয়জনের মৃত্যু তিনি চাক্ষুষ করেননি। সর্বক্ষেত্রে বিয়োগান্ত নাটক ঘটে গেছে তাঁর অনুপস্থিতিতে। বললেন— আবাল্য আমি মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলাম। শরীর রুগ্ণ। ক'দিন বাঁচব সেই ছিল ভাবনা। পরিবার-পরিজন সম্পর্কেও উদ্‌বেগ ছিল। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতাম দুরুদুরু বুকে। দূর থেকে দেখতাম ঘরে আলো জ্বলছে কি না। কাছে এসে যদি শুনতাম রেডিয়ো চলছে তবে নিশ্চিত হতাম। যাক, তবে সব ঠিকঠাক আছে। পরবর্তীকালে নিজেই লিখেছেন, 'আমার উচ্চতা পাঁচ ফুট আধ ইঞ্চ, ওজন এক মণের সামান্য উর্ধ্বে সারাজীবন ধরিয়া; দেহ হাড়-জিরজিরে কৃকলাশের মতো।'

আটচল্লিশ বছর বয়স থেকে তিনি পুরোপুরি দন্তহীন। চশমা চোখে উঠেছে আরও আগে থেকে। সে-কারণেই লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যোদ্ধারও ছিল বিশেষ সাধনা। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন সেই সাধনারই এক দিক। এক জায়গায় লিখেছেন নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তিনি বিজ্ঞাপন দেখে 'স্যান্টোজেন' খেতে আরম্ভ করেছিলেন কারণ, বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল সেটা খেলে 'বৃষের মতো' শক্তি হয়। তা নিয়ে নিজেও রসিকতা করেছেন। বলেছেন— খাওয়ার পর তিনি ছাগশিশুও হতে পারেননি। সে দিনই জেনেছিলাম তিনি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। পরজন্মেও না।

কথায় কথায় সেদিন তিনি তাঁর দিল্লির বাড়ি সম্পর্কে বললেন— আমি ভাড়া বাড়িতে থাকি, নিজের মর্জিমতো থাকি। বাড়িওয়ালা কবে কী করে দেবেন তার অপেক্ষায় না থেকে আমি আমার বাড়ি নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছি। উঠে গিয়ে বাড়ির রঙিন ছবি নিয়ে এলেন। দেখুন, বিলেতের বাড়ির মতো সামনের দিকটা কাচে ঘেরা। জানালায় দামি পর্দা। অনেক বাঙালি ভাবে আগে নিজের বাড়ি হোক, তার পর মনের মতো পর্দা টাঙাব। আমি এ-সবের মধ্যে নেই। যখন যেখানে থাকি সেটাই আমার বাড়ি। এই দেখুন, বৈঠকখানার দেওয়ালে শায়িত ভেনাস। অরিজিন্যাল কোথায় পাব? দামি প্রিন্ট। বাঙালি ভদ্রলোক

ভদ্রমহিলারা দেখে চোখ ফিরিয়ে নেন। মনে করেন অশ্লীল ছবি। শিল্পসাহিত্যে রুচি রাতারাতি হয় না। তার জন্য চর্চা চাই। চাই মানসিক পরিবেশ। আমার এক ছেলে শ্যামদেশীয় কন্যা বিয়ে করেছে। আমি খুশি। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কিশোরগঞ্জকে পিছনে ফেলে আমি যেখানে পৌঁছেছি আমার ছেলেদের তার চেয়েও এগিয়ে যেতে হবে, এভাবেই না গড়ে ওঠে পারিবারিক ঐতিহ্য। আমার এক নাতনির নাম রেখেছি— পপাগিনা। বলুন তো এটা কীসের নাম? মনে মনে শঙ্কিত আমি। ভাবলাম বুঝিবা এবার সেই বহুশ্রুত 'কুইজ মাস্টার'-এর হাতে পড়লাম। ইয়ান জ্যাক লিখেছেন— নীরদচন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—১৯৩৯ সালে ব্রিটেনের কয়টি যুদ্ধজাহাজ ছিল এবং সেগুলোর নাম কী। বলেই মন্ত্রের মতো নামগুলো বলে যেতে লাগলেন। বললেন— জাপানি জাহাজগুলোর নাম বলব? তার পর বললেন— নেপলিয়নের বাইশজন মার্শালের নাম বলতে পার? আমি পারি। 'আমি পারি' এই উচ্চারণেই প্রশ্নের ফাঁদে পড়া সকলের মুক্তি। আমারও। বললেন— জানেন না? এটি বিটোফেনের একটি গৎ!

তার আগে নীরদচন্দ্র ম্যাক্স মুলার ভবনে এক বক্তৃতায়, বক্তব্যে যত না শ্রোতাদের চমকে দিয়েছিলেন তাঁর পোশাকে এবং আচমকা একটি তলোয়ার বের করে তার থেকেও বেশি চমকিত করেছিলেন। পোশাকটি অষ্টাদশ শতকের বিশেষ শ্রেণীর সাহেবদের পরিচ্ছদ। বিস্তর পয়সা খরচ করে তিনি বিলাত থেকে সেটি করিয়ে এনেছিলেন। উপস্থিত শ্রোতারা সেটি দেখে হেসে খুন। পণ্ডিত না জোকার? মনে মনে অনেকের প্রশ্ন। তলোয়ারটি টেবিলে রেখে গম্ভীরভাবে বললেন, এই অস্ত্র নিয়ে আঠারো শতকের অমুক সালে অমুক তারিখে আলিপুরে ওয়ারেন হেস্টিংস এবং ফিলিপ ফ্রান্সিসের ডুয়েল। দু'-চারজন উৎসাহী শ্রোতা বললেন— দেখি; — দেখি; নীরদচন্দ্র সফল। আমি সে-সভায় হাজির ছিলাম না। যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছে শোনা। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি কাগজে সতর্ক পাঠকের চিঠি— এ-সব ধোঁকাবাজি। নীরদ সি চৌধুরী সে-অস্ত্র কোথায় পাবেন? আমরা শুনেছি লড়াই হয়েছিল পিস্তলে, আর তা আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে। যথারীতি নীরদচন্দ্র কোনও উত্তর দেননি। এক ফাঁকে আমি তাঁকে বললাম— সেদিন সভায় এ-সব করতে গেলেন কেন? বললেন— স্রেফ মজা করার জন্য। নাটকীয় কিছু করা গেল। নয়তো লোকে বক্তৃতা শুনবে কেন?

সেদিনের ওই আলোচনায় ম্যাক্স মুলার ও তাঁর পরিবার প্রসঙ্গে কিছু বললেন। তিনি ম্যাক্স মুলারের জীবনী লিখছেন, জানতাম। জানতাম না তাঁর মাথায় তখন বইয়ের পর বই। কত না বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন তিনি। বললেন, প্রথমে লিখব— বাঙালি জীবনে ইউরোপীয় সংসর্গের অভিঘাত নিয়ে। নারী নিয়ে বাংলা লিখেছি। এবার লিখব প্রকৃতিপ্রেম নিয়ে। তার পর— তার পর—। তারই মধ্যে এক ফাঁকে বের করলেন ছোট্ট একটি পুস্তিকার কপি—'পাশ করা মাগ।'— লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে পেয়েছি। বটতলার বই। আরও অনেক মজার মজার বই রয়েছে। আমাদের সমাজকে বোঝার পক্ষে সেগুলিও পড়া দরকার। মনে হল, সময় পেলে তিনি বটতলার বই নিয়েও হয়তো একটা বই লিখে ফেলবেন। 'দেশ' পত্রিকায় অবশ্য 'পাশ করা মাগ' নিয়ে লিখেছিলেন, আর লিখেছিলেন 'ভোট মঙ্গল' নামে আর-একখানা বই নিয়ে। নাম না করলেও তাঁর লেখায় এখানে-সেখানে বটতলার বই থেকে উদ্ধৃতি চোখে পড়েছে। সে-সব অশিষ্ট বাক্য অবশ্যই কোনও প্রতিষ্ঠিত লেখকের কলমে উচ্চারিত নয়।

সেদিন কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল কাজের সূত্রে ফের বিলাত গেলেও তিনি হয়তো অগস্ত্যযাত্রা করবেন না। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি কেন গ্রহণ করেছিলেন সে-সম্পর্কে তিনি নিজে একাধিকবার কৈফিয়ত দিয়েছেন। যা হোক, বিদায়ের আগে তিনি ছোট্ট একটা গল্প শোনালেন। বললেন— কাল খুব তামাশা হয়েছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি গিয়েছিলাম সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। পরনে আমার সেই সাদা ঝালর দেওয়া লাল জ্যাকেট। কথাবার্তা শেষে বেরিয়ে আসছি, সুনীতিবাবু বললেন— ও নীরদবাবু, আপনার পকেট থেকে রুমালটা পড়ে যাচ্ছে। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললাম— সুনীতিবাবু, ওটা রুমাল নয়, স্কার্ফ। আর এটা পড়বে না, এটা এভাবে ঝুলেই থাকবে। এই পোশাকের সঙ্গে এই স্কার্ফ এভাবেই পরতে হয়। সুনীতিবাবু বললে— ও এই নাকি!

সেবারই ওঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। সেই যে বিলেত চলে গেলেন আর ফেরেননি। তাঁর সম্পর্কে খুশবন্ত সিংহ লিখেছেন— নীরদবাবুকে আমি জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সঙ্গে গ্রহনক্ষত্র নিয়ে আলোচনা করতে দেখেছি। ফরাসি সাহিত্যের অধ্যাপককে পঞ্চদশ শতকের ফরাসি কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে দেখেছি। দেখেছি— মদ্যব্যবসায়ীকে মদ্য বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিতে। একবার দেখেছি আইসল্যান্ডের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লেখক ল্যাক্সনেসকে তিনি আইসল্যান্ডের সাহিত্য বিষয়ে নানা কথা বলছেন। তিন-তিনবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলেও নীরদচন্দ্র আমাদের সঙ্গে কোনও বিশেষ বিষয়ে আলোচনা করেননি। এর কারণ হয়তো এই যে, দু'বারই তিনি ছিলেন ছুটির মেজাজে। প্রথমবার তাঁর মধ্যে ছিল বিলেত থেকে ফিরে আসার উত্তেজনা, দ্বিতীয়বার ফের বিলেত যাত্রার সম্ভাবনায় চঞ্চল। তা ছাড়া, তিনি হয়তো আমাদের কোনও বিশেষ বিষয়ে গভীর আলোচনাযোগ্য আগন্তুক বলে মনে করেননি। কারণ যা-ই হোক-না-কেন, তিনি নিজেকে বিদ্যার জাহাজ বলে জাহির করেননি। আমাদেরও মূর্খ বলে প্রতিপন্ন করেননি। সর্বক্ষণ তিনি ছিলেন সহজ স্বচ্ছন্দ নিপাট বাঙালি ভদ্রলোক।

পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে আবার যোগাযোগ ঘটে। অবশ্য পত্রযোগে। কখনও কখনও টেলিফোনে। প্রধানত উপলক্ষ ছিল আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য কোনও বিষয়ে লেখার প্রস্তাব নিবেদন। প্রয়োজনে সে-সম্পর্কে কাগজের তরফে বিশেষ কোনও দাবি থাকলে তা জানানো। তার মানে এই নয় যে, তাঁর কাছে ফরমায়েশি লেখা চাওয়া হয়েছে। বিষয়টা বিশদ করে বলা হয়েছে এই যা। তিনি কখনও আমাদের প্রত্যাখ্যান করেননি। প্রতিটি চিঠির উত্তর দিয়েছেন নিজের হাতে লিখে। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাঁর লেখা পৌঁছেছে সময়মাফিক। কখনও কখনও লেখার পিঠে তাঁর মাথায় অন্য লেখাও এসেছে। তাও তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। এভাবে বহুকাল পরে 'দেশ' ও 'আনন্দবাজারে' তাঁর বেশ-কিছু বাংলা রচনা প্রকাশিত হয়। বাঙালি পাঠক নতুন করে নীরদচন্দ্রের বাংলা রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান। আর আমি পাই অপরিমিত স্নেহ ও কিছু পরিমাণে আশকারা। অনেক চিঠি লিখেছেন তিনি আমাকে। সর্বশেষ তাঁর শতবর্ষ পূর্তির দিন-কয়েক আগে। সে-চিঠিও তিনি লিখেছেন নিজের হাতে। চিঠিগুলো ধীরে ধীরে জমে ওঠা কাগজপত্রের ভিড়ে কোথায় যেন পালিয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছি না। তবে দুটি চিঠির কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। একটিতে আলোচ্য ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদের সমস্যা।

লিখেছিলেন, একই গানে যখন রাত্রি বোঝাতে রজনী, যামিনী, বিভাবরী লেখা হয় তখন শুধু 'নাইট' দিয়ে তা কেমন করে প্রকাশ করা সম্ভব? 'বধূ' অনুবাদের সমস্যা নিয়েও কিছু লিখেছিলেন। আর-একটি চিঠিতে আলোচনা করেছিলেন আধুনিক বাংলা ভাষা বিষয়ে। গদ্যশিল্পী নীরদচন্দ্র একবার লিখেছিলেন, "আমি আধুনিক বাঙলা লিখিতে পারি না, প্রয়োজনও হয় না।... সত্য বলিতে কি আমি আজিকার বাঙলা বুঝিতেও পারি না। ইহা সাধু ভাষা ও কথিত ভাষার পার্থক্যের জন্য নয়, আমি বাঙলা সাধু ও কথিত দুই ভাষাই বুঝি। কিন্তু আধুনিক বাঙলা গদ্য, না আগেকার সাধু, না আজিকার মৌখিক ভাষা এই দুইটার কোনওটাই নয়।" এই তত্ত্বটাকেই কিছু উদাহরণ সহযোগে তিনি বিশদ করেছিলেন।

নীরদচন্দ্র কি 'কালাসাহেব'? তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডের উৎসর্গপত্রটি পড়ে অনেকের তা-ই ধারণা। কিন্তু আমার বিশ্বাস পুরো বইটি পড়লে এত সহজে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যেত না। তা ছাড়া এক অর্থে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি এবং ভারতীয়রা সকলেই কি কমবেশি সাহেব নয়? আমি একবার লিখেছিলাম আমাদের মানসলোকে এবং ব্যবহারিক জীবনে পশ্চিমি ভাবধারার প্রভাবের কথা যখন ভাবি তখন ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে মনে হয় আর-এক শ্রেণীর 'অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান', জাতি বা সম্প্রদায় অর্থে নয়, সাংস্কৃতিক অভিধায়। নীরদচন্দ্র আরও গভীরভাবে ভিক্টোরীয় এবং এডোয়ার্ডিয়ান ইংরেজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অবগাহন করে তার মধ্যে সংস্কৃতির একটি বিশেষ মানকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন এই যা। এ দেশের ইংরেজ রাজপুরুষ বা শাসককুল সম্পর্কে কিন্তু তিনি ছিলেন নির্মোহ, তাঁদের আচার-আচরণ মনোভঙ্গি এবং ব্যবহারিক জীবনের কঠোর কঠিন সমালোচক— তাঁরা উদ্ধত, সংকীর্ণচিত্ত এবং নীরদচন্দ্রের মতে জাতিবিদ্বেষে জর্জর। তিনি যাঁদের বলেছেন 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি', ইংরেজি-শিক্ষিত সেইসব ভারতীয় আমলা, লেখক এবং ভাবুকদের সঙ্গে আরও এক ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে তাঁর। তাঁর বইগুলোর মনোযোগী পাঠকরা জানেন ওইসব 'কালা সাহেব'-এর তুলনায় নীরদচন্দ্র অনেক বেশি ভারতীয়।

এই দেশের ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য সংস্কৃতি এমনকী প্রকৃতিকে তিনি যেমন গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তেমন অল্পজনই দাবি করতে পারেন। তাঁর বাঙালিত্ব সম্পর্কেও একই কথা। মনে রাখা দরকার, অক্সফোর্ড গত ত্রিশ বছর ধরে তাঁর ঠিকানা হলেও তাঁর ধ্যানের কেন্দ্রে ছিল ভারত এবং বাংলা। তার পর আধুনিক ইংল্যান্ড।

তাঁর রচনার ব্যাপ্তির কথা যখন ভাবি, তখন বিস্মিত হই। অবলীলায় তিনি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর বাংলা আত্মচরিত আলোচনা প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম— তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন প্রতিটি বিষয়। "এই ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য আজকের এই স্পেশালাইজেশন বা 'বিশেষজ্ঞদের' যুগে সাধারণত পল্লবগ্রাহিতা বলে গণ্য। কিন্তু এই বাঙালি-প্রতিভা নিছক পল্লবগ্রাহী নয়। তিনি তথ্যে, তত্ত্বে, শাণিত যুক্তি এবং প্রখর বুদ্ধিবলে পাঠককে হাত ধরে টেনে নিয়ে যান এমন এক এলাকায় যেখানে চোখ-কান বন্ধ করে আপন বিশ্বাস ও মতবাদ আঁকড়ে পড়ে থাকা প্রায় দুঃসাধ্য। তাঁকে অমান্য করা যায়, কিন্তু উপেক্ষা করা যায় না।"

কোনও কোনও পাঠক আছেন যাঁরা পড়বার মতো রচনা পেলে পড়তে আগ্রহী হন, তা লেখকের মতামত যাই হোক-না-কেন। আমি নিজেকে সেই শ্রেণীর পাঠক বলে মনে করি। আমি সমকালের এমন অনেক ভাবুক ও লেখকের রচনা আগ্রহের সঙ্গে পড়ি, মতবাদে এবং

মতামতে যাঁদের একজনের সঙ্গে অন্যজনের কোনও মিল নেই। তাতে লেখকের শক্তি বা রচনার বক্তব্য বা প্রসাদগুণ উপভোগের পক্ষে কোনও বাধা জন্মায় না। নীরদচন্দ্রকে আমি সেভাবেই পড়তে শুরু করি। ইতিমধ্যে অনেক কিছুই পড়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আরও অনেক পাঠকের মতো আমারও তর্ক আছে। তিনি ইতিহাস আলোচনা করেন অর্থনীতি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে। এমনকী যে 'অবক্ষয়' দেখে তিনি হতাশ সেখানেও অর্থনৈতিক উত্থানপতনের কোনও সম্পর্ক খুঁজে দেখা তিনি প্রয়োজন মনে করেন না। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণাও সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। মেনে নেওয়া যায় না নারী সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। 'বাঙালি জীবনে রমণী'র মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বইয়ের লেখক তিনি। কিন্তু মেয়েদের চাকুরি করা বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা তিনি ভাবতে পারেন না। যে-সব মেয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমিয়েছেন তাঁদের নিয়ে স্থূল রসিকতা করতেও তাঁর দ্বিধা নেই। একবার সরাসরি এ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলায় তিনি উত্তরে লিখেছিলেন— আমি সেযুগের বাঙালি পুরুষের জীবনকে 'নারীর সন্ধান' বলেছি। তাতে নারীর আর্থিক স্বাধীনতা বা অন্যান্য লৌকিক দিকের কথা উঠতেই পারে না। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি— আমি ব্যাপারটা নারীর দিক থেকে দেখিনি, দেখেছি একমাত্র পুরুষের দিক থেকে।

কখনও কখনও স্ববিরোধিতা, কখনও রক্ষণশীলতা, এবং প্রায়শ বিশেষ থেকে সামান্যে পৌঁছবার জন্য বিপজ্জনক প্রবণতা সত্ত্বেও বলব নীরদচন্দ্র চৌধুরী একালের এক আশ্চর্য বাঙালি ভাবুক। তাঁকে যখন উনিশ শতকের বাংলার তথাকথিত নবজাগরণের শেষ উত্তরাধিকারী বলা হয়, তখন ভুল বলা হয় না। তরুণ গরুড় সম তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা, মহৎ ক্ষুধার এই আবেশ এ কালে আশা করা যায় না। প্রথাসিদ্ধ, আপস-পরায়ণ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। আপন বিশ্বাসের জন্য তিনি চরম মূল্য ধরে দিতেও ইতস্তত করেননি। একশো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি নিজের বিশ্বাস আঁকড়ে থেকেছেন। অথচ প্রচলিত ধর্মমতে তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। আস্থা ছিল না আত্মার অমরত্বেও। তবে কি তিনি তাঁর খ্যাতির অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন? তাও নয়। তিনি লিখেছেন— "আমার অবর্তমানে ব্যক্তি হিসাবে কোনো বাঙালী আমাকে স্মরণ করিবে না।... অন্য বাঙালীর কাছে আমি কোনোদিন শ্রেষ্ঠ বাঙালী বলিয়া গণ্য হইব না। আমার ব্যক্তিত্বের বা লেখার কোনো অভিঘাত বাঙালী জীবনের উপর পড়িবে না, আমার লেখার দ্বারা বাঙালী জীবনে কোনো পরিবর্তন দেখা দিবে না।"

তবু তিনি আমরণ লিখে গেছেন। এই লেখককে ভুলি কেমন করে?

"The point of all this is simply that its not a 'new Nixon' thats now at the top of the polls, It's the old Nixon with his strengths looking stronger and his negatives blurred by the years— and, if he's not quite the white knight we saw in our dreams he's still the best man by far we could send to Washington..."

[*The selling of the President 1968, Joe Mc. Ginniss. (1969)*].

শেষ পর্যন্ত মার্কিন ভোটারদের কাছে রিচার্ড নিক্সনকে 'বিক্রি করা' সম্ভব হয়েছিল। তাঁর এই সাফল্যের পিছনে ছিল মেডিসন অ্যাভিনিউয়ের কারিগরেররা, সাজঘরের কুশলী প্রসাধনকারীরা, দক্ষ বক্তৃতা-লেখকেরা এবং টিভি-র চতুর পরিচালক ও পরিবেশকরা।

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর পিছনে এমন কোনও উপস্থাপক-বাহিনী বা প্রযোজক-পরিবেশক ছিলেন না। পাঠক এবং বুদ্ধিজীবী মহলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে তাঁকে নিজেরই একক উদ্‌যোগে। অথচ গ্রহণযোগ্যতার প্রাথমিক বিচারে নীরদচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন সম্ভবত নিক্সনের অনেক পিছনে। তাঁর নিজের কথায়—'আমার উচ্চতা পাঁচ ফুট আধ ইঞ্চ, ওজন একমণের সামান্য ঊর্ধ্বে সারাজীবন ধরিয়া; দেহ হাড়-জিরজিরে কৃকলাশের মতো। রং আধময়লা; মুখের বিশেষ শ্রী নাই।' শুধু চেহারায় নয়, অন্য লক্ষণেও তিনি ছিলেন বেশ পিছিয়ে-পড়া বাঙালি তরুণ। আবাল্য রুগ্‌ণ নীরদচন্দ্র দীর্ঘকাল নানা কষ্টকর ব্যাধিতে ভুগেছেন। যৌবনে একবার হৃদ্‌রোগের আশঙ্কাও করা হয়েছিল। ৪৮ বছর বয়সেই তিনি পুরোপুরি দন্তহীন। লেখাপড়ায় ভাল হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি তাঁর তহবিলে ছিল না। বংশগৌরব থাকলেও দীর্ঘকাল ছিল না আর্থিক সচ্ছলতা। ছ' বছর কোনও চাকরি ছিল না। তার মধ্যে সাড়ে তিন বছর বেকার জীবন কেটেছে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে। তাঁর নিজের কথায়— 'তখন রাত্রিতে শুইতে যাইবার সময়ে আতঙ্কিত হইয়া দেখিয়াছি বাড়িতে একটি পয়সা নাই। এক মুঠো চাল নাই, অথচ সকালেই দুইটি শিশুকে খাদ্য দিতে হইবে। লাঞ্ছনা ও অপমানের কথা না-ই বলিলাম। তবু মরি নাই।' 'মরি নাই' সরল উক্তি মাত্র। তিনি এখনও বেঁচে আছেন এবং ভীষণভাবে বেঁচে আছেন। নিজের জীবনকে তিনি তুলনা করেছেন রেল লাইনে স্থাপিত একটি গাড়ির সঙ্গে। এমন গাড়ি যার যাত্রাপথ নির্দিষ্ট, লক্ষ্য স্থিরীকৃত। কিন্তু চলার বেগ অনিশ্চিত। কারণ, "ইঞ্জিনটি প্রথম হইতেই ছিল ছোট ও কম শক্তির; তারপর ছিল ভঙ্গুর।... সুতরাং আমার জীবন 'লোকাল ট্রেন' হইয়া গেল। 'ব্রেক-ডাউন' না হইলেও সেই ট্রেনকে পাশের লাইনে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত দ্রুতগামী 'মেল ট্রেন'কে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ট্রেন যে লক্ষ্যে পৌঁছেছে সে সম্পর্কে সন্দেহে নেই। না তাঁর নিজের, না দেশবিদেশে তাঁর পাঠককুলের। নীরদচন্দ্র নিজেকে বিশ্বের ক্ষুদ্র এক কণা বলে গণ্য করেন। সেইসঙ্গে তাঁর ধারণা বিশ্ব তাঁর অন্তহীন শক্তির আধার থেকে তাঁকে প্রয়োজনীয় শক্তি দিয়ে একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারির মতো ছুড়ে দিয়েছে মানুষের পৃথিবীতে। আটানব্বই বছরেও সেই ছোট্ট বৈদ্যুতিক আধারটি এখনও সক্রিয়। আমাদের কালে যে-সব দীর্ঘজীবী সৃজনশীল মানুষের কথা আমরা জানি তাঁদের মধ্যে তিনজনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। বার্নার্ড শ বেঁচে ছিলেন ৯৬ বছর পর্যন্ত। বার্ট্রান্ড রাসেল ৯৮ বছর, পিকাসো ৯২ বছর। প্রাণশক্তিতে নীরদচন্দ্র শুধু তাঁদের সমকক্ষ নন, সম্ভবত অনেক বেশি প্রাণবন্ত। এই বয়সেও তিনি বুদ্ধিজীবী মহলে 'অশ্বমেধ ঘোড়া'র লাগাম ধরে অভিযানে বের হচ্ছেন, শত বর্ষের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে এখনও তিনি কলম হাতে পাঠকমহলে অভিঘাত সৃষ্টি করতে চাইছেন। তাঁর প্রাণ-ঐশ্বর্যের সত্যিই কোনও তুলনা হয় না। অথচ কী অনিশ্চয়তার মধ্যে না তাঁর যাত্রারম্ভ! সেদিন কে জানত এক কালের 'অখ্যাত ভারতীয়' নীরদচন্দ্র চৌধুরী নিজেকে একদিন প্রতিষ্ঠিত করবেন তাঁর আপন কালের সুখ্যাত ভারতীয়দের একজন হিসাবে।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী, মনে হয়, 'ব্র্যাডম্যান ক্লাস' খুঁজতে ভালবাসেন। একবার তিনি বিশ্বের প্রধান চারজন প্রতিভাধরের এক তালিকা তৈরি করেছিলেন। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল পঞ্চম স্থানটি অধিকার করবেন তিনি নিজে। যত দূর জানি, সে-দাবি এখনও তিনি কোথাও পেশ করেননি। কেননা, তাঁরই কথা—'আ স্ট্যান্ডার্ড ইজ আ স্ট্যান্ডার্ড।' তবে এখনও তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি কে তাই নিয়েও আলোচনা করতে বসেন। আমরা নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে কোনও দীর্ঘ,

নাতিদীর্ঘ অথবা হ্রস্ব তালিকায় ঠাঁই দেওয়ার চেষ্টা করব না। তাঁর কালে অনেক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ভারতীয় ছিলেন, এখনও রয়েছেন। বিদ্যার নানা শাখায় কৃতী ভারতীয়ের অভাব নেই। তাঁদের মধ্যে কারও কারও খ্যাতি বিশ্বজোড়া। তবু তাঁদের সঙ্গে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর তুলনার কোনও অর্থ হয় না। কেননা, তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনও বিশেষ কক্ষে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর কক্ষপথ কিংবা তাঁর বিচরণভূমি একান্তভাবে আপন। সেদিক থেকে ভাবলে এই বাঙালি কলমধারী অনন্য। তাঁর এক হাতে যদি ইংরেজি কলম, তবে অন্য হাতে বাংলা। বিস্তর লিখেছেন তিনি। ইংরেজি লিখছেন সেই ১৯২৫ সাল থেকে। বাংলা লেখা শুরু করেন দু'বছর পর, ১৯২৭ সাল থেকে। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বই, 'দি অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান'। তার পর এ পর্যন্ত ১৪টি বই প্রকাশিত হয়েছে। দশটি ইংরেজিতে, চারটি বাংলায়। বেশির ভাগ ইংরেজি বই প্রকাশিত হয়েছে বিদেশে, কিছু এ দেশে। বাংলা বইগুলো সবই অবশ্য কলকাতা থেকে প্রকাশিত। আমাদের আলোচ্য এই বইখানা তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত বাংলা বই। তার কথা পরে। আগে সংক্ষেপে নীরদচন্দ্রের অন্য বইগুলোর কথা। ইংরেজি আত্মজীবনীর পর আরও একখণ্ড আত্মজীবনী বের হয়েছে তাঁর—'দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক'। তা ছাড়া প্রকাশিত অন্যান্য বইয়ের মধ্যে আছে তাঁর প্রথম বিলাত দর্শনের কাহিনী—'আ প্যাসেজ টু ইংল্যান্ড', ম্যাক্স মুলার ও ক্লাইভের দুটি জীবনী, ভারতের সমাজ এবং জনজীবন সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বই 'দ্য কন্টিনেন্ট অব সার্সি', 'হিন্দুইজম' ইত্যাদি। এই 'ইত্যাদি'র মধ্যে 'দ্য ইন্টেলেকচুয়াল ইন ইন্ডিয়া' এবং 'কালচার ইন দ্য ভ্যানিটি ব্যাগ'-এর মতো বইও রয়েছে। বাংলা বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বাঙালী জীবনে রমণী' ছাড়াও 'আত্মঘাতী বাঙালী'-র দুটি খণ্ড এবং 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' শীর্ষক এই আত্মকথা। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেভাবে অবলীলায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছেন বিবিধ বিষয় এবং প্রতিটি রচনায় যেভাবে সৃষ্টি করেছেন বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ তাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

তাঁর পাণ্ডিত্য নিয়ে রসিকতা অজ্ঞ এবং একমাত্র নির্বোধের পক্ষেই সম্ভব। নিবিষ্ট পাঠক, যিনি নীরদচন্দ্র চৌধুরীর রচনার সঙ্গে পরিচিত, তিনি কোনও বিষয়েই তাঁকে বিশেষজ্ঞের শিরোপা দেবেন না হয়তো কিন্তু বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং কলমের জোরে তিনি যে একালের একজন বিশিষ্ট মনস্বী এ সম্পর্কে তর্কের অবকাশ কম। এই মননশীলতাকে নিছক সাংবাদিকতা বলে উড়িয়ে দিলে ভুল হবে। এটা ঠিক, নীরদ চৌধুরীর জীবনের সঙ্গে সাংবাদিকতার সম্পর্ক দীর্ঘকালের। তাঁর প্রথম ইংরেজি ও বাংলা রচনা প্রকাশিত হয় দৈনিক এবং সাময়িকপত্রে। এখনও তিনি সুযোগমতো সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে বাংলা ইংরেজি রচনা লিখতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নন। কেনই বা তা হবেন! একজনের কথা শুনেছি, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন আবার সংবাদপত্রের সঙ্গেও ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি নাকি একবার বলেছিলেন— যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম তখন দেখেছি, মূর্খের পাণ্ডিত্য। বলাই বাহুল্য, দুইটি বিশেষত্বের কোনওটিই যথার্থ অধ্যাপক এবং সাংবাদিকের পক্ষে নিয়ম হতে পারে না। সাংবাদিক নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ক্ষেত্রে তো নয়ই। মনে রাখা চাই পৃথিবীর তাবৎ লেখককুলকে তিনি দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন। এক দল 'ছাগল জাতীয়' অন্য দল 'পাগল জাতীয়'; 'ছাগল জাতীয় লেখক ছাগলের মতোই আচরণ দেখায়। ছাগল সকল

উদ্ভিদই খায় ও ক্রমাগত খাইতে থাকে। সে কি খাইল তাহার বিচার করে না, যাহার দ্বারা উদর পূরণ হইবে তাহাই খায়।... ছাগল জাতীয় লেখক নিজের রুচির অপেক্ষা না রাখিয়া পাঠকেরা যাহা পড়িতে চায় তাহাই লেখে ও ক্রমাগত সেই ধরনের লেখাই লিখিয়া যায়। নিষ্কাম লেখা ছাগল জাতীয় লেখকের ধর্ম নয়।' অন্য দিকে 'পাগল যেমন যাহা খুশি তাহাই বলে, পাগল শ্রেণীর লেখকও তেমনই যাহা খুশি লেখে, উহা লোকের প্রয়োজনে আসিবে কি না, লোকে উহা কিনিবে কি না, অর্থাৎ লেখা হইতে বৈষয়িক লাভ বা জীবনধারণের উপায় হইবে কি না তাহা চিন্তা করে না, লেখার পাগলামি তাহাকে পাইয়া বসে, তাই লেখে।' নীরদচন্দ্র চৌধুরী নিজেকে সেই পাগলদের একজন বলে মনে করেন। ক'জন সাংবাদিক সে তকমা বুকে ধারণ করতে সম্মত হবেন? সুতরাং লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরী আগমার্কা 'পণ্ডিত', অথবা নিছক একজন 'সাংবাদিক'— এই অবান্তর তর্কে রুচি নেই। নীরদচন্দ্র চৌধুরী একজন লেখক এবং প্রাবন্ধিক হিসাবে তিনি আপন কালে যে বিশিষ্ট একজন মননশীল প্রাবন্ধিক এই সত্য মেনে না নিতে পারলে পাঠক নিছক ঈর্ষা, অজ্ঞতা সংকীর্ণতা এবং কুসংস্কার-কবলিত বলে গণ্য হবেন মাত্র।

মনে পড়ে 'বাঙালী জীবনে রমণী' লিখতে বসে তাঁর কিছু উক্তি। তিনি লিখেছিলেন, 'বাঙালীর মনে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি জিনিস একেবারে নূতন করিয়া দেখা দিল— যেমন মানুষের ব্যক্তিত্ব, দেশ ও দেশপ্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধারণা; আবার কতকগুলি জিনিস নূতন চক্ষে, নূতনভাবে দেখিতে শিখিলাম— যেমন ঈশ্বর, নরনারীর দৈহিক সৌন্দর্য, নরনারীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এই সবগুলি লইয়া ইংরেজীতে একটা বই লিখিবার উদ্দেশ্য আছে।' ঊনবিংশ শতাব্দী নিয়ে কত বই-ই না লেখা হয়েছে। কিন্তু বাঙালির সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে, বিশেষত মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে যে স্থূল সূক্ষ্ম পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, দুই মলাটের মধ্যে তা নিয়ে বিশিষ্ট কোনও আলোচনা হয়েছে কি? নীরদচন্দ্রও তাঁর সেই প্রস্তাবিত বইখানি লিখে উঠতে পারেননি। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রোম্যান্টিক প্রেমের উন্মেষ এবং তার বিকাশের যে কাহিনী তিনি 'বাঙালী জীবনে রমণী' বইটিতে উন্মোচন করেছেন, এবং দেহ-সৌন্দর্য থেকে শুরু করে নরনারীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারে যে নতুন ধারণা ও ভাবের নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন, বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় সেটাও সম্ভবত নতুন বিষয়। সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব এখনও বাংলায় তার প্রাপ্য গুরুত্ব লাভ করেনি। নীরদচন্দ্রের ওই বইখানা কিন্তু ইঙ্গিতে জানিয়ে গেছে সেই তাত্ত্বিক আলোচনার সম্ভাবনা কত দূর প্রসারিত। বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্তের বিশেষ সাংস্কৃতিক লক্ষণগুলোর পর্যালোচনার সুযোগ না পেলেও ভারতের ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি নিয়ে 'দ্য কন্টিনেন্ট অব সার্সি' নামে যে-বইটি তিনি মনস্বী পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তার পাতায় পাতায় অফুরন্ত চমক। ভারতীয়দের মুখ্য জনগোষ্ঠীকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন কার্যত পতিত ইউরোপিয়ান বলে। হিন্দুর নানান আচার-অনুষ্ঠানে তিনি বিপন্ন ইউরোপীয় জীবনের অনিবার্য কারণেই নানা বিকৃতির লক্ষণ আবিষ্কার করেছেন। পেশাদার ঐতিহাসিক হয়তো ওই বইটিতে তথ্য ও তত্ত্বগত অসংগতিও খুঁজে পেতে পারেন, কিন্তু আপন দেশের ইতিহাস ও সমাজ-সভ্যতা সম্পর্কে লেখকের অনুসন্ধিৎসা এবং নিজস্ব বিচারবোধ সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না। আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কিত অধ্যায়টি। এদেশের

প্রধান সংখ্যালঘু হিসাবে মুসলমানদের বিষয়েও একটি দীর্ঘ অধ্যায় রয়েছে বটে, কিন্তু অন্য একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাঁর বিশেষ আলোচ্য হয়ে ওঠে। নীরদচন্দ্রের মতে তাঁরাই 'দ্য ডমিনেন্ট মাইনরিটি' বা প্রধান সংখ্যালঘু। কারা তাঁরা? যে ছোট্ট সম্প্রদায়ের, বলতে গেলে, তিনিও একজন সদস্য, সেই ইংরেজ-ভাবাপন্ন উচ্চবর্ণের ও বর্গের ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে নীরদচন্দ্র বলেছেন সব চেয়ে ক্ষমতাবান, সব চেয়ে প্রভাবশালী সংখ্যালঘু। এই সত্য কি অস্বীকার করা যায়? বইটি হাতের কাছে নেই, তবে মনে পড়ে চমৎকৃত হয়েছিলাম আর্যদের যৌথ জাতিগত স্মৃতিসম্পর্কিত কিছু কথা পড়ে। নীরদচন্দ্র বলেছিলেন পাহাড় বন মেঘ সম্পর্কে উত্তর ভারতের মানুষের মনে যে ভাবাবেগ, বরফের জন্য ব্যাকুলতা, সেই ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় অভিযাত্রী আর্যরা বিশ্বের কোন এলাকা থেকে কোন প্রকৃতির পরিচয় নিয়ে 'সার্সি'র এই আপন মহাদেশে এসে পৌঁছেছেন। ওঁরা এদেশে আসার পর চারটি জিনিস কিছুতে ভুলতে পারেননি; যথা: বেদ, ফরসা গায়ের রং, নদী এবং গোরু। কালো মেয়ের দুঃখের পেছনে রহস্য কী তাও তাঁর সন্ধানের বিষয়। এটা ঠিক, বিশেষ থেকে অবলীলায় সামান্যে পৌঁছনো সব সময়ে নিরাপদ নয়, বিচারবিভ্রাটের আশঙ্কা থাকে। সেভাবে খুঁজলে নীরদচন্দ্রের সামান্যকরণেও নিশ্চয় কখনও কখনও ফাঁক খুঁজে পাওয়া যাবে। তবু আমরা অবাক হই, যখন দেখি কিশোরগঞ্জকে অবলীলায় তিনি স্থানান্তরিত করতে পারেন অক্সফোর্ডে। এবং মিলিটারির অ্যাকাউন্টস অফিসের স্থূল যৌনাত্মক কথাবার্তাকে তিনি ব্যবহার করেন বাঙালি জীবনে রমণীর স্থান নির্ণয়ে। ইতিহাস হোক, ধর্মতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব সাহিত্য আলোচনা যাই হোক, আমাদের দেশে সবই করা হয় প্রথাসিদ্ধ প্রণালীতে, বিশেষ ছকের মধ্যে। নীরদচন্দ্রের রচনা এই ছকের, প্রথার বা রীতির বাঁধন মানে না। তাঁর সিদ্ধান্তগুলো যেমন একান্তভাবে ব্যক্তিগত, তাঁর যুক্তিসংগ্রহ এবং আক্রমণ ও রক্ষা-ব্যূহ সাজানোর পদ্ধতিও তেমনই ব্যক্তিগত। মনস্বিতার বিশেষ লক্ষণ যদি এই হয় যে, তিনি নিজের মতো করে এমন কথা বলছেন, যা বহুশ্রুত নয় এবং সমর্থনে এমন সব যুক্তি আহরণ করছেন যা নিছক গ্রন্থপঞ্জি বা উদ্ধৃতিনির্ভর নয়, যত্রতত্র থেকে আহৃত এবং বিনিময়ে পাঠকের মনে অভিঘাত সৃষ্টি করতে সক্ষম, তবে নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে কেন আমরা একজন প্রথম শ্রেণীর বাঙালি ভাবুক বলে স্বীকার করতে দ্বিধাগ্রস্ত হব? তিনি বিশেষ মতবাদের সমর্থক নয় বলে কি? তাঁকে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা যাচ্ছে না বলে কি? আমার মনে হয়, তাত্ত্বিক হিসাবে, লেখক হিসাবে তাঁর কুলজি স্থির করা দুঃসাধ্য বলেই তিনি আরও অপ্রতিরোধ্য!

'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি' তাঁর আত্মকথা। ইংরেজি দুইটি আত্মজীবনীতে পনেরো শত পৃষ্ঠা জুড়ে আপন জীবনের যে কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন, তার কিছু কিছু এ-বইতেও আবার এসেছে। তবে বাংলা রচনাটির সঙ্গে এ-বইয়ের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। এ-বই বস্তুত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর জবানবন্দি। কয়েকটি অধ্যায়ের শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় বাঙালি পাঠকের কাছে তিনি নিজের জীবন সম্পর্কে নিজস্ব কৈফিয়ত দিতে চাইছেন। 'আমি কেন লিখি', 'আমি কেন বিলাতে আছি', 'জীবনের কাহিনী', 'আমি সাম্রাজ্যবাদী কেন', 'আমি একাধারে বাঙালী ও ইংরেজ' ইত্যাদি অধ্যায়-শীর্ষ থেকেই বোঝা যায় তাঁর সম্পর্কে পাঠকের মনে যে জিজ্ঞাসা দীর্ঘকাল ধরে অনুরাগী ও বিরাগীরা সৃষ্টি করে চলেছেন, নীরদচন্দ্র সরাসরি তার উত্তর দিতে চেয়েছেন। এই উত্তর, তাঁর মতে, পাঠককে শোনানো

দরকার। কেননা, নিন্দা ও প্রশংসা দুই ক্ষেত্রেই ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ। কৌতুক করে বলেছেন, 'আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনি, সে-সব কি সত্যি?' 'আমি উত্তর দিয়া থাকি যদি আমার পক্ষে হয়, ধরে নেবেন পনেরো আনা মিথ্যা, আর যদি বিপক্ষে হয়, তবে নিশ্চিত জানবেন, ষোলো আনাই তদ্রূপ।' এ-বইয়ে ভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা তিনি করেননি। খোলাখুলি বলেছেন, নিজের জীবনের কাহিনী এবং জীবন সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণার কথা। এমন খোলামেলা আত্মকথা, এমন স্পষ্ট জবানবন্দি খুব কমই সফল বাঙালি আমাদের শোনাতে পেরেছেন। নীরদচন্দ্রের ইংরেজি আত্মকথা দুইটি অবশ্যই বিশিষ্ট। তিনি নিজের জীবনকে সেখানে স্থাপন করেছেন সমকাল ও সমসাময়িক সমাজের পটভূমিতে। তাঁর জীবন এক দিক থেকে স্বদেশ, স্বকাল এবং সমসাময়িক সমাজের দর্পণ। তিনি একই সঙ্গে দর্শক ও কথক। এ-ধরনের আত্মকথা আমরা কিছু কিছু এ দেশেও দেখেছি। জওহরলাল নেহরুর 'আত্মচরিত' বা 'ভারত সন্ধানে'। একাধারে নিজের কথা এবং দেশের কথা। দেশের ইতিহাস লেখার ফাঁকে ফাঁকেও তিনি বলে নিচ্ছেন নিজের কথা। বাঙালি রাজনীতিকদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র পালের রচনাতেও এই শৈলীটি দেখা যায়। তবে ওঁরা ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। দেশ এবং সমাজের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ। সমকালের রাজনীতিতে তাঁদের ভূমিকাও ছিল বিশিষ্ট। তুলনায় নীরদচন্দ্র চৌধুরী একজন শিক্ষিত সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাত্র। চলমান ইতিহাসে অসংখ্যের ভিড়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে তিনি নিতান্তই একজন দর্শক। কিন্তু সে দর্শক যে কতখানি মনোযোগী এবং তাঁর দৃষ্টির ব্যাপ্তি কত দূর প্রসারিত, আত্মজীবনীর দুই খণ্ডে তার প্রমাণ তিনি রেখেছেন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা শুধু প্রসারে দিগন্তবিস্তৃত নয়, দৃষ্টিভঙ্গিও গভীর এবং কখনও কখনও তির্যক। 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি'-তে তুলনায় আপন কথাই মুখ্য। তাঁর পারিবারিক জীবন, নিজের জীবন, জীবনপথে বাধাবিঘ্ন, বেদনা ও আনন্দ, হতাশা নৈরাশ্য, নিজের ক্ষমতা অক্ষমতা— সবই নির্দ্বিধায় পাঠকের কাছে উন্মোচন করেছেন তিনি। সফল মানুষ সাধারণত নিজের অতীতকে ভুলতে চান, সাফল্যের মোড়কে অক্ষমতাকে আড়াল করতে চান; নীরদচন্দ্র একবারও সে চেষ্টা করেননি। তাঁর চরিত্রের মতোই এ-বইয়ের প্রধান গুণ সততা এবং সাহসিকতা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারা, চাকরি পেয়েও না রাখতে পারা, লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে বাড়ি ছেড়ে রেল-কামরায় আশ্রয় নেওয়া, দুর্ঘটনায় মরতে মরতে বেঁচে যাওয়া এবং জীবন-জীবিকার সন্ধানে কিশোরগঞ্জ থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে শেষ পর্যন্ত অক্সফোর্ড পর্যন্ত দীর্ঘ পথে পদে পদে যে অনিশ্চয়তা এবং হতাশা আর আশাবাদ— সবই বিস্তারিত বলেছেন তিনি। ব্যাখ্যা করেছেন সর্ব লক্ষণে অক্ষম হয়েও কীভাবে শেষ পর্যন্ত সক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন তিনি। তাঁর উক্তি, 'তবে জিজ্ঞাসা করিবেন ছিয়ানব্বই বৎসর পার হইলাম কি করিয়া? ইহার উত্তর সহজ। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে ক্ষুদ্র জন্তু ও আগাছা যত সহজে বাঁচে, যেমন ইঁদুর বা ঘাস, বৃহদাকার প্রাণী ও ভাল ফল ও ফুলের গাছ এত অযত্নে বাঁচে না। সুতরাং দেখা গেল আমার survival যতটা Unfittest-এর বাঁচিয়া থাকা, ততটাই lowliest-এর বাঁচিয়া থাকা।'....

অথচ কোনও দিনই তিনি ইঁদুর কিংবা ঘাসের মতো জীবনযাপন করেনি। সহস্র সমস্যার মধ্যেও নিজের চারিত্র্যধর্ম বাঁচিয়ে রেখেছেন এই ছোটখাটো মানুষটি। তিনি লিখেছেন,

"অনেক বাঙালিই আমার বাহিরের পাট দেখিয়া মনে মনে বলেন, 'বটে! ভেবেছ তোমার হাঁড়ির খবর আমরা রাখি না। আমরা বেশ জানি, তোমার বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন।' সত্যই আমার বাহিরে কোঁচার পত্তন। কিন্তু ভিতরে ঠিক ছুঁচোর কীর্তন হয় নাই।... অবশ্য ইহার জন্য আমাকে অপমানসূচক কথা শুনিতেও হইয়াছে। বন্ধুরাও বলিয়াছেন, 'খেতে পায় না, তবু জানালায় সিল্কের পর্দা টাঙায়!' তাঁহারা বুঝেন নাই যে, এই সিল্কের পর্দা শুধু আমার জানালাতেই ছিল না, আমার দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা এক দিকে, অন্য দিকে আমার মন— এই দুয়ের মধ্যেও ছিল।"

এই পর্দাটিকে তিনি এ-বইয়ে পুরোপুরি সরিয়ে দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁর জীবনের অন্দর ও সদর। লেখালেখি, গৃহস্থালী, বই লেখার পটভূমি, কোন বই কীভাবে ছাপা হল তার কাহিনী। কেন তিনি বিলাতে আছেন, কেন তিনি নিজেকে সাম্রাজ্যবাদী বলেন, কোন যুক্তিতে একই সঙ্গে নিজেকে ইংরেজ এবং বাঙালি বলে দাবি করেন, কেমন করে কোন ক্ষমতার বলে অক্ষম তিনি সাফল্যের এই বিন্দুতে পৌঁছেছেন—সবই সবিস্তারে বলেছেন তিনি তাঁর আশ্চর্য সাবলীল ভাষায় এবং মার্জিত রসবোধ সহ। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর গদ্য এক কথায় অনবদ্য।

তাঁর গদ্যকে নিছক সাধু ভাষা বললে ভুল হবে। সাধু ভাষার যে গতিশীলতা, প্রাঞ্জলতা, এবং কোনও কোনও লেখকের হাতে তার যে সহজ, সবল এবং সরস ব্যবহার আমরা এককালের বাংলা গদ্যে দেখেছি, নীরদচন্দ্রের গদ্য সরাসরি সেই ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্বসূরিদের মতো তাঁর রসবোধও এক বাড়তি প্রাপ্তি। এ-বইয়ে তার উদ্ধৃতিযোগ্য অনেক নমুনাই রয়েছে। ছিটেফোঁটা শোনা যেতে পারে। যথা, "দেশি কাগজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ 'অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ', আর বিলাতি কাগজের সঙ্গে 'লাভ ম্যারেজ'।" 'সজনীবাবুই তাঁহাদের (প্রগতিবাদী লেখকদের) বেশি আক্রমণ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা সজনীবাবুকে গালি দিতে ভরসা পাইত না, কারণ তাঁহার এরকম পাকা খিস্তি আয়ত্ত ছিল যে, সেই অর্বাচীন বালকদের সাধ্যও ছিল না যে তাঁহার সঙ্গে খেউড়ে টেক্কা দেয়।' অথবা "একটি মহিলা (বাহাত্তর পূর্ণ হওয়ার পর) আমার বয়সের অনুচিত চাপল্য দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, 'আপনার বয়স যত বাড়ছে নষ্টামিদুষ্টামিও ততই বাড়ছে।' এখন সাতানব্বই চলিয়াছে, কম হওয়া দূরে থাকুক, সেই চাপল্য আরও বাড়িয়াছে। একেই বলে, 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'— তবে মাইকেলের অর্থে নয়।" অম্ল-মধুর-তিক্ত-কষায় নানা স্বাদের স্মিত হাসির কণা ছড়ানো পাতায় পাতায়।

প্রশ্ন এই, যিনি আবাল্য 'মিটমিটে ডান', 'ফাজিল', 'জ্যাঠা', 'বয়ে যাওয়া ছোকরা', 'অপদার্থ' বলে বিশেষিত হয়েছেন, সাত-আট বছর বয়সে কোনও আত্মীয় যে অপদার্থ ছেলেটিকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'এটিকে ধরে কেবল চাবুক মারা উচিত', সেই নীরদচন্দ্র জীবন-সংগ্রামে বার বার পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েও শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হলেন কীসের বলে? সে কি কোনও ধর্মবিশ্বাসের জোরে, জ্যোতিষীর কোনও ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রেরণায়? না, অক্ষমের এই ক্ষমতা অটল অবিচল আত্মবিশ্বাসেরই ফল? আত্মবিশ্বাস ছাড়া নির্ভর করার মতো অন্য কিছু নেই, এই বিশ্বাস তাঁর যৌবনেই গড়ে ওঠে। বইতে সেই নব-উপলব্ধির কথা তিনি বিস্তারিত বলেছেন। 'প্রথম পরিবর্তন, হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস হারাইলাম। ইহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রচলিত ধর্মেও বিশ্বাস হারাইলাম। সুতরাং হিন্দু না

থাকিয়া ব্রাহ্ম বা খ্রিস্টান হইব, এরূপ সঙ্কল্প আমার মনে কখনও জাগে নাই। আমার মনে প্রশ্ন উঠিল, ধর্মের উপর নির্ভর না করিয়া জীবনকে কিভাবে পরিচালনা করিব, কিসের শক্তিতে বা কিসের ভরসায় জীবনের অনিবার্য দুঃখ-কষ্টকে অতিক্রম করিতে পারিব। আরেকটা গুরুতর পরিবর্তনও ধর্মবিশ্বাস হারাইবার ফলেই আসিল। আমি আত্মার অস্তিত্বে ও পরলোকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।' সুতরাং এ জীবনের মধ্যেই জীবনকে খুঁজতে হবে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন তিনি। বলছেন—'আমি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপর অপরিসীম আস্থা স্থাপন করিলাম। মনে করিলাম জীবনের রহস্য বুঝিবার জন্য বুদ্ধিই যথেষ্ট, বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই।' শেষ পর্যন্ত তিনি অবশ্য বিশ্বাসও খুঁজে পেয়েছেন। সেই বিশ্বাস বিশ্বের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে। তাঁর নব উপলব্ধি, মানুষ এই শক্তির অংশীদার। যা-কিছু করণীয় এই বিশ্বে, এই জীবনে তা করতে হবে। বিশ্বের কাছে তাই এ জীবন দায়বদ্ধ। জীবনকে সে-কারণেই তিনি বলেছেন 'দেবোত্তর সম্পত্তি', অন্যভাবে বললে—'বিশ্বোত্তর'।

সাধ্যমতো নিজের সব শক্তি তিনি নিঃশেষ করে দিচ্ছেন নিজের কাজে। শিকারি কুকুর, শেয়াল এবং মোরগের গল্প শুনিয়ে লিখেছেন, 'আমিও আমার বাঙালী ভাইদের বলিব, তোমরা তোমাদের শত কৌশল লইয়া নিরাপদে থাক, আমি স্বল্পবুদ্ধি প্রাণী— একটি কৌশলমাত্র জানি— লেখা।' এই রচনাই তাঁর জীবন, তাঁর দেবোত্তর তথা বিশ্বোত্তর সম্পত্তি। আমরা যাঁরা একালের পাঠক, নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সব বক্তব্যই কি আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়? অবশ্যই নয়। তাঁর এই বইটিতে নীরদচন্দ্র আত্মগর্ব প্রকাশ করবেন না বলে কথাচ্ছলে স্থানে স্থানে কিন্তু গরিমা প্রকাশে ইতস্তত করেননি। কখনও কখনও অহংজ্ঞান তাঁকে ছেলেমানুষিতেও প্ররোচিত করেছে। 'ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ'-এ বড় মাপের তাঁর ছবি বের হওয়া নিয়ে তিনি বড়াই করে লিখেছেন—'এত বড় প্রতিকৃতি এই পত্রিকায় এক জবাহরলাল নেহরু ও আমার ভিন্ন কোনও ভারতীয়ের বেলাতে ছাপা হয় নাই।' কিংবা অন্যত্র অন্যদের বেতন-সর্বস্বতা নিয়ে রসিকতা করলেও এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'আমার প্রত্যেক দুঃখের চক্র হইতে পরেকার সুখের চক্র বৃহত্তর হইয়াছে।... আমি যখন সরকারি প্রথম চাকুরি ছাড়ি, তখন আমার মাসিক বেতন ছিল ১১০ টাকা। আমার দ্বিতীয় সরকারি চাকুরি যখন ছাড়ি ১৯৫২ সালে, তখন আমার মাহিনা ছিল ১১০০ টাকা। সুতরাং ছাব্বিশ বছরে আমার মাহিনা বাড়িয়াছিল দশ গুণ। অন্য উপার্জনও ছিল।' এরকম আরও অনেক নমুনা ছড়িয়ে আছে বইটিতে। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর জীবন এবং রচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের কাছে এ-সব কথাবার্তা মোটেই অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না। নানা ব্যাপারে তাঁর উন্নাসিকতার কথা অনেকেরই জানা। যেমন তিনি 'পেপারব্যাক' বই পছন্দ করেন না। বলেছেন, 'পেপার-ব্যাক কিনি না। শখের বই এই ধরনের ছাপা ও বাঁধানো হওয়াকে মদ্যপানের শখ থাকিলে ধেনো মদ খাইবার মত মনে করি।' এ-সব কথাবার্তা শুনতে আমার অন্তত মোটেই খারাপ লাগে না। বরং মনে হয় এই অহং, এই উন্নাসিকতা, এই আপাত ছেলেমানুষি নিয়েই আরও আকর্ষণীয় চরিত্র নীরদচন্দ্র চৌধুরী নামক মানুষটি। এমন বর্ণাঢ্য বলেই না তিনি আরও অপ্রতিরোধ্য! কিন্তু তার পরও বলব সব ব্যাপারে তাঁকে নির্বিচারে গ্রহণ করা শক্ত। নীরদচন্দ্র চৌধুরী নিজেকে একই সঙ্গে খাঁটি বাঙালি ও খাঁটি ইংরেজ বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন রামমোহন রায় থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তানদের

সকলেরই ছিল দ্বৈত সত্তা। তাঁরা একই সঙ্গে ছিলেন বাঙালি তথা ভারতীয় এবং ইংরেজ। নিজেকে তিনি ওই দলেই বন্ধনীভুক্ত করেছেন। বলেছেন, 'আমি বাঙালী হিসাবেও খাঁটি, ইংরেজ হিসাবেও খাঁটি। ইহা আজিকার বাঙালীর বোধগম্য হইবে না। না হইবার কারণ এই যে, ইঁহারা বাঙালী হিসাবেও মেকি, সাহেব হিসাবেও মেকি।' তিনি দাবি করেছেন, 'দেশের প্রায় সকল বাঙালীর অপেক্ষা বেশি খাঁটি বাঙালী আছি।' তার পর ব্যঙ্গের সুরে বলেছেন, 'আশা করি এই কথা স্বীকার করিয়া যে সব বাঙালী ও বাঙালিনী দেশে থাকিয়াও জীন্‌স পরেন, তাঁহারাও আমাকে দেশত্যাগী বলিয়া নিন্দা করিবেন না।'

তাঁর বাঙালিয়ানার দাবি অস্বীকার করার উপায় নেই। 'সাহেবিয়ানা'র দাবিকেও না হয় মেনে নেওয়া গেল। ঔপনিবেশিক আমল থেকে ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি তথা ভারতীয়রা বিশেষ বিশেষ লক্ষণে কম-বেশি সবাই সাহেব-ভারতীয় বা এক অর্থে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। নীরদচন্দ্র চৌধুরী নিজেই উচ্চস্বরে তা ঘোষণা করছেন— এই যা। এই স্বীকারোক্তিকে সততার লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন নিজেকে তিনি 'সাম্রাজ্যবাদী' বলে জাহির করেন।

সাম্রাজ্যবাদ বলতে তিনি যদি নিজের বিদ্যাবুদ্ধির শক্তিতে নিকট ও দূরের পাঠকমহলে বুদ্ধিগত আধিপত্য বিস্তার বোঝাতেন, কিংবা কিশোরগঞ্জের বনগ্রাম থেকে কলকাতা এবং কলকাতা থেকে দিল্লি, অবশেষে দিল্লি থেকে অক্সফোর্ডে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাকে বোঝাতেন তা হলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু নীরদচন্দ্র ইতিহাসের পররাজ্য-আগ্রাসী শক্তিমানের দেশে দেশে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার গর্বে উৎফুল্ল, তাদের বন্দনায় মুখর। বস্তুত, ইতিহাসের নিবিড় ছাত্র হিসাবে তাঁর যে পরিচয় 'আমি সাম্রাজ্যবাদী কেন' এই অধ্যায়টি তাঁর পক্ষে নিতান্তই এক শৌখিন মন-গড়া রচনা মাত্র। বিশেষ থেকে সামান্যে পৌঁছবার যে বিপদের কথা আগে বলেছি এই রচনাটি তার একটি প্রমাণ। ব্রিটিশ শাসনের কালে তিনি কত 'পার্সেন্ট' ইনকাম ট্যাক্স দিয়েছেন, আর স্বাধীন ভারতে কত 'পার্সেন্ট' বেশি দিতে বাধ্য হয়েছেন, তাই দিয়ে কি সাম্রাজ্যবাদের গুণাগুণের বিচার হতে পারে? সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীদের ব্যঙ্গ করে তিনি লিখেছেন—'ইংরেজের প্রসঙ্গে যাঁহারা সাম্রাজ্যবিরোধী হইয়াছেন তাঁহাদের জামা খুলিলে দেখা যাইবে, পিঠে লোহা পুড়াইয়া অক্সফোর্ড কেমব্রিজ হারভার্ড ও অন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাগা দেওয়া আছে। আমি এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নই, সুতরাং সাম্রাজ্যবিরোধী হইতে পারিলাম না।' দেশে দেশে স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের যে ইতিবৃত্ত, এটা কিন্তু তার অতি সরলীকরণ। আরও আছে। রোম্যান্টিক প্রেমের সন্ধানে যিনি বাংলা সাহিত্যে তছনছ করেছেন, নব যুগের নরনারী সম্পর্কে যিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পেয়েছেন, নারী সম্পর্কে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন, সেখানে তিনি নিতান্তই সেকেলে এক ভদ্র বাঙালি পুরুষ। এই পুরুষ আদ্যোপান্ত পিতৃতন্ত্রের ভাবধারায় লালিত ও পুষ্ট।

তা না হলে নিজে রোম্যান্টিক স্বভাবের মানুষ হয়েও তিনি প্রচলিত রীতির কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করতে পারতেন না। নীরদচন্দ্র প্রেমের সঙ্গে জ্যামিতির যোগ নিয়ে বিস্তর বলেছেন। প্রেম সম্পর্কে একটি ইকুয়েশনও উপস্থাপন করেছেন।

রোম্যান্টিকতার আবেশে স্বপ্নে তিনি নিজেকে প্রেমিক হিসাবে দেখতে পেয়েছেন। কাশী ও কলকাতায় দূর থেকে দেখা দুটি অপরিচিত রূপসী তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল। এমনকী

একটি ঝুলন্ত শাড়িতেও তিনি তন্বী মূর্তি আবিষ্কার করে উদ্‌বেলিত হয়েছেন। কিন্তু চৌত্রিশ বছর পার হওয়ার পর তিনি বিয়ে করেন পিতার মনোনীত পাত্রীকে। এমনকী কনে দেখার ব্যাপারটাও তিনি অভিভাবকদের ওপরই সমর্পণ করেন। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, সম্মানবোধ, আস্থা এবং নির্ভরতা— সবই তাঁর ছিল। সর্বলক্ষণেই ওঁরা ছিলেন সুখী দম্পতি। স্ত্রী অমিয়া দেবী চৌধুরানী অবশ্যই ছিলেন এই প্রতিভাবান স্বামীর যোগ্য গৃহিণী, সচিব ও সখা। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁর নিজস্ব গুণাবলিরও অভাব ছিল না। দুই খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথা অবশ্যই তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুখপাঠ্য। কিন্তু পড়তে পড়তে মনে হয়, স্বামীর সাধনায় সহযোগিতাই ছিল যেন তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। এ-ধরনের সফল দাম্পত্য সম্পর্ক অনেক দম্পতি নিশ্চয় জীবনে ভোগ করেছেন। কিন্তু তার পরও প্রশ্ন থেকে যায়, নারী কি শুধুই পুরুষ নামক তমালতরু-আশ্রিত সুখী মাধবীলতা? নীরদচন্দ্র অমিয়া দেবীকে উচ্চতর বিদ্যা অর্জনের সুযোগ দেননি। কারণ, স্ত্রী চাকুরি করবেন, এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। উচ্চতম শিক্ষা কি শুধুই চাকুরির জন্যে? যে-সব মেয়ে বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন তাঁদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং রসিকতাও অনেকের কাছে আপত্তিকর মনে হবে। এমনকী, তাঁর অনুরাগীদের পক্ষেও ওইসব স্থূল বাক্য অস্বস্তিকর মনে হবে হয়তো। চাকুরিজীবী মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব সম্পূর্ণ সহানুভূতিবর্জিত। এক কথায়, নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধির সহজ স্বাভাবিক বিকাশ যে সম্ভব, স্বনির্ভরতা যে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ততার পক্ষে জরুরি হতে পারে— এই সহজ স্বাভাবিক সত্য, সুখী আত্মতৃপ্ত সংসারের কর্তা নীরদচন্দ্র যেন পুরোপুরি ভুলে গিয়েছেন। 'অক্ষমের ক্ষমতা' শীর্ষক রচনায় রোম্যান্টিক প্রেমের যে উপভোগ্য আলোচনা আমরা পাই, এইসব উক্তির পর তা অনেকাংশে অর্থহীন হয়ে যায়। প্রকট হয়ে ওঠে ক্ষমতাবানের অক্ষমতা। তা না হলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তিনি রোমের পোপের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতেন না।

তর্ক আর বাড়াব না। রিচার্ড নিক্সন দিয়ে শুরু করেছিলাম। তাঁর প্রসঙ্গ টেনেই শেষ করি।

প্রচার-বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম গ্রাভিন টেলিভিশনে নিক্সনকে দেখার পর শ্রোতা তথা ভোটারদের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সে-সম্পর্কে লিখেছিলেন—'Reason requires a high degree of discipline, of concentration; impression is easier. Reason pushes the viewer back, it assaults him, it demands that he agree or disagree; impression can envelop him, invite him in, without making an intellectual demand...' এই বিদ্বান, তীক্ষ্ণধী, সুরসিক এবং শাণিত কলমধারীর সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার চেয়ে অবশ্য সহজতর তাঁকে মেনে নেওয়া, অথবা বর্জন করা।

বইটি বন্ধ করার সময়ে এই পাঠক শেষ পর্যন্ত চোখ বুজে ভোট দিতে বাধ্য হয়েছেন প্রথম সিদ্ধান্তটিরই সপক্ষে। কারণ, আমাদের এই বর্ণহীন, তর্কহীন, নিস্তরঙ্গ সমাজে এখনও মাঝে মাঝে ঢিল ছুড়ে ঢেউ তুলতে সমর্থ বুঝি বা এই একজনই, শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী, 'আমার দেবোত্তর সম্পত্তি', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪

বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব ও বই
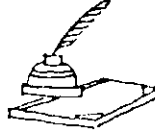
'All historical experience confirms the truth that man would not have attained the possible unless time and again he has reached out for the impossible.'

—Max Weber (1918)

"জার গদিচ্যুত। তাঁর বদলে এসেছেন কেরেনস্কি। এই নবজাত স্বাধীনতা অবশ্য অবিমিশ্র আনন্দের ব্যাপার হয়নি। কেননা পরস্পরবিরোধী নানা দলের আবির্ভাব ঘটেছে। ফলে শাসন-ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত অচলপ্রায়। শোনা যাচ্ছে জনৈক এ উলিয়ানভ লেনিন ক্ষমতা দখল করেছেন। একজন সাবঅলটার্ন নিযুক্ত হয়েছেন দেশের প্রধান সেনাপতি।" ইত্যাদি। ১৯১৭ সালের রুশ-সমাচার জানাচ্ছেন ব্রিটেনের হুইটেকার অ্যালমানাক। ওঁরা তখনও জানেন না রাশিয়ায় কী ঘটে গেছে। দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে রুশ বিপ্লব। এই শতকের এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৪৯ সালে চিন বিপ্লব। ১৯৬৫-৬৯ সালে চিনে আর-এক বিপ্লব। সাংস্কৃতিক বিপ্লব। ১৯৫৪ সালে দিয়েন বিয়েন ফু। হো চি মিনের ভিয়েতনামের কাছে ফরাসি ঔপনিবেশিকদের পরাজয়। ভিয়েতনামে বিপ্লব। ১৯৫৯ সালে কাস্ত্রো তাঁর বাহিনী নিয়ে হাভানায়। বাতিস্তা পর্যুদস্ত। বিপ্লব কিউবায়। মাঝখানে শতকের তৃতীয় দশকে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্কে বিপ্লব। ১৯২৩ সাল। সুলতানের বিদায়। খলিফার ছুটি। তুরস্কে সাধারণতন্ত্র। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছেদ। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। বোরখা এবং ফেজ পরা বারণ। তুর্কিদের পশ্চিমি পোশাক পরতে হবে। লেখাপড়া করতে হবে আরবির বদলে রোমান হরফে। আরও নানা কাণ্ড। বাঙালি কবির কলমে সেদিন বন্দনা— 'কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই।' শতকের দ্বিতীয় দশকেই ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীজির আবির্ভাব। তিন দশকে তিন গণ-আন্দোলন। আইন অমান্য, অসহযোগ, অগস্ট আন্দোলন। যদিও প্রচলিত অর্থে বিপ্লব নয়, তবু শতকের উপাখ্যানে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

কারণ, সেদিনই বিশ্বময় সূচিত হয়েছিল পশ্চিমি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অবসান।

কখনও-বা রথের গতি উলটো দিকে। বিপ্লবের বদলে প্রতিবিপ্লব। কামাল পাশার অনুকরণে আফগানিস্তানে আধুনিকতার আবাহন ঘটাতে গিয়ে ১৯২৯ সালে ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের কাছে গদি হারালেন আমির আমানুল্লা। আফগানিস্তান এখনও অশান্ত। বাতাসে বারুদের গন্ধ। ত্রিশের দশকে ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান। ইতালি, জার্মানি, স্পেন। বিধ্বংসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। অনেক রক্তের বিনিময়ে ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ। ইতিহাসের রথ আবার রাজপথে।

১৯৬৮ সালের মে। আবার বুঝি বা ফিরে এল ফরাসি বিপ্লব। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সমবেত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কেতাকানুন, পঠনপাঠন রীতির বিরুদ্ধে। তাঁরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তাঁরা ধনতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে। পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে। পথে পথে ব্যারিকেড। সেইন নদীর বাম তীর যেন মুক্তাঞ্চল। প্যারিস বলতে গেলে তরুণ-তরুণীদের দখলে। ইংরেজিতে বললে তাঁদের ব্যানারে পোস্টারে উচ্চারিত বক্তব্য— 'রেভলিউশন আই লাভ ইউ!'— 'আনবাটন ইওর ব্রেন অ্যাজ অফেন অ্যাজ ইওর ফ্লাই'— 'ইট ইজ ফরবিডেন টু ফরবিড।' ওঁরা বলছেন— ধনতন্ত্রের বিকল্প আছে। অন্য সমাজও সম্ভব। ধনতন্ত্র এবং রুশ ঘরানায় সমাজতন্ত্রের বাইরে ওঁরা অন্য ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান। ওঁদের সহমর্মিতা দেখাতে ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন ৩০ লক্ষ শ্রমিক। দ্য গল কম্পমান। তিনি শেষ পর্যন্ত আবাহন করেছিলেন দেশপ্রেমের। রক্ষণশীলদের পথে নামিয়ে। প্যারিসের ঢেউ পৌঁছেছিল ইতালি, পশ্চিম জার্মানি এবং ব্রিটেনেও। ফ্যাসিস্ট স্পেন, কমিউনিস্ট চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ডও বাদ ছিল না। সে বছরই প্রাগে বসন্ত। সোশ্যালিজমকে একটা মানবিক মুখ দিতে চান আলেজান্ডার ডুবচেক। হঠাৎ মুক্তির হাওয়া। খোলামেলা রাজনৈতিক আলোচনা, সংবাদপত্রের মুক্তি, শিল্পে সাহিত্যে নাটকে সৃজনশীলতার তরঙ্গায়িত প্রবাহ। দেখাদেখি পোল্যান্ডেও ছাত্ররা আওয়াজ তুললেন— আমাদেরও চাই একজন ডুবচেক। ১৯৫৬-র হাঙ্গারির পুনরাবৃত্তি ঘটল। অগস্টে প্রাগের পথে নাম রুশ ট্যাঙ্ক। কিন্তু স্বপ্ন তবু বিফলে গেল না। ১৯৮৫-৮৬-তে খাস সোভিয়েত ইউনিয়নেই আবির্ভূত হলেন আর-এক ডুবচেক— মিখাইল গোরবাচেভ। গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রোইকা। খোলামেলা আলোচনা, মুক্ত সমাজ, নবনির্মাণ, নববিন্যাস। পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতোই পালাবদল ঘটে চেকোশ্লোভাকিয়ায়। তবে এখানে 'ভেলভেট রেভলিউশান'— মখমলের মতো নরম বিপ্লব।

পরিবর্তন এমনকী খাস সোভিয়েত ইউনিয়নেও। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর প্রয়াত ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী এক প্রবন্ধে ('বিপ্লব দীর্ঘজীবী নয়', দেশ, ২২ অক্টোবর, ১৯৯৪) আইজাক ডয়েশারকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন— রুশ বিপ্লব পূর্ববর্তী আর-সব সফল বিপ্লবের ব্যতিক্রম। কারণ অন্য সব বিপ্লবের উপসংহার ঘটেছে প্রতিবিপ্লবে। "সপ্তদশ শতকের ইংরেজ-বিপ্লবের পরিণাম স্টুয়ার্ট রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন। বাস্তিল দুর্গ পতনের পঞ্চাশতম বছরে কেউ মনে রাখেনি রাজহত্যা বা জাঁকবাদের ত্রাসের রাজত্ব। কিন্তু রুশ বিপ্লব আলাদা। কারণ ডয়েশার মনে করেন প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনা আর আছে বলে মনে হয় না। (Seems to have outlasted all possible agents of vestoration.')" অধ্যাপক ত্রিপাঠী বলেন— "ওই বক্তৃতার ২৪ বছর পরে ১৯৯১ সালের ঘটনা—কমিউনিজম-এর পতন,

ফরাসি বিপ্লব। ১৭৮৯। ভার্সাইয়ের পথে সশস্ত্র বিদ্রোহী নারীর দল। সমসাময়িক চিত্র।

রুশ বিপ্লবের পরে। সোভিয়েট রাশিয়ায় যাজকদের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রচার। একটি দেওয়াল-চিত্র। এই সিরিজে ছবি ছিল সত্তরটি। মস্কো, ১৯২৩।
বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব ও বই
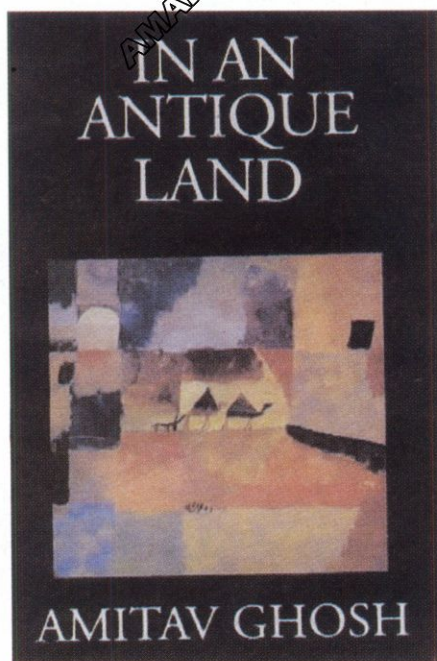
অমিতাভ ঘোষ, 'ইন অ্যান অ্যান্টিক ল্যান্ড' : প্রচ্ছদ চিত্র
ভারতীয় কন্যা আর পরদেশি প্রেমিক

গর্বাচেভের প্রস্থান, ইয়ালৎসিনের উত্থান ডয়সারের দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছে। চোখের সামনে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল স্তালিনের বিশাল সাম্রাজ্য, একশৈলিক পার্টি, আর্থিক/প্রযুক্তির সাফল্য। আজ সেখানে কালোবাজারির মরসুম... রাশিয়া আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের দরজায় ভিক্ষার্থী, তার শিল্পের পর শিল্প উদারকরণের নামে বেসরকারি হাতে!" ১৯১৭ যদি বিপ্লবের বছর হয়, ১৯৯১ তবে প্রতিবিপ্লব বইকী।

বিপ্লব। প্রতিবিপ্লব। 'রিভলিউশন' শব্দটা মূলত জ্যোর্তিবিজ্ঞানের শব্দ। সূর্যের চার দিকে গ্রহ, গ্রহের চার দিকে উপগ্রহের আবর্তন 'রেভলিউশন'। রেমন্ড উইলিয়ামস বলেন রাজনৈতিক অর্থে শব্দটির ব্যবহার বেশ জটিল। আজকাল কথায় কথায় 'বিপ্লব' শব্দটির ছড়াছড়ি পরিবর্তন মানেই যেন বিপ্লব। সবুজ বিপ্লব, সাদা বা দুধ-বিপ্লব, ফ্যাশান-বিপ্লব, কত না বিপ্লব। রেমন্ড উইলিয়ামস বলেন রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে রিভোল্ট বা বিদ্রোহেরও যোগ রয়েছে। 'রেভলিউশন' রাজনৈতিক অর্থে ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে সপ্তদশ শতক থেকে। ফরাসি বিপ্লবে রাজা ও রাজমন্ত্রীর সেই বহু-উদ্ধৃত কথোপকথন স্মরণীয়। ষোড়শ লুইয়ের প্রশ্ন— তবে এটা বিদ্রোহ? মন্ত্রীর উত্তর— না, বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব। বিপ্লব মানে আমূল পরিবর্তন। আমূল এবং সার্বিক। স্থিতাবস্থার বদলে নতুন ব্যবস্থা। যা ছিল তার সংস্কার নয়— সম্পূর্ণ নবনির্মাণ। ('setting up of a new order contradictory to the traditional one.') বিপ্লবীর সেটাই স্বপ্ন, তা-ই তাঁর অভীপ্সা।

বিপ্লব হোক, আর প্রতিবিপ্লবই হোক— তার সমিধ মুদ্রিত হরফ। বই। বই আর বই। বাস্তব পরিস্থিতি যদি পুঞ্জীভূত আবর্জনা, তবে তাকে জ্বালিয়ে দেয় বই নামক দেশলাই কাঠি। দাউ দাউ জ্বলে ওঠে ঝরে যাওয়া জীর্ণ পাতা, প্রতিক্রিয়ার খড়কুটো, প্রতিরোধের ভঙ্গুর দেওয়াল। বই কখনও-বা ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি। অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতে সে বিস্ফোরণ ঘটায়। শাসক বদলায়। সমাজ বদলায়। নেপোলিয়নের অনুকরণ করে লেনিন বলেছিলেন— কামান ধ্বংস করেছে ফিউডালিজমকে, কালি ধ্বংস করবে এই পচা সমাজকে। লক্ষ লক্ষ কালো হরফ বের হয়েছে তাঁর কলমের মুখ থেকে। রোগশয্যায় শেষ ক'টি দিন বাদ দিলে পুথি এবং চিঠিপত্র মিলিয়ে তাঁর রচনাবলি সম্পূর্ণ ৬৩ খণ্ডে। শুধু লেনিন কেন, গান্ধী, মাও, চে— সকলের হাতেই বই।

দুই বিপ্লবের মুখে বসে লেখা লেনিনের দুটি বইয়ের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। একটি, 'করণীয় কী' (*What is to be done,* ১৯০৪), অন্যটি— 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' (*State and Revolution,* ১৯১৭)। কার্ল মার্কসের কথা ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একমাত্র সম্ভব হতে পারে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে। তবে ১৮৮০ সালে তিনিও এই সম্ভাবনা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, রাশিয়ায়ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব। লেনিন এই সম্ভাবনাকে সম্প্রসারিত করে আরও অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম তাঁর চিন্তায় উঁকি দিল গণতান্ত্রিক বিপ্লব। কৃষক ও শ্রমিকের নেতৃত্বে সমস্ত নিপীড়িত মানুষের বিপ্লব। রাতারাতি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ১৯০৫ সালেও তাঁর চিন্তায় অকল্পনীয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদের রীতিনীতি বিচার করে রাশিয়াকে তিনি চিহ্নিত করেন উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল এক দেশ— 'উইকেস্ট লিঙ্ক ইন দ্য চেইন'। এই রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা আছে বইকী। তিনি দেখিয়েছেন যে-দেশে কৃষকরা গরিষ্ঠ

ও দরিদ্র, শ্রমিকের লঘিষ্ঠ ও ক্লিষ্ট, শিল্প শৈশবে, চার্চ সরকারের হাতে হাতিয়ার, গণতন্ত্র রক্তশূন্য, রাষ্ট্র সেখানে তাদের দেশ মাত্র। সুতরাং, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পতাকা ওড়ানো অসম্ভব হবে কেন? এই তত্ত্বে পৌঁছনোর আগে বিপ্লবের মুখে বসে লেখা বই— 'হোয়াট ইজ টু বি ডান'। এই বই পার্টি সম্পর্কে লেনিনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক রচনা। রুশ দেশের শ্রমিক শ্রেণীর কিছু গোষ্ঠী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে সমস্ত শ্রেণীর নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে না লেনিন সেদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন। বস্তুত দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান সম্পর্কে প্রলেতারিয়েতের যে ব্যাপক জ্ঞান বা চেতনা গড়ে ওঠেনি, এ-বইয়ে লেনিন তা তুলে ধরেন। তাঁর মতে প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক সংগ্রাম অত্যন্ত সংকীর্ণ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই তাঁদের পক্ষে নিজেদের উদ্‌যোগে ব্যাপক চেতনা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। নিজেদের মতো চলতে দিলে প্রলেতারিয়েত বুর্জোয়া মতাদর্শ অনুসরণ করবে। তার সুযোগ রাখা চলবে না। হয় বুর্জোয়া পন্থা, নাহয় সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ— এর মধ্যে কোনও অন্য পন্থা নেই। কেননা, মানব প্রজন্ম কোনও তৃতীয় মতাদর্শ সৃষ্টি করেনি। আর শ্রেণীদীর্ণ সমাজে 'নন-ক্লাস', কোনও-না-কোনও শ্রেণীতে পড়েন না, এমন মানুষ যেমন নেই, তেমনই নেই 'অ্যাবাভ-ক্লাস', বা সব শ্রেণীর ঊর্ধ্বেও কেউ। সে-কারণেই পার্টির দায়িত্ব নির্দেশ করতে এই বই। ১৯১৭ সালের পরে লেনিন আর সেটি প্রকাশ করেননি। এ-বই পার্টির গঠন পর্বের বই। নতুন করে তার তাত্ত্বিক মূল্য তুলে ধরা হয় আবার স্তালিন পর্বে।

'স্টেট অ্যান্ড রেভলিউশন', ১৯১৭ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফিনল্যান্ডের রাজলিব দ্বীপে বসে লেখা। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত লেনিনের মৌল ধারণা ছিল ধনতান্ত্রিক রাশিয়ায় বুর্জোয়া বিপ্লব পরিচালিত হবে প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে। বিপ্লবের লক্ষ্য তখন স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে রুশ দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। রুশ দেশের বিরাট কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মৈত্রী করা হবে কি না তা নিয়ে মতভেদের অন্ত ছিল না। লেনিনই প্রথম মার্কসবাদী যিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নে কৃষকদের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পশ্চিম ইউরোপের সংগ্রামে মার্কসবাদীরা লিবারেলদের যে ভূমিকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন লেনিন রুশ দেশে কৃষক সম্প্রদায়কে সেই ভূমিকা দিতে চান। 'স্টেট অ্যান্ড রেভলিউশন'— তাত্ত্বিক কারণে সন্দেহ নেই এক গুরুত্বপূর্ণ বই।

চলতে চলতে লেনিনের মত বদল হয়েছে বার বার। রাষ্ট্র উচ্ছেদের বদলে তার প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়েছিলেন তিনি। ফলে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। ১৯১৯ সালের মধ্যেই ডিকটেটরশিপ অফ দ্য প্রলেতারিয়েত পরিণত হয় ডিকটেটরশিপ অব দ্য পার্টিতে। ১৯১৭ সালের আগে লেনিন কখনও একদলীয় শাসনের অধীন রাষ্ট্রের কথা বলেননি। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ, যুদ্ধকালীন কমিউনিজম এবং আমলাতন্ত্রের বিকাশ লেনিনকে বাধ্য করে পার্টির নেতৃত্বের উপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করতে। আমলাতন্ত্রের বিকাশের জন্য একশিলা নকশাটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠে। রুশ স্বৈরতন্ত্রে যে-ধরনের আমলাতান্ত্রিক কাজকর্ম চলত, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত দেশেও ক্রমে তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পার্টি সংগঠনও যে ক্রমে এভাবে আমলাতন্ত্রের প্রভাবের অধীনে চলে যাবে, মনে হয় লেনিনের মনে সে-আশঙ্কা ছিল না। পরে ঠিক সেটাই ঘটে। এবং ঘটনাবলি ক্রমে ক্রমে ১৯৯১ সালের দিকে এগিয়ে যায়।

লেনিনের মতো মাও জে দং‌ও লিখেছেন বিস্তর। ১৯৪০ সালে 'যুদ্ধের সমস্যা ও রণনীতি' শীর্ষক নিবন্ধে ('Problems of war and strategy') তিনি লিখেছিলেন— এই সত্য বুঝে নিতে হবে যে বন্দুকের নলই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। আমাদের নীতি হবে, বন্দুক থাকবে পার্টির হাতে। বন্দুক কখনও চালনা করবে না পার্টিকে। এই বন্দুকের বলেই অষ্টম পদাতিক বাহিনী উত্তর চিনে শক্তিশালী পার্টি সংগঠন গড়ে তুলেছে। আমরা ক্যাডার তৈরি করেছি, স্কুল গড়ে তুলেছি, গড়ে তুলেছি গণ-আন্দোলন। ইয়েনানে যা-কিছু সৃষ্টি করেছি আমরা, করেছি বন্দুকের জোরে।— 'অল থিংস গো আউট অব দ্য ব্যারেল অব দ্য গান'। মাও কবিতাও লিখতেন। বন্দুকের বন্দনায় তিনি যেন বিমুগ্ধ এক কবি। ভবিষ্যৎ বিপ্লব সম্পর্কে মাওয়ের ধারণা রূপ পায় তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'নয়া গণতন্ত্রে' ('New Democracy', ১৯৪০)। সেখানে লেনিনের নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে স্তালিন যেভাবে পপুলার ফ্রন্ট গড়ে তুলেছিলেন তারই প্রভাবে মাও লেখেন চিনে বিপ্লব ঘটবে দুই স্তরে। প্রথমে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, তার পর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। চিন বিপ্লব বিশ্ব-বিপ্লবেরই অংশ। তাই যদিও সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্যের যুগে এই পর্বে চিন-বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব, তা পরিচালনা করতে হবে প্রলেতারিয়েত নেতৃত্বে। দুই পর্যায়ই কিন্তু চিনে সাধিত হয়েছিল একসঙ্গে। কারণ, মাও মনে করতেন তিনি লড়াই করছেন বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে নয়, এমন একটি নতুন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে যার নেতৃত্বে থাকবে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণী, আর পুরোভাগে থাকবে চিনের প্রলেতারিয়েত। এই প্রলেতারিয়েতের গরিষ্ঠ অংশই চিনের কৃষক। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করা হবে— সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। মাওয়ের ভাষায়— নয়া গণতন্ত্র।

এই পর্যায়ে তাঁর আরও দুটি বিখ্যাত রচনা 'অন প্র্যাকটিস' ('On Practice) আর 'অন কনট্রাডিকশন' ('On Contradiction')। দ্বিতীয়টির শেষ কথা— যুদ্ধ যেমন রূপান্তরিত হয় শান্তিতে, তেমনই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে শাসিত প্রলেতারিয়েতের পক্ষে সম্ভব শাসকে পরিণত হওয়া। আর, তখন বুর্জোয়ারা, যাঁরা এতকাল শাসন করে এসেছেন তাঁরা হয়ে যান শাসিত। মাওয়ের নেতৃত্বে চিনের বিপ্লবে নানা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে। একটি অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশে বিপ্লব সম্ভব করেছেন মাও। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৩৪ সালে শুরু হয়েছিল কিয়াংশি থেকে শেনসির লক্ষ্যে দীর্ঘ পদযাত্রা, তিন হাজার মাইলের লং মার্চ।

সফল বিপ্লবের প্রায় দুই দশক পরে চিনে আবার বিপ্লব। এবার সাংস্কৃতিক বিপ্লব। ১৯৬৫ সালে তা সূচিত হয়েছিল অপেরার লড়াই দিয়ে। নব যুগের নতুন অপেরা বনাম পুরনো দিনের অপেরা। নতুন মানুষ নতুন অপেরা দেখতে চান। কিন্তু নেতারা অনেকেই পুরনোর ভক্ত। দ্বন্দ্ব তা-ই নিয়ে। শুরু হয় পোস্টারের লড়াই। মাও পুরনোপন্থীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ডাক দিলেন। সেটা ১৯৬৬ সালের কথা। এতকাল তর্ক চলছিল পার্টির কর্মী আর কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে। এবার শামিল হলেন ছাত্র আর যুব সমাজ। মাও তাঁদের নিয়ে গড়ে তুললেন রেড গার্ড। নিজের হাতে তাদের পরিয়ে দিলেন লাল ব্যাজ। হাতে হাতে তুলে দিলেন ছোট্ট একখানা লাল মলাটের বই— 'রেড বুক'। মাওয়ের বাণী সংকলন।— বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস।...আইন সভা শুয়োরের খাঁচা,... বিপ্লব ভোজসভা নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্তরের দশকে কলকাতার দেওয়ালেও তার প্রতিধ্বনি। নিজে পোস্টার লিখলেন মাও— সদর দফতরে কামান দাগাও! রেডগার্ড যাবতীয় পুরনো প্রথা, পুরনো রীতিনীতি,

পুরনো চিন্তা, পুরনো সংস্কৃতি উচ্ছেদের নামে দেশ জুড়ে আন্দোলনে নামল। দেশ তছনছ। চার দিকে চরম বিশৃঙ্খলা। অর্থনীতি প্রায় অচল। দেশে নৈরাজ্যের হাওয়া। তত্ত্বগতভাবে যাঁরা সাংস্কৃতিক বিপ্লব অনুমোদন করেন তাঁরাও স্বীকার করেন রেডগার্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। স্বভাবতই শুরু হয় সংশোধনের পালা। ভাঙনের পর আবার পুনর্নির্মাণ। সেই সূত্রেই দুই দশক আগে দেঙ জিয়াও পিং-এর আবির্ভাব। ১৯৯৯ চিনা বিপ্লবের সুবর্ণ জয়ন্তী। দেঙ-এর নবীকরণ আন্দোলনের কুড়ি বছর পূর্তি। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় নাকি জানা গিয়েছে এই মুহূর্তে চিনে শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীর দেঙ জিয়াও পিং। শ্রেষ্ঠের তালিকায় মাওয়ের স্থান— পঞ্চম।

কাগজ কলম বই গান্ধীজির হাতেও। দিনের পর দিন তিনি লিখেছেন 'হরিজন'-এর পাতায়। রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সমাজনীতি— কিছুই বাদ নেই। গান্ধীর ক্ষেত্রে সবই গুরুত্বপূর্ণ। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবধারার সন্ধান মেলে যদি 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' *(The Indian Struggle)* আর 'তরুণের স্বপ্ন'-তে, গান্ধীজির তবে 'হিন্দ স্বরাজ'-এর পাতায় পাতায় ('Hind Swaraj or Indian Home Rule')। ১৯০৯ সালে লন্ডন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরার পথে জাহাজে বসে লেখা ৭৬ পৃষ্ঠার এই ছোট্ট বইটিকে বলা চলে গান্ধীজির জীবনবেদ। লিখেছিলেন গুজরাতিতে। কলম কখনও ডান হাতে, কখনও নাকি বাঁ হাতে। প্রথমে তা ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়, 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রে। ইংরেজি অনুবাদ তাঁর নিজেরই করা। বই হিসাবে ভারতে হিন্দ স্বরাজ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে। গান্ধীবাদের মূল এবং মৌলিক তত্ত্বের ভিত খুঁজে পাওয়া যায় এই ছোট্ট বইটিতে। সত্যের সঙ্গে তাঁর জীবনভর পরীক্ষার অন্তর্নিহিত যে দর্শন তারই রূপরেখা মেলে হিন্দ স্বরাজে। গান্ধী বলেন— আমরা যদি ন্যায় পথে থাকি তবে ভারত তাড়াতাড়ি স্বাধীন হবে। আমরা যদি প্রত্যেক ইংরেজকে শত্রুভাবে চিন্তা করে চলি তবে স্বশাসন বিলম্বিত হবে। আমরা যদি তাঁদের সঙ্গে ন্যায়সম্মত আচরণ করি তবে আমরা তাঁদের সমর্থন পাব। স্বশাসন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য আমরা যদি ইংরেজকে বাদ দিয়ে ইংরেজি-শাসন চাই তা হলে সেটা হবে বাঘকে বাদ দিয়ে বাঘের চরিত্র লাভ করার মতো। ভারতকে ইংরেজ করে ফেলবে এমন স্বরাজ আমি চাই না। গান্ধী কী চেয়েছিলেন আর ভারত কী পেয়েছে, সে-হিসাব কার না জানা।

অতঃপর নব্য-বামের বইপত্র সম্পর্কে কিছু কথা। বিপ্লবের উপাখ্যানে এবং সমকালের আরও কারও কারও রচনা ছিল বিপ্লব কিংবা ব্যর্থ বিপ্লবের প্রেরণাস্বরূপ। '৬০ এবং '৭০-এর দশকের গোড়ায় লাতিন আমেরিকার অনেক দেশ বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর। জনমন উত্তাল। আর্জেন্তিনার সন্তান চে গেভারা সেদিন দেশে দেশে পরিণত এক স্বপ্নালু বীর নায়কে। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। মেক্সিকোর বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সেখান থেকে কিউবা। কাস্ত্রোর সঙ্গে প্রথম দেখা ১৯৫৫ সালে। কিউবার সফল বিপ্লবের পর কিছুকাল সরকারে ছিলেন। তার পর চলে যান কঙ্গো। সেখান থেকে ফিরে এসে বলিভিয়ার অরণ্যে গেরিলা ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সরকারি বাহিনীর হাতে ১৯৬৭ সালে তাঁর মৃত্যু। তাঁর কবর আবিষ্কৃত হয় ১৯৯৭ সালের জুলাইয়ে। কালো বুক খোলা শার্ট, ঘন কালো চুল, আয়ত চোখ, গালে কালো চাপ দাড়ি। ছবি দেখে জন বার্জার লিখেছিলেন— খ্রিস্টের প্রতিমা। সে প্রতিমা যখন লাশঘরে তখন তার আলোকচিত্র

দেখে মন্তব্য করেছিলেন তিনি— যেন রেমব্রান্টের 'অ্যানাটমি লেসন্‌স'। আলবের্তো কোর্দার সেই ফোটোগ্রাফ লক্ষ লক্ষ ছাপিয়ে ইউরোপ প্লাবিত করে দেন ইতালির এক প্রকাশক ফেলত্রিনেল্লি। চে পরিণত হন 'কাল্টফিগার'-এ। তিনি চিরবিপ্লবী। তিনি শহিদ।— 'ভিভা চে!'

চে-র কিউবার বিপ্লবের স্মৃতিচারণ সেদিন খুবই জনপ্রিয়। জনপ্রিয় তাঁর বলিভিয়ান ডায়েরিও। তাঁর বক্তব্য ছিল: সবার উপরে গেরিলা বিপ্লবী গোষ্ঠী, পার্টি তার নীচে। গেরিলারাই সংগঠিত করবে গ্রামের কৃষককে। তারা গ্রামীণ সমাজকে পালটে দেবে। মাওয়ের মতো তাঁরও ভরসা কৃষকশ্রেণী। কিছুকাল চে'র সঙ্গী হয়েছিলেন ফরাসি তরুণ সাংবাদিক রেজি দেব্রে। নব্য-বামের তিনিও একজন তাত্ত্বিক। তবে তিনি বলেন তাঁর তত্ত্ব একান্তভাবে লাতিন আমেরিকাতেই প্রয়োগ করা সম্ভব, অন্যত্র নয়। কিউবার বিপ্লব বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন— লাতিন আমেরিকায় ধ্রুপদী মার্কসবাদ অচল। চাই গেরিলা বাহিনী। তারা পাহাড়ে কিংবা বনে গিয়ে আশ্রয় নেবে। সেখান থেকে গ্রামীণ এলাকায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে দ্রুত চলনশীল গণ-ফৌজ গড়ে তুলে লড়াই করে ক্ষমতা দখল করবে। এবং তার পর প্রতিষ্ঠা করবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। 'রেভলিউশন ইন রেভলিউশন'-এ দেব্রে বলেন—

গেরিলা গোষ্ঠীকে পার্টির অধীন করলে সেটা হবে মারাত্মক ভুল। কারণ, পার্টির সাধারণ কাজকর্মের সঙ্গে গেরিলাদের কর্মধারার কোনও মিল নেই। দেব্রে মনে করেন শহরের বসতি এলাকায় পার্টির কাজকর্ম বৈপ্লবিক চেতনাকে ভোঁতা করে দেয়। পাহাড় এমনকী বুর্জোয়াকেও প্রলেতারিয়েতে পরিণত করতে পারে, শহর প্রলেতারিয়েতকে করে তোলে বুর্জোয়া ভাবাপন্ন। পার্টির অগ্রবর্তী বাহিনী হিসাবে গঠিত গেরিলা গোষ্ঠীর নাম দিয়েছিলেন তিনি 'ফোকো' (Foco)। তারই মধ্যে নাকি নিহিত সত্যকারের পার্টির ভ্রূণ। দেব্রে পরে নিজেই স্বীকার করেছেন— তাঁর তত্ত্ব ছিল ভুল। ফিদেল কাস্ত্রো, গেভারা, সালভাদোর আলেন্দে এবং ফ্রঁসোয়া মিতেরঁ— চার-চারজন নায়কের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা ছিল দেব্রের। সম্প্রতি এক স্মৃতিকথায় নাকি বলেছেন— চারজনের কেউই তাঁকে খুশি করতে পারেননি। প্রত্যাশা তাঁর অপূর্ণই রয়ে গেল।

নব-বামের আর-এক সাগ্নিক ফানঁ। তাঁর মূল ফরাসি বইটির নামের অর্থ— 'দ্য ড্যামড' *(The Damned)*। ইংরেজি অনুবাদের পর নাম রাখা হয়— 'দ্য রেচেড অব দি আর্থ'। *(The Wretched of the Earth)*। আফ্রিকার সন্তান ফানঁ ছিলেন চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী এবং ক্ষুরধার কলমধারী লেখক। জঁ পল সার্ত্রর বন্ধু। ফরাসি উপনিবেশ আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তিনি। বেশ-কিছু বই লিখেছেন ফানঁ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'ব্ল্যাক স্কিন, হোয়াইট মাস্ক' *(Black Skin, White Mask)*, 'আ ডায়িং কলোনিয়ালিজম' *(A Dying Colonialism)*, 'টুওয়ার্ডস আফ্রিকান রেভলিউশন' *(Towards African Revolution)*। তবে তাঁর সবচেয়ে প্রভাবশালী বই— 'দ্য রেচেড অব দ্য আর্থ'।

ফানঁর বক্তব্য-সার মোটামুটি এইরকম: উন্নত পুঁজিবাদী দেশে, এমনকী কিছু পরিমাণে তৃতীয় বিশ্বেও শ্রমিকশ্রেণী আর বিপ্লবের প্রধান স্তম্ভ নয়। এ-ব্যাপারে মার্কস-এর বিশ্লেষণ কিংবা প্রত্যাশা প্রমাণিত ও পূর্ণ হয়নি। এই শ্রেণী কিছু সুযোগসুবিধার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে। বিপ্লবের সম্ভাবনা মূলত নিহিত আজ তৃতীয় বিশ্বের কৃষকদের

হৃদয়ে। তাঁরাই সবচেয়ে অত্যাচারিত। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া তাঁদের সামনে অন্য পথ খোলা নেই। এই লড়াইয়ে চালিকা শক্তি ফার্নাঁ-র মতে, ঘৃণা। বর্ণভেদ এবং ঔপনিবেশিক পীড়নের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ঘৃণা। ফানঁ মনে করেন হিংসা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। এই ঘৃণা সাধারণ মানুষের ঘৃণা। তাকে শিক্ষিত এবং দীক্ষিত করে তুলবেন সচেতন নেতারা। তাঁরাই জনতাকে সমাজের বাস্তব সত্য বুঝতে সাহায্য করবেন, তাদের হাতে হাতে তুলে দেবেন মীমাংসার চাবিকাঠি। ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী হিংসাকে তিনি পরিণত করেছিলেন— বিশল্যকরণীতে। তাঁর ঘৃণার উপলক্ষ এমনকী বুর্জোয়া মানসিকতায় আক্রান্ত শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধেও। ঔপনিবেশিক শক্তি আর তার সহচরদের বিরুদ্ধে তিনি লড়াইয়ে ডাক দেন এলিট পাতি বুর্জোয়া, লুম্পেন প্রলেতারিয়েত আর কৃষকের সক্রোধ সহিংস জোটকে। একজন মন্তব্য করছেন— আফ্রিকায় বিপ্লবের ব্যর্থতার দায় এই ধরনের মতবাদের। দায়ী, যত আন্তরিক, যত শুদ্ধচিত্ত হন, ফানঁ নিজেও।

ষাটের দশকে নব্য ফরাসি বিপ্লবের, ঐতিহাসিক ছাত্র-বিদ্রোহে ক্রিয়াশীল ছিল নব বামের এইসব অপ্রচলিত, অপ্রত্যাশিত ভাবাদর্শ। মার্কস, মাও, লেনিন, ট্রটস্কি এবং পুরনো দিনের নৈরাজ্যবাদীরা— নেপথ্যে সবাই কমবেশি হাজির ছিলেন বটে, কিন্তু সামনের সারিতে তাত্ত্বিক হিসাবে, এগিয়ে আসেন চে, দেব্রে, ফানঁ এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রখ্যাত দার্শনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা হার্বার্ট মার্কুইস। তা ছাড়া সার্ত্রে তো ছিলেনই। গার্সিয়া মার্কেস-এর 'ওয়ান ডাইমেনশনাল ম্যান' *(One Dimensional Man)*, 'সোভিয়েত মার্কসিজম *(Soviet Marxism)* 'ইরস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন' *(Eross and Civilization)* তৎকালে অতিশয় প্রভাবশালী বই। মার্কুইস, বলা যেতে পারে ষাট-সত্তর দশকের ছাত্রবিদ্রোহের পিছনে প্রধান প্রাণ-পুরুষ। তিনি বিপ্লবের পুণ্য দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন ছাত্রসমাজের উপর। তাঁর 'ওয়ান ডাইমেনশনাল ম্যান'-এর প্রতিপাদ্য ছিল উন্নত ধনবাদী সমাজে মানব-বিযুক্তি বা 'অ্যালিয়েনেশন'। মার্কস-এর অ্যালিয়েনেশন তত্ত্বকে সেদিন কতভাবেই না ব্যাখ্যা করেছেন নানা তাত্ত্বিক। উল্লেখ করা প্রয়োজন নব ফরাসি বিপ্লবে প্রেরণা জুগিয়েছেন নব্য নারীবাদী তাত্ত্বিকরাও। সৃজনশীলতার অন্তত সে-যুগ এক অর্থে বৈপ্লবিক যুগ বটে। উল্লেখ্য, নব্য-বামরাও কিন্তু মার্কসবাদেরই সন্তান-সন্ততি। লেনিন, মাও, হো চি মিনরা হয়তো সরাসরি উত্তর পুরুষ, বা অন্যরাও লতায় পাতায় সম্পর্কিত মার্কস লেনিন মাওয়ের সঙ্গে। ১৮৪৮ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, ১৮৬৭ সালে ক্যাপিটাল-এর প্রথম খণ্ড। এই দুই বই ছাড়াও আধুনিক চিন্তার জগতে মার্কস এঙ্গেলস আইডিয়ার এক অফুরন্ত উৎস।

ফ্যাসিবাদের সঙ্গেও বইয়ের নিবিড় আত্মীয়তা। অনেক বই পুড়িয়েছেন ফ্যাসিবাদীরা। ১৯৩৩ সালের মে মাসে রীতিমতো ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে শত শত মানুষের হর্ষধ্বনির মধ্যে বার্লিনে বই পুড়িয়েছেন গোয়েবলস। আগুনে বই পুড়ছে, সেইসঙ্গে চলেছে তাঁর আগ্নেয় বক্তৃতা— টু নাইট ইউ উইল ডু ওয়েল টু থ্রো ইন দ্য ফায়ার অবসিনিটিস ফ্রম দ্য পাস্ট।' অতীতের অশ্লীল আবর্জনা পোড়ানো হচ্ছে। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, বলে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে বই। কুড়ি হাজার বই পোড়ানো হয়েছিল সেদিন। তালিকায় ছিল ফ্রয়েড, মার্কস, জোলা, প্রুস্ত, আইনস্টাইন, এইচ জি ওয়েলস, টমাস মান, জ্যাক লন্ডন এবং আরও অনেকের রচনাবলি।

কিন্তু ফ্যাসিবাদীদেরও চাই বই। মাইন কাম্ফ-এর ভূমিকায় হিটলার লিখেছিলেন—'এই

বই আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে না, বরং সংগ্রাম যাঁদের হৃদয়ের দাবি তাঁদের কাছাকাছি আমাকে পৌঁছে দেবে, তাঁদের জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করবে। আমি জানি যত লোককে মুখের কথায় কাজ করানো যায়, লেখা দ্বারা তা সম্ভব নয়। প্রতিটি সৎ এবং মহৎ সংগ্রাম পৃথিবীতে যা সংগঠিত হয়েছে তা জন্ম নিয়েছে মহৎ বক্তার বক্তৃতা থেকে, কোনও বড় লেখকের লেখা থেকে নয়।' তবু শুধু গলাবাজিতে চলে না, বই লিখতে হয়। লিখতে হয় 'মাইন কাম্ফ'। হিটলার তার পাতায় স্বীকার করেছেন একটি বই তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। সেটি ফ্রাঙ্কো-জার্মান ইতিহাস। দুটি পর্বে লেখা একটি সচিত্র বই। যুদ্ধের তথ্যপঞ্জিতে ঠাসা। 'আর', হিটলার বলেন— 'এই বইটি পড়েই কতকগুলো প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে জেগে ওঠে।' সে-কারণেই হয়তো প্রশ্ন এবং উত্তর দুই-ই জোগাত 'মাইন কাম্ফ'।

ফ্যাসিবাদ এই শতকে ফুলে পল্লবে বিকশিত হয়ে উঠলেও বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হয়েছিল গত শতকেই। তার গূঢ় মন্ত্র নিহিত ছিল নিটশে এবং ফরাসি দার্শনিক গোবিনো ও জার্মান চেম্বারলেনের রচনায়। নিটশে কোনও বিশেষ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেননি। তাঁর 'অতিমানব' আসবেন বিভিন্ন দেশ ও গোষ্ঠী থেকে। তিনি জার্মান ইহুদিদের সংখ্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও ইহুদি-বিদ্বেষী ছিলেন না। তবে নিটশের শক্তিপূজা, কোমলতার প্রতি অবজ্ঞা, অতিমানবতত্ত্ব ফ্যাসিবাদের পক্ষে প্রেরণা হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। গোবিনোর বক্তব্যও ফ্যাসিবাদকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বলেন সব জাতির বিশেষত্ব আছে। তবে শ্বেতাঙ্গ জাতি শ্রেষ্ঠ। আর শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সব-চেয়ে সেরা জার্মানরা। অভিজাত ফরাসিরাও জার্মানদের বংশধর। গোবিনোর আত্মিক শিষ্য স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন জন্মসূত্রে ইংরেজ হলেও জার্মান নাগরিক। তাঁর কথা— যা ভাল নয় তা অ-জার্মান। যা জার্মান নয়, তাই খারাপ। ইহুদি ধর্মের সঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। জার্মানরাই খাঁটি খ্রিস্টান। জার্মান রক্তের, বিশুদ্ধতা রক্ষাও চেম্বারলেনের চিন্তায় জরুরি। এ-ধরনের অনেক বই এবং পুস্তিকাই প্রচারিত হয়েছে শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপে। আর তা ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে ফ্যাসিবাদের বুনিয়াদ। অনেক বিশিষ্ট চিন্তাশীল লেখক এবং শিল্পী সেদিন ফ্যাসিবাদের অনুরাগী। ফ্যাসিবাদ অনেক প্রভাবশালী লেখকের সমর্থন ল্যাভ করেছে। প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে। কোনও কোনও ফ্যাসিবাদী লেখক সৃজনশীল রচনায়ও দেখিয়েছেন সাফল্য এবং সার্থকতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অতএব মুসোলিনি আর হিটলারের একক কৃতিত্ব নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হয়। কিন্তু ফ্যাসিবাদীদের কাছে সেই ধ্বংসস্তূপে পুষ্পিত কাঁটাগুল্মের মতো বেঁচে থাকে স্পেন। এই শতকে অন্যতম প্রতিবিপ্লব সেখানে। ১৯৩১ সালে এক ডিক্টেটরশিপ উচ্ছেদ করে স্পেনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা দেশান্তরী হন। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন সাধারণতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রীরা। দক্ষিণপন্থীরা বাধা দেন। গণতন্ত্রীরা '৩৬ সাল অবধি গদিতে ছিলেন। সে বছর নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী ও মধ্যপন্থীদের পরাস্ত করে নির্বাচনে জয়ী হন বামপন্থীরা। পপুলার ফ্রন্টের নেতা হিসাবে মানোয়েল আসানা প্রেসিডেন্টের আসনে বসেন। ভূমিসংস্কার থেকে শুরু করে নানা সংস্কারমূলক কাজকর্ম শুরু হয়। শুরু হয় দক্ষিণপন্থীদের প্রতি আক্রমণ। বিদ্রোহ। প্রথমে শুরু হয় স্প্যানিশ মরক্কোয়, তার পর তা ছড়িয়ে পড়ে খাস স্পেনে। এক দিকে বামপন্থী ও গণতন্ত্রীরা, অন্য দিকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে উচ্চশ্রেণীর আমলা, জমিদার, জোতদার,

সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণী, ক্যাথলিক এবং রাজতন্ত্রীরা। তাঁদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউরোপের নানা দেশের ফ্যাসিবাদীরা এক আন্তর্জাতিক বাহিনী গড়ে তোলে। সাধারণতন্ত্রীদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাঁরাও জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। দেশে চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলে তিন বছর ধরে। দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান এই যুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিবাদীদের সমর্থনের ফলে ফ্যাসিবাদীদেরই জয় হয়। যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে। জেনারেল ফ্রাঙ্কো দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে গদিতে বসেন ১৯৪২ সালে। অতঃপর স্পেনে দীর্ঘ অন্ধকার রজনী। ফ্রাঙ্কোর দলই দেশে একমাত্র রাজনৈতিক দল।

এভাবে কখনও বিপ্লব, কখনও প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে ইতিহাস। কখনও কোথাও কোথাও এগিয়ে যাওয়া, আবার কোথাও পিছিয়ে পড়া। শতকের সংক্রান্তিতে পৌঁছে চার দিকে তাকালে কি মনে হয় তবে কি ফুকুয়াসাই সত্য? ইতিহাসে সত্যিই কি দাঁড়ি টানা হয়ে গেছে? অবশ্যই নয়। সত্য, সমাজতান্ত্রিক শিবির ছত্রখান। দেশে দেশে কমিউনিস্টরা সাইনবোর্ড পালটে ফেলছেন। এখন কমিউনিস্ট কম, তাঁদের অধিকাংশই বুঝি-বা ভূতপূর্ব কমিউনিস্ট। ধনতন্ত্রের বিজয়পতাকা পতপত করে উড়ছে। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি বিশ্বকে পরিণত করেছে এক গণ্ডগ্রামে। দুনিয়া জুড়ে বাজারের আবহাওয়া। উদারনীতি আর বাজারি অর্থনীতির জয়জয়কার। এই বিজয় অবশ্য নিরবচ্ছিন্ন নয়। আকাশে থেকে থেকে অনিশ্চয়তার ছায়া। পূর্ব এশিয়ার ব্যাঘ্র-শাবকরাও কোথাও কোথাও বিড়ালে পরিণত। বত্রিশ বছর বজ্রমুষ্টিতে শাসন করার পর ইন্দোনেশিয়ায় গদি ছাড়তে হয়েছে জেনারেল সুহার্তোকে। সেখানে গণ-আন্দোলনের ঢেউ। ইউরোপের দেশে দেশে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের অভ্যুদয়। চরম দক্ষিণপন্থাই শেষ কথা নয় কোথাও। পৃথিবী স্পষ্টতই স্থির নয়। পরিবর্তিত, এমনকী চিনও। কুড়ি বছর আগে দেঙ জিয়াও পিং-এর আধুনিকীকরণের চার মন্ত্র নিয়ে নতুন পথে পা বাড়িয়েছিল চিন। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আর সামরিক বাহিনী— চার ক্ষেত্রেই চাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার সংকল্প। চার সংকল্পই বলতে গেলে পূর্ণ। নিয়ন্ত্রিত উদার অর্থনীতির চর্চা করে চিন আজ সর্বার্থেই অতিশয় শক্তিমান। তবু বিপদের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ১৯৮৯ সালে তিয়েনানমেন স্কোয়ারের ঘটনা ইঙ্গিতে জানিয়ে গেছে চিনের গোড়ালিতে একটি বিপজ্জনক বিন্দু রয়ে গেছে। দেঙ সর্বক্ষেত্রে সংস্কারের সুপবন বইয়ে দিয়েছেন বটে। কিন্তু রাজনৈতিক কাঠামোকে রাখা হয়েছে যথাপূর্ব। চিনে এখনও কমিউনিস্ট দলের একচ্ছত্র শাসন। দ্বিতীয়ত, একই দেশে দুই ধরনের আর্থিক বন্দোবস্তের ফলেও জনমনে অস্থিরতার লক্ষণ স্পষ্ট। অলাভজনক কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, ফলে বেকারি বর্ধমান। তৃতীয়ত, পর্যবেক্ষকরা বলেন ধনতান্ত্রিক আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে চিনে শুধু পশ্চিমি সংস্কৃতির নানা অবাঞ্ছিত উপাদানই যে জনপ্রিয়তা লাভ করছে তা নয়, দেশে দেখা দিয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি। নাইট ক্লাব, পশ্চিমি ফিল্ম, জ্যাজ এবং পপ সংগীত, ফ্যাশন শো, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, বেশ্যাবৃত্তি, কোনও কিছুই বাদ নেই। আর দুর্নীতি? প্রধানমন্ত্রী ঝু রংজি অবশ্য কড়া হাতে দুর্নীতি দমনে সচেষ্ট, কিন্তু একটি পশ্চিমি কাগজের মতে সুডৌল পেলব আপেল ভেতর থেকে পোকায় খেয়ে নিচ্ছে। ওঁরা হিসাব কষেছেন দুর্নীতির জন্য সরকারকে সাকুল্যে খেসারত দিতে হয়েছে ৩.৭ ট্রিলিয়ন ডলার, বার্ষিক জি ডি পি-র চার গুণ। এই পাপ থেকে পার্টি সদস্যরাও

নাকি মুক্ত নয়। সম্প্রতি ৯০০ পার্টি সদস্যকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অবস্থা নাকি এমন দাঁড়িয়েছে যে, দুর্নীতির উচ্ছেদ ঘটাতে হলে পার্টিকেই উচ্ছেদ করতে হয়, আর দুর্নীতি চলতে দিলে জাতির প্রাণসংকট। সুতরাং, চিন এখনও এক বৃহৎ প্রশ্নচিহ্ন।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় এখন শিবরাত্রির সলতের মতো জ্বলছে— কিউবা। এ বছর জানুয়ারি ১ তারিখে ছিল বিপ্লবের ৪০ বছর পূর্তি। সান্তিয়াগোর যে টাউন হলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে চল্লিশ বছর আগে নিজেদের বিজয়বার্তা ঘোষণা করেছিলেন ফেদেল কাস্ত্রো, সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি গ্রহণ করেছেন জনতার অভিনন্দন। মাথার চুল পেকে গেছে, দাড়িতেও পাক ধরেছে। বিপ্লবের সময় বয়স ছিল তাঁর চৌত্রিশ। এখন চুয়াত্তর। কিন্তু গায়ে তাঁর সেদিনও সামরিক উর্দি। তৎকালে ঘাড়ে রাইফেল ফেলে কাস্ত্রো নাকি একটানা কুড়ি দিন হাঁটতে পারতেন। পরশু খেয়েছেন কি না মনে রাখতে পারতেন না, বক্তৃতা করেছেন পাঁচ ঘণ্টা। এবার অবশ্য দেড় ঘণ্টায় থেমেছেন তিনি। শত্রুদের মুখে ছাই দিয়ে কিউবা এখনও টিঁকে আছে, এটাই ছিল তাঁর বক্তব্যের সার। কিন্তু আর কতকাল? কিউবার মানুষের উত্তর— চিরকাল— 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক', এই ছিল সেদিনও স্লোগান।

সফল অথবা ব্যর্থ, মানুষ পরিবর্তনের জন্য স্বপ্ন দেখবেই। কখনও কখনও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে সে। অন্যরা হয়তো তখন ছক কাটবে প্রতিবিপ্লবের। বিপ্লব অথবা প্রতিবিপ্লব, কোনও কিছুই নিখরচায় হয় না। বিপ্লবের জন্য যেমন ঢালা হয়েছে ঘড়া ঘড়া রক্ত, প্রতিবিপ্লবের জন্যও তেমনই। এমনকী গণতন্ত্রও নিখরচায় চলে না। নানাভাবে তারও চাই রক্তের মূল্য। তবু বিপ্লবের স্বপ্ন, সংকল্প। মনে পড়ে জর্জ অরওয়েল-এর 'হোমেজ টু ক্যাটালোনিয়া'য় *(Homage to Catalonia)* বর্ণিত একটি দৃশ্যের কথা। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। আহত হয়ে হসপিটাল ট্রেনে অন্য আহতদের সঙ্গে ফিরে আসছেন। পথে উলটো দিক থেকে আসা স্বেচ্ছা-সৈনিক বোঝাই ট্রেনের সঙ্গে দেখা। ওঁরা চলেছেন রণাঙ্গনের দিকে। আহতরা সর্বশক্তি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন ওঁদের। জানালায় জানালায় আন্দোলিত হাত। একজনের হাতে একটি ক্রাচ!

এই হচ্ছে মানুষের ইতিহাস। এক দল পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে আসে। অন্য দল এগিয়ে যায়।

রচনায় উল্লেখিত, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী
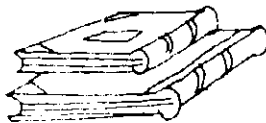
এই সংকলনে যে-সব বই আলোচিত

1. Alberto Manguel, *A History of Reading*, Viking, New York, 1996.

2. Jonathon Green, *Chasing the Sun: Dictionary Makers and the Dictionaries they Made*, Pimlico, London, 1997.

3. *Alberunir Bharat Tattva (Alberuni's Kitab-fi-Tahkike Malil Hende Min Makalatum Mokbulatun fil-Akleao Marzulatun)*, translated by Mahamed Habibullah, Bangla Academy, Dacca, second edn., 1982 (in Bengali).

4. Jeremiah P. Losty, *The Art of the Book in India*, The British Library, London, 1982.

5. Nathaniel Brassey Halhed, *A Grammar of the Bengal Language*, Hoogly, August, 1778.

6. *Half a Tale [Ardhakathanaka]*, tr. by Mukund Lath, Rajasthan Prakrit Bharati Sansthan, Jaipur, 1981.

7. John Noble Wilford, *The Mapmakers: The Story of the Great Pioneers in Cartography— From Antiquity to the Space Age*, Pimlico, London, 2002.

8. Susan Gole, *India within The Ganges*, Jaya Prints, New Delhi, 1983.

9.(A) —*Indian Maps and Plans: from earliest times to the advent of European surveys*, Manohar, 1989.

(B) —*Maps of Mughal India, Drawn by Colonal Jean-Baptiste Joseph Gentil, agent for the French Government to the court of Shuja-ud-daula at Faizabad, in 1770*, Manohar, New Delhi, 1988.

10. Dava Sobel, *Longitude: The True Story of A Lone Genius who solved the Greatest Scientific Problem of His Times*, Fourth Estate, London.

11. Arno Karlen, *Man and Microbes: Diseases and Plauges in History and Modern Times*, G. P. Putnam's Sons, New York, 1995.

12. Marilyn Yalom, Alfred A. Knopf, *A History of the Breast*, New York, 1997.

Gentil, agent for the French Government to the court of Shuja-ud-daula at Faizabad, in 1770, Manohar, New Delhi, 1988.

10. Dava Sobel, *Longitude: The True Story of A Lone Genius who solved the Greatest Scientific Problem of His Times,* Fourth Estate, London.

11. Arno Karlen, *Man and Microbes: Diseases and Plauges in History and Modern Times,* G. P. Putnam's Sons, New York, 1995.

12. Marilyn Yalom, Alfred A. Knopf, *A History of the Breast,* New York, 1997.

13. (A) Ronald Hyam, *Empire And Sexuality,* Manchester University Press, Manchester, 1992.

(B) Anfon Gill, *Ruling Passions: Sex, Race and Empire,* B. B. C. Books, London, 1995.

14. Desmond Doig, *My Kind of Kathmandu, An Artist's Impression of the Emerald Valley,* Harpen Collins/Indus, New Delhi.

নির্ঘণ্ট